শরৎচন্দ্রের নারীসমাজ
ও
সেকালের একালের বারবনিতা

অমরেন্দ্র দাস

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জিত দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৬
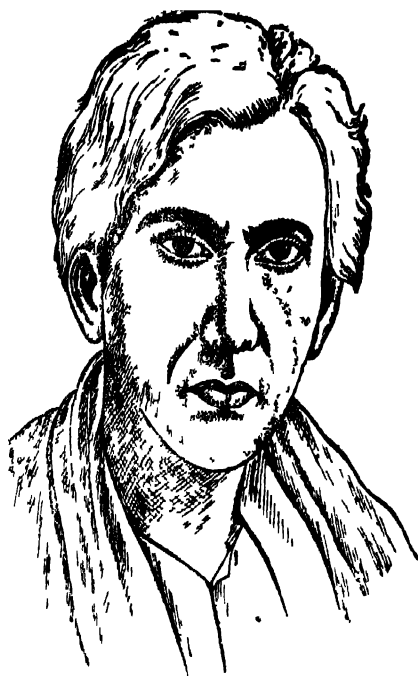
জন্ম ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬।

মৃত্যু ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮।

লেখা না এলে ভাবনার সাগরে ডুবে শরৎচন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে এই ধরণের গান গাইতেন।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
—আকুল করিল মোর প্রাণ,
সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।"

উৎসর্গঃ

যারা চোখে কাজল, মুখে স্নো, শাড়ী ঘুরিয়ে পরে সন্ধ্যেবেলা খদ্দেব ডাকে, যাদের এক চোখে জল, এক চোখে বাঁচাব বেসাতি—তাদের কথা শরৎচন্দ্র যেমন বলেছেন, আমরা ও না বলে পাবি না।

সেইসব হতভাগী মেয়েদের উদ্দেশ্যে—

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ঐতিহাসিক উপন্যাস—

বেগম ম্রিজিয়া
জেবুন্নিসা
নজরানা
সরদানা
বাঈ বেগম বাঁদী
নর্তকী নিকী
সিরাজের কৈজী
যমনাবাঈ
পুতলীবাঈ
দিলবাহার
নেভে নাই দীপ
এই সেতু সেই সেতু
ইমন রাগে সানাই
বেকসুর খালাস
বিদ্রোহিনী
ক্রীতদাসী
বেলোয়ারী বিলাস
মিঠি বেগম
আশমানের আয়না

রহস্য উপন্যাস—

বিবর্ণ পলাশ
পয়লার রাত্রি

প্রবন্ধ—

রাজনারায়ণের কলকাতা

পৌরানিক উপন্যাস—

রূপে অরূপে মহামায়া

সামাজিক উপন্যাস—

নূপুর ছন্দ
অন্যতরঙ্গ
শনিবারের সম্রাট
সুলতার স্বর্গ
এ পৃথিবী স্বর্গ নয়
আকাশ কন্যা
পটে আঁকা ছবি
নীল পদ্মের আলপনা
আলেয়া মঞ্জিল
আলোর লগন
তিতিক্ষা
কয়েকঘণ্টা বৃষ্টি
রঙ বদলায়
দিন বদলায়
তবু আকাশ রাঙা
কালীঘাটের ঘর সংসার
কুহু কুহু, শ্রীমতী সংবাদ

গল্পগ্রন্থ—

মেমবৌ
লুগে

কিশোর উপন্যাস—

নাম নেই ছেলেটির
অদৃশ্য দেবতা
ম্যাচিক
এর শেষ নেই
ক্রীতদাসী

'শ্রদ্ধাঞ্জলি'

শ্রদ্ধা মানুষকে জানানো যায় কখন, যখন তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হন। শ্রদ্ধারও শ্রেণীবিভাগ আছে। বয়েসে বড় হলে শ্রদ্ধার পাত্র হন কিন্তু সে শুধু বয়সেরই হেরফের। মনে একটা তাচ্ছিল্য কি সেইজন্যে থাকে না? জন্ম দিয়ে সবকিছু বিচার করা যায় না। তবু শ্রদ্ধা একটা এমন বস্তু, যা মন থেকেই উৎসারিত হয়। মনের একোণ ওকোণ জুড়ে ঝর্ণার মত শতধা হয়ে বেরিয়ে আসে। সেটা কেন হয়? মনের পরিপূর্ণ বিচারই তো এই উৎসমুখ খুলে দেয়। শরৎচন্দ্র সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এই লেখকের শ্রদ্ধা সমস্ত বিচারের পরই শতধা হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখবার আগে পর্যন্ত নানাজনের মতবাদে তিক্ততা লুকোনো যায় নি। একবাক্যে এই বরেণ্য লেখককে কেউই তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দিতে নারাজ। নানাজনের নানা মত। তাঁর লেখার মধ্যে অনেক ফাঁক, অনেক গোলমাল। আর জনপ্রিয়তা? 'ও এদেশে এখনও অল্প বিদ্যার লোক প্রচুর। সহজ সরল লেখা বলে লোকে খুব পড়ে।' এই হালকা যুক্তি এ যেন Tradition হয়ে গেছে। বরেণ্য লেখক জীবৎকালেও এর শিকার হয়েছিলেন। সেইজন্যে আক্ষেপে বলতে হয়। 'আমরা বাঙালী জাতি কি কারও ভাল দেখতে পারি না?' শরৎচন্দ্র যে আমাদেরই একজন ছিলেন। আমাদেরই পরমাত্মীয়। বরং এও বলা যায় তিনি সারাজীবন আমাদেরই কিসে ভাল হবে তার চিন্তা করে গেছেন। তাঁর লেখার কোন চরিত্র তো অবাঙালী ছিল না। তিনি যে মনে প্রাণে বাঙালী সেটাই বার বার লেখার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। বরং এও বলা যায়, যাঁরা অবাঙালী, যারা অন্য ভাষাভাষী, যাঁরা তাঁর লেখা অনুবাদের মাধ্যমে পড়েছেন, তাঁরা উপরিলিখিত বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু যাঁর গভীরত্ব সমুদ্র সমান, বক্তব্য প্রাণের শিকড় ধরে টান দেয়, তাঁকে প্রাণ থেকে সরায় কে? তাই তিনি অন্য ভাষাভাষীরও প্রাণের মানুষ হয়ে গেছেন। দরদী কথা সাহিত্যিক যে সত্যি কথা এর আর দ্বিমত নেই। তিনি যেন সবার আঘাতকে জয় করে ক্ষমার চোখে মানুষকে দেখেছেন। মানুষই তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী ছিল। সেই মানুষের অবিচার কি তাঁর অজানা ছিল? যখন তাঁর প্রতিটি বই সংস্করণের পর সংস্করণ হচ্ছে, তখনও তিনি যে বিরুদ্ধ সমালোচনার শিকার হয়েছেন। 'অরক্ষণীয়া' গ্রন্থাকারে প্রকাশ হবার সময়ে একজন

অখ্যাত বন্ধুর ভূমিকাই তার প্রমাণ। সেই শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে শরৎচন্দ্র নিজের বইতে জুড়েছিলেন। এবং তাতে লেখা ছিল, 'শরৎবাবুর গ্রন্থে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রী চরিত্রই অধিক ফুটিয়াছে, প্রিয়নাথের অপেক্ষা দুর্গামণি অধিক ফুটিয়াছে, অতুলের অপেক্ষা জ্ঞানদা অধিক ফুটিয়াছে, শম্ভু চাটুযো অপেক্ষা পোড়াকাঠ অধিক ফুটিয়াছে…।' কি দুভার্গ্য এই লেখক জীবনের? একদফা বিরাট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে লিখতে হয়, ভাল হলেও তার নানান ঝড় ঝাপ্টা। পাঠক যদি তুলে নেয়, লেখকপাঠক তাকে অস্বীকার করে। এই লেখকপাঠকের জ্বালায় শরৎচন্দ্রকেও কম নাস্তানাবুদ হতে হয় নি। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আজ শতবর্ষেও তাঁর জনপ্রিয়তা কেউ খর্ব করতে পারে নি। তাই ভয় হয়, শরৎচন্দ্রের না হয় জনপ্রিয়তা ছিল মূলধন। অন্যদের অবস্থা।

তাই যুদ্ধং দেহি বলে লেখককে বুকে অজস্র বল সঞ্চয় করতে হয়। শুধু কলম ধরলেই হয় না, ঝাপ্টা সহ্য করবার মত অপরিমিত মানসিক বল দরকার। আমাদের কালেও যে তার কোন হেরফের আছে বলে মনে হয় না। সেই একই Tradition সমানে চলে আসছে। তার কোন পরিবর্তন নেই।

তাই বলতে হয়, সমালোচনার পরোয়া না করে আপনার কাজ আপনি করে যাও। মুখ আছে, মুখের ট্যাক্স তো আর নেই, সেই মুখ কথা ছড়াবেই শরৎচন্দ্র যেমন এক এক সময় রাগী স্বভাবটা প্রকাশ না করে পারেন নি। 'আমি যা লিখেছি, বুঝে শুনেই লিখেছি, আমার কলম আমার অবাধ্য নয়।'

এসব কথা জোড়া দিয়েই সেই মানুষটার অন্তঃস্থল পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে এসব কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। অভিজ্ঞতা যে নানা দিকে ছিল তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর সমস্ত রচনা পাঠেই বোঝা যায়। বিশেষ করে তাঁর অভিনব নারী চরিত্র। এসব কথা তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে কিছু কিছু আলোচনার মাধ্যমে বলেছি। এখন এই শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখতে গিয়ে সপক্ষে কিছু কৈফিয়ৎ। তাঁর নারীচরিত্রের মানসিকতা জানতে গিয়ে তাঁর মতই কিছু অপাংক্তেয় নারীদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। তাদের জীবন ভাবনা দেখে এই লেখকও অবাক হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র একদিন এদের অবস্থা দেখে তাদের সাহিত্যে তুলে নিয়ে এসে তাদের মানসিকতা প্রকাশ করেছিলেন, কি নিদারুণ যে তাদের জীবন! আরও যেন নিদারুণ। এই লেখক দেখেও চোখে জল রাখতে পারে নি।

অনেকে অবশ্য এই লেখা পড়তে পড়তে এই লেখককেও কটূক্তি না করে ছাড়বেন না কিন্তু সে কটূক্তি হজমই করতে হবে। শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করতে গেলে যে বারাঙ্গনালয়ে না গেলে তাঁর আসল মূল্যায়নে ফাঁক থেকে যায়, সেটাই মনে হয়েছে।

কিন্তু যাদের জন্যে এত করেছেন, দু'চারজন ছাড়া তারা জানেই না তাদের একজন অতি কাছের মানুষ ছিল, যি'ন তাদের জীবনের জন্যে কত আন্দোলন করে গেছেন। তারা এমনই এক চিন্তার ঘোরে থাকে, যা দেখে অবাক হতে হয়।

সেই অবাকই এই লেখকও হয়েছে।

'তোমরা শরৎচন্দ্রকে চেনো না?'

'কে শরৎচন্দ্র? আমাদের বাড়ীতে যে ঠাকুর পূজো করে? না, না সে তো অনাদিচরণ। তবে?'

'অনেক ভাল ভাল বই লিখেছেন।'

'বই তো আমি পড়ি না। মালতীদি পড়ে।'

'সিনেমা দেখ নি?'

'হ্যাঁ।'

'দেবদাস দেখেছ?'

'হিন্দী। হ্যাঁ দেখেছি। বৈজয়ন্তীমালা ছিল।'

'তারই লেখক।'

'ও, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?'

এই চিন্তাই ঐ সব জায়গার মেয়েদের। কিন্তু ওরা না জানুক, ওখানেই যে নারীমনের আসল স্বরূপ দেখা যায়, শরৎচন্দ্র যেমন দেখেছিলেন, আমরাও দেখি। ওখান থেকেই পেয়েছেন শরৎচন্দ্র তাঁর অপূর্ব কতকগুলি নিটোল মহিয়সী নারী চরিত্র। যারা লেখকের সৃষ্ট হলেও সজীব ও প্রাণবন্ত।

সেইসব মেয়েরা আজও আছে। আজও তাদের জীবন একই খাদে বয়ে চলেছে, তাদের কোন পরিবর্তন নেই। আর পরিবর্তন যে হবে না এর মূল্যায়ন এর পাতায় পাতায় করেছি। এক লেখক হয়ে আর একজন লেখকের মানসিকতা ধরবার চেষ্টা করেছি। এ সমালোচনা গ্রন্থ নয়। সমালোচনা করবার অধিকার এক ধরণের বিদ্বজ্জনের করায়ত্ত। এ অনুজ লেখকের অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। শ্রদ্ধাঞ্জলিই। তার বেশি নয় কিন্তু এই শ্রদ্ধার বেদী তৈরি

করতে গিয়ে যে শ্রম স্বীকার করতে হল, সে এই কথার যোজনায় বোঝানো যাবে না।

বিরাট সমুদ্রের তল খুঁজতে গিয়ে যেমন, ডুবুরীকে সমুদ্রের তল পর্যন্ত নেমে পড়তে হয়, সেইভাবেই লেখকের পূর্ণমূল্যায়ন করেছি। একজন মানুষের মন যেমন অন্যে বোঝে না। তার সঙ্গে মিশে তার মন বুঝতে হয়, তেমনি শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, তাঁর বৈঠকী গল্প, সমালোচকদের নানান গ্রন্থ পাঠে সেই মানুষটির মনের আসল স্বরূপটি জানবার চেষ্টা করেছি। কতখানি সার্থক হয়েছি জানি না। তার ওপর সাহিত্যের পাতায় শরৎচন্দ্র আমাদের তৃতীয় পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পথ প্রদর্শক, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র, তার পরের জন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র কি ভাবে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অবাক হতে হয়। আমাদের গর্ব, বলতে গেলে ঈশ্বরেরই কৃপা, বাংলা সাহিত্য উর্বর করতে এই তিন প্রধানের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই তিন প্রধানের লেখনী নিঃসৃত চরিত্রগুলি আজও আমাদেব ভাবায়। আজও আমরা ব্যবহারিক জীবনে নানা আলোচনার মধ্যে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিনী' 'চোখের বালির বিনোদিনী' 'চরিত্রহীনের কিরণময়ীকে' মনে করি। একবারও ভাবি না, এ শিল্পীদের কল্পনা, এ যেন সজীব ও আমাদের কাছের মানুষ।

এই যে অমর সৃষ্টি, এরপর তো কিছু নেই। তাহলে এদের শক্তির কথা আমরা কি করে বিস্মৃত হই? এইসব কথা বলার কারণ, ঐ উন্নাসিক পণ্ডিতদেব একটু বুঝিয়ে দেওয়া, তোমরা যতই শিল্পীকে নস্যাৎ কর, তিনি অনেকের প্রাণের মধ্যে ঢুকে গেছেন, তাঁকে সরানো বড় সহজ নয়, সরাতে গেলে তোমাকেও তাঁর মত হতে হবে, সেই প্রাণের মধ্যে ঢুকে তাঁর জায়গা কেড়ে নিতে হবে। সে কি খুব সহজ কাজ?

যাক্ এ নিয়ে চিরকাল বাদানুবাদ চলছে, এবং চলবেই। আমার এ ক্ষুদ্র মানসিকতায় যেটুকু পিতৃতর্পণ করা উচিত করলাম। অনেকে আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন কিন্তু একেবারে তুচ্ছও যে হবে না এই মনে হয়।

২৩এ, নুর আলি লেন,
কলিকাতা-১৪

অমরেন্দ্র দাস

বিষয়-সূচী

ব্যক্তি মানস

একজন মহৎ মানুষের মহৎ চিন্তার চাবিকাঠি তাঁর জন্মলগ্ন। জন্মের পর থেকেই তাঁর চিন্তাভাবনা, চলাফেরা, ভাবুকপ্রিয় মন, সবার সঙ্গে আলাদা একটু, কেমন যেন বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। আত্মীয় স্বজনেরা বলে, 'এ কেমন ধারা ছেলে হয়েছে গো, খাওয়া, বসা, ঘুম, লেখাপড়া, খেলাধুলা কিছুই করে না, শুধু নির্জনে একা একা বসে থাকে? আর চোখ মেলে আকাশের অসীম শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে?' তন্ময়, গভীর তন্ময়তার মধ্যে কোথায় যে ভাবসমাধি হয় ছেলে নিজেই জানে না। কেউ ঠেলা দিলে আচমকা বাহ্যজগতে ফিরে আসে কিন্তু দৃষ্টি দেখে বিস্ময় জাগে, এ চোখে এখনও সেই অসীম শূন্যের সুদূরের প্রতিচ্ছায়া।

এমনি স্বভাবই বুঝি মহৎ জীবনের চাবিকাঠি। আমরা চিরকাল যে সব মহৎ মানুষের দেখা পেয়ে এসেছি, শৈশবকাল তাঁদের প্রায় একই ছাঁচে ঢালা ছিল। মহৎ জীবনের গোড়াপত্তন তাই শৈশবকাল দেখেই বোঝা যায়। একই ধারায় শৈশবকাল ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামী বিবেকানন্দের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের, আরও আরও অনেকের।

আমাদের আলোচ্য মানুষের শৈশবকালও ছিল একই ধাঁচের। বাইরেটা ছিল শান্ত প্রকৃতির কিন্তু ভেতরটা দুর্জয় কৌতূহলের। চঞ্চল, অস্থির কি যে মন চায় সে নিজেই জানে না। বিশ্ব প্রকৃতির এই বিশ্ব মেলায় কত বিস্ময়ই না নানা রঙে ছবির মতো ফুটে আছে। কিশোর কি পারে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এই সব অপার্থিব বস্তুর আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে? বঞ্চিত হন নি বলেই শরৎচন্দ্র কৈশোর থেকেই বাউণ্ডুলে ও ভবঘুরে। প্রকৃতি তাঁকে টেনেছে, প্রকৃতি তাঁকে ঘর ছাড়িয়ে নিজের সৌন্দর্য দেখিয়ে দিয়েছে। আর কানে কানে বলে দিয়েছে, 'মানুষের সংসারের সৌন্দর্য তুমি কি দেখবে? আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে সুবিশাল, তুমি দেখতে দেখতে একদিন এমন আস্বাদ পাবে, মানুষের এই ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র রূপ তোমার কাছে তুচ্ছই মনে হবে। মানুষ তো আমারই সৃষ্টি। মানুষ যতই তার সৃষ্টির বড়াই করুক, তার অহমিকা তাকে এই ক্ষুদ্র জীবনেই রেখে দেবে।' শরৎচন্দ্র যে প্রকৃতির সেই অনুচ্চারিত মনের ভাষা পড়তে পেরেছিলেন, কৈশোরের জীবনই তার প্রমাণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, মাছ ধরে,

ভোজা ঠেলে, নৌকো বেয়ে দিন কাটে। এই মাছ ধরা প্রসঙ্গে লেখকের নিজেরই একটা কথা মনে পড়ে। শরৎচন্দ্র ছোটবেলায় মাছ ধরতেন। ছোটবেলায় বড় মাছের চিন্তা থাকে না। অবশ্য ছিপে যদি রুই কাৎলা খেলো তো মন্দ কি? আর সেই মাছ যদি ডাঙায় তোলা গেল, আনন্দ কম হয় না। কিন্তু যে ছিপে পুঁটিমাছ ধরার শক্তি, পুঁটিমাছই সব কিশোর ধরতে চায়, সেই ছিপে রুই মাছ খেলে সে কি আর শেষপর্যন্ত ডাঙায় ওঠে? শরৎচন্দ্রের উঠত কিনা জানি না। তবে তাঁর বাল্যকালের এক গল্পে ঠ্যাঙাড়েদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'নয়নচাঁদের পিসিমার বাড়ী বসন্তপুরে ভাল ছিপ পাওয়া যায়, আর এই ছিপ এক তাড়া কাঁধে ফেলে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিলেন।' এই এক তাড়া ছিপ কি শুধু পুঁটিমাছ ধরবার জন্যে? যাই হোক্ পুঁটিমাছই ধরুন, আর রুইমাছই ধরুন, মাছ ধরার আনন্দ যে ছোট বেলায় কি লেখকও তা জানে। স্কুলটা একবার ছুটি হলেই হয়, তারপর একটু ময়দা কোন রকমে যোগাড় হলেই—। এই ময়দা যোগাড় করতে গিয়ে লেখকই কতদিন চোর অপবাদ নিয়ে মায়ের কাছে মার খেয়েছে। তবু কি সে নেশা গেছে? শরৎচন্দ্রও নিশ্চয় খুব ভাল সমাদর পান নি? মাছ ধরা, ঘুড়ি ওড়ানো, নৌকা নিয়ে উজান গাঙে ভেসে চলা—তাঁর যে এসব অভিজ্ঞতা খুবই ছিল, শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের কাহিনীই তার প্রমাণ। তিনি ছিলেন স্বভাবে শান্ত কিন্তু মনে মনে দুরন্ত। তাই দুরন্ত কোন সঙ্গীর দেখা পেলে তাঁরও মনের দুরন্তপণা শতধা হত। শ্রীকান্তের শৈশবই যে শরৎচন্দ্রের শৈশব সে আর বলে দিতে হবে না। অবশ্য শরৎচন্দ্র কোথাও বলেন নি, 'এ আমার-আত্মজীবনী'। তবে আমরা জানি, লেখক আত্মজীবনী না লিখলেও তাঁরই বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে পাত্র পাত্রীর শরীর তৈরি করে নিজেকে প্রকাশ করে, এ আর অনস্বীকার্য নয়। শরৎচন্দ্র যদি ছোটবেলায় মাছ ধরে, ঘুড়ি উড়িয়ে, বাড়ির লোককে কাঁদিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা না করতেন, তাহলে শ্রীকান্ত শরীর নিয়ে আর্বিভূত হত না। তারপর ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথও একজন সজীব মানুষ। সজীব মানুষ না হলেও কোন আশ্চর্য হবার ছিল না। শরৎচন্দ্র ছিলেন বাইরে শান্ত কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুরন্ত। দুরন্তপণার দুটি চোখ যেন সর্বদা বৈচিত্র্য সন্ধানে ঘোরাফেরা করত। সেই দুরন্তমনই বেপরোয়া ভঙ্গিতে ইন্দ্রনাথ হয়ে আবির্ভূত হল। শরৎচন্দ্র যা বাইরের চোখে পারতেন না, অথচ করার জন্য অদম্য স্পৃহা ছিল, সেগুলি ইন্দ্রনাথ সমাধা করেছে।

ইন্দ্রনাথ সজীব না হলেও আমরা আশ্চর্য হতাম না। লেখক শরৎচন্দ্র

যেমন নিজের স্বভাবের মমতা দিয়ে শ্রীকান্তকে রচনা করেছেন, ইন্দ্রনাথও সেই লেখক শরৎচন্দ্রের আর এক স্বভাবের মানবরূপ। এই হলেও আমরা কিছুমাত্র আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ ছিল রক্তমাংসের একজন গোটা মানুষ। ভাগলপুরে যখন শরৎচন্দ্র মামার বাড়ীতে থাকতেন, সেই সময় রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই রাজেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে লেখক শরৎচন্দ্রের কলমে ইন্দ্রনাথ হয়ে গেছে।

ইন্দ্রনাথ যে সজীব একজন মানুষ, রাজেন্দ্রনাথের কথা না জানলে কখনই বিশ্বাস হত না। ঠিক যেন গল্পের এক ডানপিটে চরিত্র হয়ে শরৎচন্দ্রের ঘুমন্ত এক দুরন্ত ও অন্য স্বভাবের ভেতর থেকে চরিত্র হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এই রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন ভাগলপুরের বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট ভাই। শরৎচন্দ্র যখন দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে মামার বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন, সেই সময়ে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ। ভাল বন্ধুই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তিনিও যাত্রা, থিয়েটার ভালবাসতেন, রাজেন্দ্রনাথও যাত্রা থিয়েটার ভালবাসতেন। তিনিও স্ত্রী চারত্রে অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করতেন, রাজেন্দ্রনাথও স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুজনের চেহারার আদল ও কণ্ঠস্বর প্রায় একই ছিল। আর স্বভাবও একই ছিল, তা না হলে বেছে বেছে শরৎচন্দ্র বন্ধুত্ব তাঁর সঙ্গে করেছিলেন কেন?

শরৎচন্দ্র যেমন যাত্রা, থিয়েটার, পছন্দ করতেন, তার সঙ্গে বাজনার দিকেও ঝোঁক ছিল বেশি। সেই বাজনা রাজেন্দ্রনাথ বাজাতে পারতেন। বাঁশী বাজাতে তাঁর মত কেউ পারত না। বাঁশী, বেহালা, তবলা, হারমোনিয়াম, তাঁর হাতে যেন সুরের বন্যা বয়ে যেত। শরৎচন্দ্রও এই রাজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই বিদ্যাগুলি আয়ত্ব করেছিলেন। লেখাপড়ার কঠিন জীবনের দিকে যত না শরৎচন্দ্রের ঝোঁক ছিল, এই সব হালকা অথচ মধুর জীবনের দিকে তত তিনি ঝুঁকে পড়তেন। তারপর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। একটা অজানিত ভয়ের দিকে শান্ত স্বভাবের দুরন্ত মন সর্বদা যেতে চাইত, সেই স্বভাবের ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। সেই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা থেকেই জন্ম নিয়েছে অন্নদাদির গল্প, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, নতুনদার গল্প, জেলেদের মাছ চুরির কাহিনী প্রভৃতি।

এ সব ঘটনা পুনরুক্তি করার কারণ একজন জনপ্রিয় লেখকের ব্যক্তিমানস কিভাবে ধীরে ধীরে পদ্ম-পাপড়ির মত দল মেলেছিল সেটাই দেখানো। শরৎচন্দ্র আত্মজীবনীমূলক কাহিনী শ্রীকান্ত লিখতে গিয়ে ভূমিকার ছলে বলেছেন, 'এই

পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্ব্বতকে পাহাড় পর্ব্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক্—এক গাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহাব মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহারো মুখ-টুখও কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করাত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা।'

শরৎচন্দ্রের এ কথাগুলি যে ঠিক সত্য নয়, এটা তাঁর বিনয়, শ্রীকান্ত লিখতে গিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। শরৎচন্দ্র যখন শ্রীকান্ত লেখেন, তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে পুরোপুরি প্রবেশ করেছেন। প্রবেশের অধিকারে ঈর্ষাকাতব কিছু সমশ্রেণীর কটুক্তিব উত্তরে বোধ হয় এই শ্লেষ। এমন কথাও হয়ত তাঁকে শুনতে হয়েছিল, সাদামাটা ভাষা রসকস নেই। বর্ণনার ব্যাপারটাও খুব সংক্ষিপ্ত। কেবল সোজা সরল গতিতে গল্প বললেই কি হয়? জনপ্রিয়তার জ্বালা যে অনেক। জনপ্রিয়তা সাহিত্য-শিল্পে কেন? হঠাৎ কেউ বড়লোক হয়ে যাক্ না, অমনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীরা খুঁজতে থাকবে বডলোক হওয়ার আসল রহস্য। যাদ কোন ত্রুটি খুঁজে পেল তো ঢাক ঢোল করতাল সহযোগে নগর প্রদক্ষিণ শুরু করে দিল। বড়লোক যারা হতে পারল না, তারা এই ত্রুটি ধরে খানিকটা তৃপ্তি লাভ করল কিন্তু বড়লোক যিনি হলেন তাঁর জ্বালা।

শরৎচন্দ্রও যে বহু সমালোচকের শিকার হয়ে বহু ঝাপটা সহ্য করেছিলেন, শ্রীকান্তের শুরুর ভূমিকাই তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃস্থানীয় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে বহু চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির কিছু কিছু অংশ পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর লেখা নিয়ে তাঁকে কত ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়েছিল। 'চরিত্রহীন' পেলে কিনা সে খবরটা দিলে না।···যাহোক ওটা পড়লে কি? কিরকম বোধ হয়?···এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে করে দিই। যদি ভাল ব'লে না মনে হয়, প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা কোরো না।···তোমাদের এটা নতুন কাগজ—একটু পুণ্যের জয়, কিংবা ঐ রকমেব ঘোরালো সতীত্ব, হিন্দুর বিধবা পুড়ে মরছে কিংবা···।' ভারতবর্ষ কাগজ তখন নতুন বের হয়েছে, তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য 'চরিত্রহীন' ছাপার

ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। লেখাটির শুরুতে ঝিয়ের কাহিনী দেখে লেখাটি ছাপার অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র যদি যমুনা, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি কাগজ না পেতেন, তাহলে হয়ত তাঁর লেখার চিন্তা অঙ্কুরে বিনাশ হয়ে যেত। তবে শিল্পীর জীবনে আঘাত দরকার, আঘাত না পেলে কি শরৎচন্দ্রের কলম এত শানানো হত? যারা আঘাত করে তারা জানে না, পরোক্ষে লেখককে সে যশস্বী করবার সিঁড়ি তৈরি করে দিল। অনুশীলনে একদিন তাঁর কলম দিয়ে আগুন ছুটবে। ছুটেছিলও শরৎচন্দ্রের কলম দিয়ে আগুন। সে আগুনে সমাজের চেহারা আমূল পালটে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র একসময়ে নিজের সম্বন্ধে এতই perfect হয়েছিলেন যে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটা চিঠিতে লিখছেন, 'আমি চরিত্রহীনের একটা লাইনও পালটাব না।'

এই perfection তাঁর কেমন করে এল? এই কথাই এই অংশে বলবার জন্যে বসেছি। অঙ্কন শিল্পী যেমন তার আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে হঠাৎ একখানি ভাল ছবি আঁকতে পারে না, অনুশীলন করতে হয়। মানসিক গঠন পূর্ণ হলে তারপর তার হাত দিয়ে কাজ বেরিয়ে আসে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই, গলা ভাল হলেই ভাল গায়ক হওয়া যায় না। গায়ক হতে গেলে অনুশীলনের দরকার।

শরৎচন্দ্র ছোটবেলা থেকেই যে লেখার চিন্তা করতেন, তাঁর এক ভাবণে দেখতে পাই। তিনি পাঠ্য বই ছাড়া অপাঠ্য বই-ই বেশি পড়তেন। গল্পের বইকে অপাঠ্য বই বলা হয় আজও। ওটা পড়ে তো সামাজিক জীবনে কোনই কাজে লাগবে না। এ অভিমত আজও কোন কোন পরিবারের অভিভাবকের মনে বদ্ধমূল। সে সময়ে সেই বদ্ধমূল ধারণা ছিল বলেই শরৎচন্দ্র লুকিয়ে লুকিয়ে 'হরিদাসের গুপ্তকথা', 'ভবানীপাঠক' প্রভৃতি অপাঠ্য বই পড়ে ফেলেছিলেন। আর সে সব বই বাবার দেরাজ থেকে শরৎচন্দ্র সংগ্রহ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাবার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, সাহিত্যের পরোক্ষ পাঠ যদি শরৎচন্দ্র কারুর কাছ থেকে নিয়ে থাকেন, তিনি হলেন শরৎচন্দ্রের পিতৃদেব অখ্যাত মুদ্রণহীন পাণ্ডুলিপি-সর্বস্ব সাহিত্যিক শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। মতিলালের জীবনটিও বড় অদ্ভুত ছিল। বিষয়ের দিকে একেবারে মন ছিল না, সংসারের আয়ের কথা ভাবতেন না, আয়েসী স্বভাব ছিল। আয়াস যে কোথায় তার মূল পরে দেখা গেল। সে কথা বলার আগে মতিলালের স্বভাবের একটু নমুনা দিই। হাজীপুরে শিক্ষকতা করতেন। পরিবার দেবেন্দ্রপুরে থাকত, শরৎচন্দ্রও সেখানে থেকে

স্কুলে পড়তেন। হঠাৎ মতিলাল শিক্ষকতার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে শ্বশুরবাড়ী ভাগলপুরে চলে এলেন। শ্বশুর কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুর বাঙালীটোলায় একজন মানী গুণী লোক। সচ্ছল অবস্থা। সেই আশ্রয়ে মতিলাল এসে পরম আরামে ও আলস্যে দিন কাটাতে লাগলেন। প্রাতে দাবা, পাশা খেলা, দুপুরে দিবানিদ্রা, সন্ধ্যায় তামাকু সেবন এই করে তাঁর দিন চলে যেতে লাগল। আর রাত্রে বসে বসে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে যেতেন। কখনও প্রকাশ করবার তাঁর ইচ্ছা হত না। বন্ধুবান্ধবদের শোনাতেন। বন্ধুবান্ধব শুনে বাহবা দিলে তাঁর লেখার স্বীকৃতি পেয়ে যেতেন। তারপর সেই পাণ্ডুলিপি ভাঙা দেরাজশায়ী হত। এই ভাঙা দেরাজ থেকেই একদিন শরৎচন্দ্র দুখানি গোটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র হঠাৎ লেখক হয়ে যান নি। লেখার বীজ তাঁর রক্তের মধ্যেই প্রোথিত ছিল। লেখা লেখা বাতিক আসবার আগে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' শুনে তাঁর চোখে জল এসেছিল। তিনি তখনই ভেবেছিলেন, লিখে মানুষের মনে এমনি দোলা দিতে হবে? ভাগলপুরে দাদামশাইয়ের বাড়ীতে 'বঙ্গদর্শন' আসত, বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ধারাবাহিক প্রকাশ হচ্ছিল। সেই উপন্যাস পড়ে তার আঙ্গিক, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি তাঁকে চমকিত করেছিল। শরৎচন্দ্র পরে নিজের ভাষণে বলেছিলেন, 'সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিনও ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।' এই মানসিক গঠন একদিক দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছিল, আর অন্যদিকে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দুরন্তপণা। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিমানসটি যে খুব ছোটবেলা থেকেই নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, তিনি যেটা ভাল বুঝতেন সেটাই করতেন, কারও নিষেধ মানতেন না, এটা সব সময়ে দেখা যেত। যাকে বলে একগুঁয়েমিতা, এটাই তাঁর বেশি কাজ করেছিল।

অবশ্য একগুঁয়েমিতা প্রকাশ না করলে পরবর্তীকালে তাঁকে এত বড কথা-শিল্পী হিসাবে আমরা পেতাম না। তিনি যদি আর পাঁচটি ছেলের মত সুবোধ হতেন, অভিভাবকের শাসনের বাইরে না যেতেন। তাহলে অভিজ্ঞতার ঝুলি তাঁর ছোট হত। ছোট ঝুলি কত নাড়া দিয়ে আর সাহিত্যের হাট গুলজার করতেন।

আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্র ছিলেন বাইরে শান্ত প্রকৃতির কিন্তু ভেতরটা দুরন্তপণায় ভরা। বাবার খামখেয়ালীপনা তাঁর জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছিল। বাবা তখন জানতেন না, চাকরী বাকরী ছেড়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে থাকাতে তিনি পরোক্ষে কি সাহায্য করছেন? এই ভাগলপুরে আসাটাই শরৎচন্দ্রের জীবনে সাহিত্যাকাশে উদিত হওয়ার গোড়াপত্তন। বোধ হয় ভাগ্যলক্ষ্মী মনে মনে সেদিন মুচকি হেসেছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী ঠিক নয়, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। কালিদাস যেমন রাজকন্যার কাছে অপমানিত হয়ে সরস্বতীর আরাধনা করেছিলেন, সরস্বতী তাঁকে বরদান করেছিল, তেমনি শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরে আসাও যেন সরস্বতীর বরদান। সেখানে যাত্রা, নাটক, থিয়েটার, গানবাজনা তার সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার। অথচ এই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে শরৎচন্দ্র ঘৃণার চোখে তাকিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ সিগারেট টানত, সিদ্ধি খেত। এই সব করা যে অন্যায়, শরৎচন্দ্রের শিশুমনের সংস্কারে আঘাত লেগেছি; কিন্তু এই রাজেন্দ্রনাথই যখন অদ্ভুত বাঁশী বাজিয়ে প্রাণমন কেড়ে নিল, তখন এই বাউণ্ডুলে ভবঘুরে বখাটে রাজুর সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র। সেই কিশোর শরৎচন্দ্রকে আজকের মানসিক চোখ দিয়ে যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাই, শরৎচন্দ্র তখন দোটানার মধ্যে বাস করছিলেন। একদিকে তাঁর সংস্কারের মন ঘরের দিকে টানছিল, আর একদিকে সংস্কার বহির্ভূত মন রাজুর মত বাউণ্ডুলের সঙ্গ চাইছিল। জয়ী হল শেষেরটাই। পড়াশুনা করে কি হবে? সিদ্ধি খেয়ে, সিগারেট টেনে, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ালেই আনন্দটা বেশি।

আনন্দের হাহাকার যেন জন্মাবধি শরৎচন্দ্রের ভেতরটা হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছিল। তাই বাঁধন তাঁর ভাল লাগত না। বাঁধনহারা হয়েই ছুটে চলতে ভালবাসতেন। সেই ভালবাসার ইন্ধন জুগিয়েছিল রাজেন্দ্রনাথ। ঐ যে আগে বলা হল, সরস্বতী অন্তরাল থেকে এই ভাবী লেখককে তৈরি করছিলেন বলে রাজেন্দ্রর মত একজন সঙ্গী শরৎচন্দ্রের জীবনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যেটুকু কিশোর বয়েসের মনে সংস্কার ছিল, রাজেন্দ্রর সঙ্গদানে তা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের যেন নবজন্ম হল।

পড়াশুনা শিকেয় উঠল। মামাবাড়ির বকুনিতে কর্ণপাত করলেন না। নাট্যশালায় স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়, সিদ্ধির পূজা ও সিগারেট টেনে দিন চলতে লাগল। এ সময়টা ভাবলে শরৎচন্দ্রের মানসিক অবস্থা বেশ ভালভাবেই বোঝা

যায়, তিনি বাবারই পথানুসরণে মন দিয়েছিলেন। বাবারও যেমন মনের মধ্যে লেখার ভাবনা, অন্যদিকে মন দিতে বিরক্ত বোধ করতেন, তেমনি ছেলে। তবে সে সময়ে শরৎচন্দ্র লেখার কথা ভাবতেন কিনা সে কথা জানা যায় নি। রাজুর অন্তরঙ্গতা তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি রাজুকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

আসলে রাজু উপলক্ষ। শরৎচন্দ্র মনে মনেই এমনি একটি জীবন চাইছিলেন। দুরন্ত, ছটফটে, ছন্নছাড়া। পাঁচজনে যা করে তিনি তা করতে চাইতেন না। এ বোধ তাঁর চিরজন্ম ধরেছিল। প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে তিনি বড় হয়েছেন। বাবার যেমন সাংসারিক দায়িত্ব ছিল না, তাঁব ছেলেপুলেও কখনও দু'মুঠি অন্ন শান্তিতে খেতে পায় নি। পরেব আশ্রয়ে থাকলে কি কেউ শান্তি পায়? যদিও সে খাদ্যতালিকা কালিয়া, পোলাও হয়, অনাদর না হলেও শান্তি নিশ্চয মনে জাগে না। আর সেই অভাববোধ শরৎচন্দ্র জীবনের অনেকদিন পর্যন্ত ভোগ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশ থেকে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখছেন, 'একশত টাকার কেরানীগিরি যদি কেউ আমাকে দেয, তাহলে আমি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ কবিতে পারি।' মাত্র একশ টাকার জন্যে এত বড একজন লেখককে কি ক্লেশই স্বীকার কবতে হয়েছিল!

অনেকে হযত এই কথায় বলবেন, ধূপ পুডলে তবে তার সৌরভ ছড়ায়। লেখক যদি কষ্ট না পায়, তবে কি তার লেখা আদৃত হয়? এসব কথা যেমন বলতে ভাল, শুনতে যে এতটুকু ভাল লাগে না সে কথা বলাই বাহুল্য। লেখকও তো রক্ত ম্যাংসেব মানুষ, তার যদি অভাবটা তাকে অর্ধেক সময় ক্ষয় করে দেয়, তাহলে সে ভাববে কখন? আব লিখবেই বা কখন? এক একজন হয়ত ব্যতিক্রম, যেমন শরৎচন্দ্র ছিলেন। শরৎচন্দ্র সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ পেযে-ছিলেন বলেই অত বাধার মধ্যেও তাঁর জযযাত্রা ঘোষিত হযেছিল।

যাই হোক, যে কথা আগে বলা হচ্ছিল, রাজুব জন্যেই শরৎচন্দ্রেব সাহিত্যের প্রথম পাঠ মনে মনে শুরু হযে গিয়েছিল। আমরা যদি বলি, শবৎচন্দ্র সিদ্ধি সেবন করে কল্পনার বলগা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা কি অস্বীকার করা যাবে? যাবে না। তার কারণ, বৃদ্ধ বয়সে যখন শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত লিখতে বসেছেন, তখনই প্রমাণ হয়ে গেছে এ সব তিনি কৈশোরে করেছিলেন, ভবিষ্যতে সাহিত্যের উপাদানের জন্যে। লেখকের অভিজ্ঞতা যে লেখার রসদ এটা তিনি সেই কিশোর বয়েসেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তখন কলম না ধরলেও মনে মনে যে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

শরৎচন্দ্র যে নিজেও কম দুরন্ত ছিলেন না, একটা গল্প বললে বোঝা যাবে। শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরীর 'শরৎ সাহিত্যে পতিতা' গ্রন্থে এ গল্প আছে। 'একদা বাবারী রাস্তায় একটি নীলের সাহেবের সঙ্গে রাজু প্রভৃতির বিবাদ হয়। তাহারা সাহেবকে সাইকেল হইতে নামাইয়া উত্তম মধ্যম প্রহার দিতে আরম্ভ করিল। শরৎচন্দ্র তাহার টুপিটি খুলিয়া লইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে টুপির ভিতর মূত্র ত্যাগ করিলেন এবং সাহেব যাওয়ার সময় তাহার মাথায় পরাইয়া দিলেন।'

এটা যে নিছক গল্প নয় সত্য কাহিনী পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর কাহিনীই তার প্রমাণ। কিশোর মনে স্বাধীনতা হরণকারীদের ওপর যে কিরকম বিদ্বেষ ছিল এই মূত্র ত্যাগই তার প্রমাণ। কৈশোর জীবন তাঁর এইভাবে বিদায় নিয়ে যৌবনের দ্বারে এসে পৌছল। সিদ্ধি সেবন ঠিকই থাকল, সিগারেটও চলল, তার সঙ্গে সঙ্গে তামাকু সেবনও চলতে লাগল। এর মধ্যে তিনি একবার বিহারের ডিহরীতে ও দেবানন্দপুরে ফিরে গিয়েছিলেন। মানে তাঁর খামখেয়ালী পিতৃদেব শ্বশুরালয় ত্যাগ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অন্নবস্ত্র জোগাড় করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এগার বছর বয়েসে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে শরৎচন্দ্র সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর বাবা ভাগলপুর ত্যাগ করে আবার দেবানন্দপুরে ফিরে যান। তখন শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কিশোর ভবঘুরে শরৎচন্দ্র যতই বাউণ্ডুলে জীবন যাপন করুন, পড়াশুনার দিকে তাঁর খুব অমনোযোগ ছিল না। তবে কি তিনি মনে মনে জেনেছিলেন, তাঁকে ভবিষ্যতে একদিন শ্রেষ্ঠ লেখক হতেই হবে। সম্ভবত তাই। বাবার অসাফল্যই বোধ হয় কিশোর মনে প্রতিজ্ঞা সৃষ্টি করেছিল। সে সময় যেমন তিনি পড়াশুনার দিকে মন রেখেছিলেন, চরিত্রের মধ্যে নানান অসামাজিক সংস্কার-বহির্ভূত দুষ্কর্মের দিকে মন ছিল। অর্থাৎ যে কাজ কেউ করে না, সিদ্ধিপূজা, সিগারেট খাওয়া, তামাকু সেবন, জেলেদের মাছচুরি আরও কত যে ভাল লাগার কাজ করতেন, এসব যে কিশোর বয়েসে করা উচিত নয় এ কি তিনি জানতেন না? বেশ ভালই জানতেন মনে হয়, তখনই বোধ হয় তার মনে হত, এসব করতে যখন মন চাইছে, তখন এসবই করা ভাল। হয়ত সেই সময় কল্পনার রঙে চরিত্র সৃষ্টি করে মনে মনে সাজাতেন দীর্ঘ কাহিনী। তাই শেষপর্যন্ত হয়েছিল, তিনি সেই মনে মনে বানানো কাহিনী একদিন খাতার পাতায় পূর্ণ করে গল্প সৃষ্টি করেছিলেন। দেখা যায়, ষোল বছর বয়েসে প্রথম তিনি গল্প রচনা করেছিলেন এবং সে গল্প

পরবর্তী কালে তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখাগুলির মধ্যে স্থানলাভ করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানসিক গঠনের ওপর লেখার মান নির্ণয় হয়, বয়স, অভিজ্ঞতা তাতে কাজ করে বটে, তবে সেটাই প্রধান নয়। শরৎচন্দ্র নিজের জবানীতে পরবর্তী কালে বলেছেন, 'আমার বাবার জন্যে আমার লেখার প্রেরণা। সেই কিশোর বয়সে বাবার অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে কত বিনিদ্র রাত্রি আমি কাটিয়েছি, এবং অসমাপ্ত লেখার শেষাংশ কি হতে পারে ভেবেছি।'

এই যে বাবার কাছ থেকে শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকারী সূত্রে যে অমূল্য বস্তু পেয়েছিলেন, কে পায় এমন সম্পদ? পুত্র তো পিতার কাছ থেকে অর্থানুকূল্যই লাভ করে, তার বেশি কি? কিন্তু মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সে সামর্থ্য ছিল না, তিনি নিজেই খেতে পেতেন না তো ছেলের জন্যে রেখে যাবেন! কিন্তু যা রেখে গিয়েছিলেন সেও কম নয়। আমরা সেইজন্যে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর পুত্রকে পেয়েছি।

বাবার অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে চিন্তা। অন্যান্যদের লেখা পড়ে হুবহু সেই-রকম লেখার চেষ্টা। সে সময় তাঁর হাতে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী এসেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার নকল করতে গিয়েছিলেন। পরে তিনি নিজের জবানীতে বলেছেন, 'নকল করলে যে নিজের মত হয় না, সে বোধ আমার ছিল, কিন্তু নিজের বানানো মনঃপূত হত না বলে হাত মক্সর জন্যে এসব করতাম।'

হাত মক্সর জন্যে আরও অনেক কিছু তিনি করেছিলেন। যখন তিনি দেবানন্দপুরে ছিলেন, সেই সময় পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর আবার যোগাযোগ হয়েছিল। এবং সেই আগের পুরনো খেলায় তিনি আবার মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তবে বয়স বাড়ার জন্যে একটু রকমফের হয়েছিল। এই সময় জমিদার নবগোপাল দত্তমুন্সীর ছেলে অতুলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়। অতুলচন্দ্র তাঁকে ভালও বাসতেন। বয়েসে অতুলচন্দ্র তাঁর চেয়ে কিছু বড়ও ছিল। ছেলেটি হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে কলকাতায় এম. এ. পড়ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ভেতরে মৌলিক লেখার চিন্তা দেখে তাঁর খুব ভাল লাগে। শরৎচন্দ্র নিজে যাত্রা, থিয়েটার খুব পছন্দ করতেন। অতুলচন্দ্র শরৎচন্দ্রের এই আসক্তি দেখে মাঝে মাঝে তাঁকে নিয়ে কলকাতায় থিয়েটার দেখাতেন কিন্তু শর্ত থাকত, থিয়েটার দেখে নিজের কথায় সেই অভিনয়ের কাহিনী হুবহু লিখে দেখাতে হবে, যদি তার মধ্যে গল্প রসের সৃষ্টি হয়, তাহলে পুরস্কৃত করা হবে। শরৎচন্দ্র যে অতুলচন্দ্রের কাছ থেকে কত পুরস্কার পেয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

এইভাবে এক শ্রেষ্ঠ লেখকের হাত মক্সর কাহিনী শুনলে ভাবিকালের লেখকরা কি মনে করবেন? শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ধরণ নিশ্চয় অনেকে লক্ষ্য করেছেন, গল্প বলতে গিয়ে যেভাবে ভাষার দৌলতে আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন, তা কি কারুর সঙ্গে মেলে? এই নিজস্ব আঙ্গিকটি তৈরি করতে তাঁকে এইভাবে হাত মক্স করতে হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন একদিনে আসে নি, বহু শ্রমের ফল এই সাফল্য, তেমনি যে কোন ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে গেলে এইভাবেই কষ্ট করতে হয়।

তারপর আবার শরৎচন্দ্রকে দেবানন্দপুর ছেড়ে ভাগলপুরে যেতে হয়, এবং সেখান থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ভাগলপুরে গিয়ে তিনি তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু সেখানে আবার রাজেন্দ্রনাথ। পড়াশুনা শিকেয় উঠল, শরৎচন্দ্রের ভেতরে আবার বাউণ্ডুলেপণা ঢুকে পড়ল। সিদ্ধি, গাঁজা, সিগারেট, তামাকুতে মেতে উঠলেন। এ সময়ে কৈশোর গিয়ে যৌবনের ধাপে এসে পৌছলেন। রাজেন্দ্রর মন অদ্ভুত ভাল, বার বার আমরা শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্রের মুখ দিয়ে সে কথা শুনেছি। রাজেন্দ্রর অনেক গুণ ছিল, আর দোষগুলি যে ছিল সে দোষ শরৎচন্দ্রের চোখে পড়ত না, বরং তাঁর অন্তরের সুপ্ত চাওয়াগুলি যেন এই সব চাইত মনে হত। প্রকৃতির লীলা নিকেতনের মত নারীর সজল চোখের চাউনি সেই প্রথম যৌবনের সুপ্ত মনে আবেগ সৃষ্টি করত। স্বাভাবিক মানবধর্ম। যে বয়েসে একটা কৌতুহলই স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে, নারীর ছায়া এসে বার বার মনে দোলা দেয়, শরৎচন্দ্রের মধ্যে তার একটু বাড়াবাড়ি দেখা গেল।

এই বাড়াবাড়ির জন্যে তাঁকে সামাজিক জীবন থেকে একটু দূরে সরে যেতে হয়েছিল। এবং দাদামশাই কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার জন্যে খুবই রুষ্ট হলেন। বাঙ্গালী টোলায় দুটি দল ছিল, একদল রক্ষণশীল ও একদল উদারপন্থী। রক্ষণশীল দলের প্রধান শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদার গঙ্গোপাধ্যায় ও উদারপন্থী দলের প্রধান শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শিবচন্দ্রের অর্থানুকুল্যে নাটক, সঙ্গীত, ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি পুরোদমে চলত। নবীনের দল এই শিবচন্দ্রপন্থী। হবে না কেন? নবীনরা চাইত সমাজের কঠিন নাগপাশ ভাঙতে। নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি তো আনন্দের সামগ্রী। নাটকের স্থুল রস ও সঙ্গীতের প্রাণ কেড়ে নেওয়া সুরের ঝরণা ধারায় কে না স্নান করতে চায়? নবীনরা তো এই সব স্থুল রস চাইবেই। শরৎচন্দ্র এই রসের মধ্যে বহু আগেই নিজের প্রাণমন খুঁজে

পেয়েছিলেন। নাটক তো বহু আগে থেকেই তিনি পছন্দ করতেন, আর সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণের বন্ধু। গান শুনতে ও গান গাইতে তাঁর খুবই ভাল লাগত। তিনি শিবচন্দ্র পন্থী হয়ে উঠলেন। দাদু কেদার গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্ন ধ্বংস করে তাঁর বিপক্ষ দলে যোগদান করলেন। কথাটি কিরকম খাপছাড়া মনে হয় না? কিন্তু ঘটনাটি তাই ঘটেছিল। বরাবরই শরৎচন্দ্র নিজের ইচ্ছানুযায়ী পথে চলতেন। যেটা তাঁর ভাল মনে হত, তাই তিনি করতেন।

কেদার গঙ্গোপাধ্যায় জানতে পেরে দৌহিত্রর প্রতি ঢালাও হুকুমজারি করলেন, 'এ সব ম্লেচ্ছদলে মেশা চলবে না।' শরৎচন্দ্র গোপনে মিশতে লাগলেন। সঙ্গে উৎসাহ দিতে লাগল রাজু ও তার ভাই শরৎ মজুমদার।

একবার চরম একটি ঘটনা ঘটল, শিবচন্দ্র য়ুরোপ ভ্রমণেব জন্যে পাপস্খালনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তর আয়োজন করছেন। কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দল সেই প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ পণ্ড করে দিল। দুই পরিবারের মধ্যে এই নিয়ে তুমুল বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেল। শবৎচন্দ্রও তাঁর স্বাধীনতা হারালেন কিন্তু সে কতক্ষণ, প্রকাশ্য যেটা ছিল সেটা গোপন হল। তবে গোপনতাও ফাঁস হয়ে গেল। নিষ্ঠুর শাসন চলল শরৎচন্দ্রের ওপর কিন্তু শাসন যিনি মানেন না তাঁকে কি শাসন করা যায়? শরৎচন্দ্রও বারবার শাসন ভাঙতে লাগলেন। শিবচন্দ্রের নাট্যশালায় গিয়ে 'জনা' ও 'মৃণালিনী' নাটকে যোগদান করলেন। 'জনা' তে এমন অভিনয় করলেন যে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। কিছুকাল পরে শিবচন্দ্রের শ্যালক কান্তি পণ্ডিতের স্ত্রী দেহত্যাগ করলেন, নবীনের দল সেই শবদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। শবৎচন্দ্রও তাঁর সঙ্গী হলেন। কেদার গঙ্গোপাধ্যাযের দল আতঙ্কিত হয়ে উঠল, সব গেল, জাত, কূল, মান, ধর্ম সব গেল। সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ল শরৎচন্দ্রের উপর। বিচারে শরৎচন্দ্রকে অপাংক্তেয় জ্ঞান করা হল।

শরৎচন্দ্র যে সে সময়ে মনে মনে হেসেছিলেন, পরবর্তীকালের এই সমাজ ভাঙার চেষ্টা লেখার মধ্যে দেখে মনে হয়। সমাজের কতকগুলি এমন রূঢ় শাসন যার কোন মানে নেই, অথচ সেইগুলি চেপে ধরে সমাজ কর্তারা মানুষের প্রাণের ওপর ছুরি চালিয়ে যে রক্তপাত করে চলেছেন, সমাজবন্ধু শরৎচন্দ্র সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। কৈশোরে বুঝেছিলেন, যৌবনে বুঝেছিলেন, বার্দ্ধক্যেও কখনও বিস্মৃত হন নি। তাই প্রতিটি লেখার মধ্যে তিনি সমাজের এই দুর্বল অথচ বজ্রসম শাসনগুলিই ভাঙবার চেষ্টা করেছেন।

এও বলতে গেলে সরস্বতী পরোক্ষে বরদান করেছেন বলা যাবে। শরৎচন্দ্রের

পিতা যেমন ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ করেছেন, তেমনি দাদু কেদারনাথ সমাজ প্রধান হয়ে সমাজের দোষত্রুটিগুলি যেন আঙুল দিয়ে শরৎচন্দ্রকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কি লিখব বলে একসময়ে যখন শরৎচন্দ্রের চিন্তা ছিল, লেখার জন্যে তাঁকে আর ভাবতে হল না। পরোক্ষে যেন কেদারনাথ শরৎচন্দ্রের কলমের আগায় লেখার রসদ জুগিয়ে দিলেন।

চরম ঘটনা ঘটল গাঙ্গুলী বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। শরৎচন্দ্র নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করছিলেন। হঠাৎ রক্ষণশীলের দল চিৎকার করে উঠলেন, 'ওকে বহিষ্কার করে দাও, না হলে আমরা নিমন্ত্রণবাড়ী ত্যাগ করব।' সুযোগটা খুবই কার্যকরী হল। অনেকদিন ধরে কেদারনাথ দৌহিত্রের প্রতি খুশি ছিলেন না। তাছাড়া তিনি যে সমাজের প্রতিভূ, তাঁর দৌহিত্র সে সমাজ ভাঙতে চায়। রাগ অনেকদিন ধরে মনে মনে জমেছিল, তিনি দৌহিত্রকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বললেন। একবারও ভাবলেন না, ছেলেটি কোথায় যাবে? কিন্তু সেইদিনই শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন সমাজ কত নির্মম। সমাজের বিরুদ্ধাচরণে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা কিছুরই দাম নেই। এই দয়াহীন সংসারে শুধু বিশাল চেহারা নিয়ে কুসংস্কারে ভরা সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই সমাজকে ভাঙবার জন্যে তাঁর কলম সক্রিয় হল। দেবদাসের গল্প নিশ্চয় অনেকের মনে আছে, দেবদাস-পার্বতীর সেই নিবিড় প্রেম, সমাজের জন্যেই তো মিলতে পারে নি। চন্দ্রনাথ এক পতিতার মেয়েকে বিয়ে করে সমাজ ভাঙতে চেয়েছিল, পরে তার খুড়া মণিশঙ্কর সেই বিয়ে মেনে নিয়ে বলেছেন, 'সমাজ মানে কি? সমাজ মানে আমি, তুমি। আমি যদি এই বিয়ে মেনে নিই তবে সমাজ কি করবে? যার অর্থ আছে, তারই কাছে তো সমাজের বিধান। আমার অর্থ আছে, আমিই সমাজের বিধান দেব।'

সমাজের এই আসল গূঢ় অর্থ শরৎচন্দ্র সেই অল্পবয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই ধনীশ্রেণীর এই সমাজ পিতাদের ঔদ্ধত্য তিনি কলমের খোঁচা দিয়ে বার বার দমানোর চেষ্টা করেছেন। লেখনী ধারণ করেছিলেন, গল্প বানিয়ে লোকের মনে রস পরিবেশন করার জন্যে। কিন্তু যখন সত্যিকারের লেখনী ধারণ করলেন, তখন শুধু কলম দিয়ে রস বেরোল না, আগুনের মত বেরিয়ে এল পাত্র-পাত্রীর শরীর নিয়ে দেশের আসল মূল্যায়নের ছবি। বাঙালী কি? বাংলা কি? বঙ্গের মানুষদের প্রাণের মূল ধরে টান দিলেন। কেঁদে কেঁদে যে সব মানুষেরা সমাজের রূঢ় শাসনের নিচে নিজেদের নিঃশব্দে বলি দিচ্ছিল, সেই মানুষের কথা

বক্তায় বেশে কলম দিয়ে বের করে পাঠকদের সামনে ধরে দিলেন। সর্বকালে সর্ব দেশে একই রীতি লক্ষ্য করা যায়, চলমান মানুষ সমাজের নিয়ম মেনে মেনে এমনিই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, এর বিকল্প কিছু আছে এ কথা তারা ভাবতেই পারে না। শরৎচন্দ্র লেখনী সহযোগে সেই নিয়মগুলির আসল স্বরূপ তুলে ধরে দেখালেন। নির্বাচিত মানুষেরা তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিল।

আর নারী সেই সমাজের আসল বলি। এই নারী প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি মানস কি ভাবে শিল্পী মানসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই কথাই আগে আলোচনার মাধ্যমে বলা হবে।

আমরা শরৎচন্দ্রের জীবনী বলতে বসিনি। বহু জীবনীকারেরা তাঁদের আপন আপন মানসিকতায় তাঁর জীবনী পরিবেশন করেছেন। আমরা বরেণ্য লেখকের জনপ্রিয়তা ও লেখার রসদ সংগ্রহে তাঁর নিজের জীবনে কি কি করেছিলেন তারই অনুসন্ধান করছি। একজন যে কোন শ্রেণীর লেখককেই লেখার জন্যে তাঁকে কখনও দর্শক, কখনও অভিনেতা হয়ে জীবনের গভীরে ঢুকে যেতে হয়, যিনি যতটুকু গভীরে ঢুকতে পারেন, তাঁর ততটুকু প্রাপ্য লাভ হয়। শরৎচন্দ্রের গভীরত্ব যে অনস্বীকার্য, এ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই গভীরত্ব মূল্যায়ন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনীই বার বার এসে পড়ছে।

এক একটি আঘাত তাঁর শৈশব কৈশোর যৌবনের প্রারম্ভে যে কত তাঁকে নাড়া খাইয়ে দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। পড়াশুনায় দারুণ মেধাবী ছিলেন কিন্তু স্কুলের বেতন, বই খাতা ছাড়া পড়াশুনা করবেন কেমন করে? দাদামশাই কেদার গঙ্গোপাধ্যায় আর কত করবেন? আর বাবার অবস্থা তো অজানা নয়। কিশোর শরৎচন্দ্র দিশেহারা হয়ে পড়লেন। পড়াশুনা করার অদম্য স্পৃহা ছিল তাঁর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাউণ্ডুলে হয়ে বয়ে যাওয়ার চিন্তা তাঁর ছিল না। যতই নেশা করুন, আর থিয়েটার পার্টিতে গিয়ে যোগদান করুন, আসল জীবনটি তাঁর শক্তমুঠিতে ধরা ছিল। তাঁকে যে একদিন শ্রেষ্ঠ লেখক হতে হবে। তাঁকে যে একদিন বড় হতে হবে। এই বোধ ছিল বলে পড়াশুনার জন্যে অদম্য আগ্রহ ছিল। পড়াশুনা না শিখলে বড় হওয়া যাবে না। জীবনের ধাপ উঁচু হবে না। ওঁর এই মানসিকতা মামাবাড়ীর লোকেরও চোখে পড়েছিল। যে ছেলেটি বেশি দুষ্টু, তার প্রতিই যে অভিভাবকের দৃষ্টি বেশি পড়ে এখানে তাই দেখা গেল।

দাদামশাই কেদারনাথ তখন মারা গেছেন। শরৎচন্দ্রের আপন দুই মামা। ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। ঠাকুরদাসের কোন চাকরী ছিল না। বিপ্রদাস তখন

সামান্য চাকরী পেয়েছেন। সেই সামান্য চাকরীতে সমস্ত সংসারের ব্যয় তাঁকে করতে হত, সেই সময় শরৎচন্দ্রের জন্যে এই ব্যয় তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। ওদিকে তখন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে শরৎচন্দ্রের কিছু মাহিনা বাকী ছিল, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না হলে ভাগলপুরে তেজনারায়ণ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় বাঁচালেন তখনকার দিনের সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক তেজনারায়ণ কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা বেণীমাধব ছিলেন শরৎচন্দ্রের দাদুর বন্ধু। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পড়ার আগ্রহ দেখে স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই স্কুল থেকেই শরৎচন্দ্র একদিন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফি ও মামা বিপ্রদাস মহাজন গুলজারিলালের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা ধার করেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র যে খুব বাজে ছেলে ছিলেন তা নয়, পড়াশুনাতেও তাঁর অদম্য স্পৃহা ছিল। কিন্তু কলেজে ভর্তি [illegible] নেই, কে আর তাঁকে কলেজে ভর্তি করবে? গরীবের বন্ধু আর কে আছে? কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনে বন্ধুও দেখা গেল। মাতামহর চার ভাই, মাতামহর সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতেন। মাতামহর কনিষ্ঠ ভাই অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথও সে বছর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেছিল। মণীন্দ্রনাথ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হল কিন্তু শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে সেটি আর হল না। সেই দেখে মণীন্দ্রনাথের মা কুসুম কামিনীর প্রাণে দয়া হল, তিনি এক উপায় ভাবলেন। তাঁর পরের দুই ছেলেকে যদি শরৎচন্দ্র পড়ায়, তাহলে কলেজের ভর্তি হওয়ার টাকা ও মাস মাস বেতন তাঁরা দিতে পারবেন। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থাই বহাল হল। ছোট দুই ভাই সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র পড়াতে লাগলেন। রাত্রে তাদের পড়াতেন কিন্তু সে সময়ে বাড়ীর যত ছোট ছেলে তাঁর কাছে বিনা বেতনে পড়ত।

শরৎচন্দ্রের কলেজের বেতন দিতেন অঘোরনাথ কিন্তু বই কেনার টাকা যোগাড় করতে না পেরে সহপাঠির বই চেয়ে এনে রাত্রে পড়তেন, সকালবেলা ফেরৎ দিয়ে আসতেন। এত করেও কিন্তু শরৎচন্দ্র এফ. এ. পরীক্ষায় বসতে পারলেন না, কেউ তাঁকে কুড়ি টাকা ফি ধার দিলেন না।

জীবনের মুখোমুখি এই সব সমস্যার সামনে পড়ে শরৎচন্দ্র ক্রোধের চেয়ে আরও দরদীই হয়ে উঠেছিলেন।

মানুষের অর্থই যে মানুষকে এগোতে দেয় না, এর জন্যে তিনি ঈশ্বরকেই

দায়ী করেছেন। আমরা তাঁর লেখার মধ্যে বহু জায়গায় দেখেছি, ভাগ্যটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে তিনি রায় দিয়েছেন। তাঁরও জীবনের এই আঘাত-গুলি যে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, এ তিনি মনে প্রাণে জেনে নিয়েছিলেন। তাই কখনও তিনি কাউকে অভিযোগ করেন নি, দায়ী করেন নি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় মুখাপেক্ষী হয়ে এই বলেছেন, 'আমার জীবনে যতটুকু তাই তুমি দিয়েছ ভগবান, পাওনার বেশি চাইতে গেলে তুমি দেবে কেন ?' এই সহজ দরদভরা মন নিয়েই তিনি কলম ধরেছিলেন, এবং তার চরিত্রগুলির ভাগ্যও নিজের ভাগ্যর মত মার খেয়েছে, আর তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই বোধ হয় এই ছিল।' এই ধরণের মানসিকতা যাঁর ছোটবেলায় গড়ে উঠেছিল, তিনি পরবর্তী কালে অপরাজেয় কথাশিল্পী হবেন না তো কে হবে ?

এই ধরণের মানুষ চরিত্র তো সাধারণত ভেসে যায়। এমন মানুষও সংসারে কম নয়। এদের বলে ভাগ্যের হাতে মার যাওযা দুর্ভাগ্যের বলি। ক্ষমতা থাকলেও ভাগ্য বিরূপতার জন্যে কোন কিছুই সুফল তার কপালে জোটে না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর ব্যতিক্রম। ভাগ্য বিরূপ বলে তিনি বসে থাকেন নি। সচেতন মনটি তাঁর সর্বদা লক্ষ্যের দিকে ধাবমান ছিল।

আজ বরেণ্য লেখকের সাফল্য অর্জনের পর তাঁর সমস্ত জীবন পর্যালোচনা করে তাঁর মানসিকতা কি ছিল এই আলোচনা করতে বসেছি। আলোচনা আপনারাও একান্ত মনে পড়ছেন কিন্তু মনে আছে একজন সফল মানুষের কীর্তিকাহিনী। কিন্তু শরৎচন্দ্র যদি সফল না হতেন, তাহলে কি এই আলোচনা কখনও আলোচিত হত ?

বার বার টলে পড়ে যেতে যেতে যে জীবন উঠে দাঁড়ায়, তাকে কি ঈশ্বরের দান বলব, না এ ব্যক্তি মানসের চেষ্টা ? কোন কিছুই মূল্যায়ন করে এর বিচার করা যাবে না। এই জীবনটি এইভাবে গেছে। এর পর এই হয়েছে, এখন আমরা এই দেখছি। সে ঈশ্বর করল না নিজেই করলেন, সে সব আমরা আর ভাবতে পারি না। এই ভাবেই কি আমরা মহৎ জীবনের আলোচনা করি না ? যাই হোক শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিমানস এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল।

শিল্পী মানস

ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া বহু লক্ষ লক্ষ মানুষ এই লেখকও কম দেখেনি। সৌভাগ্যবান মানুষ আর কজন! সকলেই চায় এক হতে, হয়ে যায় আর এক। জন্মাবার পর কেউ বলতে পারে না সে কি হবে। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু কজন পিতৃবৃত্তি ধারণ করে? ধারণ করার স্পৃহা থাকলেও কি যেন কোথা দিয়ে হয়ে যায়। এই কোথা দিয়ে হয়ে যায় এই রহস্য কেউ জানে না। জানে না বলেই সংসারে এত গল্প।

কেউ ডাকাত হল, চোর হল, স্মাগলার হল। চোর, ডাকাত, স্মাগলার তো এই ভদ্রঘরেই জন্মায়। তবে কি বলতে হবে তাদের মানসিকতা ছোট ছিল? না তারা ডাকাত হবার জন্যেই জন্মেছিল?

কেউ জানে না সে কি হবে? তেমন চোর ডাকাত হওয়াও সংসারে ঘৃণ্য নয়। তখনই বলতে হয়, ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠাবার সময় তার বৃত্তিটিও ঠিক করে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের যুগে এসব কথা বলা খুবই হাস্যকর কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান কি বলে? জন্মকোষ্ঠি কেন দেখা হয়?

শরৎচন্দ্রের জন্ম-কোষ্ঠিতে ছিল তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক হবেন। এ কথা পরবর্তী কালে ঘটে যাবার পর বলা হয়েছে। আজ এই জন্মের শতবর্ষে তাঁর কর্মের পর বলা হচ্ছে। যদি ছোটবেলায় শরৎচন্দ্র জানতেন, তিনি এক'দিন শ্রেষ্ঠ লেখক হবেন, এই কথা জানার পর তিনি হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকলেই তো তাঁর সৌভাগ্যটি সহজে হাতে এসে যেত। অত কষ্ট করার দরকার কি ছিল? কিন্তু এসব কথা কথার ছলেই বলা। কে বা জানতে পারে সে কি হবে? শুধু মানসিক গঠনই তাকে প্রেরণা যোগায় লক্ষ্যের দিকে।

শরৎচন্দ্র সেই প্রেরণা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ যে আগে বলা হয়েছে, সরস্বতী কালিদাসের মত তাঁকে বরদান করেছিল, সেটাই মনে হয় আসল। ব্যক্তি জীবনের এই টানা পোড়নের মধ্যে তিনি কেন লাভ করলেন একটি সাহিত্য গোষ্ঠি? ভাগলপুরেই তাঁর উত্থান-পতনের জীবন। সেখানকার আকাশ, বাতাস, ধূলিকণা যেমন তাঁর শরীরের রক্ত মজ্জা দৃঢ় করেছে, তেমনি দিয়েছে সাহিত্যের প্রেরণা।

ভাগলপুরের মামাবাড়ী যেমন সাহিত্য-শিল্পে আগ্রহী ছিল, সেই আগ্রহী পরিবারের প্রেরণা তাঁকে বৃহত্তর জীবনে আশীর্বাদ দান করেছিল। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবারের কথাও এখানে এসে যায়। রবীন্দ্রনাথও যে পরিবার-ভুক্ত ছিলেন, সেখানে দিনরাত শিল্প কথাই আলোচনা হত। পরিবেশ যে মানুষকে কত সাহায্য করে, ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। দিনরাত যে বাড়ীতে গান গাওয়া হয়, সেখানে গানের লোকের আবির্ভাব বেশি হবে, না গানের বাইরের লোকের আবির্ভাব বেশি হবে?

শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর অনেকেই এই সাহিত্য শিল্পে হাত পাকাবার সাধনা করে যাচ্ছিলেন, তার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ প্রধান। এঁরা ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহর তৃতীয় ভ্রাতার পুত্র। সরস্বতী পরোক্ষভাবে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য না করলে কি এমনি একটি দুর্লভ পরিবেশ তিনি পেতেন? এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গোড়া থেকে এ পর্যন্ত সাহিত্যিক পরিবেশের কথা এসে যায়। ছোটবেলা থেকে হাত না পাকালে সাহিত্য মূল্য সৃষ্টি হয় না। সেইজন্য দরকার ছোট ছোট সাহিত্য সঙ্গ। সেখানে দু'দণ্ড বসে নিজের রচনা পাঠ করা যাবে, অপরে শুনে তার সাহিত্য মূল্য বিচার করবে, আলোচনা হবে এবং সে আলোচনায় অনেক ত্রুটিও সংশোধিত হবে। এইভাবেই সাহিত্যিক তার রচনার নগদমূল্য পেয়ে যায়। অনেক স্বনামধন্য সাহিত্যিক এইভাবে একদিন নিজের প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কিন্তু সবাই কি আর সাহিত্যিক হয়, সবাই সাহিত্যিক হলে পাঠক কে হবে? তাই যারা একদিন সাহিত্য সাহিত্য খেলা নিয়ে কৈশোর যৌবনে মেতে উঠে, তারপর অন্য কর্মের তাড়নায় ভেসে যায়। সংযম, তিতিক্ষা, অধ্যাবসায় যে সাহিত্যিকের মূলধন, যে এটুকু অর্জন করতে পারে, সেই ভবিষ্যতে সাহিত্যিক মূল্য পায় কিন্তু মূল্য পেতে গেলে কত তাকে দিতে হয় সে কে জানে? সাহিত্যিকও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, তারও আশা আকাঙ্খা, তারও সাধারণের মত বাঁচবার প্রত্যাশা থাকে। তারও অর্থের প্রয়োজন হয়, খিদে পেলে খেতেও হয়। কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্যে তাকে অন্যকর্ম করতে হয়। এই সব নানামুখী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অনেকেই শখ বলে সাহিত্য শিল্প ত্যাগ করে। যারা করে তাদের নিয়ে আমাদের কোন কথা নয়। কিন্তু যারা করে না! আমাদের আলোচ্য মানুষ শরৎচন্দ্র করেন নি। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে একটু টলে যেতেন কিন্তু সিধে হতে তাঁর বেশি দেরি হত না। ঐ যে বলা হয়েছে সরস্বতী বরদান করেছিলেন, সেটাই শুধু সত্য

এই সংযমের জন্যে। না'হলে একদিন ত লেখা টেখা ছেড়ে দিয়ে চাকরীর সন্ধানে বর্মায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের মাতুলরা যদি অগ্রণী হয়ে যমুনার সম্পাদকের হাতে শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনা না তুলে দিতেন, তাহলে কি তাঁকে আমরা পরবর্তীকালে সাহিত্যিক হিসাবে পেতাম? সেইজন্যে বলতে হয়, সরস্বতীই পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছেন। তবে সে সব কথা অনেক পরের।

তিন মাতুলের সাহায্যে যে সাহিত্য সঙ্গ তৈরি হয়েছিল, সেই কথাই এখন বলা হবে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকে বাস। সৎ, অসৎ কোন ভেদাভেদই শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনে করেন নি। সংসারে সবেরই প্রয়োজন হয়, ঈশ্বর যেমন দুরাত্মার সৃষ্টি করেছেন, সুস্থ আত্মাও সৃষ্টি করেছেন। ভালো, খারাপ না থাকলে যেমন ভালোর প্রকাশ হয় না, তেমনি আঁধারের মাঝেই তো আলোর উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। শরৎচন্দ্রের মধ্যে ঈশ্বরের এই সৃষ্টির মহিমাটি এতই কাজ করেছিল যে তিনি লেখনী ধারণ করে, গল্পে মনুষ্য শরীর সৃষ্টি করে তার দোষ-গুণ সব ঈশ্বরের মহিমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যে দেখতে পাই, নরনারীর দুঃখ, কষ্ট, সুখ, আনন্দ তার প্রতি অবিচার এমনকি দুর্জন হয়ে যারা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছে, তাদের কথাও বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ঈশ্বরের অভিপ্রেত বুঝি এই ছিল।' 'ঈশ্বর তাকে সমাজে এই করতে পাঠিয়েছেন।' 'ঈশ্বর নিশ্চয় তার ভালর জন্যে এই করেছেন।' এই যে ঈশ্বরের ওপর আস্থা, এ শরৎচন্দ্র নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন। আমরা নিমিত্তমাত্র, বিশ্বচরাচর, চন্দ্র, সূর্য, এই পৃথিবী, সমস্ত প্রাণী জগৎ সবই তো সেই ঈশ্বরেরই দান। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই। ঈশ্বর যদি না চান, তুমি কিভাবে ঈশ্বরের শক্তি ব্যাহত করে এগিয়ে যাবে? যারা জানে না তারা নিবুদ্ধিতার পরিচয় দেয় কিন্তু শরৎচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই তা জেনেছিলেন।

তাই অত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি কখনও ঈশ্বরের ক্ষমতা বিস্মৃত হন নি। দারিদ্র্য তো তাঁকে বার বার পথে নামিয়ে দিয়েছিল। কই তিনি তো ঈশ্বরকে তার জন্যে এতটুকু দায়ী করেন নি, বরং বলেছেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই ছিল।'

এই যে বিশ্বাস এই বিশ্বাসই বুঝি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি। এই বিশ্বাস ছিল বলেই বোধ হয় ঈশ্বরের কৃপা তিনি পেয়েছিলেন। ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে আর থাকতে

পারেন নি। অলক্ষ্যে থেকেও ভক্তের ভক্তি দেখে প্রসন্ন হয়েছেন। আর ঈশ্বর যখন যাকে দেন, সে তো সবাই জানে, তার ব্যাখ্যা মেলে না। তাই শরৎচন্দ্র পরোক্ষে যে ঈশ্বরকেই কায়মনোবাক্যে ডেকে গেছেন, তাঁর পরবর্তী জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই তার প্রমাণ।

ভাগলপুরে ছেলেখেলার মত এক সাহিত্য সভা সৃষ্টি হয়েছিল, ছেলেখেলাই তাকে বলা যাবে কারণ তাঁরা কি তখন জানতেন, এই গোপন ও সাধারণ একটি খেলা খেলা সভা আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে? পুরাতন জেলা স্কুলের নালার পাশে সেই সভা বসত। নালার পাশে কেন? নিশ্চয় সাহিত্য সভাটি কোন নিষিদ্ধ প্রেমের লীলাক্ষেত্র ছিল না? তবু নালার পাশে বেশ নিরাপদই মনে হয়, সভার সভ্যরা সভাটি একটু গোপনেই রাখতে চেয়েছিলেন। আরও একটি কথা ভাবা যেতে পারে, সভ্যরা তাদের রচনা পাঠ বড়দের সামনে করতে লজ্জা পেতেন বলে এই সভার ঐ বিশেষ ব্যবস্থা। যাই হোক, সেই নালাও একদিন কনিষ্ঠ সাহিত্যিকদের ভাগ্যকে বিরূপ করল। পূর্ণ মাস্টার তাঁদের বহিস্কার করলেন নালার কায়েমী অধিকার থেকে। অর্থাৎ রসকষহীন পূর্ণ মাস্টার মনে করলেন, এই সব ছেলেরা খাতার পাতায় সব নোংরা কথা লিখে পরস্পরকে শুনিয়ে আনন্দ পায়।

সে যাই হোক, তাতে সাহিত্যিকরা এতটুকু নিরুৎসাহ হল না, অদম্য স্পৃহা যখন সাহিত্যের জন্যে, সরস্বতী নিত্য নতুন গল্পের ভাণ্ডার যখন সেই কুঁড়ি সাহিত্যিকদের পরিবেশন করছেন, তখন সেই সাহিত্যিকরা সেই সব প্রকাশ না করে কি পারে? এর মধ্যে আবার শুধু লেখক ছিল না, লেখিকার সমাবেশও ছিল। তরুণ মনে আগ্রহ বোধ হয় সেইজন্যে বেশি হয়েছিল। এ কথাটা বলার কারণ, পরবর্তীকালে তার রহস্যও প্রকাশ হয়েছিল বলে তারুণ্যের সেই প্রেরণার রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করা হল। নারীর ছায়া পড়ুক ক্ষতি নেই, সাহিত্য তো স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নয়! যাইহোক পুরাতন জেলা স্কুলের নালা ছেড়ে 'ওয়েজফিল্ডের মাঠ' নির্দিষ্ট হল। সভাপতি বরাবর শরৎচন্দ্রই ছিলেন। যোগেশচন্দ্র মজুমদার কার্যাধ্যক্ষ, গিরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিপিকার, সভ্যদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভট্ট ও তাঁর বিধবা বোন নিরুপমা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নিরুপমা দেবী উপস্থিত থাকতেন না। তাঁর ভাইয়ের হাত দিয়ে রচনা পাঠিয়ে দিতেন।

শরৎচন্দ্র যখন এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র, সেই সময়ে এই সভা হত। এই সময়ে
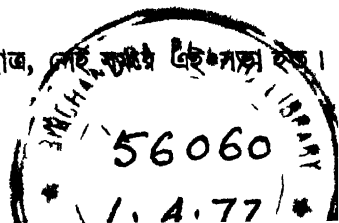
তিনি বহু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু তাঁর লেখাগুলি পরবর্তী কালে আমরা পাঠ করে দেখেছি, সে লেখা কোন অংশেই ছেলেখেলার মত নয়। যদিও তিনি ব্রহ্মদেশে থেকে বার বার মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন, 'আমার আর কত শ্রাদ্ধ করবে? একদিন হাত মক্সর জন্যে যে লেখা লিখেছি, সে কি লেখা হয়েছে?

শরৎচন্দ্র এই সময়ে অভিমান (হেনরি উডের ইস্টলিনের ছায়া অবলম্বনে লেখা), বাসা অথবা কাকবাসা, আর বাগান নাম দিয়ে তিনখণ্ডে একটি রচনাবলী তৈরি করেছিলেন। বাগানের প্রথম খণ্ডে ছিল, বোঝা, কাশীনাথ এবং অনুপমার প্রেম। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল, কোরেল গ্রাম (পরে এটির নাম হয় ছবি), শিশু, পরবর্তী কালে এর নাম হয় বড়দিদি, ও চন্দ্রনাথ। তৃতীয় খণ্ডে হরিচরণ, দেবদাস, বাল্যস্মৃতি, শুভদা, ব্রহ্মদৈত্য ও পাষাণ (মেরি কোরেলির 'মাইটি এটমে'র ছায়া অবলম্বনে লেখা) এই সব লেখা তিনি লেখেন ঐ ভাগলপুরে পাঠ্যাবস্থায়। সাহিত্য সভায় পাঠ হত, আর কুঁড়ি সাহিত্যিক মিলে 'ছায়া' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিল তাতে প্রকাশ হত। এই রচনা লেখার সময়ে শরৎচন্দ্র আর কি করতেন? সেই সময়ে আমরা দেখি, শরৎচন্দ্র কখনও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত, কখনও নেশাভাঙ করে রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভবঘুরের মত ঘুরছেন, কখনও বিভূতিভূষণ ভট্টদেব বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। এই মানসিকতার ওপর সৃষ্টি হয়, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা প্রভৃতির গল্প।

শরৎচন্দ্র এক সময়ে প্রতিষ্ঠা পাবার পর বলেছেন, 'আমার গল্পের সমস্ত চরিত্রই আমার দেখা। নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন চরিত্রই আমি কাল্পনিক রচনা করি নি। শুধু চবিত্রগুলিকে একটু কল্পনার রঙে ছুঁইয়ে সত্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি।' এই যদি সত্য হয়, তাহলে ঐ বয়সে 'দেবদাস' উপন্যাসের চন্দ্রমুখীকে কোথায় পেয়েছিলেন? 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে কাশীতে সরযূর মায়ের সেই চরিত্রটিও কোত্থেকে এল? শুভদার কাত্যায়ণী, জয়াবতী, ললনার চরিত্র এসবই বা শরৎচন্দ্রের কলমে ঐ বয়েসে কিভাবে এসেছিল?

আমরা শরৎচন্দ্রের মানসিকতার পর্যালোচনা করতে বসেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমালোচনায় বসিনি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন যাই হোক, অন্তত সে সম্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল থাকা উচিত নয়। পাঠক চায় ঠাঁস বুনটের এক রসালো গল্প। সে গল্পে চমক থাকবে, সমাজের কথা থাকবে, পাত্র পাত্রীর মানসিকতার ওপর গল্পের মনোরম সমাপ্তি ঘটবে। এই সব হলেই পাঠক খুশি

হবে। আর এই সবের জন্যেই ঐ তরুণ বয়সে শরৎচন্দ্র নতুনত্বের সন্ধানে অনেক কিছু করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এইটুকু বুঝেছিলেন, অন্যেরা যা লিখছেন, তাদের মত হলে হবে না। তাঁকে কলম ধরতে হবে একেবারে অন্যভাবে। কলমের মুখে এমন কাহিনী বলতে হবে যা কেউ কখনও বলে নি। ঐ তরুণ বয়েসে ঐ মানসিকতার ওপর সৃষ্টি হয়েছিল 'দেবদাস' উপন্যাস। 'দেবদাস' উপন্যাস ছাপার সময়ে এটি তাঁর কাঁচা লেখা বলে .ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যখন তিনি সত্যিকারের কলম ধরেছেন, তখন তিনি অনেক পরিণত। দেবদাস ও পার্বতীর ঐ বাল্যক্রীড়া ও বাল্যপ্রেম আর কোথায় পাবেন?

আমরা 'দেবদাস' উপন্যাস নিয়ে যখন আলোচনা করব, সে সম্বন্ধে ব্যাপক বিশ্লেষণ করব। সেই সঙ্গে পার্বতীর মানসিকতা। পার্বতী সামাজিক প্রয়োজনে বৃদ্ধের স্ত্রী হল, আসলে কিন্তু দেবদাসকে মনে রেখে দিয়েছিল। এই যে দ্বিচারিনী সত্তা শরৎচন্দ্র সেই বয়সে কোথায় পেয়েছিলেন? তারপর সেই সময়ে তাঁর কলমে এল চন্দ্রমুখী। চন্দ্রমুখী বারবনিতা, তার কাছে চুনীলাল নিয়মিত যেত, দেবদাস যখন পার্বতীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মনস্থির করতে পারছে না, সেই সময় চুনীলালকে সে দেখল, প্রত্যহ রাত কাটিয়ে কোত্থেকে আসে? দেবদাস যখন জানল চুনীলাল এক বারবনিতার কাছে যায়, সেও যাবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করল কিন্তু গিয়ে কি পেল? ঘৃণা। চুনীলালকে বলল, তুমি এখানে এসে কি পাও? চুনীলাল বলল, আনন্দ পাই। কিন্তু দেবদাস চন্দ্রমুখীর সান্নিধ্যে এতটুকু আনন্দ পেল না।

এই যে মানসিকতা, এই মানসিকতা শরৎচন্দ্র ঐ বয়সে কোথায় পেয়েছিলেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র সে বয়েসে এই ধরণের বারবনিতার কাছে প্রচুর যেতেন। বারবনিতা তাঁকে আনন্দ দিত কিনা সে কথা অজ্ঞাত, তবে তিনি যে' নারীর সান্নিধ্যের জন্যে এ সব জায়গায় ঐ বয়সে গিয়েছিলেন তা প্রমাণ হয়।

শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সে ব্রহ্মদেশ থেকে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছেন, 'আমি অনেক অপরাধ অনেক গর্হিত কাজ আমার প্রথম জীবনে করেছি। আর করতে চাইনে ভাই।' গর্হিত অর্থে কি বলতে চেয়েছিলেন? নিশ্চয় এই সব অসামাজিক নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা।

শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বহু আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে, সবই প্রায় এই লেখকের চোখে পড়েছে, কিন্তু তাঁর মানসিকতার ওপর আলোচনা বোধ হয় খুব একটা হয় নি। ব্যথার ব্যথী না হলে যেমন ব্যথীর মানসিকতা বুঝতে পারে না, তেমনি

আলোচনাও হৃদয়গ্রাহী হয় না। একজনের অন্তর যেমন একজন বুঝতে পারে না, সে যতই প্রিয়জন হোক। তেমনি শরৎচন্দ্র সে সময়ে কি চাইতেন সেটা প্রায় অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনে কখনও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কারুর কাছে মুখ খোলেন নি। কেন খোলেন নি? এই কেনর উত্তর অজ্ঞাত বলে আজ তাঁর শতবর্ষের সময়ে সমালোচকরা নানান কথা নিয়ে তোলপাড় করছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বরেণ্য লেখকের লেখার শ্রেষ্ঠত্বই লেখকের মানদণ্ড নয়, লেখকের ব্যক্তিগত জীবনটিও সকলের কৌতূহল জাগায়। একজন সাধারণ লোক জীবনের প্রয়োজনে যা করে, লেখক যে তা করে না, তাঁর শিল্পীমন শিল্পের খাতিরে যে অনেক কিছুই করে, সেটাও সাধারণের আলোচনার বস্তু হয়। শরৎচন্দ্র কখনও মুখ খোলেন নি। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের রহস্য সন্ধানে তাঁকে সম্মানের উচ্চপদ থেকে বার বার নিচে নামিয়ে তাঁর নাড়ী-নক্ষত্র দেখেছেন। . এ কথা জীবিত অবস্থাতেও শরৎচন্দ্র শুনেছিলেন বলে মনে মনে তিনি কষ্ট অনুভব করেছিলেন। তাই মুখ একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইদানীংকালে রাধারাণী দেবীর লেখাতেও তা দেখতে পাওয়া যায়। সে সময়ে রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। অনেক কথাই কথাচ্ছলে হত। শরৎচন্দ্র আড্ডা দিতে ভালবাসতেন, আড্ডা দিতেন। একজন এত বড় লেখকের সান্নিধ্য সে তো গৌরবেরই বিষয়। কিন্তু রাধারাণী দেবী বৃদ্ধ বয়সে 'দেশ' পত্রিকার মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে সব কথা পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, সে কথা যে তাঁর তোলা উচিত হয় নি, তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম আলোচনাই তার প্রমাণ। শরৎচন্দ্র জীবনে দুবার বিয়ে করেছিলেন, দুবারই ব্রহ্মদেশে। একবার শান্তি দেবী বলে একজনকে। তাঁর গর্ভে একটি সন্তান হয়েছিল, পরে হিরণ্ময়ী দেবীকে। হিরণ্ময়ী দেবীকে নিয়েই সারাজীবন ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন বলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। রাধারাণী দেবী প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তিনি একজনকেও বিয়ে করেন নি। এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় আমরা দেশ পত্রিকাতেই পেয়েছি।

রাধারাণী দেবী বরেণ্য লেখকের সান্নিধ্যলাভে তাঁর প্রতি এঁর শ্রদ্ধা কতখানি কাজ করেছিল, এই লেখাই তার প্রমাণ। কি প্রয়োজন ছিল এই সব কথা আজ সেই শিল্পীর মৃত্যুর আটত্রিশ বছর পরে আলোচনা করার? তবে কি রাধারাণী দেবী যখন তাঁর সান্নিধ্য পেতেন, মনে মনে এই লেখকের কাছে নারীর মূল্য

কতখানি সেই আলোচনাই করতেন ? এবং সে আসন যে খুব শ্রদ্ধার নয়, তাও এই বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন দেখে মনে হয়।

আমরা শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করি। যেমন শিল্পীর শিল্পত্ব শ্রেষ্ঠ হিসাবে চাই, তার ব্যক্তিগত জীবনটিও কাঁচের মত পরিস্কার হবে তাই আশা করি। এ কেমন করে সম্ভব তা একবারও ভাবি না। শিল্পী যদি তাঁর অভিজ্ঞতা না সঞ্চয় করে, তাহলে লিখবে কেমন করে? ড্রইংরুমে বসে, সোনার কলমে দামী কাগজ নিয়ে প্রিয়জনকে চিঠি লেখা যায়, অন্তত সৃষ্টিধর্মী লেখা সম্ভব নয়। তার জন্যে তাঁকে যত্রতত্র ঘুরতে হয়, এই যত্রতত্র ঘোরার অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্র ছোটবেলায় অভ্যাস করেছিলেন বলে তাঁর কলমের মুখে নানা পরিবেশের গল্প এসে গিয়েছিল।

ছোটবেলায় যে কথা ঐ বরেণ্য লেখকের মনে রেখাপাত করেছিল, তারপর তো অনেক বছর গত হল, কই এখনও কি সে সব কথা সাধারণের বোধগম্য হল না? লেখা জিনিসটা অভিজ্ঞতা না হলে হয় না, লিখতে গেলেই, গল্প সৃষ্টি করতে গেলেই চোখ মেলে মানুষের জীবন ধারা লক্ষ্য করতে হয়। গল্পটা নিজস্ব সম্পত্তি কিন্তু মানুষের জীবনধাবা দেখে সেই গল্পই মানুষের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হয়।

শরৎচন্দ্র ছোট বেলায় সে কথা জেনেছিলেন বলে তাঁর অভিজ্ঞতাব ঝুলি নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ভরে উঠেছিল। শিল্পী মানস যে সেই ভাগলপুরের সাহিত্য সভায় গল্প পাঠের সময় তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তাঁর তখনকার রচনাই তার প্রমাণ। শবৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনেব আর একটি দিক এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যায়। বিভূতিভূষণ ভট্টেব বোন নিরুপমা দেবীর সঙ্গে তাঁর সুপ্ত প্রণয় ঘটে গিয়েছিল। এ কথা আমরা শরৎচন্দ্রের জবানীতেই লক্ষ্য করেছি। সে সময় শরৎচন্দ্র ও নিরুপমা দেবী যে বয়সে ছিলেন, প্রণয় ঘটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। শরৎচন্দ্র প্রায় সময় তাঁদের বাড়ি আড্ডা দিতেন। শিল্পী মন, নিরুপমা দেবীর মধ্যে তাঁর মানসীকে বোধ হয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিরুপমা দেবী যদি বিধবা না হতেন, হয়ত অন্য একটি ঘটনা ঘটে যেত।

আমরা এই প্রণয় সম্বন্ধে শিল্পীর কাছ থেকে পেয়েছি 'বড়দিদি'। সেটিও সেই সময়ের লেখা। বড়দিদির মানসিকতা থেকে আমরা পেয়েছি সে যুগে বিধবাদের মনের পরিচয়। বিধবার মনেও যে প্রেম জাগে, সে প্রেম শুধু অপ্রকাশ্য, সামাজিক নিয়মের কঠিন শাসনের জন্যে তা প্রকাশ হয়েও প্রকাশ হতে পারে না, এ যে কি কষ্ট, শরৎচন্দ্র নিরুপমা দেবীকে দেখেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর

রচনা 'বড়দিদি' প্রকাশ হয়। বড়দিদির মাধবী যেন নিরুপমারই আর এক রূপ। যে নির্বিবাদে শুধু সংসারের কর্তব্য করে যায়, নিজের জন্যে ভাবে না, কারণ নিজে যে বিধবা। বিধবার যে নিজের জন্যে আর ভাবতে নেই, স্বামীর সঙ্গে তার ভালবাসার সব অধিকার অন্তর্হিত হয়েছে। সামাজিক শাসন যে কত নির্মম, সে কথা শরৎচন্দ্র মাধবীর মধ্যে দিয়েও দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র যখন বড়দিদি লেখেন, তখন তাঁর সাহসটা কম ছিল। তাই মাধবীর অনুচ্চার ভালবাসা সখী মনোরমার কাছে প্রকাশ করেছেন, প্রেমাস্পদের কাছে প্রকাশ করেন নি। মনোরমা তাকে ধিক দিয়েছে, মনোরমা ঠিক নয়, মনোরমা নামের সমাজ কিন্তু মাধবী তার জন্যে কি করবে? তার যে মন ভাবুক ভোলা সুরেন্দ্রনাথের জন্যে কেঁদে উঠেছিল। আমাদের মনে হয়, নিরুপমা দেবীরও এই অবস্থা হয়েছিল, তাঁর মন শরৎচন্দ্রের জন্যে কেঁদে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। শরৎচন্দ্রের সমস্ত নায়ক চরিত্রই তাঁর মত আত্মভোলা। দেবদাসের দেবদাস, চন্দ্রনাথের চন্দ্রনাথ, বড়দিদির সুরেন্দ্রনাথ, দত্তার নরেন, পল্লীসমাজের রমেশ, চরিত্রহীনের সতীশ, গৃহদাহর মহিম, প্রায় সব গল্প উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রর নায়ক চরিত্র তিনি নিজে। এর বাইরে তিনি পরিণত বয়েসেও যেতে পারেন নি। তাঁর মনে হত, তাঁর পুরুষ চরিত্রটি নায়িকাদের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। নায়িকারা এই আত্মভোলা লোক দেখে ভাল না বেসে পারে না। তবে নায়করা আত্মভোলা হলেও শারীরিক দিক দিয়ে যে বলশালী সেটা দেবদাস, চন্দ্রনাথের মধ্যে যত না দেখা যায় শ্রীকান্তর শ্রীকান্ত, দত্তার নরেন, পল্লীসমাজের রমেশের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। নরেন বন্ধ জানালা খুলে প্রমাণ করেছিল তার শক্তি, রমেশ লাঠির ঘায়ে আকবর ও আকবরের দুই ছেলেকে ঘায়েল করে প্রমাণ করেছিল সে কত বড় লাঠিয়াল। শ্রীকান্ত শ্মশানে গিয়ে পিয়ারী বাঈজীর ভালবাসা পেয়েছিল। নায়িকারা যে পুরুষদের শক্তিকে পূজা করে, এটা শরৎচন্দ্র তাঁর মানসিকতায় বুঝতে পেরেছিলেন। মেয়েদের ভালবাসা একদিক দিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকলেও বীরের প্রতি যে তাদের একটা অহেতুক দুর্বলতা থাকে, নারী মনস্তত্ত্ব যাঁরা জানেন, তাঁরা ঠিকই এটা উপলব্ধি করেন। শরৎচন্দ্রের সেই উপলব্ধিবোধ বহু আগেই হয়েছিল।

বিধবাদের নিয়ে তাঁর চিন্তা, নিরুপমা দেবীর দেখা না পেলে কি হত জানি না। তবে তিনি সমাজ দর্শন করেছিলেন খুব বাল্যকালেই। সমাজের নির্মম অনুশাসন তাঁর জীবন দিয়ে তাঁকে বার বার ধাক্কা মেরে সমাজের বাইরে ফেলে

দিয়েছিল। তাঁর বাবা কেদার গঙ্গোপাধ্যায় যখন বাড়ী থেকে বহিষ্কার করে দিলেন, তিনি সন্ন্যাসী হয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এইরকম সন্ন্যাসীর জীবন তিনি পাঁচবার গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি সারা ভারতবর্ষের মানুষদের কি চোখে দেখেছিলেন? আমরা পরিণত বয়সে শ্রীকান্তের মধ্যে এই ভবঘুরে জীবনের অভিজ্ঞতার লিখিত সমাচার পাই। সেখানে একটি চরিত্রই উপলক্ষ্য—সে হল রাজলক্ষ্মী, সে মনে প্রাণে এই ভবঘুরে লোকটাকে ভালবাসে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বাঈজী চরিত্র পিয়ারী, যার দর্শন তিনি মজঃফরপুরে মহাদেবের ঘরে পান, পরে তিনি শ্রীকান্তের জবানীতে লিখতে গিয়ে শ্রীকান্তের সঙ্গে তার বাল্যকালে যে রাজলক্ষ্মীর সখ্যতা ছিল সেটা দেখিয়েছেন। এই রাজলক্ষ্মীর মত কোন সখী কি শরৎচন্দ্রের জীবনে ছোটবেলায় ছিল? বাল্য প্রেমের এক গোপন প্রত্যাশা শরৎচন্দ্র কিশোর বয়েসেই অনুভব করেছিলেন। এটা শুধু তাঁর অনুভবই নয়, জীবন্ত কোন বালিকার সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল কিনা শরৎচন্দ্রের জীবনীকাররা কেউই তাঁর জীবনীতে প্রকাশ করতে পারেন নি। বাল্যকালে দেবানন্দপুরের পাঠশালায় তিনি পড়তেন, বালক-বালিকার সমাবেশ সেই পাঠশালায় বিচিত্র নয়। কোন বালিকার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক না ঘটুক, বালিকা যে বন্ধু ছিল সেটা নিশ্চয় আশ্চর্য নয়, মনে মনে ভালবাসা যে পাপ নয়, আর কারুর সঙ্গে যদি খেলেই থাকেন সেটা কি পরবর্তীকালে প্রেম হিসাবে ধরে নিতে হবে? বাল্যসাথী থাকতে পারে কিন্তু সেটা সাধারণত খেলারই সাথী। ঐ বয়সে প্রেম নামক বস্তুটি তো ঘাড়ে এসে চাপে না। শরৎচন্দ্র যখন দেবদাস লিখেছিলেন, তখন তিনি তরুণ। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার শেষ ধাপে এসে পৌচেছেন, তখন দেবদাসের কাহিনী লিখতে গিয়ে পার্বতীর মত একটি বাল্যসাথীকে খাড়া করেছেন। পারু, মাধবী, সরযূ যেই হোক, একজন বাল্যসাথীর রূপ তাঁর হৃদয়ে মানসীর ছায়া নিয়ে কাজ করছিল, সেই পার্বতী হয়ে দেবদাস উপন্যাসে ধরা দিয়েছে।

আমরা লেখক মনের মানসিকতা পর্যালোচনা করে দেখি, গল্প লিখতে গেলে নিজের ভেতরের দেখাটাই পাত্র পাত্রীর শরীর তৈরি করে গল্পের আকারে বেরিয়ে আসে। কখনও সে দেখা অবচেতন মনে কাজ করে, কখনও একটি বিশেষ পুরুষ বা নারীকে দেখে তার কথা শুনে মনে হয়, একে আমি আমার তুলিতে আঁকব। কিম্বা কোন নারীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সে জড়িয়ে গেল, তার চলা-ফেরা কথা বলা, চাউনি, স্বরের ধ্বনি সবই বুকে গিয়ে

জমে থাকল। লেখক যখন তুলি ধরে, সে হয়ত জানেই না তার অচেতন মন থেকে সে অসংখ্য নারীচরিত্র সেই একটি নারী থেকেই সৃষ্টি করেছে।

এইভাবে লেখক তার মানসিকতা প্রকাশ করে। যে সব লেখকদের অভিজ্ঞতা সীমিত, যারা একটি নারীর সঙ্গে চিরকাল বসবাস করে এসেছে, তাদের লেখার পরিধিও সীমাবদ্ধ। তাদের কাছ থেকে পাঠক একই পরিবেশ, একই নর নারীর দেখা পায়। সে নর নারীর কিছুটা লেখক নিজে, আর হয়ত কাছের যে জন সে হয়ত স্ত্রী। লেখক সমাজে বাস করে বলে, সমাজের নিন্দা থেকে বাঁচবার জন্যে বহুধা হতে পারে না। যারা এমনি করে, তাদের লেখার উৎকর্ষতা দেখলেই বোঝা যায়।

লেখক জীবন যে কত নির্মম, সে লেখক মাত্রেই জানে। একে তাকে সমাজের মধ্যে সমাজ রক্ষা করতে হয়, লোক লজ্জা, আত্মীয়স্বজনের মাঝে নিজের সম্মান রক্ষা, উপর্যুপরি নিজের ঘরোয়া শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য থাকে। এই সব করে যা লেখা হয় সেটা দায়সারা গোছেরই একটা মামুলি কিছু তৈরি হয়। পাঠকের মনে কোন দোলা লাগে না। পাঠকও তাকে নিয়ে কোন আলোচনা করে না।

লেখক জানে তার দুর্বলতা কোথায়। তখন ন যযৌ ন তস্থৌর মত অবস্থা হয়। এক লেখকের কথা এই সূত্রে আলোচনা করা যায়, তিনি নিজের মান বজায় রাখবার জন্যে ভদ্র বেশে বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে ঘুরতেন। তাদের যুবতী মেয়ে থাকলে মেয়েদের সঙ্গে, না থাকলে যুবতী বৌদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করতেন, করে লেখার রসদ যোগাড় করতেন। আবার কোন কোন সময়ে হঠাৎ সেই বাড়ীতে জানান না দিয়ে ঢুকে পড়লেন। একেবারে যে কিছু পেলেন না তা নয়, হয়তো সেই বাড়ীর মেয়েটি দরজা খোলা রেখেই কাপড় ছাড়ছিল, লেখকের যা দেখার দেখা হয়ে গেল। তারপর অপ্রস্তুত হবার ভূমিকা। মেয়েটি আর কিছু মনে করল না, সে মুচকি হেসে ভদ্রতার খাতিরে হয়তো বলল, 'আপনি তো আর জেনে শুনে ঢুকে পড়েন নি, আমারই তো ভুল হয়েছিল দরজা খুলে রাখা।' এমনি আরও এই লেখকের আচরণ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল, ঝি বলল, 'দিদিমণি বাথরুমে, আর কেউ বাড়ী নেই।' লেখক হয়তো সে কথা জানতেন, জেনেই তো সুযোগটি নিয়েছিলেন। লেখক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, পাপ কাজ করতে গেলে তো সাহস সঞ্চয় করতে হয়, তারপর আড় চোখে দেখে নিলেন ঝি ধারে কাছে আছে কিনা, নেই দেখে বাথরুমের ফুটোতে গিয়ে চোখ রাখলেন।

নগ্ন নারী দেহ লেখক কেন দেখতে চান সে কথা বলতে গেলে সাধারণত অনেকে বাহ্যদৃষ্টিতে বলবেন, 'লেখকগুলি সবই চরিত্রহীন, নারীদেহ চিবিয়ে খাবার যম।' এ কথা সাধারণের কথা কিন্তু শিল্পীর মানসিকতা কে জানে? নারীদেহ বা পুরুষদেহ ঈশ্বরের সৃষ্টি। প্রকৃতির মতই তার নানান সৌন্দর্য বিকশিত হয়। বিশেষ করে নারী শরীর, তার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পরিবর্তন এ শিল্পেরই একটা অঙ্গ। সেই নারী দেহের নগ্ন রূপ যদি শিল্পী দেখতে চান সেটা শিল্পীর চোখে শিল্পের সৌন্দর্য বলেই ধরে নিতে হবে। কই ফুল, ফল, সঙ্গীতকে তো সাধারণ লোকে এত ভালবাসে না, শিল্পী যত ভালবাসে?

আরও বুঝিয়ে বলতে গেলে শ্রেষ্ঠ অঙ্কন শিল্পীদের কথা বলা যায়। পিকাসো বা লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি নগ্ন নারী রূপের নানা সৌন্দর্য তুলির অঙ্কনে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন, কই সেই ছবি দেখে তো তাদের চারিত্রিক দোষ ধরা হয় না বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করা হয়?

তাই শিল্পীর মানসিকতা সাধারণের বিচার্য একেবারেই হতে পাবে না। শিল্পী কোন্ চোখ দিয়ে কি দেখতে চাইছে সে নিজেই জানে। ঈশ্বর একজন প্রধান সৃষ্টি কর্তা, তিনি সবাব বড শিল্পী, সেই সৃষ্টির গভীরত্ব মানব শিল্পী তার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কবে নিজের তুলি সক্রিয় করে।

তাই আমরা কখনও সাধারণের মত শিল্পীর জীবন দেখব না। স্রষ্টা কখন কি ভাবছে? কি তার মনের অভাব, কোন্ অভাবের জন্যে সে এই করতে চাইছে, সহানুভূতিব সঙ্গে গবেষণা করব। আজকে আধুনিক সমাজের মানুষ অনেক বুঝতে শিখেছে। আজকে আর কেউ অজ্ঞান নয়, তাই শিল্পীর স্বাধীনতা সর্বাগ্রে তাকে দেওয়া উচিত। মদ খেলেই মাতাল হয় না, মাতাল যারা হয়, তাদের ঘৃণা করা উচিত, মদ্যপায়ীকে করা উচিত নয়। মদ তো অনেক ব্যাপারেই অনেকে খায়।

শরৎচন্দ্র মদ খেতেন, গাঁজা খেতেন, সিদ্ধি, ভাঙ, তামাক, সিগারেট কিছুই বাদ যেত না। বহু বেশ্যার সঙ্গে অনেক ছোটবেলাতেই মিশেছেন কিন্তু পরিবর্তে আমরা তাঁর কাছ থেকে কি পেয়েছি? শ্রেষ্ঠ কতকগুলি রচনা। যে রচনার ধারে কাছে কেউ যেতে পারে না।

তাহলে আমরা শিল্পীর কাছ থেকে কি চাই? সৃষ্টির ভুবন ভোলানো রসালো ছবি। যে ছবি দেখে আমরা অভিভূত হই। শরৎচন্দ্র আমাদের সে অভাব পূর্ণ করেছেন। তাহলে বরণীয় লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমাদের

এত মাথাব্যথা কেন? ভাগলপুরে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়েছিল। দু' তরফাই হয়েছিল, কিন্তু এক তরফা নীরব ছিল। নীরব থাকলেও শরৎচন্দ্রের মনে যে অর্থটা উপস্থিত হয়েছিল, সেটা পরবর্তীকালে সমস্ত বিধবা মেয়েদের মনেরই কথা। বাল্যবিধবা বা অল্পকাল যারা স্বামী ভোগ করে বিধবার বেশ পরিধান করল, সেই সব মেয়েদের সমাজের অনুশাসন মেনে যুবতী মনের কামনা বাসনাকে চেপে রেখে কত কষ্ট করে কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়ে জীবন শেষ করতে হয়, শরৎচন্দ্র নিরুপমাকে দেখেছিলেন বলেই তো অতো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন। না হলে সমাজের এত বড় একটা ত্রুটি হয়ত তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত। কিম্বা হয়ত দেখতেন কিন্তু সেই নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবার মত মানসিক জোর পেতেন না। বিধবাদের কপাল ভাল, নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিল্পীর মনে কারও ছায়া পড়লে সমাজেরই কোন না কোন ক্ষেত্রে মঙ্গল হয়।

শরৎচন্দ্রের তারপরই লক্ষ্য পড়েছিল, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, এবং বিধবা বিবাহ আইন পাশ। কিন্তু তিনি বিধবাদের জন্যে মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন, তাঁর রচনার মধ্যে তাদের সামাজিক বেদনা প্রকাশ করেছেন, তাদের ভেতরের ভালবাসা দেখিয়েছেন, তবু তাদের বিয়ে দিতে সাহস করেন নি। কেন? তাঁর মত মুক্ত মন এমন সংস্কারে আচ্ছন্ন হল কেন? তবে কি নিরুপমা দেবীকে তিনি পেলেন না বলেই এমনি অনুশাসনে আবদ্ধ হলেন? নিরুপমা দেবী সে যুগে শরৎচন্দ্রের বহু আগেই খ্যাতিময়ী লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি যে কটি উপন্যাস রচনা করেছেন খুবই সামান্য, শ্যামলী, অন্নপূর্ণা মন্দির, দিদি, আরও ক'টির নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, সেই লিখেই যশস্বিনী হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে সব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে পাড়ি দিতে হল। এবং শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাও এই আমি চাই।'

এই যে ভালবেসে নির্বাসন, নিজেকেও সরিয়ে নিলেন, প্রেমাস্পদকেও সরিয়ে দিলেন, এই মানসিকতার ওপরই শরৎচন্দ্র চিন্তা করেছেন, বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত নয়। আমরা জানি না হয়ত এই প্রশ্ন তিনি নিরুপমা দেবীকেও করেছিলেন, 'আমি তো বিয়ে করতে চাইছি, তবে বাধা কেন?' নিরুপমা দেবী যে বাড়ীতে বাস করছিলেন, সেখানে শিল্প-সাহিত্য অনুপ্রবেশ করেছিল, কিন্তু তাঁরা অত উদার নয়। শরৎচন্দ্র হয়ত বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের আইন পাশ দেখিয়েছিলেন কিন্তু নিরুপমা দেবী তাতে মত দেন নি।

কিন্তু কেন? তার উত্তরে হয়ত নিরুপমা দেবী বলেছেন, 'এক পুরুষের স্ত্রী হয়ে দ্বিতীয় পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে পারব না।'

এ সবই মন গড়া কথা। শরৎচন্দ্রও কোথাও মুখ খোলেন নি, নিরুপমা দেবীও আজীবন নিরুত্তর থেকেছেন কিন্তু শিল্পী তাঁর কলমের মুখে সেই অভিজ্ঞতারই ফসল সৃষ্টি করেছেন। বড়দিদির মাধবী বিধবা বলেই সুরেন্দ্রনাথকে 'বিস্মৃত হয়েছিল। পল্লীসমাজের রমা রমেশকে এত ভালবেসেছিল, তবু সে বিধবা বলে শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গে রমেশের মিলন দেখাতে পারেন নি। বামুনের মেয়ে গোলক চাটুয্যের শালী জ্ঞানদার গর্ভে ভগ্নীপতির অবৈধ সন্তান উৎপাদন করলেন, তবু বিধবা বলে গোলক চাটুয্যের বাড়ীতে আশ্রিতার মত রাখতেও সাহস করলেন না। এই যে বিধবাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের নির্মমতা, এ কি নিরুপমা দেবীকে না পাওয়ার জন্যে নয়? তবে শরৎচন্দ্রের মানসিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দ্বিচারিণী বা ব্যভিচারিণীর প্রতি শরৎচন্দ্রের দরদী মুক্ত মন সংস্কারহীন ছিল না। বাল্যকালের রচনাতেও দেখা গেছে, পার্বতী বিবাহিতা হয়ে প্রেমাস্পদের জন্যে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, পার্বতী দেবদাসকে তার নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চেয়েছে কিন্তু শরৎচন্দ্র নিয়ে যান নি, যখন নিয়ে গেছেন তখন গল্প শেষ।

বৃদ্ধ ভুবন চৌধুরী পার্বতীর কাছে যতখানি কৃতজ্ঞ, দেবদাসের কথা যদি আগে জানতে পারতেন, তাহলে কি এই কৃতজ্ঞতা দেখাতেন? এ তো গেল বাল্যকালের রচনা। পরিণত বয়েসে 'গৃহদাহ'র অচলার মধ্যে যে নির্মমতা দেখিয়েছেন তাকেও ক্ষমা করেন নি। সুরেশের দোষে অচলা নিজের সংযম হারালো কিন্তু দোষী হল অচলা। তার পরিণতিও শরৎচন্দ্র ক্ষমার চোখে দেখেন নি।

শরৎচন্দ্রের শিল্পী মানস পর্যালোচনা করলে এই দেখা যায়, তিনি নিজে যতই সমাজকে আঘাত করে করে সমাজের ঘুনধরা প্রাচীন অনুশাসনগুলি ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছেন, আসলে তিনিও সমাজের বাইরে নিজেকে নিয়ে গিয়ে বিপ্লব জাগাতে পারেন নি। তখনই তাঁর কলম স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভেবেছেন এটা করা ঠিক কি হবে? না, এতখানি করলে সমাজের ওপর ভীষণ অন্যায় করা হবে। সুতরাং এরা যা হতে পারবে না, তাদের না হতে দেওয়াই ভাল। এই সংস্কারের বাইরে শরৎচন্দ্র কোনদিনও যেতে পারেন নি। যেমন পুরুষগুলির কাম প্রবৃত্তি তাঁর মনে ঘৃণার সঞ্চার করেছিল, তাদের জঘন্যতম প্রবৃত্তিগুলি পাঠকের চোখে তুলে ধরার জন্যে তাঁর কলম এতটুকু গতিহীন

হয়নি, তেমনি চিত্র যাতে পরিস্ফুট হয়, তারই চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যের অনেকটাই গ্রাম্য পরিবেশে কেটেছে। তিনি গ্রামের নরনারীর জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে দেখেছেন। সেখানকার সমাজ যেমন নির্মম, আবার সমাজের দোহাই দিয়ে সমাজপতিদের জঘন্যতম জীবন নির্বাহ, দরিদ্রকে কিভাবে সবলে গলা চেপে মারতে পারে, সে নারীঘটিত হোক বা অর্থকরীর ব্যাপারেই হোক সমাজপতিরা তার বিবিধ সুযোগ নিয়েছে। এই সমাজের শাসন স্বরূপ উদঘাটিত করে মানুষের ঘুমন্ত বিদ্রোহকে জাগানোর জন্যে কলম ধরেছেন।

আজ আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করতে পারি, সম্পূর্ণ না হোক কিছুটা উপকার শরৎচন্দ্র গ্রাম্যমানুষদের জন্যে করেছেন। বেণী ঘোষালের দেখা আজ আমরা পাই বটে, জোতদার, মহাজনরা এখনও দুর্বলের ঘর-বাড়ী, সম্পত্তি, সুন্দরী স্ত্রী বা মেয়েকে নিয়ে যায় বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। শরৎচন্দ্রেব আমলের মত নির্বিবাদে তারা বেশিদিন এই স্বভাব নিয়ে রাজত্ব করতে পারে নি। আজও ঘরে ঘরে গোলক চাটুয্যের মত লোক দেখা যায়, যারা নিজেরাই দুধটি মেরে ক্ষীরটি খাবার চেষ্টা করে কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের আর সে দৌত্য নেই, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বই এখন স্বীকার্য নযত ব্রাহ্মণেব দৌত্য। উনবিংশ শতাব্দীর ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্যের এই দৌত্য খুবই আকাশচুম্বী হয়েছিল। দম্ভ যে কোন শক্ত ভিতকেও বেশিদিন দাঁড করিয়ে রাখে না, সে শিথিল হয়ে যায়, এই ব্রাহ্মণত্বের শেষ পরিণামই তাব প্রমাণ।

শরৎচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সে যুগের ব্রাহ্মণ কিন্তু তাঁর চোখ ছিল খোলা। নিজের জাতের লোকগুলির কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি নিজেই হতবাক। সেই ব্রাহ্মণ হয়ে নিজেই নিজের জাতের দম্ভ চূর্ণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে তাঁকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। আমরা দেখেছি শরৎচন্দ্র কৈশোরে দাদু কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্নে পুষ্ট হয়েও তিনি শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযের দলে গিয়ে মিশেছিলেন। কিন্তু কেন? শুধুই কি যাত্রা, থিয়েটার আনন্দ স্ফূর্তির লোভ? শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্যস্মৃতি স্মরণে বলেছেন, 'এই সব করতে আমার ছোটবেলায় খুব ভাল লাগত।' কেন ভাল লাগত? শরৎচন্দ্রকে নিশ্চয় আমরা সাধারণ কিশোর দলে ফেলব না। পাঠ্য বইয়ের সেই কঠিন শব্দগুলি গলাধঃকরণ করার চেয়ে মাঠে ঘাটে গিয়ে সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে প্রাণ খুলে গান গাওয়া, প্রকৃতির শিশু প্রকৃতির কোলে নিজেকে মেলে দিয়ে তিনি প্রকৃতির

কাছ থেকেই অফুরন্ত আনন্দ আহরণ করেছেন। অথচ কলম যখন ধরেছেন, তখন বেণী ঘোষাল, রাসবিহারী, গোলোক চাটুয্যে, রাসমণির মত কুৎসিত জঘন্যতম চরিত্রগুলি বেরিয়ে এসেছে।

শরৎচন্দ্র একদিন ভেবেছিলেন কি লিখব? তখন তিনি চোখের ওপর এই সব দেখে তাদের সাহিত্যে আনবার চেষ্টা করেন নি। হয়তো তখন ভেবেছেন, এসব লিখলে কি কেউ পড়বে? এ সবের মধ্যে রসের চেয়ে গ্রাম্য ষড়যন্ত্রের কচকচানিই বেশি। তাই সমাজের কথা মুলতুবী রেখে তিনি অন্যভাবে গল্পকে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। বড়দিদিতে পাই বিধবার প্রেম, চন্দ্রনাথে পাই একটি কিশোরীর প্রতি চন্দ্রনাথের ভালবাসা, তবু তার খুড়োর চরিত্রের মধ্যে সমাজপতির দেখা মেলে কিন্তু সে চরিত্র অত উগ্র নয়। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি তখন অত প্রখর হয় নি, আর হলেও শক্তি সীমিত, তাই খুড়ো সমাজপতি হয়েও নির্মম নয়। সে প্রথমে চন্দ্রনাথের অপরাধে ক্ষুন্ন হয়েছিল কিন্তু রাখাল ভট্টাচার্যের মত বদলোকের দেখা পেয়ে তাকে শাস্তি দিতেও কার্পণ্য করেনি। শুধু হরিদয়ালের ব্রাহ্মণত্ব শরৎচন্দ্রের কলমে আসল ব্রাহ্মণ স্বরূপের দেখা মিলল। হরিদয়াল যখন জানল, বামুন ঠাকুরুণের জাতের ঠিক নেই, তখন সে নির্মম হয়ে উঠল কিন্তু শরৎচন্দ্র পাশাপাশি আর একজনকে সৃষ্টি করলেন যে উদার, যে হৃদয়ের কারবারী, যে ব্রাহ্মণ হয়েও জাতের ভয়ে হরিদয়ালের মত উন্মাদেব পরিচয় দেয় না, সে হল কৈলাস খুড়ো এই যে তারুণ্যে সমাজের আসল স্বরূপের উদঘাটন, সেই কিশোর মনে আলো জ্বেলেছিল, সেই আলো আমরণকাল তাঁর মধ্যে ছিল। আর সেই প্রজ্বলিত আলোর আভায় তিনি মানুষের মনের অন্ধকার দূর করেছেন। আজকের সমাজ অনেক পালটে গেছে। এ পালটানোর মূলে যদি আমরা লেখকের সহযোগিতার কথা বলি, তাহলে কি কথাটা অত্যুক্তি হবে না। আমার সঙ্গে হয়ত অনেকেই এক মত হতে পারবেন না, কারণ উন্নাসিক মানুষ বলবেন, গল্প উপন্যাস লিখে কি সমাজে বিপ্লব আনা যায়? সে কথা যদি বলা হয়, তাহলে বলব, শরৎচন্দ্রের আজও পাঠক সংখ্যা সীমিত নয়। তারও হয়তো উত্তর শুনব, 'লেখাগুলি পড়তে খুব ভাল লাগে।' শুধুই পড়তে ভাল লাগে? আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলির কান্না কি বুকে গিয়ে বাজে না? বিস্ময় জাগে না সেইসব নির্মম, জঘন্য, অত্যাচারী, শঠ, প্রবঞ্চকদের চেহারা দেখে?

আমরা বসেছি এই শতবৎসর পরে একজন শিল্পীর দরদী মনের শিল্প সত্তার ওপরে তাঁর আসল মনটি কি ছিল তার মূল্যায়ন করতে। স্রষ্টা তো নিজেই

তাঁর সৃষ্টির মাধ্যম খুঁজে নেন নিজের হৃদয় থেকে। সেই হৃদয় যেমন হবে তার সৃষ্টিও তেমনি হবে। এ কথা শরৎচন্দ্র বাল্যকাল থেকে জেনেছিলেন বলে তাই রূঢ় বাস্তব সংসারের মধ্যে বার বার আঘাত পেয়ে তিনি প্রত্যাঘাত করেন নি, বরং আরও দরদী হয়ে এই বলেছেন, 'মানুষ তো মানুষেরই সংহার কর্তা। সেই মানুষের ওপরে যিনি নিয়ন্ত্রণ কর্তা তাঁর কাছে তো কোন ফাঁকি নেই, তিনি সবই জানেন. তিনিই বিচার করবেন মানুষের এই অবিচার।' কথাটা লিখিত হওয়ার পর কত তুচ্ছ মনে হল কিন্তু অন্তর দিয়ে যদি কেউ বিশ্বাস করে, তাঁর ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, তার মত সুখী বোধ হয় ইহজগতে আর কেউ নেই। শরৎচন্দ্র সৃষ্টির জীবনে যেমন নরনারীর ওপর অবিচারের সমস্ত দায়িত্ব সেই সর্বশক্তিমানের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন, তেমনি নিজের জীবনটিও। ঈশ্বর তাঁকে বিমুখ করেন নি, তিনি জগৎজোড়া নাম পেয়েছেন, এবং তাঁর কলম সোনার কলম হয়ে গেছে।

নারীসমাজ

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীসমাজের কথা এই শিল্পীর জন্মের শতবর্ষ পরে বলতে গেলে, শরৎচন্দ্রের দেখা নারীসমাজ ও আজকের নারীসমাজের যে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে সে কথা আগে আলোচনা করতে হয়। তারপর শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীদের মধ্যে ফিরে যাওয়া হবে। আজকের নারীসমাজ কি? শহর ও গ্রামের দিকে ফিরে যান। আজকের নারীরা আর পুরুষের পায়ের তলায় বসে সতীত্ব ভিক্ষা করে না, বরং তাদের প্রয়োজন যে পুরুষের কাছে অনেক বেশী, সেটা তারা সোচ্চারে ঘোষণা করে। নারী খুব অল্পায়াসে বুঝতে পারে, তাদের প্রয়োজন পুরুষের কাছে কতখানি। এটা এ যুগে যেমন বেশি, সে যুগেও নারী জানত। তাই কোন কোন নারীর মধ্যে সে ভাবটা প্রকট হয়ে প্রকাশ পেত কিন্তু তার প্রসাদগুণ থাকত অন্য। কিন্তু তখন পুরুষ সমাজের কর্তা হয়ে নারীর ঐ দাপট এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিত। তর্কের জাল সৃষ্টি করে, শাস্ত্র আউড়িয়ে দেখাত, নারীর আসন পুরুষের অনেক নিচে। নারী শুধু ভোগ ছাড়া পুরুষের আর কোন কাজে লাগে না। সমাজ ব্যবস্থাও সেইভাবে তৈরি হয়েছিল, নারীর একটু বেচাল দেখলেই তার মাথায় কুলের কালি লাগিয়ে দিত, আর সঙ্গে সঙ্গে সাপ ফণা গুটিয়ে ঝিমিয়ে যেত। 'কুলটা' কথাটা যে নারীর মনে বড় বাজে! কুলটা আর বাঁজা। ·নারী সব সইতে পারে, চরিত্রহীন কেউ বললে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। আর যে নারী সব পেয়েও মা হতে পারল না, তার যে কি কষ্ট! এই আধুনিক যুগেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। নারীর মা না হওয়া যেন তারই অক্ষমতা। সে মনে করে, 'আমার জীবন এই অক্ষমতার জন্যে ব্যর্থ হয়ে গেল।' কৈশোরে পিতা-মাতা-ভাইবোনের প্রতি মমতা, যৌবনে একজন কাউকে পেলে মনের সুখ, তারপর বিবাহিত জীবনে স্বামী-প্রেম, তার সঙ্গে সন্তান আকাঙ্খা। এই বৃত্তের কোনটা নিস্ফল হলেই নারী সুখী হয় না। ওরা বড় বাস্তব নিয়ে মাথা ঘামায়, নিজের দাবি যেমন তারা একচুলও ছাড়তে নারাজ, তেমনি সুখের জন্যেও তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করে। সুখ পুরুষও কি চায় না? চায় বটে কিন্তু নারী পুরুষের এই স্বভাবের কিছু তারতম্য আছে। একজন গভীরে ঢুকে যায়, এক 'ন ক্ষণিক পাওয়াটাকে আনন্দ মুহূর্ত মনে করে। নারী প্রেমে ঘর বাঁধার প্রভ..."। গোপনে লালন করে, পুরুষ প্রেমে সঙ্গটাকেই পাথেয় মনে

করে। তারপর গাঢ় প্রেমের পরিণামে চিরস্থায়ী মিলনের প্রশ্ন এসে যায়। সেই মিলনে নারী যতটুকু সুখী হয়, পুরুষ কি হয়? পুরুষ বরং বিবাহপূর্ব রোমান্টিক জীবনের কথা বার বার স্মরণ করে স্বপ্ন দেখে। তার মনে হয়, স্বপ্নের সেই নারী বাস্তবে তার ঘরণী হয়ে কেন তার স্বপ্ন ভেঙে দিল? পুরুষ সারাজীবন স্বপ্ন দেখতেই ভালবাসে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে যখন তার মধ্যে যৌবন আসে, সে নারীর ছায়া দেখে পুলকিত হয়। সে আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল, গান, পাখী, প্রকৃতির সঙ্গে নারীর রূপও মনের মধ্যে কল্পনার তুলিতে রাঙিয়ে তোলে, আর সেই কল্পনাই আজীবন তার সঙ্গী হয়। এসব কথা পুরুষের সপক্ষে বলা হল বলে কেউ যেন অন্য কথা মনে না করেন যে পুরুষ প্রকৃতি এই, তারা প্রেমে যেমন পাগল, বিচ্ছেদেও কি আত্মহত্যা করে না? চঞ্চল, অস্থির, ছটফটে, এক পুরুষ স্বভাব নিয়ে পুরুষই কি পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল চষে ফেলে না? সত্যিকথা কিন্তু নারী যে ঠিক তার বিপরীত। নারী অন্ধ ভালবাসা নিয়ে বিনিদ্র রাত্রি কাটায় না। সে যাকে ভালবাসে, তার আকর্ষণীয় সত্তাগুলি তাকে মুগ্ধ করে। নারী এসব ক্ষেত্রে বুদ্ধি ধরে। সে যাকে ভালবাসে তাকে অবলম্বন করলে তার জীবনের বাকী দিনগুলি কিভাবে কাটবে সে কথাও সে মনে ভাবে। ভালবাসা অন্ধ। কখন যে প্রেমের দেবতা কার ওপর ভর করেন কেউ জানে না। শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পের অনেক জায়গায় সে কথা বলেছেন। অনেক মহৎ মনীষীরও তাই মত। আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি, বিরাট ধনী কন্যাও বাউণ্ডুলে বেহালা বাদককে ভালবেসে ঘর ছেড়েছে। বাপের অর্থের দম্ভও তাকে সেই প্রেম থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি।

তবু বলব এ গল্পই। প্রেমকে সার্থক রূপ দিতে শিল্পীরা কৃতসঙ্কল্প হয়ে এই সব বানানো গল্প তৈরী করেছেন। অবশ্য নারী বিশেষ বয়েসে একটা মোহের ফেরে পড়ে। সে তখন প্রথম যৌবনের উদ্দামতায় যে কোন লতাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়, তবে তাই বলে এই বলা যাবে না সেটাই সার্থক ভালবাসা। সেইজন্যে অভিভাবকরা এই বয়সটায় মেয়েদের পাহারায় রাখে। বয়েসের সেই সমুদ্র কল্লোল স্তিমিত হবার পর নারীই আপন ভাগ্য চিনে নেয়। তখন আর অভিভাবকের মনে দুশ্চিন্তা থাকে না। তারাই বলে, 'ওতো বড় হয়েছে, ওরও তো একটা মতামতের দাম আছে!'

যুগে যুগে সর্বকালে সর্বদেশে নারী পুরুষের এই বোঝাবুঝি নিত্যই পরিবর্তিত হচ্ছে। ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা আজ আর বুঝি এর তল পায় না। এখন নারীকে আমরা নিজের ভাগ্য বুঝে নেবার ক্ষমতা দান করেছি। নারী প্রগতি পেয়ে

কতখানি সে নিজের জীবন উন্নত করেছে? শিক্ষার আলো তার মধ্যে ঢুকেছে। বিচার করবার শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে এক আসনে বসে কর্ম করবার ক্ষমতা পেয়েছে। ভাবতে শিখেছে, 'আমরা কোন অংশেই পুরুষের নীচে নই।' পুরুষেরও যেমন যা প্রয়োজন, তাদেরও তাই। পুরুষের যেমন ক্ষিদে পায়, তাদেরও পায়। পুরুষেরও যেমন নারীসঙ্গ প্রয়োজন, নারীও পুরুষ বর্জিত জীবন যাপন করতে পারে না।

নারীর এই প্রয়োজনগুলি আমরা পুরুষরা দিনের পর দিন আন্দোলন করে করে তাদের পাইয়ে দিয়েছি। তাতে কি উপকার হয়েছে? নারীরাও যে মানুষ সে কথা পুরুষজাতির সামনে প্রকাশ পেয়েছে।

নারীদের অনেকদিনের অনেক চোখের জল মহা মহা মনীষীরা দেখেছিলেন। এদেশের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ওদেশের ডেভিডহেয়ার, বেথুনসাহেব, লর্ড বেন্টিঙ্ক, আরও আরও দূরে তাকালে দেখা যায়, নারীপ্রগতির জন্যে টলস্টয়, মোপাসাঁ, সেক্সপীয়ার, বার্ণাডশ, মম, সার্ত্রে প্রমুখ শিল্পীরা কলম ধরেছিলেন। ওদেশের নারীরা বহু আগেই স্বাধীনতা পেয়েছিল, কিন্তু এদেশের নারীরা সমাজের কতকগুলি অনুশাসনের যূপকাষ্ঠে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ছিল। আর অনুশাসনগুলি এমনিই যে ধর্মের দোহাই দিয়ে বুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা এমনি একটি নির্মম অনুশাসন। ব্রাহ্মণরা তখন সমাজ-নিয়ন্ত্রণ কর্তা, তাদের বিধানই ঈশ্বরের বিধান। কুলের মর্যাদা রক্ষার জন্যে ছোট ছোট বালিকার বিবাহ সংখ্যাতীত বিবাহিত কুলপতি বৃদ্ধের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল, আর তার ফল তো সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছিল। বৃদ্ধ হঠাৎ চোখ বুজলে এই সব সদ্য প্রস্ফুটিত কিশোরীগুলিকে চিতা সাজিয়ে সহমরণে পাঠান হচ্ছিল। সদ্য পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধের সঙ্গে যাদের পরিচয় হচ্ছে, তাদের যদি এভাবে ঢোল করতাল বাজিয়ে জ্বলন্ত চিতার ওপর চাপানো যায়, আর আনন্দ করতে করতে বলা হয়, 'এ শাস্ত্রের বচন। স্বামী যখন স্ত্রীর গেল, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কি?' এই যে নারীদের ওপর এইভাবে অত্যাচার, তখন কেউ এই নারীদের জন্যে এতটুকু মমতা দেখান নি কিন্তু হঠাৎ একজন সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হল তিনি রাজা রামমোহন। তিনি সেই হতভাগ্য মেয়েদের দুঃখের কথা বুঝলেন। রামমোহন রায় আন্দোলন করে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করিয়ে নিলেন, আইন পাশ করাবার আগে বহু পণ্ডিতরা 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন। এই পণ্ডিতদের কথা

বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁরা হিন্দুধর্মের কতকগুলি ভুল অনুশাসনকে মনে ধারণ করে হিন্দুনারীদের শাসনে রাখতে চেয়েছিলেন। নারীই যে নরকের দ্বার, নারী যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নারী হতেই সমাজে কলঙ্ক সৃষ্টি হয়, পুরুষ বিচলিত বোধ করে। সমাজ গোল্লায় যায়। এই ছিল পণ্ডিতদের ধারণা।

এ সব কথা পুনরাবৃত্তি থেকে আমরা বিরত থাকব এই জন্যে যে এ সব কথা বহু আলোচিত। তারপর এলেন বিদ্যাসাগর। তিনিও নারীদের দুর্ভাগ্য দেখে কাতর হলেন। এই পুরুষজাতিই নারীর ওপর নির্যাতন করে তাদের রসাতলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিল, সেই পুরুষজাতিই এগিয়ে এল মঙ্গলের নিশান হাতে নারীজাতিকে সবার উপরে স্থান দিতে। অশিক্ষিত, মূর্খ নারীজাতির মনের মধ্যে জ্ঞানের আলো পুরে দেবার জন্যে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হল। তার সঙ্গে বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ যাতে বন্ধ হয় তার জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় চেষ্টা করতে লাগলেন। স্বামী মরে গেলে স্ত্রীরা সহমরণে যাবে না কিন্তু বৈধব্য জীবন নিয়ে তারা করবে কি? রামমোহন প্রমুখ সমাজ সংস্কারক জঘন্য সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলেন বটে কিন্তু বিধবাদের জীবন কাটানোর কোন সৎ উপায় ভেবে পেলেন না। এইদিকে লক্ষ্য গেল বিদ্যাসাগরের। অল্পবয়সী মেয়েরা ভরা যৌবন নিয়ে কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে সারাজীবন কাটাবে কেমন করে? সেই সব অশ্রুমুখী দুর্ভাগা হতভাগী মেয়েদের নীরব চোখের জলে কাতর হয়ে বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্মের নানান শাস্ত্র উল্লেখ করে তাদের নির্বাণের আয়োজন করলেন। এর জন্যে তাঁকে যে কি কষ্ট করতে হয়েছিল তাঁর লিখিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুখানি পুস্তকই তার প্রমাণ। এবং ইংরেজ সরকার তাঁর যুক্তির অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আইন পাশ করতেও দ্বিধা করে নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, শুধু তাই নয়, জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতব্যক্তিও ছিলেন। তিনি আইন পাশ করিয়ে বুঝেছিলেন, সংস্কারাবদ্ধ মানুষ যতই এই আইনকে অভিনন্দন জানাক, মনে প্রাণে তারা বিধবা বিবাহ দিতে রাজী হবে না। সেই সনাতন সংস্কার। মেয়েদের দুবার বিয়ে হবে কি? আর মেয়েরা প্রথমে খুব নেচে উঠেছিল কিন্তু হিন্দুর মেয়ে, আবাল্য আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষ, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করবে কি? আগের স্বামীর কথা মনে পড়ে যাবে না? বাল্য বিবাহ যাদের হয়েছিল, যারা জ্ঞানে কখনও স্বামীর মুখ দেখে নি, মিলন তো দূর পথ, তাদের বিয়ের কথা উঠল কিন্তু সেখানে ঐ প্রশ্ন এসে দেখা দিল, স্বামীর মুখ না

হয় মেখে নি, বিয়ে তো হয়েছিল। হিন্দুর মেয়ে দুবার বিয়েতে বসবে? এই সংস্কারটা এমনিই মনে গেঁথে বসল যে মেয়েরাও আর বিয়েতে বসতে রাজী হল না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই সে সব কথা কানে নিলেন না, তিনিই প্রথমে বিয়ে দিলেন এবং বিধবা বিবাহ চালু করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। হিন্দুশাস্ত্রের বেশ কিছু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শাস্ত্রের বচন দেখিয়ে নারীধর্মের ওপর যে অবিচার করছিলেন, উদার মনের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেটাই বুঝে নারী মুক্তির জন্যে সচেতন হলেন কিন্তু সে আন্দোলন যে পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করে নি, আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি। আমাদের 'মেয়েরাই রাজী হয় নি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে।

এটা সনাতন ভারতবর্ষ। এ দেশের মেয়েদের জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি এই দেশের আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে। য়ুরোপ দেশের নারীরা য়ুরোপীয় ভাব ধারায় মানুষ। তারা স্বামী পাল্টাতে যেমন দেরী করে না, দীর্ঘস্থায়ী সুখও বোধ হয় তারা আশা করে না। তাই সে দেশের নারীর সঙ্গে এদেশের নারীর তফাৎ অনেক। এদেশের নারীরা বিয়ের আগে অনেক ভাবে কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পর বিয়ের মন্ত্রের জোরে স্বামীকেই প্রাণপণে মনে ধরে রাখে। স্বামী লম্পট, মদ্যপ, অত্যাচারী হলেও ভারতবর্ষের নারী স্বামী ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় পুরুষকে মনে স্থান দেয় না।' এই সনাতন ভারতবর্ষের কথা মনে রেখেই অতীতে শরৎচন্দ্র কলম ধরেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী নারীর কথাই তাঁর কলমে বিশেষ করে এনেছেন যেহেতু তিনি বঙ্গভাষার লেখক, কিন্তু তাঁর লেখাগুলি কি বঙ্গভাষার পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? আমরা দেখেছি তাঁর লেখা সব ভাষায় অনুদৃত হয়ে সব ভাষার পাঠকের মনে দোলা দিয়েছিল, কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, তিনি সমস্ত নারীর মনের বেদনাগুলি টেনে টেনে বের করে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরে দরদী মন দিয়ে তাদের বর্ণনা করেছেন।

সেইজন্যে মুক্তিপাগল নারীই শরৎচন্দ্রকে বুকে তুলে নিয়ে বলেছে, 'তিনি আমাদের লেখক। তিনি আমাদের মনের কথাগুলি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, কই আর কারও কলম তো সে কথা বলে নি!' বিদ্যাসাগর মশাই নারী জাগরণের জন্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে চেয়েছেন, বহুবিবাহ যাতে আর কেউ না করতে পারে তারও জন্যে আন্দোলন করেছিলেন

কিন্তু কোনটাতেই তিনি কৃতকার্য হতে পারেন নি কারণ তাঁর আন্দোলনের ভিতটাই ছিল ভীষণ কাঁচা। যাদের জন্যে তিনি আন্দোলনে নামলেন, তারাই যদি সায় না দেয়, তাহলে আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়? বিধবা বিবাহ প্রচলনের আইন পাশ হল, তবু মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে বিয়ে করতে এগিয়ে এল না। এখনও এই প্রগতির যুগে কোন ভালো স্বভাবের শিক্ষিতা যুবতী বিধবাকে যদি বিয়ে করতে বলা হয়, সে হয়ত অপমানিত বোধ করবে। তাই সনাতন ভারতবর্ষে নারী প্রগতির আলোচনা করতে গিয়ে বার বার এই কথাটাই মনে আসে, অন্যত্র, অন্য দেশে যা সম্ভব এ দেশে তা নয়। এ দেশ মাটির -শিকড়ের দিকে তাকায়, কাণ্ডের লোভ করে না। এ দেশের নারী জানে তার চিন্তাধারার বৈকল্যর ওপর সমস্ত দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে' তাই এমন কিছু তার করলে চলবে না, যা জাতি ও দেশকে গোল্লায় দেবে। তবু পরিবর্তনশীল ভারতবর্ষ সর্বদাই পবিবর্তিত হচ্ছে। নারীর মনে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে। নারী তার আপন ভাগ্য আপনিই সৃষ্টি করতে পারে। অন্য দেশের হাওয়া এসে আমাদের দেশের নারীর গায়ে লেগেছে। তারা আর সমাজের বলি হয়ে পুরুষ নির্যাতনের মাঝে নিজেকে নীরব করে রাখে না। তাদের মুখে ভাষা ফুটেছে, তারা পুরুষদের স্বভাবের সমালোচনা করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে মাথা উঁচিয়ে বলতে পারে, 'ভুলে যাবে না আমরা মেয়ে হলেও মানুষ, আমাদেরও ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে। আমরা যদি মনে করি তোমাদের এই যথেচ্ছাচার আমরা মানব না, তাহলে তোমাদের কিছু করার নেই।' নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব আজীবন ধরে চলে আসছে, পুরুষও কর্তৃত্ব করে করে এমন নিজের অভিভাবকত্ব কায়েমী করেছে, এর উল্টোটা হলেই তার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। তখন অশান্তি দেখা দেয় সংসারে।

তবু আনন্দের সঙ্গে এটুকু স্বীকার করব; শরৎচন্দ্র যে কাল দেখে, যাদের কথা জেনে, যাদের নির্বাণের জন্যে কলম ধরেছিলেন, তাদের নির্বাণ হয়েছে। এখনও শিক্ষার আলো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌছোয় নি, তবু মুষ্টিমেয় যারা শিক্ষিত হয়েছে, তারাই প্রচার করেছে, তারাই অজ্ঞানীদের চোখে নারীর আসল স্বরূপ বুঝিয়ে দেবার ভার নিয়েছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাই নারী মুক্তির আর বেশি দেরি নেই। তবে এসব কথা বলা হল উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষদের নিয়ে। নীচু জাতের জন্যে শরৎচন্দ্রের কি কাতরতা ছিল সে ত দেখা গেছে। পল্লীসমাজের সেই দুলে বাগ্দীর অস্পৃশ্যতা, 'তোমরা যাদের জাতের দোহাই দিয়ে মানুষ বল

না, তাদের দোষগুলি এত বড় করে দেখ যে তারা আর হালে পানি পায় না, জলে ডুবে হাবুডুবু খাওয়ার মত অবস্থা হয়,' সেইসব নীচু জাতের মানুষদের জন্যে শরৎচন্দ্রের কষ্ট কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথও এই নীচু জাতের প্রতি শ্রদ্ধায় বলেছেন।

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাদের সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
কোলে দাও নাই স্থান ॥
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।'

মহানমানুষ ব্যক্তিমানুষের ভাল করার চিন্তার চেয়ে সমষ্টিগত মানুষের ভাল করার চিন্তায় তাঁদের মন নিয়োজিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ভারতবর্ষের দর্শন শাস্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করে আধ্যাত্মিক রূপের সমন্বয়ে মানুষের নির্বাণের আলো জ্বালতে চেয়েছিলেন, তেমনি এই ভারতবর্ষের বহু মনীষী তাঁদের নিজ নিজ চিন্তাধারার পরিকল্পনা অনুযায়ী কেউ শ্লোগান দিয়ে, কেউ বক্তৃতা দিয়ে, কেউ কলম ধরে নির্বাণের আলো জ্বেলেছেন। তাতে এই দেশের উপকার হয়েছে, মানুষ যেসব ভুল অভ্যাসগুলি নিয়ে নিজের মৃত্যু ঘটাত, তার সংস্কার হয়েছে। শরৎচন্দ্রও অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন, কিন্তু আমরা যদি তাঁকে কথাশিল্পী না বলে সমাজ সংস্কারক বলি, তাহলে নিশ্চয় তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে না। ব্রাহ্মণধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ব্রাহ্মণরা সমাজের ওপর যে প্রভুত্ব ফলাত, তার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র কলম ধরে ছিলেন, আজ ব্রাহ্মণের সেই প্রভুত্ব অস্তমিত। কুলীন মেয়েদের কুলের মর্যাদা রাখবার জন্যে কোন রকমে তাদের উচ্ছুগু করা হত, তারপর সারাজীবন তারা নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে জীবন শেষ করত। শরৎচন্দ্র কুল অভিমানী ব্রাহ্মণদের আসল স্বরূপ উদঘাটিত করে দিয়েছেন।

আমরা আলোচনা করতে বসেছি শরৎচন্দ্রের দেখা নারীসমাজ—শরৎচন্দ্র যাদের দেখে তাঁর বইতে সৃষ্টি করেছেন। কারণ শরৎচন্দ্র দেশ কালের বর্ণনার চেয়ে মানুষের বর্ণনাই পছন্দ করতেন। আর সেই মানুষগুলি কালকে অতিক্রম করতে পারে নি। তারা সেই কালে বসেই কালের কথা শুনিয়েছে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী সমাজের কথা বলতে গেলে প্রতিটি নারীকে ধরে ধরে তার সঙ্গে মিলিয়ে সে যুগের সমাজের কথা এসে যায়। তাই সে সব কথা বলার

আগে একশ বছর পর বা পঁচাত্তর বছরের মধ্যে আমরা আমাদের নারীদের কি পরিবর্তন দেখছি সেটাই আগে বলা হবে।

হয়ত অনেক কথা অনেকের মনের সঙ্গে মিলবে না, তবে আমরা সাধারণ ভাবে একটা পরিক্রমা করতে চাইছি। তাতে কি সমাজের একটি চিত্র ফুটে উঠবে না? গ্রাম ও শহর দু'ভাগে সমাজের দুটি রূপ। শহরে যেটা চলে, গ্রামে সেটা চলে না। গ্রাম ও শহর এখনও আলাদা। শহর পাশের বাড়ীর কোন লোকের কথা মনে রাখে না কিন্তু গ্রামে তা হয় না, এখনও এ গ্রামের কথা ও গ্রামের লোক আলোচনা করে। আর এই গ্রামকে বাদ দিয়ে সমাজ উন্নত হতে পারে না। কোন যুবক এখনও কোন যুবতীকে প্রেম করে বিয়ে করে গ্রামে তিষ্ঠুতে পারে না, তাকে শহরে বাসা নিতে হয়। গ্রাম্য জীবনের এই যে সংস্কার, শরৎচন্দ্র যতই আলো জেলে যান, সে আলো সম্পূর্ণ জ্বলেনি। গ্রাম তার আপন ঐতিহ্য এতটুকু ছাড়তে চায় নি। তবু এইভাবে বললে বোধ হয় সম্পূর্ণ বোঝানো যাবে না। কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক্।

গ্রামে স্কুল কলেজ আর স্বপ্ন নয়, প্রায় গ্রামে তার প্রাধান্য বেড়েছে। পল্লী-সমাজে যেমন শরৎচন্দ্র গ্রামের স্কুলটা ভেঙে যাচ্ছে বলে রমেশকে দিয়ে টাকা খরচ করে স্কুল সংস্কার করিয়েছিলেন, তেমনি একালে রমেশের দরকার নেই। প্রত্যেকেই তাদের তাগিদে স্কুল কলেজের ব্যবস্থা করে। আর সে সব স্কুল কলেজে ছেলেমেয়েরা পড়ে দু'তিনটে পাশও দেয়। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে বলে তাদের অভিভাবকরা সংসারের যাঁতাকলে আটকে রাখে না। এমনি একটি গ্রামে সেদিন গেছি। গ্রামের চেহারা চমৎকার। কোঠাবাড়ীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি মাটির বাড়ীর সংখ্যাও কমেছে। পিচের সরু রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে দু'পাশে সবুজের ক্ষেত দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। গ্রীষ্মকালের নিঝুম পল্লী। জায়গায় জায়গায় বাগানের দেখা মিলতেও লাগল। আমগাছে রংধরা পাকা আম দেখে পুলকিত হয়ে সঙ্গীর দিকে তাকালাম। সঙ্গী মৃদু হাসল। আমি যে গ্রাম সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সেটা তার হাসির মধ্যেই প্রকাশ হল কিন্তু আমার আহ, উহু, বাহ এই সব মন্তব্য গোপন করতে পারলাম না। উচ্ছ্বাসটা যে স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসে সেটা অস্বীকার করা যায় না। সত্যিই একালের একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পল্লীগ্রাম।

বাস ছেড়ে দিয়ে যাবার পর যতই ভেতর দিকে যেতে লাগলাম, যেন আমি কোন শিল্পীর রং তুলিতে ভরানো কোন স্বপ্নের গ্রামের মধ্যে যাচ্ছি। একটা চক

মেলানো ভাঙা বাড়ী দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, নিশ্চয় এরা আগে প্রচুর অর্থের মালিক ছিল ?' সঙ্গী হেসে বলল, 'এ অঞ্চলের জমিদার ছিল। সেই শরৎচন্দ্রের কালের মানুষ বলতে পার, জাতে মুখুজ্যে বামুন, আসলে কুলীন বলে মাথা হয়ে অনেকের মাথায় ঘোল ঢেলেছে। তারপর একটু সরে এসে বলল, 'ঐ যে ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গড়গড়ি মুখুজ্যে সাবিত্রীকে রেখেছিল।'

'সাবিত্রী !' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল চরিত্রহীনের সাবিত্রীর কথা। সাবিত্রী ঝি ছিল। কিন্তু ভদ্র ঝি। শরৎচন্দ্র তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন। আমার অন্যমনস্কতা দেখে সঙ্গী বলল, 'তুমি যে সাবিত্রীর কথা ভাবছ, এ সে সাবিত্রী নয় !'

'তবে ?'

সে ইতিহাসটা বলে গেল। 'সাবিত্রীও কামারের মেয়ে ছিল। বাপ রীতিমত হাঁপর চালিয়ে ছুরি, কাঁচি, দা বানাত। সংসারে ঐ একমাত্র মেয়ে। অপরূপ সুন্দরী। তার সৌন্দর্য দেখে গ্রামের ভদ্রঘরের ছেলে বুড়ো সবাই কেমন হয়ে গিয়েছিল।'

'তারপর ?'

'কিন্তু সাবিত্রী সে সব ভ্রূক্ষেপ করত না। সে যেন রূপের দেমাগে এই সব ভদ্রলোকদের মাড়িয়ে চলত। কেউ কোন প্রেম নিবেদন করতে এলেই মুখের ওপর টাস্ টাস্ কথা শুনিয়ে দিত। বলত, আমি কামারের মেয়ে। আমার বাপ বুধন কামার। তোমাদের লজ্জা করে না আমাকে ভালবাসা জানাতে ?

কিন্তু অর্থের ওপর যেমন মানুষের লোভ, রূপও মানুষকে মুগ্ধ করে। সাবিত্রীর রূপই যে কাল। আর সে রূপ নিয়ে ঘরে বন্ধ থাকে না, গ্রাম ঘুরে সবাইকে দেখায়। আর গ্রামের মরদরা সেই রূপ দেখে তৃষ্ণায় আছাড়ি পাছাড়ি করে।'

শরৎচন্দ্রও কিরণময়ীর অপরূপ রূপ দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। কিরণময়ীও নিজের রূপের কথা বলতে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে নি, সে বলেছে, 'নারীর এই দেহের রূপের কোন মূল্য নেই, এটা তার অভিশাপ।' কিরণময়ী একথা বলতে পারে কারণ তার রূপের পূজারী কেউ ছিল না। স্বামী কখনও দেখেও দেখেনি, সে তাকে একনিষ্ঠ ছাত্রীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিল, আর যাদের কিরণ ভালবাসতে চেয়েছিল, তারা কিরণময়ীর রূপে মুগ্ধ হয় নি।

সঙ্গী বলল, 'কিন্তু রূপের যে দাম আছে বুধন কামারের মেয়ে সাবিত্রীকে দেখে

বোঝা গেল। পাশাপাশি কতগুলি গ্রামের লোক যে এ গ্রামে যখন তখন এসে উপস্থিত হয় সেটাও দেখা গেল। গড়গড়ি মুখুজ্যের টনক নড়ল। একদিন বুধন কামারকে ডেকে বললেন, 'বুধন, তোর মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছিস্ না কেন?'

বুধন বলল, 'হুজুর পাত্র পাওয়া যে দুষ্কর। তাছাড়া মেয়ে আমার বিয়ে করতে চায় না।'

গড়গড়ি মুখুজ্যে গড়গড়া টানতে টানতেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, 'বিয়ে করতে চায় না!' বুধন বলল, 'হাঁ হুজুর। আরও কি সব কথা বলে।' বুধন থামল।

গড়গড়ি মুখুজ্যে বললেন, 'কি বলে?'

'সে সব পাগলের কথা ছেড়ে দিন। ওটা একটা পাগলই।' কিন্তু গড়গড়ি মুখুজ্যে ছাড়লেন না, বললেন, 'কি বলে বলই না।' তখন বুধন বলল, 'পাগলটা বলে আমি কাকে বিয়ে করব বলো। মানুষগুলো তো কুকুরের মত শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের ওপর ঘেন্না হয়, বিয়ের যোগ্য কে? আমায় তুমি বিয়ে করতে বলোনা বাবা।'

গডগড়ি মুখুজ্যে গডগডা টানতে টানতে শুধু চোখ বুজিয়ে বললেন, 'হুঁ'।

তিনি যে তখন কি চিন্তা করছিলেন বোঝা গেল না, শুধু অনেক পরে বললেন, 'তোর মেয়ের দেমাগ মন্দ নয়।' একদিন গড়গড়ি মুখুজ্যে তাঁর জুড়ি গাড়ি করে বাড়ীর দিকে ফিরছেন, হঠাৎ একটা পুকুরের ধার দিয়ে আসতে আসতে তিনি গাড়ী থামাতে বললেন। পুকুরে তখন সাবিত্রী স্নান সেরে ভিজে কাপড গায়ে জড়িয়ে ফিরছিল, সবে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠেছে সামনে জমিদার গড়গড়ি মুখুজ্যে। পরণে চুনোট করা ধুতি, গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবী। পায়ে ঝকঝকে কালো পাংশু জুতো, হাতে রূপো বাঁধানো ছড়ি। সাবিত্রী পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু যেতে পারল না। গডগড়ির ছড়ি তাকে পথচলায় বাধা দিল।

গড়গড়ি সাবিত্রীর অপরূপ রূপের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'তুমিই তো বুধন কামারের মেয়ে সাবিত্রী, না?'

সাবিত্রী মাথা হেঁট করল, কোন জবাব দিল না। গড়গড়ি বললেন, 'মানুষগুলোকে কুকুর দেখ, না?'

সাবিত্রী এবারও জবাব দিল না।

'আমিও কি তোমার কাছে কুকুর—?' গড়গড়ি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ এই ভাবে চলে যাবার পর সাবিত্রী কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'পথটা ছাড়বেন তো! ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। লজ্জা করে না?' গড়গড়ি তবু হাসতে লাগলেন, 'লোকে যে বলে মন্দ কথা বলে না।'

'কি?'

'তোমার রূপ। সত্যিই তুমি সুন্দরী।'

সাবিত্রীর ঠোঁটের ওপর এক বিজাতীয় হাসি খেলে গেল। কিন্তু দেশের বড় মানুষকে কিছু বলতে বাঁধল, তাই জিব শানিয়ে উঠলেও চুপ করে রইল। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, তাই বলল, 'আমি যাব।'

গড়গড়ি বললেন, 'কোথায়?'

'বাড়ী।'

'তুমি বিয়ে করছ না কেন?'

'কাকে বিয়ে করব?'

'কেন তোমাদের জাতের কেউ নেই?'

'না। থাকলেও আমার উপযুক্ত নয়।'

হঠাৎ গড়গড়ি মুখুজ্যে বললেন, 'আমাকে পছন্দ হয়?'

'বিয়ে করবেন?'

মেয়েটির স্পর্দ্ধায় গড়গড়ি যেন হোঁচট খেলেন। ক্ষুব্ধভঙ্গিতে বললেন, 'এতদূর স্পর্দ্ধা।'

'আপনারও তো স্পর্দ্ধা কম নয়! আমাকে অপমান করেন!'

'বুধন কামারের মেয়ে হয়ে তুমি এতখানি ওপরে উঠে গেছ? জানো তোমাদের আমি কি করতে পারি?'

'একঘরে করবেন এই তো! আমি ভয় পাই না। আবার আপনারাই আমার দরজায় এসে ধন্না দেবেন।'

'মানে?'

'আমায় ভগবান রূপ দিয়েছেন।' সাবিত্রীর গায়ে ভিজে কাপড় শুকিয়ে গিয়েছিল, রোদের তাত বাড়ছিল, সে পথ ছাড়তে বললো কিন্তু গড়গড়ি মুখুজ্যে ছাড়লেন না। কাপড়ের ভেতর থেকে সমস্ত দেহের ছটা গড়গড়ি মুখুজ্যেকে মুগ্ধ করছিল, আর মেয়েটির স্পর্দ্ধা দেখে কি করবেন ভাবছিলেন। কিন্তু সব ভাবনা হঠাৎ লয় হয়ে গেল, পুরুষের সেই লালসার শিকার তিনি হলেন। তাছাড়া গড়গড়ি মুখুজ্যে খুব পবিত্র মনের লোক ছিলেন না। অনেক কানাঘুষো তাঁর সম্বন্ধে ছিল।

হঠাৎ তিনি সাবিত্রীকে দু' হাত বাড়িয়ে শূন্যে তুলে নিলেন। দু' একজন এদিকে সেদিকে লুকিয়ে এই রগড় দেখছিল, তারা এই কাণ্ড দেখে একেবারে লুকিয়ে গেল।

সাবিত্রী চিৎকার করতে যাচ্ছিল কিন্তু গড়গড়ি মুখুজ্যে এক ধমক দিয়ে বললেন, 'একদম চুপ।' হঠাৎ সাবিত্রী খিল খিল করে হেসে উঠল। গড়গাড় মুখুজ্যে অবাক হয়ে বললেন, 'হাসছ কেন?'

'আমার রূপও আপনাকে মোহিত করল?'

'মোহিত!'

সাবিত্রী গড়গড়িব বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে বলল, 'তাই। আমি কামারের মেয়ে তাও তো আপনার মনে থাকল না।'

'তারপর?'—আমি সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

সঙ্গী বলল, 'সত্যিই সাবিত্রী কামারের মেয়ে হলেও ঐ কুলীন সমাজপতিকে অনেক দূর নামিয়েছিল। ঐ যে আলাদা ভাঙা দালান দেখছ, ওটা সাবিত্রী-মহল। ব্রাহ্মণ বলে যে গড়গড়ি মুখুজ্যের অহঙ্কার ছিল, সে অহঙ্কার সাবিত্রী চূর্ণ করেছিল।

গড়গড়ি যতদিন বেঁচে ছিল সাবিত্রী গড়গড়িকে কুকুরই মনে করত। গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়েস্থরা জমিদারের এই দুরবস্থা দেখে যে যার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। গড়গড়ি মুখুজ্যের স্ত্রী, ছেলেরা, আত্মীয়-স্বজন তাঁর মুখ দেখত না। না দেখল তো বয়ে গেল।

গড়গড়ি মুখুজ্যে সেই সাবিত্রীর মহলে সর্বক্ষণ থাকত, আর সাবিত্রী তাকে একটু কৃপা করে সমস্ত জমিদারী নিজে দেখাশুনা করত।'

'এ যে তুমি সেই মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা বলছো? যে নূরজাহানের প্রেমে আত্মহারা হয়ে সবকিছু ভুলেছিল।'

সঙ্গী বলল, 'ঠিক তাই। আমাদের দেশের গড়গড়ি মুখুজ্যেও মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।' বলতে বলতে আমরা এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা ফিয়াট গাড়ী আমাদের পাশ দিয়ে এসে সেই ভাঙা বাড়ীর গেটের মধ্যে ঢুকল। নামল একজন চল্লিশোত্তীর্ণ দোহারা গড়নের মানুষ। দেখতে খুবই সুন্দর। যেন সাহেব, হন হন করে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলে আমার সঙ্গী বলল, 'সাবিত্রীর প্রথম ছেলে।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাবিত্রীর ছেলেও হয়েছিল?'

'সাবিত্রীর দুই ছেলে তিন মেয়ে। আগের পক্ষের মাত্র তিনটি মেয়ে ছিল।'

'এ বাড়ীতে তাহলে সবাই মিলেমিশে থাকে?'

'উপায় কি? গড়গড়ি মুখুজ্যে যখন মরবার সময়ে সাবিত্রীকে সব দিয়ে যান, তখন এরা আর কি করবে? সাবিত্রীই বরং সতীনের মেয়েদের বুকে তুলে নিয়েছিল বলে এরা বেঁচে গেল।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'তাহলে কামারের দেশে তুমি বাস কর বলো?'

সঙ্গী হাসল, 'এসব আর কেউ এখন মনে রাখে?'

সত্যিকথা, শরৎচন্দ্রের সেই গ্রাম আর কি এখন আছে? সাবিত্রীর কাহিনী আজ চল্লিশ বছর আগে ঘটে গেছে। চল্লিশ বছর আগে যখন এই গ্রাম আর জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি, তখন এসব তো এখন ডাল ভাত। বরং এখন এ সব ঘটলে লোকে বলে, যার সঙ্গে যার মজে, সেই লাভবান হয়, আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কি?

একালে আর এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সমাজ সমাজ বলে যারা চিৎকার করে, সেই সব সনাতনপন্থীদেব কেউ পাত্তা দেয় না। এখন সমাজের দোহাই দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের আর কোন সুবিধা হয় না বলে তারা অন্য পন্থা নিয়েছে। চিরকাল ধনী-দরিদ্রের একটা আলাদা পার্থক্য ছিল, সেটাই এই আধুনিক কালে প্রবল হয়ে উঠেছে। অর্থ ছড়িয়ে অনেককে কেনা যায়, এবং অনেকের বুকের ওপর চড়ে বসা যায়। ধনী পুত্র ও জমিদার পুত্র শুধু কালের দুজন রকমফের মানুষ। জমিদার পুত্ররা আগে গৃহস্থের যুবতী মেয়েদের রূপমুগ্ধ হয়ে তাদের সতীত্ব নাশ করত। এখন ধনী পুত্ররা করে, তবে তারও রকমফের ঘটেছে। সাবিত্রীর মতই মেয়েরা ধনীপুত্রের লালসায় বলি হয় না, তাদের স্ত্রী হবার মর্যাদা পায়।

বুদ্ধি সে যুগেও মেয়েদের ছিল, তবে সে বুদ্ধি প্রকাশ করবার ক্ষমতা দেওয়া হত না। মেয়েরা আবার কি বুদ্ধি দেবে? কথাটা প্রবাদ বাক্য কিন্তু এই মানা হত। 'দশহাত কাপড়ে মেয়েরা ন্যাংটা।' এখন আর অত তাচ্ছিল্য করা হয় না। এখন মেয়েদের যুক্তি সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে। এটাই আনন্দের ও এটাই সুখের। আর এটা যে বহু আন্দোলনের ফল এটাও মেনে নিতে হবে। হঠাৎ চলতে চলতে লক্ষ্য পড়ল, ক'টি যুবতী মেয়ে একসঙ্গে স্নান করে ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে পুকুর থেকে উঠে এল। দেখে মনে হল, মেয়েগুলি সবাই ভদ্রঘরের

ও শিক্ষিতা কিন্তু আমাদের দেখে কোন লজ্জা প্রকাশ করল না, বরং আমার সঙ্গীকে বলল, 'শিবনাথদা, কেমন আছেন? বৌদি ভাল তো?'

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে আছি। খানিকটা অবাক চাউনি আমার। মেয়েগুলি বেশ স্বাস্থ্যবতী, তাছাড়া বয়সও সব কুড়ি বাইশের মধ্যে। গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে যে তাদের দেহ-মাধুর্য সম্পূর্ণ গোপন হচ্ছিল না, তার দিকে যেন কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন কি আমার দৃষ্টিকেও তারা পরোয়া করল না। আমার সঙ্গীর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করে তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে হাসতে বিদায় নিল। যেন কত সহজ তাদের আবেদন। সমস্ত পরিবেশটাই যেন একটা পবিত্র পবিত্র ভাব হয়ে থ মেরে থাকল। ওরা চলে যাবার পর আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। মনে হল, এই কিছুক্ষণ আগে কি সাত আটটা মেয়ে এখানে ছিল, না ছেলে? ছেলেমেয়েদের পার্থক্য যেন মনেই হল না। এই যে সহজ আবেদন, এই যে সহজ করে কথা বলা, জানতে না দেওয়া আমরা মেয়ে, ওরা যদি মেয়েলী লজ্জা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে কোন রকমে পাশ দিয়ে সংকোচে চলে যেত, কিম্বা আমাদের দেখে পুকুর থেকে না উঠে জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকত, তাহলে আমাদের একটা কৌতুহলই থাকত।

মেয়েদের মনে শিক্ষার আলো ঢুকে এই হয়েছে ওরা ওদের জড়তা ভুলেছে। ভালবাসাবাসির খেলাতেও যে তারা পিছিয়ে নেই সেটাও দেখা গেছে। এ যুগের ছেলে-মেয়েরা চুটিয়ে প্রেম করতেও শিখেছে। বয়েসের একটা প্রাথমিক অবস্থায় প্রেম প্রেম খেলা সেটা হৃদয়ের আনন্দ কিন্তু তাই বলে সেটা ঘর বাঁধার বন্ধন নয়। ঘর যখন বাঁধা হবে তখন অন্য অবস্থা। এই মানসিকতা আজকের ছেলেমেয়ের মধ্যে সংখ্যাধিক্য। তাতে ভাল কি খারাপ সে বিচার মুলতুবী রাখাই শ্রেয়, কারণ যুগ পালটাচ্ছে। পরিবর্তন আসবেই। সে পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হবে।

চল্লিশোত্তীর্ণ মানুষ এখন কুড়ি ষোলর ছেলেমেয়ের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সেদিন শহর দিয়ে সন্ধ্যা বেলা কোন এক অঞ্চলে যাচ্ছিলাম, বাস রাস্তায় এসে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ কানে গেল, 'এই বুবু কোথায় যাচ্ছিস্?'

বুবু যার নাম সে বলল, 'যাচ্ছি অনুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। তুই কোথায়?'

'কোথায় আর? মনি কাল রাত্রে বাড়ী ফেরে নি ওর মা ডাকতে পাঠিয়েছে তাই যাচ্ছি।' মনি মানে মনিকা। 'কেন তার কি হয়েছে?'

'কে জানে?' ছেলেটি বিজ্ঞের মত হেসে উঠল। আমি এবার চোখ ফেরালাম। ছেলেটির বয়স বছর কুড়ি। পাতলা চেহারা। জামার বোতাম খোলা, বুকের হাড় গোনা যাচ্ছে। দাঁড়ি গোঁফ উঠেছে কিন্তু না কামানোর জন্যে নরম ও কচি দেখাচ্ছে। কিন্তু সে জায়গায় মেয়েটির বেশ গড়ন। বেলবটস্ আর সার্ট পরেছে। সার্টের ওপর দিয়ে বুকের কারুকার্য দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যবতী। মুখখানিও সুন্দর। গা দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলছিল, হেসে বলল, 'তুই জানিস না তুই তো বেশি মনির সঙ্গে মিশতিস্।'

'আমি তো তোর সঙ্গেও মিশতাম তাতে হল কি?'

বুবু কথাটা চাপা দেবার জন্যে বলল, 'মিশতিস্ মিশতিস্ এখন তো মিশিস্ না।'

'মিশি না কেন তুই জানিস্ না!'

'কি?' বুবু যেন একটু ম্লান হয়ে গেল।

ছেলেটি ঘৃণা মিশ্রিত স্বরে বলল, 'যেদিন থেকে তুই মানুকের সঙ্গে মিশছিস্ তখনই বুঝে গেছি তুই কি চাস্?'

বুবু পাতলা ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কি যেন লুকোবার চেষ্টা করল, তারপর হেসে উঠল, বলল, 'জয় তুই কি আজকাল এস্ট্রোলজি প্রাকটিশ করছিস্ নাকি?'

জয় দুর্বিনীতের মত মুখের ভঙ্গি করে বলল, 'এতে এস্ট্রোলজি প্রাকটিশ করতে হয় না। মানুককে আমি চিনি না এমন তো নয়। ও মেয়েদের সঙ্গে কেন মেশে তা তো আমার অজানা নয়।'

বুবু যেন জলে ডোবার আগে আর একবার জেগে ওঠবার চেষ্টা করল, হাসবার মত ভঙ্গি করে বলল, 'কেন মেশে?'

'বলব? পালাবি না তো!'

তবু বুবু সাহস দেখিয়ে বলল, 'বল্ না।'

'সত্যি কথা বলবি কিন্তু বুবু, মানুকে তোর বুকে হাত দেয় না?'

বুবু রেগে গেল কিন্তু রাগ দেখাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিল, জয়ও যেন কিছু বিজয় করেছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'আমরা কি এসব জানতাম? মানকেই তো গল্প করে। তোর সাইজ, মনির সাইজ পিতুর সাইজ……।'

বুবু হঠাৎ আরক্ত মুখে ধমকে উঠল, 'থামবি?'

জয় না থেমেই তাচ্ছিল্য ভরে বলল, 'যা যা শুনতে লজ্জা পাচ্ছিস্। যখন এসব করিস তখন মনে থাকে না? তখন বুঝি খুব ভাল লাগে? ভাল যে

লাগে তা তো জানি, না হলে মানকে তোদের বন্ধু হয়?' বুবু কথা পালটানোর জন্যে বলল, 'মনিদের বাড়ি যাবি না?'

জয় তাচ্ছিল্য ভরে বলল, 'গিয়ে কি হবে? ও কোথায় আমার কি জানতে বাকী আছে? যখন ড্রিঙ্ক করতে শিখেছে, তখনই বুঝে গেছি ওর বারটা বেজে গেছে।'

'ড্রিঙ্ক!'

'কেন অবাক হচ্ছিস্ নাকি? তুইও সেদিন সতেদের ঘরে খাস্ নি?'

'কক্ষনো না।'

'এই বুবু মিথ্যে কথা বলবি না। সতের দাদা আরব থেকে ফেরার পর ফরেন লিকার নিয়ে আসে নি?'

বুবু হাসতে লাগল, 'তুই দেখছি সবই জানিস্।' জয় বিজ্ঞের মত হেসে বলল, 'আরও জানি, শুনবি?' বুবু ভয়ে ভয়ে বলল, 'বল্।' ভোম্বল ড্রিঙ্ক করে তোর জামার বোতামে হাত দেয় নি?'

'দিয়েছে: আমি তো তাকে পাত্তা দিইনি।'

'আর আমি তোর কাঁধে একদিন হাত দিয়েছিলাম বলে তুই হাত নামিয়ে দিয়েছিলিস্?'

বুবু রাগ দেখিয়ে বলল, 'তোর মতলব অন্য ছিল।'

জয় মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কক্ষনো না। বন্ধুর কাঁধে কি কেউ হাত দেয় না?'

'সেটা জানলে তোর হাত সরিয়ে দিতাম না।' বুবু মৃদুস্বরে টেনে টেনে বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ জানি জানি। ভোম্বলের মতলব, মান্কের কাণ্ড তোর ভাল লাগে, শুধু আমিই খারাপ।'

বুবু হেসে বলল, 'এই জন্যে বুঝি রাগ করেছিস্?'

জয় আর কোন কথা বলল না, এগোল।

বুবু ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বলল, 'এই, রাগ করে চলে যাচ্ছিস্ যে?'

জয়ের তখন চোখে জল এসে গেছে, বাঁ হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'হাত ছাড়। আমি খারাপ। আমায় কারুর পছন্দ নয়, আমার সঙ্গে মিশিস্ না?'

বুবু বলল, 'এই রে তুই কাঁদছিস্?'

জয় বলল, 'না, কাঁদব কেন? আমার কাকা জামসেদপুরে যেতে বলেছে, আমি সেখানে চলে যাব।'

'আমার ওপর রাগ করে ?' বুবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

জয়ের চোখ দিয়ে তখনও জল গড়াচ্ছিল। ওর জল যেন থামবে না। ভেতরে কত দুঃখ যে তার জমা হয়েছে ও নিজেই তার খতিয়ান করতে পারে না। বুবু নিজের রুমাল দিয়ে ওর চোখের জল মোছাতে মোছাতে বলল, 'সত্যি তুই একটা পাগল। নে চ মনিদের বাড়ী যাই।'

জয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'তুইও যাবি ?'

'হ্যাঁ।' মনিটার দুশ্চিন্তায় ওরও যে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে গোপন রইল না। জয় বলল, 'মনি কি সতের দাদার পাল্লায় পড়েছে মনে হয় ?'

'সম্ভবত।'

'তাহলে তো মনি খুব জব্দ হয়ে গেল।'

'যেমন মেয়ে ঠিকই হয়েছে। ও যেন একটু বেশি বেশি।' তারপর নিজেই যেন নিজেকে শোনাবার মত করে বলল, 'আমি যে কি করে প্রণয়দাকে বলবো তাই ভাবছি।'

'কি বলবি ?' জয় বোকার মত প্রশ্ন কবল।

বুবু বলল, 'প্রণযদার নার্সিং হোম আছে জানিস্ না ?'

জয় আর কথা বলতে পারল না। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি সব জেনে ফেলে কিন্তু ছেলেদের অভিজ্ঞতা সীমিত। জয় তাই দুর্ভেদ্য পাহাড়ের কোন গুহা দেখছে এমনিভাবে বিবশ চোখে বুবুর দিকে তাকিয়ে রইল।

ওরাও এগোল, আর আমারও বাস এসে গেল। বাসে বসে বসে এই দুটি ছেলে মেয়ের কথাগুলি ভাবতে লাগলাম। কত সহজভাবে এরা সর্বসমক্ষে এই সব আলোচনা করে। একবারও তারা আশে পাশে চোখ মেলেও দেখে না। তাতেই বোঝা যায়, ওরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে নিজেরাই ব্যস্ত। কিন্তু এই সমস্যা যে অন্যের চোখে কেমন লাগতে পারে, সেটা ওরা ভাবতে চায় না। নিশ্চয় ছেলে মেয়ে দু'টি কলেজ বা স্কুলে পড়ে। এক অঞ্চলের বাসিন্দা। বুবু মানকের সঙ্গে কেন মেশে সে কথা জয় স্পষ্ট বলে দিল। বুবুও অস্বীকার করতে পারল না। ফ্রি মিক্সিং। অভিভাবকরা এই সহজ মেশার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না কিন্তু মেশাটা ওদের যে সহজ নয় এই মাত্র তার প্রমাণ মিলল। এই হাওয়াটা এখন শহরে চলছে। গ্রামেও যে এ হাওয়া বিরল তা নয়। কিন্তু এই হাওয়াটা কোথেকে এল ?

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাল্য প্রেমের উপন্যাস দেবদাসের কথা মনে পড়ে।

পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের পাঠশালা থেকে ভাব। দেবদাসের সব দৌরাত্ম্য পার্বতী সহ্য করে। যখন পার্বতী বয়ঃসন্ধিক্ষণে এসে পৌছল, দেবদাসকে দেখেই লজ্জা হল। দেবদাসও গ্রামে ফিরে পার্বতীর দিকে তাকিয়ে আর কথা বলতে পারল না। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'পার্বতী ও দেবদাস যে শুদ্ধ আনন্দের মধ্যে জীবনযাপন করিত, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া গেল।' দেবদাস শুধু গিয়ে খুড়িমার সামনে দাঁড়ায়, পার্বতী হয়ত সেখানে আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না। কি যেন জড়তা তাকে এসে ভর করে। এই যে কি যেন জড়তা? শরৎচন্দ্র দেবদাস উপন্যাস যখন লিখেছিলেন, তাঁরও বয়স দেবদাসের মত ছিল। দেবদাসের মানসিকতা তাঁর। এই যে পারু নামের মেয়েটিকে দেখে তাঁর সঙ্কোচ, সে সঙ্কোচ দেবদাসের মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

আজ প্রায় আশী বছর তারপর চলে গেছে। এই দেশের ওপর দিয়ে দুটো বিশ্বযুদ্ধের ঝামেলা গেছে। অনেক ওলট পালট হয়েছে সমাজ ব্যবস্থায়। নারী-পুরুষও অনেক খোলস পালটেছে। খোলস অর্থে মন। নারী নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এক একটা যুদ্ধ মানে যে মানুষের পরিবর্তন, সে আর অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধ হয়তো সায়গনে কিন্তু এখানকার মানুষ তারই ঝাপটায় মন পালটায়। হু হু করে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেল। বেকার সমস্যার সমাধান হল, লোকেরও আস্থিরতা বাড়ল। তখন কিভাবে বড়লোক হওয়া যায়, তারই ফন্দি ফিকির মানুষের মগজে। আমার এমন অনেক পরিচিতরা আছেন, যাঁরা যুদ্ধের বাজারে লাল হয়ে গেছেন। আজও তারা লাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি ঘটনা মনে পড়ে, ভদ্রলোক একটি সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন, হঠাৎ যুদ্ধ লাগতে চাকরীটা ছেড়ে দিলেন। স্ত্রী বললেন, 'ওকি গো, চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বসলে কেন?'

লোকটি তখন তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের স্ত্রীকেই দেখছে। স্ত্রী বেশ সুন্দরী, পঁয়ত্রিশের কোঠায় বয়স গেলেও পঁচিশ দেখায়। শক্ত বাঁধুনি। চোখ মুখও ফিরে ফিরে দেখবার মত। চারটি ছেলেমেয়ে। বড় মেয়েটিও বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। লোকটি তাকিয়ে আছে দেখে স্ত্রী লজ্জা পেল, তাড়াতাড়ি দেহের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টির পাহারা ফেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অমন করে কি দেখছ?'

লোকটি উত্তর দিল না বেরিয়ে গেল। ক'দিন পরে লোকটি হঠাৎ সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। স্ত্রী ভাবল অন্য,

তাই বউ দরজার দিকে তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'তোমার দিন দিন কি ভিমরতি হচ্ছে? কি করলে বলতো?' লোকটি বলল, 'চুপ।' তারপর এমন প্রস্তাব করল, স্ত্রী অবাক হয়ে গেল। 'এসব কি বলছ গো? . তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

লোকটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'না, ঐ দেড়শো টাকা মাইনেতে আমি এই সংসার চালাতে পারব না। যুদ্ধ লেগেছে দেখছ না?'

'তাতে কি?'

'আমায় টাকা করতে হবে। বড়লোক হতে হবে। গাড়ী, বাড়ী, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।'

'কিন্তু।' সুবালা কেঁদে উঠল, 'আমাকে ভাঙিয়ে খেতে তোমার লজ্জা করবে না?'

লোকটি যে মদ খেয়েছিল তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। ও যে এই সব কাজ করার জন্যে মানসিক অবস্থা দৃঢ় করতে উত্তেজক পদার্থ খেয়েছে সেটা আর গোপন রইল না। সেই লাল চোখ তুলে বলল, 'আমি যা বলছি তাই তোমায় শুনতে হবে। একটা বড় কণ্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্যে টাকা দরকার। সেই টাকা পেতে গেলে তোমায় যেতে হবে। শুধু হাতে কি কেউ টাকা দেয়?' লোকটি ধমকে উঠল।

প্রথম একটু দ্বিধা। এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা। সঙ্কোচ, চোখের জল। গোপনতা অবলম্বন। সুবালারও তাই হয়েছিল, তারপর দিনে দিনে সৌভাগ্য সৃষ্টি হতে তার জড়তা কেটে গেল। সুবালা গেল, তার মেয়ে কমলা গেল, আর সুরেশচন্দ্র বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কের টাকায়—সেই দেড়শো টাকার কেরানী আর থাকলো না। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল কিন্তু সুরেশচন্দ্র সেই যে জেনারেশন পালটে ফেললো, পালটেই ফেললো। এইভাবে সমাজের পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। শরৎচন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেন নি। সমাজের ওপর যে পরিবর্তনগুলি হচ্ছিল, সেগুলি তিনি লক্ষ্য করেন নি। ভালবাসাটাই তাঁর কাছে বড় ছিল। কে ভালবেসে কাকে বিয়ে করতে পেল না, কার ভালবাসার জবাব কে দিতে পারল না, ব্রাহ্মণধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, এই সব নিয়েই তিনি মাথা ঘামিয়েছেন।

তাই নতুন যে সব মানুষের জন্ম হচ্ছিল। যে সব নরনারী আবার তাদের নতুন সমস্যাগুলি নিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল, তাদের দিকে দেখবার তিনি অবসর পান নি।

অনুরক্ত দেখল, সে আর শ্রদ্ধা করতে পারল না। তবু মূল উপন্যাসে মূল চরিত্রের ওপর আলোকপাতের জন্যে এই খণ্ড চিত্র সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্র কখনও স্বামী-স্ত্রীর মিলনকে ভাঙতে চান নি। আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকিয়েও দেখি, তিনি যৌবনে যে ছন্নছাড়া জীবন যাপন করেছেন, পরবর্তীকালে তার জন্যে অনুতপ্ত হয়েছেন। জীবনকে মধুময় করতে গেলে যে সামাজিক কতকগুলি নিয়মকানুনকে মেনে চলতে হয়, এটা পরিণত বয়সে বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর ছন্নছাড়া জীবনের অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁর লেখনী সরস হয়েছে, পাঠক সমাদর কবেছে কিন্তু আপনজনের কাছে তাঁর আদর হয় নি। সেইজন্যে প্রথম জীবনে ভাগলপুরে সামাজিক জীবনে তাঁকে লোকে এড়িয়ে চলত, সেই এড়িয়ে চলা তখন দুঃখের হয় নি কিন্তু পরবর্তী জীবনে সেটা তাঁর মনে খুব বাজে। তাই সহজে তিনি কোন ব্যাপারটাকেই অশান্তির মধ্যে ভাবতে চান নি।

নিজের বিবাহিত জীবন নিয়েও তিনি কখনও আলোচনা করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই যে জয়ঢাক বাজিযে বলার নয় সে কথা জানতেন বলেই চিবকাল ঐদিকের সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন।

এ যে কি কষ্ট সে কথা আমরা আজ বুঝতে পারি। আজ মহান লেখককে নিয়ে অনেক আলোচনার ঝড় ওঠে। কেউ বলেন, তিনি দুটো বিয়ে করেছিলেন। কেউ বলেন, তিনি আদৌ বিয়েই কবেন নি। রক্ষিতা ছিল। এ সব বলার কারণ, শরৎচন্দ্রের অনেকখানি জীবনই কতকগুলি পতিতার সংসর্গে কেটেছিল। পতিতালয়ে তিনি কেন গিয়েছিলেন? আমরা ধরে নেব, প্রথমে তাঁর মধ্যে কৌতুহল জেগেছিল। যে বয়সে নারীর ছাযা মনের মধ্যে দোলা জাগায়, শরৎচন্দ্র সাংসারিক জীবনে সে নারীর দেখা পান নি। তাবপর শিল্পী মন প্রকৃতির লীলা নিকেতনের সঙ্গে অতন্থব লীলা তাঁকে অস্থির করেছিল।

না হয় ধরে নিলাম, শরৎচন্দ্রের মধ্যে রাজু প্রভৃতির সঙ্গ-দোষে মদ, গাঁজা, সিদ্ধির মত নারীর চাহিদাও জাগে, তিনি সেই জন্যে বারবনিতালয়ে গিয়েছিলেন। তারপর……। মেয়েগুলি অর্থ নিয়ে দেহ বিক্রী করে কিন্তু সেই বেচাকেনার হাটে গিয়ে তাঁর হঠাৎ চৈতন্যোদয় হল, তিনি চমকে উঠলেন। এই মেয়েগুলির পদস্খলনের গল্প এত মর্মান্তিক? এরা দেহ বিক্রী করে নিরুপায় হয়ে? তখনই তাঁর কলম সক্রিয় হল। এই ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে তাদের যেন বের করার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠলেন।

আমরা এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করব অন্যত্র। কারণ যাদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেছিলেন, তাদের কোন উপকার হয়েছে কিনা সেটা এই শতবর্ষ পরে দেখা দরকার।

তবে তাঁর লেখনীর বিভিন্ন স্তরে যে সব নারীর আগমন হয়েছে, তারা যে কেমন, সমাজে তারা এখনও আছে কিনা, এবং থাকলে কতখানি আছে সেই সম্বন্ধে আলোচিত হবে। শরৎচন্দ্র তাঁর নারী চরিত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাগ করে নিয়েছেন। কুমারী, সধবা, বাল্যবিধবা, পতিতা। কুমারী মেয়ে তার কুমারী জীবনের আশা আকাঙ্খা নিয়ে বড় হয়েছে। তার মধ্যে এক দয়িতের রূপ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে পেলে সে সুখী হবে। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, কুমারী মেয়ের এই আশা আকাঙ্খা চিরন্তন। সে কাল বিচার করে না, সমাজ জানতে চায় না, সে ভালবাসার নিধিকে পাবার জন্যে যুদ্ধ করে কিন্তু এই যুদ্ধটা কতখানি, কালে কালে সে বিচার হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর কুমারী মেয়েদের কখনও বেপরোযা করেন নি। তারা তাদের আপন গণ্ডিতে থেকে তার দয়িতকে লাভ করতে চেয়েছে। দেবদাসের পার্বতী পরিবারের অভিমতই মেনে নিয়েছিল। তবে সে অনেক ঝুঁকিও নিয়েছিল, গভীর রাত্রে দয়িতের শয়নঘরে গিয়ে নিজের মনের কথা বলতেও দ্বিধা করে নি। এ উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বেশ শক্তি প্রকাশ করেছেন। বাল্যের রচনা বলে সাহসটা বোধ হয় বেশিই হয়েছিল। একটি কুমারী মেয়ে, সে যখন জেনে ফেলেছে, একটি পুরুষের ঘরে ঐ রাত্রে গেলে কি হয়? দেবদাসের ওপর বিশ্বাস ছিল, দেবদাস তার বাল্য সাথী, কোন অঘটন সে ঘটাবে না কিন্তু যদি ঘটাত? পার্বতী কি সে কথা বোঝে নি? তবু গিয়েছিল কিন্তু তার নিরাপত্তা আরও তীব্রভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে শরৎচন্দ্র দেবদাসের মাধ্য দিয়ে তার দুর্নামের ভয়টা আরও তুলে ধরেছিলেন। 'তুমি যে এই রাত্রে এলে কেউ দেখে নি তো।' পার্বতী নিঃসঙ্কোচে বলেছিল, 'দারওয়ান দেখেছে।' এই যে কুমারী মেয়ের মনের সাহস, তার অর্থ হচ্ছে পার্বতীর গভীর ভালবাসা। কুমারী মেয়েরা যতই নিজের দেহের চারিদিকে পাহারা বসাক, দয়িতের কাছে তাদের অদেওয়ার কিছু থাকে না। দেবদাস যদি সেদিন এই সুযোগটি সদ্ব্যবহার করত, পার্বতী তাহলে বোধ হয় বাধা দিত না। কুমারী মেয়ের মানসিকতা নিয়ে বলা যায়, এটাই ঠিক, বরং সে খুশি হয়ে যে চিন্তার নাগপাশে [illegible]ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, তার একটা সমাধান হত। পার্বতী হয়ত হাসি কান্নার মাঝে চিরন্তন ভালবাসাকে

বুকে ধরে দেবদাসকে বলত, 'বিয়ের আগে তুমি আমার লজ্জা কেড়ে নিলে? বিয়ে করবে তো।' অনিশ্চয়তা বুকে ভয় করত কিন্তু দেবদাসের ওপর বিশ্বাস তার যেত না। শরৎচন্দ্র যে যুগে বসে কাহিনী রচনা করেছেন, মিলনই টানতেন। আর কোন ঝুঁকি নিতেন না। তবু পরিণতি খুব হৃদয়গ্রাহী হত না। নর-নারীর যৌন তৃপ্তি হবার পর অন্তত পুরুষ কি আর তারপর বিয়ে করবার আগ্রহ দেখায়?

এই যুগেও সেই সমস্যা একই। যুবক যুবতী ভালবাসে। কোন কারণে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। নয় যুবতীর বাড়ীর তরফ থেকে বাধা আসে কিম্বা যুবকের। সে বাধা নানা কারণের হতে পারে। জাতের বাধা। অর্থকরীর সমাধান। হয়ত যুবতীটি চাকরী করে, বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে বাড়ীর অবস্থা অচল হবে। মায়ের দাপটে যুবতী বাড়ীতে তার বিবাহের কথা বলতে পারছে না। কিম্বা যে যুবককে যুবতী নির্বাচন করেছে, বাড়ী থেকে তার অনেক দোষ দেখাচ্ছে। অনেক সময়ে দেখা যায়, যুবতী নিজেই বাড়ী ছেড়ে চলে এসে যুবকের সঙ্গে মিলিত হয়। এ ঘটনা খুব বিরল নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাই ঘটে কিন্তু সে বেপরোয়া মেয়েদের ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন মেয়েটি শান্ত, সহজ ও ভাল মানুষ ধরণের হয়, সবার জন্যে তার কাতরতা, বাড়ীর জন্যেও, প্রেমিকের জন্যেও। প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে তাকে কত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

ধরে নিলাম প্রেমিকটি ভাল চরিত্রের। কিন্তু তবু তার মধ্যে এই দীর্ঘ ভালবাসার কূজন করতে ভাল লাগে না। বিয়ে যখন হতে দেরী হচ্ছে সে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই একদিন চল না আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে যাই। বন্ধুর স্ত্রী বাপের বাড়ীতে গেছে আমরা বেশ কয়েক ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে আসব।' শিপ্রা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সলজ্জ হয়ে বলল, 'না না সে কি করে হয়? বিয়ের আগে, ধ্যেৎ।'

আরও অন্যভাবে ঘটনাটা ঘটে। হয়ত প্রেমিক প্রেমিকাকে বললই না কোথায় যাচ্ছে। প্রেমিকা খুব বিশ্বাস করে প্রেমিককে। ওরা যখন একটা ফাঁকা বাড়ীতে ঢুকল, তখন প্রেমিকা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কোথায় এলে?' প্রেমিক তার উত্তরেও মুচকি হাসল। ভাঙল না কিছু। তারপর যখন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে গেল, প্রেমিকা আতঙ্ক বলে উঠল, 'না না সুমন বিয়ের আগে এ আমি পারব না।' সুমনের যদি পরিণতিতে ভয় না জাগে, বা তার যদি তখন আদিম প্রবৃত্তি বেশী তাকে বশীভূত করে, সে প্রেমিকার

কোন বাধাই মানতে চায় না। বেপরোয়াভাবে তার কাপড় ধরে টানাটানি করে। একজনের অনিচ্ছায় এই দৈহিক মিলনে মানুষ কি যে পায়! ভালবাসাবাসির খেলায় নারী নিজেই সক্রিয় হয় কিন্তু তার বাধা সে অপবিত্র হয়ে যাবে। নাহলে কি তারও ইচ্ছা জাগে না? আধুনিক সমাজে নারীর দৈহিক মিলনের দিকে ঝোঁক বেশি। অনেক কথাই এ প্রসঙ্গে মনে আসে কিন্তু পাঠকের চিত্ত বিরূপ হবার আশঙ্কায় আলোচনা করতেও ভয় জাগে। কিন্তু যা সত্য তা অপ্রিয় হলেও বলা উচিত। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে এ যুগের অনেক কথাই এসে পড়ে। অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা এখন ভালবাসাবাসির খেলায় মেতেছে, তারা কি সত্যিই পরস্পরকে ভালবাসে? আমার তো মনে হয়, ভালবাসা তাদের বাইবের প্রকাশ, আসলে তারা যৌনসুখকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। দু-একটির কথা ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই ঐ পূর্বকথিত তাড়না। এর আগে দুটি ছেলেমেয়ের কথোপকথন উদ্ধৃত করেছি। বুবু আর জয় পরস্পরের খেলার সাথী কিন্তু তারা কি নিয়ে আলোচনা করছিল? হয়তো বলা হবে, 'এ ধরণের যৌবনের তাড়না আগেও ছিল।' অবিশ্বাস হয় না কিন্তু জিজ্ঞাসা, 'এতটা কি ছিল?'

একটি ছেলে একটি মেয়েকে সিনেমায় যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মেয়েটি বলছে, 'সিনেমায় যেতে পারি কিন্তু অসভ্যতা করবে না।' ছেলেটি হেসে বলল, 'অসভ্যতা করি, তোমার ভাল লাগে না?' যে মেয়ে বেপরোয়া সে হাসে। যে মেয়ে শান্ত সে লজ্জা পায় কিন্তু দু'জনের ভাল লাগার জন্যেই এই যোগাযোগ। শরৎচন্দ্রও বলেছেন, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে দশ বছর বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায়। সে ঈশ্বরের সৃষ্টি। আমরা তার ওপর আর কি বলব?

শরৎচন্দ্রও তাঁর গল্পে অল্প বয়েসেব মেয়েদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করেছেন। সন্ধ্যা অরুণকে ভালবাসত। সে ভালবাসার মধ্যে যথেষ্ট গভীরত্ব ছিল কিন্তু তার মা জগদ্ধাত্রী যখন জাতের দোহাই দিয়ে অরুণকে ত্যাগ করল, তারও মন খানিকটা বিরূপ হল কিন্তু অরুণের ওপর তার যথেষ্ট বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসে সে অরুণের ওপর ছোট জাতের এক নিরাশ্রয়ের ভার চাপাল কিন্তু জাতের দোহাই দিয়ে তাদের মিলন নাকচ করে দিল।

সন্ধ্যার মত মেয়ে এ যুগে বিরল নয় কিন্তু তারা অত জাতের দোহাই দেয় না। শরৎচন্দ্র ভালবাসাকে যত না প্রাধান্য দিয়েছেন, জাতের চিন্তায় তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। সে যুগে জাতের চিন্তাটাই বেশি ছিল বলে স্বর্গীয় প্রেমের মূল্য

শরৎচন্দ্র দিতে পারেন নি। তাঁর এমন কোন উপন্যাস নেই নরনারী দুর্বার গতিতে ভালবাসার টানে এগিয়ে চলেছে।

পরিণীতা শরৎচন্দ্রের মিলনান্ত উপন্যাস। ললিতা ও শেখরের বাল্যপ্রেম ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেখরের সব ভার ললিতা বহন করে। এটা অবশ্য খুবই অযৌক্তিক। ললিতা একটি কুমারী মেয়ে, সে কিভাবে একটি অবিবাহিত ছেলের ঘরে দিনরাত যাওয়া আসা করতে পারে? এমন কি শেখরের আলমারীর চাবিও ললিতার আঁচলে। শরৎচন্দ্র লিখছেন, 'ললিতাকে শেখরের মা খুবই স্নেহ করিত।' 'স্নেহ করিত' বলেই যে শেখরের ভার ললিতা নেবে, এ উপন্যাসে সম্ভব, সাধারণ জীবনে বড় একটা দেখা যায় না। আধুনিক যুগেও সেটা খুব কমই দেখা যায়। হোক না ললিতারা গরীব। যাই হোক, শরৎচন্দ্র তাদের মধ্যে হঠাৎ প্রণয়ের আবির্ভাব ঘটালেন। প্রণয় প্রেমিককে ঈর্ষান্বিত করে। যখন শেখর দেখল, তারই মত বয়সী একটি ছেলে ললিতার মামার বাড়ীতে আসন গেড়ে বসেছে, তার চিত্ত বিকল হল। আর ললিতা তারই আমন্ত্রণে সেজেগুজে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। ললিতা অনুমতি চাইতে এলে স্পষ্ট বলে দিল, তুমি যাবে না। শেখর এতেও ক্ষান্ত হল না, একদিন অসহ মুহূর্তে খেলার ছলে ললিতার গলায় মালা পরিয়ে দিল। শরৎচন্দ্র এ জায়গায় শেখরের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, 'শেখর এই খেলার ভবিষ্যৎ পরিণতি একবারও ভাবে নাই।' তাই কি ঠিক? শেখর ললিতার ওপর অধিকার হারাবার ভয়ে কি এ কাজ করে নি? অবশ্য বলা যেতে পারে শেখর এই মালাবদলের পরবর্তী পরিণতির কথা একবারও ভাবে নি। কিন্তু ললিতা সেটা স্মরণ করিয়ে দিল, মালাবদল মানেই বিয়ে। অনুষ্ঠান না হোক, এ বিয়েকে তো অস্বীকার করা যায় না। যখন ললিতা জিজ্ঞাসা করল, 'এবার আমি কি করব বলে দাও?' শেখর জবাব দিতে পারল না।

শরৎচন্দ্রের কালে কিনা জানি না, সে যুগে নারীরা যতখানি পাকা-পোক্ত, নায়করা ততখানি নয়। অবশ্য গল্প বানাবার জন্যে লেখককে একটু কৌশলের আশ্রয় নিতেই হয়।

কিন্তু লেখক কল্পনাবিলাসী হলেও বাস্তবমুখী। বাস্তবের বাইরে তো তার যাবার উপায় থাকে না। ধরেই নিলাম, সে যুগে মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি পাকা হত। আর এই পাকা হবার ফল, শরৎচন্দ্র অল্প বয়েসের মেয়েদের মুখে পাকা পাকা কথা তুলে দিয়েছেন।

পার্বতী, ললিতা, সন্ধ্যা প্রায় একই কিন্তু অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার মুখে পাকা কথা দিলেন না কেন? দিলে তো তাকে সব হারাতে হত না? তবে জ্ঞানদা ছিল কুরূপা। কুরূপার মুখে বোধ হয় পাকা কথা শোভা পায় না।

পাকা কথার প্রসঙ্গ যখন এল, তখন এ যুগে পার্বতীর মত একটি মেয়ের কথা বলি। গ্রাম্য মেয়ে। দেশ পাড়াগাঁয়ে মানুষ। সাইকেলে করে ঘুরে বেড়ায়। কাউকে পরোয়া করে না। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত ফ্রক পরে। ছেলেদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেয়। কথাবার্তাও ছেলেদের মত। তারপর তার যৌবন এল। যৌবন এলে মেয়েদের যা পরিবর্তন হয়, তারও হল। ছেলেরা আড্ডা দিতে দিতে তার বুক ছোঁবার চেষ্টা করে, ছুঁলেও সে কিছু বলে না। হাসে। ছেলেরা ভাবে, 'একি মেয়ে বাবা কোন ভ্রূক্ষেপ নেই?' ছেলেরা নানা জায়গায় গীতাকে নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু তাকে তারা ভয় করে। গীতার গায়ের জোরের কাছে অনেকেই পেরে ওঠে না। একটা থাপ্পড় মারলে অনেকে ঘুরে পড়ে। এই মেয়েরও প্রতি লোভের চক্রান্ত হল। অন্য একজন সে ছেলেদের দলে নয়, গাঁয়েই বাস করে। রুগ্ন, দুর্বল, গীতার ডবল বয়স। শহরে কি একটা কাজ করে। দেশে একা থাকে। সে গীতাকে সাইকেল করে যেতে কতদিন দেখেছে। সেই দেখাই বোধ হয় প্রেম জাগা। একদিন দুপুরবেলা গীতা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, সে জানালার ধারে বসেছিল। চোখা-চোখি হয়ে গেল। গীতা এমনিই একটু সহজ সবল, আসলে সাহসিনী, দেশের লোক, বেশি আলাপ না থাকলেও সে ভ্রূক্ষেপ করল না। সহজভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কি অফিস যাননি?'

'না, শরীরটা খারাপ।' গীতা চলে যাচ্ছিল। সে ডাকল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

গীতা বলল, 'আমার আর যাওয়া। দেখি মানিক, ললিতকে পাই কিনা! আড্ডা না দিলে আর সময় কাটছে না।'

সে এই সুযোগটা নিল। বলল, 'আড্ডা দিতে চাও তো সাইকেলটা রেখে আমার ঘরে এস না।'

গীতা কাউকে ভয় করে না। মেয়েলী সাবধানতাও তার ছিলনা, এইজন্যে কতদিন তার মা দিদিরা বলেছে, 'গীতু ভুলে যাসনি, তুই মেয়ে। মেয়েদের কতরকম বিপদ আছে।' গীতা একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে রোদ্দুরটা পরখ করে নিল। তারপর তার দিকে হেসে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কুকুরটা বাঁধা আছে তো!' গীতা কুকুরকে খুব ভয় করে। সে বলল, 'সে ঘুমুচ্ছে। তুমি এস।'

বলেই নিজে জানলার কাছ থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ কোথা দিয়ে চলে গেল দুজনেই জানে না। গীতা এক বাণ্ডিল তাস নিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে খেলছিল। হঠাৎ তার লক্ষ্য গেল সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গীতার তো ওসব ভয় ছিল না, এক মনে তাস খেলতে লাগল। হঠাৎ সে গীতাকে জড়িয়ে ধরল। গীতা ইচ্ছে করলে তাকে সরিয়ে দিতে পারত কিন্তু সে কিছু বললো না। সে গীতার বুকে মুখ দিয়ে বলল, 'গীতা আমি তোমাকে ভালবাসি।' গীতা হাসল।

গীতা বোধ হয় তখন নারী হয়ে উঠছিল। চুপ করে রইল। তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু তাকে দেখছিল।

'আমি তোমাকে বিয়ে কবব।'

গীতা হাসল। সে গীতার পাশে শুয়ে পড়ল। গীতাকে আকর্ষণ করতে যেতেই গীতা জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানলাটা খোলা রয়েছে না?'

সে তড়াক করে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

গীতা আর সাইকেল চড়ে না। ছেলে বন্ধুরা ডাকতে এলে যায় না। গীতার পরিবর্তন দেখে ছেলে বন্ধুরা বলে, 'তোর হল কি রে?'

গীতা প্রায় সময় তার বাড়ীতে যায়। তার একার সংসারে রান্না-বান্না করে। গীতা একদিন পাকা গিন্নী হয়ে উঠল। এদিকে ওদের প্রথম দিনের মত নারী পুরুষের উত্তেজনার খেলা সমান তালে চলল। গীতা তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখে। ওর বিস্ময় জাগে, সে এতদিন নিজেকে নিয়ে কি ভাবত?

ধীরে ধীরে আর একটা উপসর্গ জুটল। গীতার পেটে বাচ্চা এল। মা দিদিরা চটে উঠল। 'এ কি গীতা তুই কি করেছিস্?'

গীতা বলল, 'বেশ করেছি।'

মা দিদিরা আরও রেগে গেল। বলল, 'বেশ করেছিস্ কি রে? তুই কি কুমারী মেয়ের মা হবি?'

'তা হব কেন?'

'তবে?'

'সে তোমাদের ভাবতে হবে না।'

তারপর গীতা গিয়ে তাকে বলল, 'তোমার ছেলে আমার পেটে, কি করবে কর।' গীতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। কিন্তু একটা কথা ভেবে তার বিস্ময় জাগছিল, এই রোগা পটকা লোক তাকে পেল কেমন করে? গীতা

জানে না, আমরা জানি, বেশ কিছুকাল ধরে যে গীতার নারীধর্মটি ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল তা তার অগোচরেই ছিল। সময় যে মানুষকে কখন কি করে সে একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। সেদিন দুপুর বেলা ঐ রোগা পটকা লোকটার হঠাৎ সাহসে যে গীতা একটি চড় কষিয়ে দিতে পারত এ আর অসম্ভব ছিল না। যাই হোক সে উত্তর দিল, 'আমার ছেলে তোমার পেটে বলো না। আমাদের দুজনেরই ছেলে। বাড়ীতে বলেছ ?'

'কি ?' গীতা তার দিকে তাকাল।

'আমাদের বিয়ে !'

'আমি বলতে পারব না, তুমি বলো।'

গীতার মা দিদিরা তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এই লোকটা গীতার স্বামী হবে ? আড়ালে গীতাকে বলল, 'তোর কি কপালে আর কেউ জুটল না ?'

'কেন ?'

'এর শরীরে আছে কি ?'

'জানি না যাও' বলে গীতা অন্যত্র সরে গেল। গীতাও কি জানে ? সে কেন এর কাছে ধরা দিল ? সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এই মেয়েটি তার ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছিল বলে ঈশ্বর কামদেবকে পাঠিয়ে এর কবলে ফেলে দিলেন।

তাই পাকা মেয়ের কথা যে আমরা বলছিলাম, গীতার দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। নারী তার আপন ধর্মে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি মনেও হয়। মনের পরিবর্তনই ভালবাসার রূপে আমরা দেখতে পাই। নর-নারীর দৈহিক মিলনকে শরৎচন্দ্র বেশি প্রাধান্য দেন নি। গল্পের তাগিদে যখন এর প্রয়োজন হয়েছে তখন পরের চোখ দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়েছেন কিন্তু নর-নারীর মধ্যে দৈহিক আকাঙ্খা জাগান নি। পরিণীতায় ললিতাকে মালা পরিয়ে দেবার পর শেখরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছেন। পরস্পরের ঠোঁটে চুম্বন এঁকেছেন কিন্তু দৈহিক মিলন কল্পনা করেন নি। সে যুগে কি দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না ? ললিতাকে যদি শেখর গ্রহণ করত, ক্ষতি কি হত ? গল্পের পরিণতি তার জন্যে এতটুকু ব্যাহত হত না। মালা পরাতে ললিতা তো শেখরেরই হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর যদি দৈহিক মিলন ঘটত, ষোলকলা পূর্ণ হত। তবে এ কথাটা ভাবা যায়, দৈহিক মিলন ঘটলে শেখর হয়ত গিরীনকে চিন্তা করে বিষের জ্বালায় জ্বলত না। তবু বলব, শরৎচন্দ্র দৈহিক মিলনকে প্রাধান্য দিতে ভালবাসতেন না। আপাত দৃষ্টিতে অবশ্য এটা বলা যায়,

দৈহিক মিলনই তো গল্পের শেষ পরিণতি। নর-নারীর ভালবাসাবাসির শেষ পরিণাম তো তাই। এটা হয়ে গেলে গল্পের আর থাকল কি? শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস বিবেচনা করলে চরিত্রহীনের 'বোল্ড এ্যাটেম্প্ট' দেখে তাঁকে বাহবা দিতে হয়। সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের আদান প্রদান সে নর নারীর এই দৈহিক মিলনের দিকেই এগিয়ে গিয়েছিল। বার বার তাদের কাছে এনেছেন, তাদের মাঝখানে দৈহিক মিলনের সমস্যা তুলেছেন, এ ক্ষেত্রে পুরুষের ইচ্ছা নারী এড়িয়ে গেছে। নারী যে পুরুষের ইচ্ছাটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, সাবিত্রী বুঝে সতীশকে তার ঘরে রাত্রিবাস করতে দেয় নি। যখন গল্পের শেষ পরিণতিতে এসেছে, উভয় উভয়ের কাছে আর গোপন থাকেনি, তখন সাবিত্রী বলেছে, 'এই দেহটা আমার নিষ্পাপ, তবু এই দেহ দেখিয়ে অনেককে তো অনেক ছলনা করেছি, তাই এই দেহ তোমাকে দিতে পারব না।' ভালবাসার খেলায় যে দেহেরও মূল্য আছে শরৎচন্দ্রও অস্বীকার করতে পারেন নি। দেহ ব্যতিরেকে যে প্রেম পূর্ণ হয় না, এও তাঁর জানা ছিল।

গৃহদাহে অচলাকে নিয়ে তিনি এই এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন। দু'টি যুবকের চরিত্র গড়েছেন, একজন সরব, একজন নীরব। নীরব মহিমের প্রতি অচলার ভালবাসা তাকে বিবাহে পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নারী কখন কি চায় নিজেই জানে না, সে কথা বার বার শরৎচন্দ্র নারী চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে বলেছেন। আমরাও তাই স্বীকার করি। নারী নিজেই কি জানে কখন সে কি চায়? এই ভাবনার কতকগুলি টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে অচলা চরিত্র। কিরণময়ী যেমন শিক্ষিতা ছিল, অচলাও শিক্ষিতা। শিক্ষার প্রলেপ থা'কলে ভালবাসার পাল্লাটা বোধ হয় নিক্তি দিয়ে ওজন করা যায়। অচলাও তাই করেছিল। সে ব্রাহ্ম মেয়ে, তাদের সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়, নাহ'লে কেদারবাবু তো সুরেশের সঙ্গেই অচলার বিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু অচলার প্রেম অর্থের ওপর লোলুপ নয়। গরীব মহিমকে অচলা জেনে শুনেই বিয়ে করেছিল। আবাল্য বিলাসের মধ্যে মানুষ হয়েও সে ঐ গ্রামের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বাস করতেও দ্বিধা করে নি। একটি শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে প্রেমকেই সর্বোচ্চ আসন দান করেছিল কিন্তু সেখানে যখন মৃণালকে দেখল, তার গভীর প্রেম একটু চঞ্চল হল। তখনই তার সুরেশের কথা মনে পড়ল। সুরেশকে সে প্রত্যাখান করেছে, তার ভালবাসা গ্রহণ করে নি, এই সব আত্ম জিজ্ঞাসা তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।

নারী যে সব সময়ে স্থির জলের মত তার মনটি ধরে রাখতে পারে না, সংশয়, দ্বিধা, নানা ভাবনায় মধ্যে তার দিন চলে, অচলা চরিত্রই তার প্রমাণ। অচলা হিন্দু মেয়ে নয় যে সে হিন্দু মেয়ের মত স্বামীই দেবতা, স্বামীই নারী জীবনের সব, স্বামীর দোষ গুণ তার দেখা কর্তব্য নয়। আর দোষ থাকলেও তার প্রতি বিরূপ হওয়ার কথা হিন্দু মেয়ে ভাবে না। সেই জন্যে লেখক অচলাকে বুদ্ধি করে ব্রাহ্ম করেছেন। ব্রাহ্ম করার কারণ, সংস্কারহীন নারীমন যাচাই করা। ব্রাহ্ম মেয়ে নিজের স্বাধীন মত নিয়ে চলতে পারে। সেই স্বাধীন মতের জন্যেই অচলা স্বামীর বাড়ীতে সুরেশকে ডেকে এনে একবার সুরেশের ওপর নিজের মন সমর্পণ করে, আবার মহিমের দিকে এগিয়ে যায়।

এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতর বাদ-বিচার হয় না, নারী তার ভালবাসার সম্পদ অন্যকে দিতে পারে না। আসলে বলা যেতে পারে নারী একটু হিংসুক প্রকৃতির। মৃণালের চিন্তা যদি অচলার মধ্যে না ঢুকত, তাহলে হয়ত অচলা সুখী হত। কিন্তু অচলার মধ্যে সুরেশ নামে আর একজন পুরুষ ছায়া ফেলেছিল বলে অচলা মহিমের নীরবতা সহ্য করতে পারে নি। পাথরের মানুষ কিনা দেখতে চেয়ে অচলা নির্মমভাবে মহিমকে আঘাত করেনি, নিজেকে আঘাত করেছে, রক্তাক্ত করেছে। কিন্তু প্রেমের দেবতা আর এক দিকে আর এক ষড়যন্ত্র গড়ছিলেন সে কে জানবে? সুরেশ বন্ধুপত্নীকে বন্ধুপত্নী হিসাবেই দেখতে চেয়েছিল। আগে যা হয়ে গেছে গেছে কিন্তু অচলার আহ্বানই তাকে আবার পুরোনো সম্বন্ধে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর তার পরিণতি কি ঘটল 'গৃহদাহ' উপন্যাস তার প্রমাণ।

'গৃহদাহ' নামকরণ সম্ভবত অচলার জন্যেই হয়েছে। অচলাই মহিমকে ভুল বুঝে নিজের গৃহ নিজেই দাহ করেছে। কে চায় নিজের গৃহকে এইভাবে পোড়াতে কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, নারী ঘর গড়ে, নারীই ঘর ভাঙে। এ প্রবাদ বাক্য যে খুবই সত্য, অচলার চরিত্রই তার প্রমাণ। অসুস্থ মহিমকে ট্রেনের কামরায় ফেলে কে প্রলোভিত করল সুরেশকে অচলাকে নিয়ে পালাতে? দিনের পর দিন অচলাই কি সুরেশকে উত্তপ্ত করেনি?

শরৎচন্দ্রের এ উপন্যাসের আখ্যানভাগের সঙ্গে আধুনিক নারীরও সম্পূর্ণ মিল। এ সমস্যা বিরল নয়, এই সমস্যাই এখন বিবাহিত নারীর মধ্যে। আমরা বহু আগে এই নিয়ে আলোচনা করেছি, নারী যতই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে, তার বিচার শক্তিও তত নানামুখী হচ্ছে। তবে এই বলব না, নারী শিক্ষিত না হউক। সমস্যা সমস্যাই। সেটা আলোচিত হলেও কোন ক্ষতি নেই।

তবে এও বাহুল্য নয়, দশ বছর পরে স্ত্রী জানল, সে স্বামীকে ভালবাসে না। এতদিন ছিল শুধু নিয়ম রক্ষার তাগিদে। বিয়েটাও কিভাবে হয়ে গিয়েছিল, সে জানে না। এই সব চিন্তা যদি আধুনিক নারীমনের সমস্যা হয়, তাহলে সাহিত্য কি দেখে এগোবে ?

নারীমন বড়ই দুর্জ্ঞেয়। দেবা ন জানন্তি·········। সমস্যা দিন দিন আরও ঘোরালো হচ্ছে। নারী আরও স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে। সে তার প্রেমাস্পদকে ছাড়া কাউকে জানতে চায় না। স্বামীর আত্মীয় স্বজন তার চক্ষুশূল। একটি ফ্ল্যাট বাড়ী, দুখানি ঘর। গ্যাস, ফ্রিজ, রেডিও, সোফা, আলমারী, খাট, ভাল ভাল শাড়ী। আটটায় ঘুম থেকে উঠে চাকরী থাকলে তাড়াতাড়ি গ্যাসে রান্না, কিংবা রাঁধুনি রান্না করতে লাগল, নিজে 'বাইরে খেয়ে নেব' বলে চলে গেল। অফিস থেকে স্বামীকে ফোন করল, 'তোমার সময় হবে মেট্রোতে দুটো টিকিট কেটেছি।' স্বামী বলল, 'যাচ্ছি। তুমি মেট্রোর সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা কর।'

এই স্বামীও এক সময়ে স্ত্রীর ভাল লাগে না। তখন হয়ত বিবাহিত জীবনের পাঁচ সাত বছর চলে গেছে। তখন হয়ত স্ত্রীর অচলার মত মনের অবস্থা হয়েছে। সে স্বামীর অনেক দোষ দেখতে পেয়েছে। আসলে স্বামীকে তার আর ভাল লাগছে না। এক স্ত্রী নিয়ে যেমন স্বামীর চলে না, তেমনি স্ত্রীরও এক স্বামীতে পোষায় না। কিন্তু আমরা সমাজবদ্ধ জীব। এক পুরুষ বা এক স্ত্রীতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। শরৎচন্দ্র এই সমস্যা নিয়েও একটি গল্প লিখেছেন। সে গল্পের নাম 'সতী'। সতীমায়ের সতী মেয়ে হয়ে নির্ম্মলা জাঁক করে বেড়াত, 'আমার স্বামী কখনও বিপথে যাবে না' কিন্তু স্বামী হরিশের অবস্থা সঙ্গীন। সে দোষের মধ্যে করেছিল, বিবাহপূর্ব জীবনে লাবণ্য বলে একটি মেয়েকে ভালবাসত। সেই ভালবাসাই তার কাল হল। নির্ম্মলা সংসারে এসে একদিনও স্বামীকে নিঃসন্দেহে জীবন যাপন করতে দেয় নি। সর্বদা তার সতর্ক দৃষ্টির পাহারা নিযুক্ত করেছে। হরিশ আগে যা করেছিল করেছিল, বিবাহের পর এতটুকু বেচাল হয়নি। বরং কি করে স্ত্রীর বিশ্বাস রাখবে এই চিন্তায় পাগল। কিন্তু স্ত্রী তো তাকে বিশ্বাস করে না। শেষ কাণ্ডটা ঘটল, লাবণ্য স্কুল ইন্সপেকট্রেস হয়ে এল, নির্ম্মলার সন্দেহ, এ সবই স্বামীর কারসাজি। অ।ঃ তার সন্দেহগুলো তার চিন্তার সঙ্গে এমন মিলে গেল যে সে আফিম খেল। হরিশের বিধবা বোন উমা বলল, 'দাদা আগে তো বহুবিবাহের চল ছিল, তুমি একটা বিয়ে কর।' তার উত্তরে

হরিশ বলল, 'করতাম, তোর বৌদি যদি একটা করতে পারত তাহলে আর ভাবতাম না।'

শরৎচন্দ্র হরিশের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, তবু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সে ঈশ্বরেরই দান। নির্মলার সন্দেহ বাতিক হলেও সে তো নিজে চরিত্রদোষ ঘটায় নি। এ যুগে এ গল্প কেউ লিখলে লেখক বাহবা পেত না, কারণ হরিশের স্বামী চরিত্রটি কোন ক্রমেই ক্ষমার যোগ্য নয়। অত ভাল মানুষের দরকার কি বাপু? দেশে কি নারীর মরুভূমি লেগেছে? মাঝে মাঝে হরিশের মধ্যে বিদ্রোহের বহ্নি দেখা গেছে। মিথ্যে বলে পার পাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু লেখকের হাতে ছিল শেষ পরিণতি। যা কিছুই ঘটুক, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ তিনি অটুট রাখবেন।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অটুট থাকুক এ সমাজের মঙ্গল কিন্তু এ যুগে কি সেই সম্বন্ধ অটুট থাকে? সাহিত্যে হয়ত জোড়াতালি দিয়ে মাঝে মাঝে মিলন টানা হয় কিন্তু সে কি সামাজিক জীবনে ঘটে?

বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ নেই বটে। বিধবা হলেও যদি স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, সে নিঃসঙ্কোচে একজনকে গ্রহণ করতে পারে। আত্মীয় স্বজনরা একটু মনঃক্ষুন্ন হয় বটে কিন্তু তারপর মেনে নেয়। আগের মত সামাজিক বাধা আর কণ্ঠ রোধ করে না।

পথনির্দেশের হেমনলিনীর কথা এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেয়।" বিধবা বিবাহ শরৎচন্দ্র পছন্দ করেন নি, তার সম্ভাব্য কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সে কারণ ছাড়া শরৎচন্দ্র নিজেও উদার মনের পরিচয় দিলেও আসলে মনে মনে তিনি হিন্দু সংস্কারকেই মেনে চলেছেন। এই কারণে হেমনলিনী হিন্দুর মেয়ে হয়ে ব্রাহ্ম সন্তানকে ভাল বেসেছিল। ভালবাসা অন্যায় নয়। জাত-কুল-মান দেখে তো কেউ ভালবাসে না। কাকে যে কখন কার ভাল লেগে যায় সে দেবা ন জানন্তি। অর্থাৎ ঈশ্বরও তা জানেন না। অনেক কুরূপাকে অনেকের ভাল লাগে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে 'ওর কণ্ঠটি ভারী সুন্দর, আমার ভেতরে ওর কণ্ঠের মিষ্টি স্বরটি বাজে।' কবি হলে হয়ত সে আরও কাব্য করে বলত, 'আমার যে মানসী প্রিয়া তার রূপ আমায় মোহিত করে না, আমি এমনি একটি কণ্ঠের অধিশ্বরীকে চেয়েছিলাম। আমার মায়ের কণ্ঠ তো এমন ছিল।' এই ভাবেই হয়ত গুণেন্দ্রের সঙ্গে হেমনলিনীর প্রেম হয়েছিল কিন্তু জাতের দোহাই, বড় দোহাই, তাদের মিলন হল না। হেমনলিনীর মা একটি

দোজবর দেখে হেমনলিনীর বিয়ে দিলেন। এক বৎসরের মধ্যে হেমনলিনী বিধবা হয়ে ফিরে এল। এবার শরৎচন্দ্র বিধবার প্রেম দেখাতে শুরু করলেন। হেম তো বিয়ে করতে চায় নি। কিন্তু সমাজের নিয়মে সে বিয়ে আটকায় কে? কিন্তু তাই বলে সমাজের নিয়মে তো ভালবাসা যায় না। যে ভালবাসা সমস্ত সমাজ সংসারের সব নিয়মের উর্দ্ধে, হেমনলিনী সেই ভালবাসায় অটল রইল। শুধু গুনেন্দ্র একটু পালটে গেল। সে তো আগের মত আর হেমনলিনীর সঙ্গে প্রেম করতে পারে না। ব্রাহ্ম গুণেন্দ্রও হেমনলিনীর সমাজ ব্যবস্থার প্রশ্ন তুলল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'হেম তুমি একদিনের জন্যেও কি স্বামীকে ভাল বাসনি?' হেমের স্পষ্ট উত্তর, 'না'। 'কিন্তু হিন্দুর নারীর একবার বিয়ে হয়ে গেলে তার স্বামীকেই ভালবাসা উচিত। এবং বিধবা হবার পর স্বামীর নাম ধ্যান করেই সারাজীবন কাটানো উচিত। না করলে তাকে হিন্দু ধর্মে পতিতা বলা হয়।'

গুণেন্দ্র এ কথাও তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল কিন্তু হেমনলিনীর মনের কথা গুণেন্দ্র জানবে কেমন করে? হেমনলিনী কিন্তু দ্বিচারিনী নয়। তার ধ্যান জ্ঞান একজন ছিল। সে গুণেন্দ্র। শরৎচন্দ্র হেমনলিনীর মধ্যে যে প্রেমের সঞ্চার করেছেন এই ধরণের প্রেম খুব বড় একটা দেখা যায় না। পার্বতীও দেবদাসকে এমনি ভাল বেসেছিল, তাই মনোকে বলতে তার বাঁধে নি, 'মনো আমার জিনিস আমি নিয়ে যাব, তাতে লজ্জার কি?'

হিন্দু রমণী বিধবা হয়ে কৃচ্ছ সাধনের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন না করে এ কি সে বিরুদ্ধ আচরণ প্রকাশ করে? স্বামীর মৃত্যুর পর সে বৈধব্য জীবন যাপন না করে সে গুণেন্দ্রকে চায়? সে কথার উত্তরে আত্ম পক্ষ সমর্থন করে হেম বলেছিল, 'আমাকে তোমরা জোর করে বিয়ে দিয়েছিলে, আমি তো এ বিয়ে চাই নি। আমি সতীলক্ষ্মীই আছি, আমি যাকে স্বামী মনে করি, মরণকালে আমি তার কাছে যাচ্ছি এই মনে করব।' হেমনলিনী যেভাবে চিন্তাটা করে নিয়েছিল, কার্য ক্ষেত্রে তা হল না, হেমকে বিধবা বলে সকলে ত্যাগ করতে চাইল। তার মা বলল, 'আমি তোকে নষ্ট করলাম'। হেমনলিনীর বহির্জগত যখন তাকে নিল না, সে বিধবার নিয়ম পালনে মন দিল। মন্ত্রজপ, স্বামীকে মনে রেখে ঈশ্বরের চিন্তা করা। গুণেন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি মন্ত্রজপের মধ্যে নিজের সিদ্ধির পথ খুঁজে পাচ্ছ?' হেমনলিনী মাথা নেড়ে বলল, 'কিছুই পাচ্ছি না। সব সময়ে তোমার কথাই মনে আসে।' গুণেন্দ্র এই উত্তর শুনে খুশি হল না। হেমনলিনী যে স্বামীকে কোনদিনও স্বামী বলে গ্রহণ করে নি, তারই ভিটেয় গিয়ে বিধবা

রমনীর যা কর্তব্য সেই করতে লাগল। কিন্তু হেমের মন যখন গুণেন্দ্রকে ছাড়া ভাবে না, সেই আনুষ্ঠানিক বিবাহিত জীবনে স্বামী কি তার আপন হবে? হিন্দু রমণী হোক, আর ব্রাহ্ম রমণীই হোক, সমাজ যে মনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে না, হেমনলিনীর চরিত্রই তার প্রমাণ। যুগে যুগে নারীমন আলোচিত হয়ে আসছে, ভালবাসা কোন বাধাই মানে না। সেখানে লোক-লজ্জা, ভয়, সমাজের অনুশাসন সবই লয় হয়ে যায়। গৃহদাহতে শরৎচন্দ্র অচলার মধ্যে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, একটি শিক্ষিত মেয়ের মানসিকতা। তাকে ব্রাহ্ম করেছিলেন এইজন্যে যে ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক অনুশাসনগুলি খুব রূঢ় নয়। অচলা কত সহজে বিবাহিত স্বামীকে ভুলে সুরেশের ওপর নির্ভর করতে পারল।

অচলার মত আজকের আধুনিক নারীরা তার মত ভাবনাকেই আমল দেয়। স্বামী যদি আমাকে সুখী না করে, স্বামীর মন যদি অন্যত্র বাধা পড়ে, তবে আমি কেন সতীর ভূমিকা নেব? এ যুগে সতী হবার জন্যে মেয়েদের অত মাথা ব্যথা নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা নিক্তির ওজনে বিচার হয়, কে কতখানি পাল্লায় ভারী। এই মানসিকতাই দেখা গিয়েছিল অচলার মধ্যে।

অচলার দেহ নিয়ে সুরেশ কি খুব খুশি হয়েছিল? শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, অচলা দেহ দিয়েও খুশি হয় নি। মেয়েরা কখন দেহ দেয়? আমরা বিচার করে দেখতে পাই, মেয়েরা স্বইচ্ছায় যখন দেহ দেয়, তখন সে তার প্রেমাস্পদকে পূর্ণ মন দান করে। আবার এও দেখা যায়, কোন এক অসহ মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটে যায়। নারী অধোবদনে চুপ করে থেকে তারপর মুখ তুলে প্রশ্ন করে, 'এ তুমি কি করলে? আমি আমার স্বামীর কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে?' এটা যে নিছক আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা, এ আর কাউকে বলে দিতে হবে না। সামাজিক বিধিনিষেধের কথা ছেড়ে দিলাম, বিবেক নারীকে দংশন করে বলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কিন্তু আসলে নারীও কি এই দুর্ঘটনা ঘটাবার জন্যে নিজে ছলাকলা করে না? নারী নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্টের জন্যে সে তার প্রয়োজনটা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারে না কিন্তু ইঙ্গিত কি সে চলনে, বলনে প্রকাশ করে না? সেই চলন ও বলনই তো নারী ধর্মের দুর্বলতা প্রকাশের আসল হাতিয়ার। যে পুরুষ চালাক, সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয়। যে পুরুষ পারে না, তাকে আবার নারীই ব্যঙ্গ করে বলে, 'তোমার মত বোকা ভূভারতে নেই।'

'কেন কি করেছি ?'

'থাক্ আর ঢাক ঢোল বাজিয়ে জানতে হবে না।' অর্থাৎ নারী বুঝে নিল এবং বুঝিয়ে দিল, এই বোকা পুরুষের দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। নারী কত সহজে পুরুষ চরিত্র বুঝতে পাবে। অচলা যত সহজে সুরেশকে বুঝে ছিল, সুরেশ কি তত সহজে অচলাকে বুঝেছিল ? আবাব অচলা মহিমকে বুঝতে পারে নি, তাই মহিমকে আঘাত দিয়ে দিয়ে তার পাথর মনে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল কিন্তু তাতে অচলাই হেরে গেল। তার পরিণতি পাঠক জানেন।

আমরা অচলা চরিত্রের জন্যে কি শোক কবব ? না। কারণ শরৎচন্দ্র পরিণত বয়েসে অচলা চবিত্র যে এঁকেছেন, আজকের আধুনিক নারীসমাজকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, 'ওহে নারীসমাজ, যতই তুমি নিজের প্রয়োজনে অন্যকে আঘাত কর, অতিরিক্ত চাহিদা থাকলেই নিজের পবিণাম নিজেই সৃষ্টি করে নেবে।' শরৎচন্দ্র দূরদর্শী সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন উপন্যাসই সৃষ্টি কবেন নি। আগে ও পরেব সমস্ত নর-নারীর মানসিক গঠন তুলনা করে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। পডার জন্যে পড়া নয়, পড়তে পডতে তলিয়ে ভাবলেই দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের মনের হুবহু ছবি। সেই ছবিই বলে দেবে মানুষেব মনের কথা। হেমনলিনীর ভালবাসা দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন, সমাজ এই ভালবাসাকে আঘাত হানতে পারবে কিন্তু তাকে টলাতে পারবে না। গুণেন্দ্র হেমনলিনীকে অবজ্ঞা করেও তো তারপর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। 'চল আমরা কাশী গিয়ে বাকী জীবন কাটাই।' হেমনলিনীর পথনির্দেশ মনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে তো টলাতে পাবে নি ?

শরৎচন্দ্র নারীচরিত্র সৃষ্টিতে অজেয় ও অমব ছিলেন। আমরা একালের লেখক হয়ে যে খণ্ড চিত্র সৃষ্টি করি, তাব মধ্যে গভীরত্ব অভাবে আমাদের গল্পের গুরুত্ব পাঠকের মনে রেখাপাত করে না। কেন ? তার কারণ আমরা বাইরেব চোখ দিয়ে মানুষকে বিচার করার চেষ্টা করি। গভীরত্ব কোথায় ? নারীর বাইরের চটকে সব ধরা পডে না। একটি মেয়ের সঙ্গে মিশে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করে ফেলি। সে যা নয় তা লিখে সাফাই জানিয়ে বলি, 'খুব ফার্স্ট ক্লাস উপন্যাস লিখেছি। এ যুগে এ চরিত্র বিরল।' হয়ত দেখা গেল, মেয়েটির মানসিকতা এক পুরুষে খুশি নয়। সে নিত্যনতুন পুরুষ সঙ্গী খুঁজে বেড়ায়। সেই পুরুষগুলির সঙ্গে সে যে সব যৌন সংসর্গ করল, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস রচনা

করে ফেললাম। পরিণতিতে নারী এক সময়ে আত্মহত্যা করল। লেখক হিসাবে তারপর জবানীতে লিখলাম, 'মল্লিকা বুঝেছিল, ওর মধ্যে যৌনবিকার তাকে সাংসারিক জীবনে সুখী হতে দেয় নি, তাই নিজেই নিজের জীবন শেষ করল।'

এই যদি আধুনিক উপন্যাসের রূপ হয়, তাহলে পাঠক কি সেই পড়ে তৃপ্তি পাবে? পাঠক তো পড়বে না, পাঠককে পড়াতে হবে। এমন উপন্যাস লিখতে হবে, যা তর তর করে পড়ার আনন্দে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু শেষের পর মনের মধ্যে একটা ছাপ সৃষ্টি হবে, এবং চরিত্র যা ফুটবে পাঠককে সেই চরিত্রের কথা ভাবিয়ে তুলবে। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস এমন অন্তঃসারশূন্য পথে এগোচ্ছে যে না আছে ঘটনার গভীরত্ব, না আছে চরিত্রের সুচিন্তিত অভিমত। হয়ত এসব কথা বলার জন্যে অনেকে এই লেখককেও তার মধ্যে টেনে আনবেন। আমি তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত হব না।

শরৎচন্দ্র বারবনিতা ভবনে গেছেন। অসামাজিক মেয়েদের সঙ্গে মিশেছেন। মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, তামাক সব নেশাই করেছেন কিন্তু তার বিপরীতে কি করেছেন? কাঁচ ফেলে হীরা তুলে নিয়েছেন। শুভদার স্বামী হারাণ গাঁজা খেত। বারবনিতালয়ে যেত। সংসার দেখত না। প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলতে সে ছাড়ত না। শুভদা সব জেনেও তাকে ক্ষমা করেছেন কারণ সে স্বামী বলে। শরৎচন্দ্র যখন এ উপন্যাস লিখেছেন, তখন হারাণের মতই চরিত্র ছিল তাঁর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র যে বয়েসে এসব করেছিলেন, তিনি লেখার জন্যে এসব করতে গিয়েছিলেন। আমাদের সাহিত্যিকরা এসব জায়গায় যান না, গেলেও তারা সুবোধ বালকের ভূমিকা প্রমাণ করতে চান।

কিন্তু তার পরিণতি কি দাঁড়ায়? ঐ আনন্দ স্ফূর্তিটাই মূলধন হয়। সাহিত্যিকের আসল উপকার কিছু হয় না। সৃষ্টি গুমরে গুমরে বারবনিতার দেহ ব্যবসার মত প্রাঞ্জল আকার ধারণ করে। মদ খাওয়া খারাপ নয়, মাতাল হওয়া খারাপ। মদ যত না খাই, মাতালের ভূমিকা করি তত। আর ইন্‌টেলেকচুয়ালের সাফাই গেয়ে অপরকে নস্যাৎ করতে পারলেই বঙ্গসাহিত্যে একজন নামজাদার নাম পাওয়া যায়।

আজ শতবর্ষের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এসব কথা বহু কষ্টে বেদনার সঙ্গে এসে গেল। শরৎচন্দ্র কি বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করে বাঙালী লেখককে বলে গেছেন, আমি যা লিখে গেলাম, তোমরা এই নিয়ে মজে থাকো। পাঠককে আর কিছু দেবার থাকল না।

অনেক দুঃখের সঙ্গে এসব কথা এসে যায়। গোষ্ঠীবিহীন লেখক কলকে পায় না। অনেক মহৎ মহৎ রচনা প্রকাশ ও প্রচারের অভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারে না। শরৎচন্দ্রও এই কষ্ট পেয়েছেন, তাঁর চিঠিপত্তর পড়ে আমরা তাঁর বহু মান-অভিমানের কথা জানতে পারি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশ হয়, বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য তাঁর লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি চরিত্রহীনের সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই লেখার অভিমত শুনে তিনি কিরকম ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, চিঠিপত্তরের প্রতিটি ছত্রই তার প্রমাণ। তিনি ঝি, বিধবা, বেশ্যা নিয়ে ছাড়া উপন্যাস লিখতে পারেন না। এই সব লেখা ভারতবর্ষের মত রক্ষণশীল পত্রিকায় প্রকাশ হলে পাঠক সমাদর পাবে না। শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'তোমরা জলধর সেন নামক লেখকদের লেখা নিয়েই পত্রিকা বের কর। তোমরা টলষ্টয়ের 'রেজাকরেসান' উপন্যাস পড়নি, তাই আমার লেখা নিয়ে এমন মন্তব্য করেছ। আমি তো সুনীতিমূলক উপন্যাস লিখিতে পারব না, আচ্ছা চরিত্রহীনের বদলে যদি অন্যরকম কিছু চাও তাও জানাবে। যদি আমাকে হুকুম দাও তো ঐ সঙ্গে দুটো লালকালিতে ছাপা তন্ত্রটন্ত্র পাঠাবে, বিশেষ আবশ্যক। ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এবং লিখে জানাবে কতগুলো সন্ন্যাসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্যে কিরকম বীরত্ব করবে তারও একটু আভাস দিয়ে দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কিনা তাও জানাবে।'

এসব কথাগুলি শরৎচন্দ্র অনেক দুঃখে বন্ধুকে লিখেছিলেন। এতেই প্রমাণিত হয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গেলে কত ঝড় ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। শরৎচন্দ্র কখনও কারুর সঙ্গে Compromise করেন নি। করেন নি বলেই আজ তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী। তবে তাঁর মধ্যে যে Perfection এসেছিল কজনের মধ্যে তা দেখা যায়? প্রমথ ভট্টাচার্যকে এক সময়ে লিখছেন, 'ভাই প্রমথ, তোমাদের ওদিকে একটা একশ টাকা মাইনের চাকরী যোগাড় করে দিতে পার না? এই একশ টাকার জন্যে আমাকে এই বিদেশে পড়ে থাকতে হচ্ছে।'

জীবনকে দেখতে গেলে যে জীবন দিয়ে সেটা উপলব্ধি করতে হয়, শরৎচন্দ্রের জীবনই তার প্রমাণ। তাই তাঁর রচনার প্রতিটি চরিত্রই এমন নিখুঁত ও শিল্পসম্মত। তিনি নিজে যে কত কষ্ট করেছেন, তাঁর বাল্য, কৈশোরের অবস্থাতেই আমরা দেখেছি। তিনি কাউকে দেখে তাঁর জীবনের গতি চালনা করেন নি। তাঁর

মনে হত, সহজ, সাধারণভাবে জীবন চালালে লেখার রসদ জুটবে না। লেখার মধ্যে বৈচিত্র্য দরকার। ইদানীংকালের লেখকের মধ্যে সে বৈচিত্র্য কোথায়? মাঠে, ঘাটে, শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, বাজারে, শুঁড়িখানায়, বারাঙ্গনালয়ে না গেলে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ডানলোপিলো কুশনের ওপর বসে রেশমী চাদর গলায় জড়িয়ে সোনার পেনে লিখলেই কি লেখা হয়? সে লেখা নিজের পয়সায় ছাপিয়ে ড্রইংরুমে অভ্যাগতদের মধ্যে বিলি করা যায়, তাতে জাত সাহিত্যিকের জীবন ভাবনা প্রতিফলিত হয় না।

শরৎচন্দ্রের মত অভিজ্ঞতার ঝুলি দরকার। জীবনধর্মীলেখক আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত সাধারণ জীবন যাপন করবে না। তাহলে লিখবে কি? স্ত্রীর সঙ্গে দশ বছরের সহবাসের কাহিনী, না মেয়ের স্কুলের দিদিমনির থুতনিতে একটি তিল আছে তার কাহিনী? অনেকের কাছ থেকে শোনা যায়, 'কি লিখব? লেখবার আর কিছু নেই। একটা মেয়েব সঙ্গে একটা ছেলের লদকালদকির কাহিনী বড় পুরোনো হয়ে গেছে। ওতে আর মন ভরে না।' এইসব লেখককে সবিনয়ে এই কথাটিই বলতে হয়, 'ওহে বঙ্গভাষার লেখক, জীবন পরিত্যাগপূর্বক কোন বেসরকারী অফিসের কারনিক হয়ে জীবনটা চালিয়ে দাও।'

শরৎচন্দ্র তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাস বই আকারে প্রকাশ করেছিলেন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁর এই উপন্যাসের পরিকল্পনা আরও দশ বছর আগে হয়েছিল। একবার ব্রহ্মদেশে কাঠের বাড়ীতে আগুন লেগে তাঁর পাণ্ডুলিপি পুড়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি আবার নতুন করে লিখতে শুরু করেন। তখনই যে কিরণময়ীর চরিত্র তিনি ভেবেছিলেন, আজ এই ছিয়াত্তর সালে বসে আমরা কত কিরণময়ীকে দেখি?

একটা গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। ঠিক গল্প নয়, সত্য ঘটনা। শুধু নাম ধাম গোপন করতে হবে। না হলে মানহানির মামলার দায়ে পড়ব। শুধু এ যুগেও কিরণময়ীর মত চরিত্র বিরল নয়, সেটাই বলার চেষ্টা।

এ শহরেরই কোন এক অঞ্চলে তিনি বাস করেন। কুমারী জীবনে বাপ-মার সংসারে খুবই কষ্টের মধ্যে কাটাতেন। এইজন্যে পড়াশুনাও বেশিদূর এগোয়নি। মনটি ছিল খুবই দরদী। পরের জন্যে তাঁর মন কেঁদে উঠত। পরের উপকার করার জন্যে ব্যাকুল হতেন। বাড়ীর ছোট ছোট বোনেরাও দিদি বলতে অজ্ঞান। দিদির কথা ছাড়া বাড়ীর কোন কাজই চলত না। দিদিও বাড়ীর জন্যে কাতর। সংসারে আয়ের সংস্থান স্বল্প বলে পড়ার টিউশনি ও গানের টিউশনি করে

সংসারের আয় বাড়াতেন। ছেলেবন্ধুও ছিল অগুনতি। ছেলেরা এই মঞ্জুলিকার ব্যবহারে এত খুশি হত যে মেশবার জন্যে পাগল হত। কিন্তু মঞ্জুলিকার একটা দোষ ছিল, তিনি সবার সঙ্গে প্রেম করতেন। মিষ্টি মিষ্টি কথা, হাতে হাত রাখা, যত্রতত্র ঘুরলে যেতেন। দেখতে ভাল নয় বলে ব্যবহারে পুষিয়ে দিতেন। কিন্তু ছেলেবন্ধুরা জানতে পারল, মঞ্জুলিকা সবার সঙ্গেই প্রেম করে। প্রেম তাঁর একটা খেলা। ছেলেবন্ধুরাও সরে পড়তে লাগল। কিন্তু তাদের দেখা গেল তাঁর বোনেদের সঙ্গে প্রেম করতে। এবং এক এক করে দুটি বোনের সঙ্গে দুজনের বিয়েও হয়ে গেল।

মঞ্জুলিকার চিত্ত চঞ্চল হল। তাঁর সেই দরদী মনটা বন্ধ হল। চোখের সামনে দুই বোনের বিয়ে হয়ে যেতে আর কান্না ধরে রাখতে পারলেন না। বিয়ে করতে হবে এমনি এক ধ্রুব প্রতিজ্ঞা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। হঠাৎ আকস্মিকভাবে এক এয়ারফোর্সের অফিসারেব সঙ্গে আলাপ হল। লম্বা চওড়া, দেখতে সুন্দর, ইংরিজী, বাংলা, হিন্দী সুললিত ভঙ্গিতে অনর্গল বলে যেতে পারতেন। এটাই তাঁর এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন। মঞ্জুলিকা তার প্রেমে পড়লেন। বিয়ের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপন লাহিড়ীও রাজী হলেন।

মঞ্জুলিকা ভাবলেন, তিনি সবচেয়ে বেশি জিতে নিলেন। বোনেরা যাদের বিয়ে করেছিল, তারা পাত্র হিসাবে সন্দীপন লাহিড়ীর মত নয়। কিন্তু অন্তর্য্যামী তখনই বোধ হয় হেসেছিলেন। দু'বছরও কাটল না, সন্দীপন লাহিড়ীর আসল গুণগুলি ধরা পড়ে গেল। এর মধ্যে মঞ্জুলিকা পড়াশুনা করে অনেকগুলি ডিগ্রি নিয়ে নিয়েছিলেন। একটা স্কুলে চাকরীও পেয়ে গেলেন। এই সময়ে একদিন একটি চিঠি তাঁর নামে এল। চিঠিতে লেখা, 'তুমি যাকে সন্দীপন বলে বিয়ে করেছ, তার নাম আসলে নিরাপদ। তার আরও দুটি বউ আছে, এবং তাদের গর্ভে অনেকগুলি সন্তান হয়েছে। নিরাপদ তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয় না।' মঞ্জুলিকা চিঠির কথা উল্লেখ না করে সন্দীপনকে গিয়ে সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আরও দুটো বউ আছে?'

সন্দীপন হেসে উঠলেন, 'বউ, কে তোমায় এসব কথা বললো?'

'নেই?' মঞ্জুলিকা সন্দীপনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সন্দীপন অভিনয়ে যে ওস্তাদ সেটা দেখা গেল, অদ্ভুতভাবে ম্যানেজ করে তাড়াতাড়ি হেসে বললেন, 'নাও নাও পড়তে বসো। ইংরিজী নিয়ে এম. এ. টা দিতে হবে না!'

বলাবাহুল্য মঞ্জুলিকা এম. এও পাশ করলেন। সন্দীপন মঞ্জুলিকাকে একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলও কিনে দিলেন। একজন সাহেব বিক্রী করে দেশে যাচ্ছিল, সেটা স্ত্রীর নামে কিনে ফেললেন। মঞ্জুলিকার মন খানিকটা ঘুষ পেয়ে শান্ত হল। চিঠির কথা বেমালুম ভুলেও গেলেন। মনে মনে এই ভাবলেন, 'বোধ হয় কেউ তাঁর সুখে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবার জন্যে উড়ো চিঠি দিয়েছে।' কিন্তু সন্দেহ একবার ঢুকলে তো সেটা সহজে যায় না। সন্দীপনের একটা স্বভাব ছিল, যুবতী মেয়ে দেখলেই তাঁর চিত্ত চঞ্চল হত। আর কি আশ্চর্য, মেয়েরাও তার কাছে এসে জড়ো হত। মঞ্জুলিকার এটা ভাল লাগত না। কিন্তু কি করবেন নির্বিবাদে সহ্য করে যেতেন।

সেদিন মঞ্জুলিকা স্কুল থেকে ফিরে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন, ঘরের মধ্যে একটি বউ সন্দীপনের সঙ্গে খুব ঝগড়া করছে। 'তুমি এই যে তিন তিনটে বিয়ে করেছ, এদের ভরণ পোষণ কে করবে?'

সন্দীপন জবাব দিচ্ছেন না।

বৌটি রেগে গেল, বলল, 'কি জবাব দিচ্ছনা কেন? আমি উত্তরের জন্যে এসেছি। আমার কপাল নয় ভেঙেছে। কিন্তু দু'দুটো ছেলেমেয়ে কি দোষ করেছে? তুমি কি পাষাণ? এই দশবছর একবারও খোঁজ নিলে না?'

হঠাৎ মঞ্জুলিকাকে দেখতে পেয়ে সন্দীপন আর থাকতে পারলেন না। রেগে বললেন, 'কি সব আবোল তাবোল বকছ? টাকাপয়সার কোন সাহায্য আমি করতে পারব না।'

'সাহায্য?' বৌটিও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল। 'তুমি সাহায্য কাকে করবে? নিজের ছেলে বৌকে খাওয়ানো কি সাহায্য? বেশ আমি নয় তোমার পর। লক্ষ্মী কি দোষ করেছিল? সে তো একটা ছেলে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।'

লক্ষ্মী সন্দীপনের দ্বিতীয় বউ। মঞ্জুলিকা এতক্ষণ শুনছিলেন। তাঁর ভেতরটা কি অবস্থা হচ্ছিল একমাত্র অন্তর্যামী ভিন্ন কেউ জানেনা। অনেক পরে তিনি শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'আপনার মাসে কত টাকা হলে চলে?'

বিনিতা এতক্ষণ মঞ্জুলিকাকে দেখতে পায়নি, হঠাৎ দেখতে পেয়ে বলল, 'তুমি দেবে নাকি?'

'দেব। বলুন কতটাকা মাসে আপনার দরকার?'

'আমার বেশি দাবী নেই। শ' দুয়েক করে পেলে চলে যাবে।'

'আচ্ছা যান পেয়ে যাবেন।'

সন্দীপন কিছু বলতে গেলেন কিন্তু মঞ্জুলিকা বলতে দিলেন না। বিনিতা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'লক্ষ্মীর কি হবে?'

সন্দীপন রেগে গিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মীর কথা লক্ষ্মী ভাববে? তুমি ভাগ তো।' মঞ্জুলিকা তাতেও বললেন, 'লক্ষ্মীর কত টাকা লাগবে?'

'ওর তো খরচ বেশি নয়, একশ টাকা হলেই চলে যাবে।'

'ঠিক আছে আপনি যান। লক্ষ্মীকেও একশ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' বিনিতা চলে গেলে সন্দীপন কিছু বলতে গেলেন কিন্তু মঞ্জুলিকা কপাল টিপতে টিপতে ভেতর ঘরে চলে গেলেন। ওঁর আর কিছু ভাল লাগছিল না। চোখে জলও এসে পড়েছিল।

এর কিছুকাল পরের ঘটনা। মঞ্জুলিকা বেড়াতে গিয়েছিলেন শিলং। ফেরার পথে নরেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে তঁর আলাপ হল। অল্প বয়সী ছেলে। মঞ্জুলিকার সমান বয়সী, কিম্বা তাঁর চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোট। সে মঞ্জুলিকার বাড়ীতেও আসতে লাগল। ঘন ঘন আসাতে আর মঞ্জুলিকার মনোভিপ্রায় জেনে সন্দীপন মনে মনে ক্ষিপ্ত হলেন কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল। সন্দীপন বাইরে থেকে ফিরে ঘরে এসে দেখলেন, নরেশ ও মঞ্জুলিকা এমন এক ঘনিষ্ঠ অবস্থায় বসে আছে যে কেউ সহ্য করতে পারবে না। উলটে মঞ্জুলিকা সন্দীপনের উপস্থিতি জেনে নরেশকে আদো আদো কণ্ঠে বলছেন, 'এই নরেশ আজ রাত্রিটা থেকে যাও না?'

নরেশ সন্দীপনকে দেখে আর কথা বলতে পারল না। 'আমি আজ যাচ্ছি বলে দৌড় লাগাল।'

একদিন নয় এমনি অবস্থা দিনের পর দিন ধরে চলতে লাগল। সন্দীপন সবই বুঝতে পাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। একদিন মঞ্জুলিকার অনুপস্থিতিতে নরেশ এসে হাজির। সন্দীপন যেন এমনি একটি সুযোগই খুঁজছিলেন। বললেন, 'কি চান?' নরেশ জবাব দিতে পারল না। সন্দীপন বললেন, 'মঞ্জুলিকা আমার স্ত্রী, সে কি ভুলে গেছেন? আর কখনও আমার বাড়ীতে যেন আপনাকে না দেখি।'

নরেশ চলে যাচ্ছিল। সন্দীপন আবার তাকে দাঁড় করালেন 'যদি দেখি তাহলে কি করব জানেন?'

কি ?

ঠ্যাং দুটো ভেঙে দেব।'

দু'তিনদিন পরে মঞ্জুলিকা উগ্রমূর্তিতে বাইরে থেকে ফিরে বললেন, 'তুমি নরেশকে কি বলেছ ?'

সন্দীপন কথার জবাব দিলেন না। একমনে বই পড়তে লাগলেন।

'উত্তর দেবে তো!'

'বলেছি।' সন্দীপন অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন।

'কি বলেছ ?'

'যা বলবার বলেছি।'

'ঠ্যাং ভেঙে দেবার কথা বলেছ ?'

সন্দীপন চুপ করে রইলেন। 'ঠ্যাং তো তোমারই ভেঙে দেওয়া উচিত।' বলতে বলতে মঞ্জুলিকা চলে যেতে উদ্যত হল। সন্দীপনও উঠে দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। মঞ্জুলিকার সামনে গিয়ে মুখের সামনে মুখ নিয়ে বললেন, 'আমার ঠ্যাং ভেঙে দেবে, এতো বড় স্পর্দ্ধা!'

'হ্যাঁ দেওয়া উচিত। জানো না তুমি ?'

'কি ?'

'আমায় তুমি ঠকাওনি ? তিনটে বিয়ে কে করেছে ?' ঠাস্ করে মঞ্জুলিকার গালে চড় মারল।

'তুমি আমায় মারলে ?'

'বেশ করেছি।'

এই শেষ নয়। নরেশও আসে। মঞ্জুলিকাও মার খায়। একদিন এমন মার খেলেন মঞ্জুলিকা, অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত মঞ্জুলিকার জ্ঞানই ফিরল না। মঞ্জুলিকা একদিন বলল, 'আমাদের এভাবে চলতে পারে না। আমি অন্যত্র থাকব।'

সন্দীপন বললেন, 'নিশ্চয় ঐ নরেশকে নিয়ে ?'

মঞ্জুলিকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তাই।'

'তাহলে ঘনিষ্ঠতা বেশ পেকে উঠেছে!'

মঞ্জুলিকা আলাদা বাসা করলেন। স্বভাবত নরেশও সেই বাসায় এসে উঠল। সন্দীপন অন্যত্র চলে গেলেন। নরেশ একটা বেসরকারী অফিসে চাকরী করত। মঞ্জুলিকা তাকে স্কুল দেখাশুনার ভার দিলেন।

আগেই বলেছি, নরেশের বয়স মঞ্জুলিকার চেয়ে কম। মঞ্জুলিকা নরেশের ওপর কর্তৃত্ব করেন। মাঝে মাঝে বলেনও, 'তোমাকে আমি জীবন দিয়েছি মনে রাখবে।' আর নরেশ দেখে, সে এক ডাকিনীর পাল্লায় পড়েছে। নরেশের তরুণ মন, সে প্রথমে মঞ্জুলিকার সঙ্গদানে একটু পুলক অনুভব করেছিল কিন্তু সেই পুলক এখন বিষের মত লাগে। আর ঐ মঞ্জুলিকার আদিম প্রবৃত্তি যেন পশুর মত মনে হয়।

নরেশ অন্যত্র মন দেবার চেষ্টা করে কিন্তু মঞ্জুলিকা শাসায়, 'আমার খপ্পর থেকে তুমি সরে যাবার চেষ্টা করো না। প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না।' নরেশ হতভম্ব হয়। কি করবে ভেবে পায় না।

পল্লীর বন্ধুবান্ধবরা নরেশকে পালিয়ে যেতে বলে। কিন্তু নরেশের সাহস হয় না। সে কপালে করাঘাত করে বলে, 'আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে।'

এই হচ্ছে মঞ্জুলিকার কাহিনী। এখন এই কাহিনীটি নিয়ে যদি কোন লেখককে বলা হয়, উপন্যাস লিখুন। তিনি কি লিখবেন?

শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর ব্যর্থ জীবন যে দেখিয়েছিলেন, সে জীবনেরও যেমন যুক্তি আছে, মঞ্জুলিকার জীবনেরও যুক্তি আছে। কিরণময়ী স্বামীর ভালবাসা পায় নি, সেইজন্যে ভালবাসার কাঙাল ছিল। উপেন্দ্রকে ভালবাসতে গেল কিন্তু উপেন্দ্র ভালবাসা নিল না। সেই রাগে তার ছোট ভাই যে কিরণময়ীর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট তাকে নিয়ে আরাকানে পালাল। কিরণময়ী প্রথমে তাকে নষ্ট করতে চেয়েছিল কিন্তু তার অপরিণত মন দেখে বিবেকে বাঁধল। তারপর দেখা গেল, দিবাকর নিজেই কিরণময়ীর দেহ আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু কিরণময়ীর মন তখন শান্ত হয়েছে, সেই বিবেকই তাকে দিবাকরকে সরিয়ে দিল।

কিরণময়ীর শেষ পরিণতিও আমরা জানি, সে উপেন্দ্রর জন্যেই এক সময়ে পাগল হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্র যখন এই উপন্যাস লিখেছিলেন, তখন তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিরণময়ীর মানসিকতা কেউ সহ্য করে নি। চীৎকার করে উঠেছিল। 'ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ। এ ধরণের লেখা চলবে না। সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে।' শরৎচন্দ্রের হাওড়া বাজে শিবপুরের বাড়ীতে একদল ছেলে গিয়ে তাঁর সামনে চরিত্রহীন পুড়িয়ে দিয়েছিল কারণ এ বই সমাজের মঙ্গল করবে না, অমঙ্গল করবে। ছেলেরা এও বলল, 'এমন লেখা যদি আপনি লেখেন, তাহলে আমরা আপনাকে পাড়া ছাড়া করব।' শরৎচন্দ্র অতি দুঃখের সঙ্গে তাদের বোঝাতে লাগলেন, 'দেখো আমি যে দুটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছি, তারা কোন

অংশে খারাপ নয়। সাবিত্রী বিধবা, যৌবনের তাড়নায় কুল ত্যাগ করেছিল বটে কিন্তু কখনও দেহ কলুষিত করে নি। তাকে আমি আজীবন নিষ্পাপ রেখেছি। সতীশ তার দেহ আকাঙ্ক্ষা করেছিল বটে কিন্তু কখনও দেহ দেয় নি। স্বভাবত পুরুষ চরিত্র যা হয় করেছি কিন্তু সাবিত্রী তো এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করে নি, বরং এমন কতগুলি ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল যা দেখে সতীশ ঘৃণা করে। তোমরা শুধু সাবিত্রীর ওপর ক্ষেপে গেছ, সাবিত্রী কুলত্যাগিনী, সাবিত্রী ঝি, সাবিত্রী যেখানে বাস করত, সে জায়গা ঐ বারাঙ্গনা ভবনের মত। কিন্তু সাবিত্রীকে লোকে খারাপ বললেও সে যে খারাপ নয়, আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি। এমন অনেক দেহবিলাসিনীকেও দেখেছি, তাদের বাঁচবার জন্যে দেহ বিক্রী করতে হয় কিন্তু তাদের মন নিষ্পাপ।' কিন্তু ছেলেরা অত বোঝবার ধার ধারল না। রোষ তেমনিই রাখল। শরৎচন্দ্র আরও বললেন, 'কিরণময়ীকে যে সৃষ্টি করেছি, নারীর এত রূপ কি স্বভাবত দেখা যায়? যে নারীর কিরণময়ীর মত রূপ আছে তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। তার মানসিকতা আর কিরণময়ীর মানসিকতার কত তফাৎ? কিরণময়ী কেন অনঙ্গ ডাক্তারকে ভয় করেছিল? যৌবনের কান্না নিশ্চয় ফেল্‌না নয়। কিরণময়ী যেটুকু অন্যায় করেছিল, 'তার স্বপক্ষে কি যুক্তি খাড়া করি নি?' ছেলেরা বলল, 'ঐ যুক্তিতে চলবে না। আমরা আমাদের ঘরের মধ্যে ঐ সব খেলা চলতে দেব না।' শরৎচন্দ্র হাসলেন, বললেন, 'আপনারা কি তাদের মেরে ঠাণ্ডা করে দেবেন?' উত্তর, 'হ্যাঁ, দরকার হলে তাই করব।' শরৎচন্দ্র তার জবাব দিলেন না। আপন মনেই বলে চললেন, 'মারলেই যে ঠাণ্ডা হয় না এ কথা আপনারা হয়ত বুঝবেন না। নারী পুরুষের যৌবন একই স্রোতে বয়। পুরুষ যেমন যৌবনের তাড়নায় নারীকে কামনা করে, নারীও তাই। তবে নারীর জন্যে আমরা কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করেছি। নারী সেই বিধিনিষেধ মেনেও চলে। কিরণময়ীও মেনে চলতে চেয়েছিল। কিরণময়ী স্ব মুখে বলেছে, 'আমি সুরবালাকে দেখে পতিপ্রেম শিখি কিন্তু সে সুযোগ আমার কপালে বেশিদিন স্থায়ী হল না। স্বামী চলে গেল।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'এই যখন কিরণময়ীর মানসিক অবস্থা তখন ও কি করবে? দিবাকরকে বাড়ীতে স্থান দিতে চেয়েছিল, তাকে নিয়ে লীলা করবার জন্যে নয়। ছোট ভাইয়ের মত একজন পুরুষ অভিভাবক থাকুক কিন্তু কিরণময়ীর মানসিকতা দেখে লোকে যেমন খারাপটাই ভাবে, উপেন্দ্রও তাই ভাবল। তাই রাগ স্বাভাবিকভাবে এল।'

শরৎচন্দ্র এমনিভাবে সেই ছেলেগুলির কাছে নিজের সৃষ্ট চরিত্রের আলোচনায়

করেছিলেন। সাফাই গাওয়ার মত বলেছিলেন, 'আমি কিরণময়ীকে তো দিবাকরের মত বয়েসে ছোট একটি তরুণের শয্যাসঙ্গিনী করি নি। সেখানে আমার কলম খুব সংযত ছিল।' আমরা আজ বলব, 'সেদিন কিরণময়ী যদি সেই জাহাজের কেবিনেও দিবাকরকে গ্রহণ করত, কিছুমাত্র অন্যায় হত না।' শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের কালের দিকে তাকিয়ে আর কিরণময়ীর মত চরিত্র দেখে চরিত্রহীন লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই বোধ হয় দেহবিলাসকে ঘৃণা করতেন। কিম্বা সমাজের দিকে তাকিয়ে দেহদানে ভয় পেয়েছিলেন। জাহাজের কেবিনে যখন দিবাকরকে নিয়ে কিরণময়ী এক শয্যায় শুল, দিবাকর সারারাত চমকে চমকে উঠেছিল। কিরণময়ীর একটা হাত তার গায়ে দেখে ভেবেছে, কখন কালনাগিনী তাকে আষ্টেপৃষ্টে ধরে!

এই অংশটি শরৎচন্দ্র কত সাবধানে পার হয়েছেন, সে তাঁর বর্ণনা দেখে বোধ হয়। কিন্তু দিবাকরের সঙ্গে যদি একবার দেহদান ঘটত, ক্ষতিটা কি হত? দুজনেই কি তৃপ্ত হত না? দিবাকরের তারুণ্য প্রথম পাওয়ায় পুলকিত হত, আর কিরণময়ী একটি পরিণত বয়স্ক যুবতী যে কান্নার জন্যে শাস্ত্রের সমস্ত ভারী ভারী উক্তিগুলিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল, সে পুরুষ সঙ্গ পেত। এই দুটি নরনারী সে দিনগুলিতে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছিল, সে কি শরৎচন্দ্র সে যুগের সমাজের দিকে তাকিয়ে কলমকে রোধ করেন নি? অবশ্য পরে সতীশ আরাকানে গিয়ে বৌঠানের সপক্ষে যে রায় দিয়েছিল, সেটাই বা কিভাবে উক্ত হত? সতীশ গর্ব করে বলেছিল, 'আমি বৌঠানকে চিনি। সে কোন খারাপ কাজ করতে পারে না।' সতীশ আরও বলেছিল, 'বৌঠান কেন এটা করেছে আমার জানা আছে।' দিবাকর চমকে উঠেছিল। তারপর বুঝতে পেরে তার মনের সমস্ত বিকার অপসারিত হল।

এই যে চরিত্র চিত্রণ, শরৎচন্দ্র সে যুগে বসে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। নারী-পুরুষের মিলন ঈশ্বরের দান। একজন নারী একজন পুরুষকে চাইলে খারাপ নয়। একজন পুরুষও একটি যুবতী রূপবতী কিম্বা কুরূপা নারীকে আকাঙ্ক্ষা করলে অন্যায় নয়। শুধু কতকগুলি সামাজিক বাধা মেনে চলতে হয়। সেটা সভ্যজগতের রীতি। ফ্রয়েড বলেছেন, 'তিনি সর্বপ্রথম মনের নির্জ্ঞান স্তরের কথা বাইরের জগতের কাছে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে চেতন মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ হয় না। মনের গভীরে রয়েছে নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব। মানুষের

অবদমিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনাগুলি একে আশ্রয় করে থাকে এবং এই নির্জ্ঞান স্তরের স্বরূপ নির্ধারণ না করলে মনের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায় না।' ফ্রয়েডের মতে মন হল গতিশীল (dynamic) জ্ঞানমূলক ক্রিয়াই মনের প্রধান ক্রিয়া নয়, ইচ্ছামূলক (Conative) ক্রিয়াই মনের প্রধান ক্রিয়া। সে কারণে ইচ্ছা, সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, বিরোধ, অবদমন প্রভৃতির মাধ্যমে মন ক্রিয়া করে। ম্যাকডুগালের উদ্দেশ্য সাধনবাদের সঙ্গে ফ্রয়েডের মতবাদের সাদৃশ্য আছে।

এছাড়া ফ্রয়েড মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন, সংজ্ঞান (Conscious) অসংজ্ঞান (Pre-conscious), ও নির্জ্ঞান (unconscious)। যা মনের সংজ্ঞান স্তরে আছে তা সহজেই অসংজ্ঞান স্তরে চলে যেতে পারে, আবার যা অসংজ্ঞান স্তরে আছে তা মনের সংজ্ঞান স্তরে চলে যেতে পারে। বস্তুত, স্মৃতির সাহায্যে আমরা যে সব প্রতিরূপগুলিকে মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তুলি, সেগুলি মনের এই অসংজ্ঞান স্তরেই সঞ্চিত থাকে। নির্জ্ঞান স্তর আমাদের অবদমিত কামনা বাসনার আশ্রয় স্থল। যে সব কামনা বাসনা সমাজ অনুমোদিত পথে স্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ হতে পারে না, সেগুলিই এই নির্জ্ঞান স্তর আশ্রয় করে থাকে। স্মৃতির সাহায্যেই এগুলিকে মনের মধ্যে তুলে ধরা যায় না। প্রশ্ন হল, কেন এবং কি কারণে স্মৃতির সাহায্যে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা যায় না? ফ্রয়েডের মতে আমাদের সব কামনা বাসনা মূলতঃ কামজ। যেহেতু এগুলিকে স্বাভাবিকভাবে পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হয় না সেহেতু এগুলি অবদমিত হয় এবং স্বপ্ন, মানসিক বিকার প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

ফ্রয়েড প্রথমে মনকে দুটি অংশে ভাগ করেছেন, ঈগো (Ego) এবং নির্জ্ঞান (unconscious)। এই ঈগো হল মনের সংজ্ঞান বা চেতন স্তর। এই সংজ্ঞান স্তর সেই সব ইচ্ছাগুলিকে অবদমিত করে, যেগুলি সে গ্রহণ করতে নারাজ, এগুলিকে সে বাধা দিয়ে নির্জ্ঞান স্তরে রেখে দেয়। নির্জ্ঞান স্তরের বিষয়গুলি সংজ্ঞান স্তরে আসার জন্যে সব সময়েই চেষ্টা করে। কিন্তু ঈগো সেগুলির আসার পথে বাধা দান করে। সে কারণে ফ্রয়েডের সংশোধিত মতবাদে দেখা গেল, ঈগো অংশতঃ সজ্ঞান এবং অংশতঃ নির্জ্ঞান। সচেতন বা সজ্ঞান হিসেবে ঈগোর সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ আছে, এটি বাস্তব সূত্র (reality principal) অনুসরণ করে। নির্জ্ঞান হিসেবে এটি স্তরের গভীরে মিশে থাকে, যাকে তিনি বলেছেন ঈদ্ (Id) এবং এটি সুখসূত্র অনুসরণ করে। ঈগোর কাজ

হল এই জগৎ এবং ঈদ্‌-এর মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করা। সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, নোদনা প্রভৃতি নিয়ে ঈদ্ (Id) গঠিত। ঈগোর কাজ হল ঈদের কাছ থেকে প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ে বাস্তব সূত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে তোলা। এ ছাড়া মনের আরও একটি অংশ আছে যাকে বলা হয় সুপার ঈগো (Super ego)। সুপার-ঈগোকে বিবেক বা নীতিবুদ্ধির সঙ্গে এবং ঈগোকে বিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

মন বা ঈগো সংজ্ঞান স্তরে বাস্তব সূত্র অনুসরণ করে সমাজের নৈতিক আদর্শ মেনে চলে। সমাজের প্রভাবের জন্যই সমাজ অনুমোদিত প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির সন্ধান করে না।

এই যে ফ্রয়েডীয় থিওরী, আমরা সমাজের মধ্যে বাস করে সর্বদা তা উপলব্ধি করি। নির্জ্ঞান স্তরেই আমাদের সব সময়ে চলা ফেরা। যা পাব না তার দিকেই ঝোঁক বেশি। কেন পাব না? ঔপন্যাসিক এই কেনর সন্ধানে কতকগুলি নর-নারীর শরীর সৃষ্টি করে তা দেখাবার চেষ্টা করেন। সেখানেও তাঁকে সমাজ মেনে চলতে হয়। সমাজের মানুষকে কতখানি দিলে তা সহ্য করবে, কতখানি দিলে করবে না। শরৎচন্দ্র ১৯১৭ সালে বসে সে কথা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন কিন্তু আমরা আরও ষাট বছর পার করে এগিয়ে এসেছি। সমাজ অনেক উদার হয়েছে, কিরণময়ীর ব্যভিচার সেদিন যেমন সহ্য করে নি, আজ ব্যভিচার শব্দটারই কোন অর্থ নেই। বরং সমাজের মানুষ তৃপ্তির সঙ্গে বলে, 'নিশ্চয় কোন কারণ ছিল, শুধু শুধু তো অমনি একটি সুন্দরী মেয়ে স্বামী-সংসার ছেড়ে একটি বাউণ্ডুলে লোকের সঙ্গে মেশে না।' আজ লেখক সমাজে যৌন স্রোতের বান ডাকিয়ে দিলেও পাঠক হৈ চৈ করে ওঠে না।

এটা হওয়ার কতগুলি কারণ আমরা উপলব্ধি করেছি। সমাজ কেন এত উদার হয়েছে? শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের পর ষাট বছর গত হয়েছে। এই ষাট বছর ধরে ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা এর আগে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, অর্থের জন্যে মানুষ নিজের পত্নীকেও অন্যের শয্যাসঙ্গিনী করতে দ্বিধা করে নি। তখন সমাজ ঘুমিয়েছিল। এক এক সময়ে সমাজের ওপর যখন ঝাপটা আসে, তখন সমাজ ঘুমিয়েই যায়। সে জানে এখন মাথা তুললে নাড়া দিলে, নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন তুললে, মানুষ ছেড়ে কথা বলবে না। সেই সময় মানুষও এমন কাজ করে সমাজের বাধা-নিষেধগুলি ধীরে ধীরে তরল হয়ে যায়। একবার সমাজের

মধ্যে ঘোলা জল ঢুকে পড়লে কি তাকে আর পরে হরিণাম সংকীর্তন করে সরানো যায়? সে শুনবে কেন? সে বলবে আমি তো সমাজের মধ্যে চালু হয়ে গেছি। তখন যদি বলা যায়, ওটা জরুরী অবস্থা ছিল সেইজন্যে চলতে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কাল হাঃ হাঃ করে হেসে বলবে, আর ফেরাতে পারবে না। একবার কোন কিছু চালু হয়ে গেলে কি আর সরানো যায়।

তারপর মন্বন্তর। সেও ঐ হা অন্ন চিন্তা। দলে দলে লোক গ্রাম থেকে শহরে এল। ভাল ভাল পরিবার দুটি অন্নের জন্যে শহরের ফুটপাতে আশ্রয় নিল। দুটি ভাতের জন্যে সুন্দরী যুবতী বৌ চলে গেল চালের আড়তদারের ঘরে। কোঁচড় ভরে চাল নিয়ে এসে যখন স্বামী-পুত্রদের খাওয়াল, কই একবারও তো স্বামী জিজ্ঞাসা করল না, 'ওগো তুমি কি দিয়ে এই চাল যোগাড় করে আনলে?' স্বামীও জানে, স্ত্রীও জানে কিসের বিনিময়ে এই সংগ্রহ? তখন কি সমাজ চোখ রাঙিয়েছিল? এই মন্বন্তরেই দেখা গেছে, কুমারী মেয়ে সাতদিন না খেয়ে যখন আর পারল না, সে তার ছেঁড়া কাপড়ের বাইরে যৌবন দেখিয়ে খাবার ভিক্ষা করেছে। নীতি তাকে লজ্জা দিয়ে ঢেকে রাখে নি, বরং সম্ভ্রমের চেয়ে সে পেটের কথা আগে চিন্তা করেছে। এই শহরের বুকেই কত নারী-পিশাচের দল সেদিন কত অল্প দিয়ে কত ভাল ভাল ঘরের মেয়েদের ভোগ করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্পও মনে আসে। একজন বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে থেকে এই গল্প শোনা। 'ব্লাক আউট। পথ দিয়ে আসছি। রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। মানিকতলার মেসে ফিরতে হবে। সামান্য যা আলো আছে, সেই আলোতে দূরের মানুষ দেখা যায় না। কোন রকমে সন্ত্রস্ত হয়ে পথ চলছি। ফুটপাতগুলি দুর্ভিক্ষ মানুষে ভরে আছে। পথ চলা যায় না। তাই রাস্তাই ধরেছি। পিছনে কালো রঙ লাগানো নিস্প্রভ হেড লাইটের আলো জ্বালিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ী আসছে। হঠাৎ শিয়ালদহর কাছে আসতে ফুটপাতের দিকে তাকিয়ে থমকাতে হল। কিছু চোখে পড়ে না, শুধু কিছু চাপা কথা। 'আগে আমাকে রুটি দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে। চারদিন কিছু খাই নি।' স্বভাবত মেয়েলী গলা। তার উত্তরে বেশ ভরাট গলার একটি লোক বলল, 'রুটি দেব আগে যা চাইছি দে।'

আমি দাঁড়িয়েছিলাম ওদেরই একটু তফাতে কিন্তু আলো বেশি নয় বলে ওরা দেখতে পেল না। চোখ সয়ে যেতে লক্ষ্য পড়ল, একটি কঙ্কালসার যুবতী

রমণী। যৌবন যে ছিল, এখনও সেটা বোঝা যায়। অনাহারক্লিষ্ট রুগ্ন দেহ, ম্লান দৃষ্টি। মুমূর্ষই বলা যাবে তাকে দেখে। শত ছিন্ন একটি ময়লা শাড়ী পরণে, সেটায় না ঢাকা পড়েছে বুক না ঢাকা পড়েছে নিম্নাঙ্গ। যে লোকটি তার ওপর লোলুপ, তার চোখ যেন ঐ গিলছে। মোটা কালো, দোহারা গড়ন, বোধ হয় কোন হোটেলে কাজ করে।

মেয়েটি এক মাথা এলোমেলো চুল ঝাঁকিয়ে মাথা নাড়ল, 'সে হবে নি। আগে দাও।' সে হাত পাতল। শীর্ণ হাতখানি টেনে নিয়ে লোকটি ওর ময়লা হাতের আঙুলগুলিই কচলাতে লাগল। আমার এত রাগ হয়ে গেল যে আমি তখনই ওকে মেরে বসতাম। কি জঘন্য বীভৎস লালসা? দুর্ভিক্ষের সুযোগে এই সব লোকগুলির কি কোনই দয়া-মায়া নেই। কিন্তু সংবরণ করে নিলাম। আবার তাকিয়ে দেখলাম, মেয়েটি হাসছে। হাসিটি এখনও সুন্দর। তবে ভাল অবস্থার সময় যে জেল্লা দিত এখন তা নেই। লোকটি বুঝল, কাজ হয়েছে। মেয়েটি হুগারায় পাশে বসতে বললো।

লোকটি বসলে মেয়েটি আবার হাত পাতল, 'দাও।' লোকটি দু' আনা পয়সা দিল। মেয়েটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'ও নিয়ে কি করব? কিছু পাওয়া যায় কিনতে? এই দেখ না আমারও আঁচলে পয়সা বাধা আছে।' বলে সে আঁচল খুলে দেখাল। তখন লোকটি ঐ রুগ্ন হাড্ডিসার মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু মেয়েটির ভাল লাগল না, এক ঝটকা মারল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'বলছি আগে রুটি দাও। চারদিন পেটে কিছু পড়ে নি। ও সব আমি পারব নি।' কিন্তু লোকটির উদ্দেশ্য বুঝলাম, বিনা পয়সায় স্ফূর্তি করতে চায়। সে হঠাৎ অতর্কিতে মেয়েটিকে চেপে ধরল, মেয়েটি দু' চারবার ককিয়ে উঠল, তারপর আর তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সারা রাত মেসে এসে ঘুমোতে পারলাম না। খাওয়াতেও রুচি এল না। মেস বন্ধুরা জিজ্ঞেস করল, 'কি হে কোথায় কি খেয়ে এলে?' দুর্ভিক্ষতে আমাদের মেসে মেপে চাল রান্না হত। নষ্ট করবার চাল তো ছিল না। সারারাত মেয়েটির কথাই চোখে ভেসে রইল। এক মুঠি ভাত, দুখানি রুটির জন্যে তার জীবনটাই খোয়াতে বসেছে। সে জায়গায় ঐ লোকটা…। সারারাত্রি সেই লোকটাকে অলক্ষ্যে ঘুসি চালাতে লাগলাম। আর নিজেকে চাপড় মারতে লাগলাম, কেন লোকটাকে বাধা দিলাম না। পরদিন একরকম কৌতুহলের জন্যেই সাত তাড়াতাড়ি সকালে উঠে সেই শিয়ালদহর দিকে দৌড়লাম। এক

মেস বন্ধু মর্নিং ওয়াক করে ফিরছিল, আমাকে দেখে বলল, 'কি হে এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ ?' তাকে কোন জবাব না দিয়ে সেই শিয়ালদহর দিকে ছুটলাম। অনুমানে সেই ঘটনার স্থলে যেতেই চোখে পড়ল, এক গাদা লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে চোখে পড়ল, সেই মেয়েটি মরে পড়ে আছে। তার বীভৎস শরীর চুইয়ে রক্ত স্রোত বইছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, 'শালা মানুষেরও কি জঘন্য প্রবৃত্তি! একটা অনাহার ক্লিষ্ট মেয়ের ওপরও অত্যাচার চালাতে ছাড়ে নি !'

এই সময় পুলিশ এসে হ্যাট্ হ্যাট্ করে লোক তাড়াতে লাগল। আমার দু'চোখ ভরে শুধু জল আর অনুতাপ। কেন কাল মেয়েটিকে ঐ লোকটির হাত থেকে বাঁচালাম না। এর জন্যে তো দায়ী আমিই। তারপর নিজেই পরে ভেবেছি, এ নয় নিজের চোখে দেখেছিলাম বলে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কিন্তু এমনি কত মেয়ের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তাদের কে বাঁচাচ্ছে ?

ডাক্তারের এই গল্পটি যে এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়, এব চেযে আরও বীভৎস ঘটনা যে পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঘটেছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' পড়লে বোঝা যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সঙ্কেত', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

সেই মন্বন্তর যেমন আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কেড়ে নিয়েছিল, তেমনি দিয়েছিল সমাজ ভেঙে। তখন জাত বলে কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ তাব ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে বড়াই করতে পারে নি, শূদ্রও নিজের জাত ভুলেছিল, আর যাদের নীচ জাতি বলা হয়, তাদের তো কোন কথাই ছিল না। সব এক হয়ে গলা জড়াজড়ি করে শুধু হা অন্ন হা অন্ন করেছিল। কিন্তু অন্ন কি মিলেছিল ? এসব কথা বলার কারণ সমাজের ঐ বিধিনিষেধের জন্যে। যখন একবার সব ভেঙে চুরে যায়, তখন কি আর জোড়া লাগে ? তাই সমাজ তার রুদ্র মূর্তি হারিয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের সেই জাত্যভিমান গেল। শূদ্রের আর জাতের অভিমান থাকল না। মানুষ যেন ধীরে ধীরে নিজেব ভুল বুঝতে পারল। এসব কথা বলার কারণ, শরৎচন্দ্রের সেই চরিত্রহীন প্রকাশের ষাট বছর পরে আমরা কোথায় এসেছি তার মূল্যায়ন করা। হয়ত এই মূল্যায়ন ঠিক হল না, তবে সমাজ যে ধীরে ধীরে আধুনিকতার দিকে এগোচ্ছে সেটা স্পষ্টই বলা যায়। তারপর এল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সমস্ত ভারতবর্ষে আগুন জলে উঠল। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই সে কথা তারা ভুলে গেল। পরস্পরের প্রাণ নেবার জন্যে তারা তৈরী হল কিন্তু

একবারও ভাবল না, এ আমরা কি করছি? নারী এতেও বলি হল। অজস্র যুবতী, কিশোরী মেয়েদের টেনে টেনে তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হল। অন্তঃপুরে ঢুকে যে সব মেয়েদের কত আশা বিয়ে হবে, স্বামী পাবে, সন্তান পাবে তাদের এমনভাবে ধর্মহানি করা হল, যা ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হয়ে আছে।

কিন্তু লাভ কি হল? কিছু লোক ক্ষয়। মানুষ কত তাড়াতাড়ি অন্যের প্রাণ নিতে পারে তারই পূর্ণ ক্ষমতা সৃষ্টি হল। আর যারা অন্তঃপুরিকা ছিল, পুরুষের সামনে সহজে বেরোত না, তাদের টেনে নামানো হল লোকচক্ষুর সামনে। শুধু নামানো হল না। উন্মুক্ত রাজপথে ফেলে তাদের নারীসম্ভ্রম কেড়ে নেওয়া হল। যা ছিল একান্ত গোপন, তা হল দশের মাঝে প্রকাশ।

এই নারীসম্ভ্রম নষ্ট করে দেশ হল ভাগ। মিলল আমাদের স্বাধীনতা। ইংরেজ চলে গেল কিন্তু আমরা এমন এক জাতিতে পরিণত হলাম, না দেশের সনাতন ধারা মেনে চললাম, না পাশ্চাত্ত্য ধারা পুরো নিলাম। অর্থাৎ অন্তঃপুর আর অন্তঃপুর থাকল না। তার পরিণতি হল আজ আমরা কফি হাউস গরম করি। শুঁড়িখানায় মাতলামো করি। আর বঙ্গসন্তান নাম ঘুচিয়ে বিদেশ পাড়ি দেবার মতলব করি। কি যে আমরা করব তা নিজেই জানি না। একটা ছিন্নভিন্ন সমাজের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের ঘুড়ি ছেঁড়া অবস্থা। এই মানসিকতার উপরই উক্ত হয়েছিল মঞ্জুলিকার কাহিনী। শরৎচন্দ্র যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তিনি কি লিখতেন? তিনি ১৯৩৮ সালে যখন মারা যান, 'শেষের পরিচয়' লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। যতটুকু লিখেছিলেন সেই কাহিনী থেকেই আমরা দেখতে পাই, সমাজ যে ভাঙছে তার চিত্র তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন। সবিতা ঘর ছেড়ে এমন এক লোকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল যাকে সে কোনদিনও ভালবাসেনি, অথচ তের বছর ধরে তারই শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল।

সবিতা নিজের স্বপক্ষে বলেছিল, 'আমি যে কেন স্বামীকে ছেড়ে ঐ লোকের কাছে এতদিন রইলাম আমি নিজেই জানি না।'

এই 'নিজে জানি না' কথাটা যে কত চরম সেটাই লক্ষ্য করবার বস্তু। আজ নারী স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে. সে তার আপন ভাগ্য নিজেই চিনে নিতে পারে। বাপ-মা মেয়ের বিয়ে দেবার সময় তার মতামত জেনে নেয়। কেন? এ সমাজ তো শরৎচন্দ্রের সময়ে ছিল না। তখন মেয়ের বিয়ে বাবা-মা ঠিক করতেন। এবং তাদের রায়ই চূড়ান্ত হত। তাতে অনেক সময় অনেক গর্হিত

কাণ্ডও হয়ে যেত। মেয়ে মনে মনে আপশোষ করত, 'বাবা-মার গোয়াতুর্মির জন্যে আমার জীবনটা গেল।' কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করত না। সে কাল অস্তমিত, সুখের কিন্তু এ কাল ভাল এই কি বলা যাবে? 'ম বাবাকে বলে দাও আমি ঐ গোবিন্দবাবুর ছেলেকে বিয়ে করতে পারব না।' কেন রে? মা অবাক হলেন।'

অনুরাধা বলল, 'আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা আছে।'

'কোথায়?'

'সে তোমায় এখন বলতে পারব না। পরে বলব।' অনুরাধা চলে গেল। রাত্রে বাবার কাছে মা সেই কথা বললেন। বাবা শুনে বললেন, আগে বললে তো আমি গোবিন্দবাবুকে কথা দিতাম না। এখন কি করি?' মা বললেন, 'যাই কর, মেয়ের অমতে কিছু করো না। মেয়ে বড় হয়েছে, বি. এ. পড়ছে। ওরও তো একটা মতামত আছে।'

আর এক দৃশ্যে দেখা গেল, নদীর ধারে অনুরাধা আর সন্দীপ বসে আছে। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। অনুরাধার কোলে সন্দীপের মাথা। সামনে নদী বয়ে চলেছে। একটু পরে সন্ধ্যা নামবে। সন্দীপ বলল, 'এই অনু আমার মাথাটা টিপে দাও তো। ভীষণ যন্ত্রণা করছে।'

অনু বলল, 'আমি কি তোমার সেবাদাসী নাকি যে মাথা টিপব?'

সন্দীপের মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। সে তড়াক করে উঠে বসে বলল, 'তবে তুমি আমার কি?'

অনু চোখ নাচিয়ে বলল, 'জান না?'

হঠাৎ সন্দীপ অনুকে জড়িয়ে ধরল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে খুব করে চুমু খেল। সন্দীপ ছেড়ে দিতে অনুও সন্দীপকে জড়িয়ে ধরে গালে মুখে সর্বত্র অনেক চুমু খেল। চুমু খাওয়া শেষ হতে সন্দীপ অনুর জামার বোতামে হাত দিল। অনু তাড়াতাড়ি বলল, 'এই না না এখন নয়।' সন্দীপের হাত জামার বোতাম থেকে সরিয়ে দিল। 'তবে কবে?'

'যেদিন বিয়ে করবে সেদিন।'

'ধ্যাৎ মেজাজটাই দিলে খারাপ করে। তুমি না এমন রসভঙ্গ কর।' সন্দীপ মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তারপর সন্ধ্যা শেষ হয়ে চাঁদ উঠল। সন্দীপ এগিয়ে যাচ্ছে অনুরাধা পিছনে। ওরা দুজনেই কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। হঠাৎ অনুরাধার

কান্না শোনা গেল। ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে। সন্দীপ ফিরল, 'কি হল কাঁদছ কেন?'

'তুমি রাগ করেছ?'

সন্দীপ জবাব দিল না।

'তুমি তো জান বিয়ের আগে এসব করা ভাল নয়।'

সন্দীপ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজকাল ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'মাথা ঘামায় না!'

'না।'

'কিছু হয়ে গেলে?'

'হয়ে গেলে ব্যবস্থা তো আছে।'

অনুরাধা শিউরে উঠে বলল, 'না না সে সব করতে আমি পারব না।'

ঠিক আছে তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি চলি। বলে সন্দীপ আরও জোরে পা চালাল। খানিকটা যেতেই পিছন থেকে অনুরাধা ডাকল, 'এই শোন।'

'কি?'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো?'

তারপর কিছুক্ষণ পরে একটা ঝোপের মধ্যে দুই যুবক যুবতীর অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি মিলন। দুজনেই প্রাণ ভরে আনন্দ বিনিময় করে নিল। যুবকটি তৃপ্ত। যুবতীও, কিন্তু সে যেন খুশি হয়েও খুশিটা প্রকাশ করতে পারলে না। সলজ্জ চাউনি তুলে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই তুমি আমাকে বিয়ে করবে তো!'

'বারবার একই কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'ভয় করছে যে! যদি কিছু হয়ে যায়? এই তুমি আমায় বিয়ে করবে না!'

'পরে ভাবা যাবে।'

'মানে!'

মানে, মানে। এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করব। ফরেনে যাব। তারপর তো! অনুরাধা আর কথা বলতে পারল না। মুখ শুকনো করে পথ চলতে লাগল। মাসখানেক পরে মেয়ের কতগুলি উপসর্গ দেখে মা চিৎকার করে উঠলেন, 'একি করেছিস্ তুই অনু?'

অনুরাধা বালিশে মুখ গুজে কাঁদতে লাগল। রাত্রে বাবা আসতে মা সে কথা বললেন। বাবা বললেন, 'এখন কি করব? অনুকে ডাকো।'

অনুরাধা এলে বললেন, 'ছেলেটির নাম বল্। আমি তার বাবাকে গিয়ে ধরি। মেয়ে জন্মানো দেখছি পাপ।'

অনুরাধা চুপ করে রইল। বাবা ধমকাতে সে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল, 'সে বিয়ে করবে না বাবা।'

'কেন?'

'সে বলে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করবে, ফরেনে যাবে।'

'তুই জানা সত্ত্বেও তার সঙ্গে মিশতে গেলি?'

'আমি ভাবতে পারি নি বাবা।' অনুরাধা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মুখ নামিয়ে কাঁদতে লাগল। কিন্তু সে কান্নায় কি বিপদ কাটবে? বাবা-মা দুজনেই চিন্তায় পড়লেন। মা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে বললেন, 'তোমার সেই গোবিন্দবাবুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও না। এখন তো ঠিক বোঝা যায় নি।'

বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 'লুকিয়ে আমায় পাপ করতে বলছ?' মা আহত হয়ে বললেন, 'কিন্তু কি করবে তাই তো বলবে?' শেষপর্যন্ত দুজনে চিন্তা করে ঠিক করলেন, ওদের এক জানাশুনা নার্সিং হোম আছে সেখানেই অনুরাধাকে নিয়ে যাবেন। আগে তো পরিষ্কার হয়ে আসুক তারপর দেখা যাবে।

এমনি কত অনুরাধা দিনের পর দিন নার্সিং হোমমুখী হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এই হচ্ছে আজকের আধুনিক সমাজ। শরৎচন্দ্র এখানে বসে কি ধরনের গল্প লিখতেন আমরা জানি না। তবে তিনি সেকালে বসে নর-নারীর এই আদিম বাসনাকে নিয়ে কোনই গল্প ফাঁদেন নি। কতকগুলি কুচক্রীর আদিম বাসনা দেখিয়েছেন কিন্তু কোন যুবক কোন যুবতীর সম্ভ্রম নিয়ে তারপর বিয়ে না করে পালিয়ে যাচ্ছে ঐ ধরণের গল্প মনে স্থান দেন নি। কেন? বোধ হয় সে যুগে যুবকদের এমনি হীনপ্রবৃত্তি ছিল না। থাকলেও তিনি সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে ঘৃণা বোধ করেছেন। আরও একটা কারণ তাঁর রচনা দেখে মনে হয়, তিনি ভালবাসাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা তাঁর কথাতেই জানি, দেহের কান্না পরে, মনটাই আসল। মনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হলে দেহ পেতে তো এতটুকু দেরী হয় না।

স্ত্রী যে স্বামীকে দেহ দান করে না, এ তো নয়, বরং স্বামীই স্ত্রীর দেহ পাবার অধিকারী, এ ঈশ্বরের দান। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। নর-নারীর মিলন তো ঈশ্বরেই সৃষ্টি। শরৎচন্দ্র ঈশ্বরের বিশ্বাস মনে ধারণ করে নারীর মন সৃষ্টি করেছেন। আর নারীর একমাত্র কাম্য স্বামীর সান্নিধ্য। তার বাইরে তিনি কখনও চিন্তা

করেন নি। আমরা 'পণ্ডিতমশাই' পড়তে পড়তে দেখি, কুসুম বৈষ্ণব ঘরের মেয়ে। ছোট জাত। কোন কারণবশত স্বামী পরিত্যক্তা। তারপর স্বামী আবার বিয়ে করে কিন্তু ভাগ্য দোষে সে মারা যায়। সেই মৃত স্ত্রীর গর্ভজাত একটি সন্তান ছিল। বৃন্দাবন যখন কুসুমকে আবার গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে, সে অভিমানে স্বামীর ঘরে যেতে চায় না। নারী কি এতই ফেল্না, তার কোন সম্মান নেই? কিন্তু নারীর ধর্ম মাতৃত্ব, যখন সতীন সন্তান দেখল তার মাতৃত্ব হাহাকার করে উঠল, সে ঐ সন্তানকে বুকে চেপে ধরে মনে মনে বলল, 'ঈশ্বর আমি কি দোষ করেছি এ সন্তান তো আমারই গর্ভে আসত?' আমরা ভেবেছিলাম সেই সন্তানের জন্যেই কুসুম স্বামী ঘরে ফিরে যাবে কিন্তু শরৎচন্দ্র এখানে মাতৃত্বের চেয়ে নারীত্বকেই বড় করেছেন। আগে নারীত্ব, নারী স্বামীর ভালবাসা চায়, তারপর মাতৃত্ব। মাতৃত্ব ম্লান করে কুসুম নারী॥ নারীত্ব উজ্জ্বল করে তুলল। যে সতীন-সন্তানকে সে ভালবেসেছিল একদিন রাগের বশে তাকেও বুক থেকে ছিনিয়ে বিদায় দিল। তারপর অনেক ঘটনার পর স্বামীর সঙ্গে তার মিলন হল বটে কিন্তু সতীন সন্তানটি তখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। এই দেখে বোঝা যায়, শরৎচন্দ্র নারীত্বের চেয়ে মাতৃত্বকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন নি। তাঁর চিন্তায় আগে নারীত্ব পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটে, তারপর দশদিক আলো করে তার সৌরভ ও সৌন্দর্য ছড়ায়, তেমনি নারীর বিকাশ আগে প্রেমে তারপর মাতৃত্বে। ঈশ্বরেরও তাই অভিপ্রেত। আগে নারী বিকশিত হয়, ভালবাসায় পূর্ণতা লাভ করে, মনের মত স্বামী পায়, তারপর মাতৃত্বের রূপে গরবিনী হয়।

শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন, 'আমি Ethics-এর student, আমি Ethics বুঝি। অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র আমার পড়া আছে। আমি যা করি বুঝে শুনেই করি।' সত্যিই শরৎচন্দ্রের রচনা পড়লে তাই মনে হয়, তিনি হেলা-ফেলার সঙ্গে কখনও কলম ধরেন নি। যখনই কলম ধরেছেন, নিজের বক্তব্য দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা নিয়ে কলম ধরেছেন। তাই এ যুগে বেঁচে থাকলে আমরা নিঃসন্দেহে অপরাজেয় কথাশিল্পীর হাত থেকে এই ছিন্ন-ভিন্ন সমাজের একটা অন্যরূপের ছবি দেখতে পেতাম। আর তা হত বিস্ময়কর সৃষ্টি।

কিন্তু সে কথা এখন ভাবাও অন্যায়। মানুষ চির অমর নয়। চিরকাল বেঁচে থাকবে এও আমরা আশা করি না কিন্তু ঠিক এমনি একজন প্রতিভাধর জন্মালো না কেন?

যাক সে নিয়ে বাকবিতণ্ডা করে লাভ নেই। হয়ত এ কথা অনেকের বিরাগের কারণ হবে। আমরা শরৎচন্দ্রের মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। তাঁর সৃষ্ট নারী, পুরুষ, সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা, প্রতিটি কাহিনীর রস বর্ণনা এই আমাদের বক্তব্য। তবে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাঁর অনন্য নারী চরিত্র তাঁর সমস্ত বচনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতীয় নারী সমাজ তাদের জীবন দর্শন এই শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখতে পেয়ে তারা নিজেরা শিল্পীকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

সেইজন্যে আজও তিনি সৃষ্টির জগতে অমর। তাঁর পাঠক সংখ্যা যেমন সবার উপরে, তাঁর পাঠিকার সংখ্যাও অগুণতি। বরং যত দিন যাচ্ছে তাঁর লেখার প্রসাদগুণ যেন আরও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? নারী তার আপন অন্তর এই লেখার মধ্যে থেকে খুঁজে পায়। এবং যুগসৃষ্টি বলে যে মাঝে মাঝে চিৎকার ওঠে, সে শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যেই দেখা যায়। সে লেখা চিরন্তন হয়ে থাকবে যতদিন মানব জীবন ও নারী সমাজ এই পৃথিবীতে থাকবে।

তাকে জয় করতে হয়। দিলীপের জয় করার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ একদিন অলকই এসে খবর দিল, 'অমুকদা, দিলীপ প্রেমে পড়েছে।' দিলীপ প্রেমে পড়েছে, এ যেন একটা আলৌকিক ঘটনা। ওর চেয়ে যদি অলক এসে বলত, 'অমুকদা আমাদের বাড়ীর ছাদে অ্যাটম বোমা পড়েছে' তাহলে বোধ হয় এত আশ্চর্য হতাম না। যাই হোক দিলীপের আগমন প্রার্থনা করতে লাগলাম কিন্তু সে যেন হঠাৎ উবে গেল। অন্যান্য বন্ধুরা আসে কিন্তু দিলীপ আসে না। হঠাৎ একদিন দিলীপ এল, তার মুখ হাসি হাসি, তার মুখে এক অদ্ভুত জেল্লা দেখা দিয়েছে। লাজুক ভাবটা প্রায় চলে গেছে।

দিলীপের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দিলীপ কলম্বাস কবে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন?' দিলীপ সালটা ভাবতে লাগল। আমি হেসে বললাম, 'সে সাল ভাবতে হবে না। বই খুললেই পেয়ে যাব। তোমার তারিখটা আমায় বলো।'

সে বুদ্ধিমান ছেলে, আমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে ললিতার সঙ্গে যোগাযোগের তারিখটা বললো।

বললাম, 'কেমন বোধ হচ্ছে?'

সে হাসল।

তারপব আর দিলীপের দেখা নেই। অলকের কাছ থেকেই দিলীপের সব কথা শুনি। অলক ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, খুব তুখড় ছেলে, এর মধ্যে এক ডজন প্রেম করেছে। ওর প্রেমের ভাগ্যটা খুব ভাল। চেহারা খুব চটকদার নয় কিন্তু কথাবার্তায় খুব চৌকস। এটাই বোধ হয় মেয়েদের আকর্ষণ করবার প্রধান কারণ। এইভাবেই এ কালের ছেলে-মেয়েদের আকর্ষণের হেতু ভাবি। অলকের কথাতেই জানতে পারি, 'মেয়েগুলো এক একটি সেক্স হাঙ্গার। একটু মেশার পরেই হাত বাড়ালে এগিয়ে আসে। তারপর লতিয়ে পড়ে। ওদের কি বিয়ে করা যায়? মেশা যায়, প্রেম করা যায়। তাবপর আনন্দ করে ছেড়ে দেওয়া যায়। ওদের নিয়ে সারা জীবন ঘর করা যায় না।'

বুঝুন একবার ব্যাপারটা। একালেব একটি যুবক এ কথা বলছে, প্রেম মানে বিয়ে নয়। বিয়ে অন্য জিনিস। অর্থাৎ প্রেমকে তারা যৌবনের উদ্দামতার একটা খেলা ধরে নিয়েছে। তার বেশী তারা ভাবে না।

যাই হোক আমার মন সাগ্রহে দিলীপের চিন্তায় ব্যাকুল। একদিন অলক খুব মেজাজ খারাপ নিয়ে আমার ঘরে এল। 'কি ব্যাপার?' অলক যা বলল তার ইতিবৃত্ত এই, 'দিলীপটা একটা যাচ্ছেতাই, ওর সঙ্গে আমিই ললিতার

আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। হাজার হোক ও তো আমার বন্ধু। লাজুক স্বভাবের জন্যে ও মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে না। ওকে বলে দিয়েছিলাম, খুব ব্যালেন্স রেখে কথা বলবি। মেয়েরা খুব ক্লেভার, ছেলেদের দুর্বলতা টপ্ করে বুঝতে পারে। কিন্তু এমন হামবাগ, সে কথা ভুলে গিয়েছে। খুব গদগদ ভঙ্গিতে ললিতার কাছে নিজের সব দুর্বলতা তুলে ধরেছে। আর ললিতাও তাকে খেলাচ্ছে।'

'কি রকম?'

'মাঝে মাঝে দেখা করে না। লুকিয়ে যায়। আবার যখন দেখা করে, দিলীপ একেবারে গদ গদ হয়ে যায়। ওকে যত বলি তুইও সরে যা দেখবি ঐ তোকে খুঁজবে কিন্তু ও বলে, না ভাই যাও একটা পেয়েছি যদি সরে যায়, তাহলে খুব খারাপ লাগবে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে জানেন?'

'কি?'

'দিলীপ ওর চাকর হয়ে গেছে। ললিতা ওকে যেদিকে ঘোরায় ও সেদিকে ঘোরে।' দিলীপের জন্যে খুবই চিন্তা হতে লাগল, এমন একটি ভাল ছেলে সে এমন হল? ললিতাও শুনি খুব ডানাকাটা পরী নয়। দিলীপের সঙ্গে মানায়ও না। ললিতার স্বাস্থ্য খুব ভাল। লম্বা চওড়া। সে জায়গায় দিলীপ রুগ্ন, দুর্বল, থাকার মধ্যে তার ব্রেণটা খুব সার্ফ কিন্তু এই ব্রেণের নমুনা! খুবই আঘাত নিয়ে দিন যাপন করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন অলক ঝড়ের মত এসে বলল, 'জানেন, দিলীপ ললিতাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

বিয়ে ব্যাপারটা ঘটলে আমার মনটা বেশ সায় দেয় কিন্তু দিলীপের বিয়ে শুনে চিত্ত চঞ্চল হল। বললাম, 'দিলীপটা গেল। ঐ মেয়ে বিয়ে করলে তো সে পার্মানেণ্ট চাকর হয়ে যাবে।'

অলক কথাটা লুফে নিয়ে বলল, 'ঠিক। আপনি ঠিকই ধরেছেন। ললিতা আসলে খুব তুখড় মেয়ে। দিলীপ তো চাকরীটা ভাল করে। মাইনে মন্দ পায় না। ললিতা ঘর বেঁধে দিলীপকে অধীন করে বেশ মজা লুটবে।'

'মজা?'

অলক অসহ্যকণ্ঠে বলল, 'মজাটা বুঝতে পারছেন না? আপনি তো ললিতাকে দেখেন নি? সে খুব চালাক মেয়ে। ছেলেদের মাথা কি ভাবে খেতে হয় ও জানে। দিলীপকে বোকা স্বামী করে সামনে রেখে সে নিজের ব্যভিচার চালিয়ে যাবে।'

অলকের বুদ্ধি দেখে আমি একটু মনে মনে থিতিয়ে যাই। হয়ত সে ঠিক ভেবেছে কিন্তু ওর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পাই। হাজার হোক ওর সঙ্গে আমার বয়েসের একটা পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার করার কিছু নেই। শুধু এ যুগের ছেলেমেয়েগুলির মানসিকতার সম্বন্ধে আতঙ্কে ভাবি। এও হয়। মেয়েরা এই ভাবে নিজেদের দেহ সুখ আকাঙ্খা করে? কিন্তু অবিশ্বাস করি কেমন করে? অলকের অভিজ্ঞতার ওপর আমার কোন অনাস্থা নেই। আমি শুধু দিলীপের আশা পথ চেয়ে বসে থাকি। একদিন সে আশা আমার মেটে। দিলীপ ঢুকেই লাজুক ভঙ্গিতে বিয়ের কার্ডটা এগিয়ে দেয়। কার্ড হাতে করে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, 'তাহলে বিয়ে করতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, যাবেন তো?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে বলি, 'দিলীপ বিয়েটা কি না করলে পারতে না?'

দিলীপ হঠাৎ রেগে যায়, বলে, 'নিশ্চয় অলক আমার নামে লাগিয়েছে?'

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলি, 'অলক তোমার শুভানুধ্যায়ী। নিশ্চয় তোমার অনিষ্ট আশা করবে না।'

দিলীপ বলে, 'অলক কত শুভানুধ্যায়ী আমার জানা আছে। সে তো বলে প্রেম করবি, আনন্দ করবি, পালিয়ে যাবি। বিয়ে এসব মেয়েকে করা যায় না।'

'সে কি ভুল বলে?'

'ভুল বলে না? কত বড় ভুল জানেন? ওর সঙ্গে আর আমি সম্বন্ধ রাখব না। ললিতা আমায় বলে দিয়েছে ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখলে সে আমার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করবে।'

অলকই যে ললিতার সঙ্গে আলাপ করে দিয়েছিল সে কথা মুখে আনি না। ওদের বিয়েতে যাওয়াও স্থগিত রাখি।

মাস তিনেক পরে উদভ্রান্তের মত দিলীপই এসে উপস্থিত হল। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'অলক আসে না? তারপর আসে না শুনে খানিকটা ঝিম মেরে বসে থেকে বলল, 'আমি সুইসাইড করব অমুকদা!'

'কেন?'

'ললিতার প্রকৃতি যে এমনি আমি বুঝতে পারি নি। সে আমাকে এখন ব্লাকমেল করে।'

'যেমন!'

'যেমনটা আর কি বলব? কিছু বলার নেই। সে আমাকে এখন বলে,

তুমি কি আমার যোগ্য? দয়া করে বিয়ে করেছি এই যথেষ্ট। আর আমার সামনেই হাজারটা ছেলে নিয়ে এসে হুল্লোড় করে।'

অলকের দূরদর্শীতার প্রশংসা করতে হয়। সে এই কথাই আমাকে বলে গিয়েছিল। তারপর অনেক দিন গত হয়েছে। দিলীপের আত্মহত্যার খবর পাই নি। তবে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

এই যে গল্পটা এখানে প্রকাশিত হল এ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা, এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। তাই এই যে প্রেম নিয়ে আমাদের আলোচনা, একালের ছেলেমেয়েদের প্রেমের নিদর্শন প্রকাশ করতে গিয়ে এ গল্প তুলে ধরলাম। দিলীপ, অলক, ললিতা কেউ হয়ত দায়ী নয়, একাল দায়ী। একালে এই হাওয়ায় যুবক যুবতীরা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাল তাদের কি দিচ্ছে? না দিচ্ছে প্রেমের স্বর্গীয় সঙ্গীত সুষমা, যে সুষমায় ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, সে জায়গায় পাচ্ছে যৌবনের উদ্দামতা, ক্ষণিক সুখের তাড়না। আর ধ্বংসকে আলিঙ্গন করার সুতীব্র ক্ষমতা। প্রেম এ জগতে নেই। এ কথা যদি বলি খুব কি অতিশয়োক্তি হবে?

আমার এই আলোচনা অন্যের কতখানি হৃদয়গ্রাহী হবে জানি না। তবে আমার চিন্তার গুরুত্ব যে কম নয়, এ কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। প্রেমের রকম ভেদ মানি, সে যুগে প্রেমটা ছিল অনেক গভীরে। মেশামেশি কম। শরৎচন্দ্র যখন 'বামুনের মেয়ে' লেখেন, সে সময়ে যে একটু মেশামেশি শুরু হয়েছে সে কথা তাঁর লেখনীতেই প্রকাশ পায়। না হ'লে অরুণ সন্ধ্যাদের বাড়ীতে আসতে সাহস করত না। আর আসার কারণও জগদ্ধাত্রীর অজ্ঞাত নয়। অরুণ বিলাত ফেরৎ। যদিও তার বিলাতী ডিগ্রী পাওয়ার চেকনাই কিছু দেখা যায় না। যাই হোক সন্ধ্যা তাকে ভালবাসত এবং অরুণ এলে তার মন দুলে উঠত। অরুণ-সন্ধ্যার এই প্রেম নিবিড়ভাবে শরৎচন্দ্র এঁকেছেন। সেখানে দেহের কোন চাহিদা প্রকাশ পায় নি। এই যে প্রেম যুবক যুবতীর মধ্যে লীলা করেছিল, তার পরিণতি বিয়েতে। বিয়ে তো এ যুগেও ঘটে কিন্তু সেই প্রেমের আকর্ষণ কোথায়? কখনও কখনও শোনা যায়, অমুক আর সারাজীবন বিয়ে করবে না। কেন? সে ভালবাসত যাকে, সে বিট্রে করেছে। এ সব শুনলে ভাল লাগে, তখন মনে হয় বুঝি প্রেম এখনও তার উপস্থিতি জাহির করে চলেছে।

যাই হোক এ যুগের ব্যাখ্যা দিয়ে আপনাদের চিত্ত আর বিকল করব না।

আপনারা সকলেই তো কম বেশী সবই জানেন। সেটা আর এই লেখকের জবানীতে পড়ে কি হবে? চিত্ত ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। তার চেয়ে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নর নারীর মধ্যে কতখানি প্রেমের স্থান ছিল, তারই আলোচনা করা যাক। এ আলোচনা আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হবে। আর আপনারাও পড়ে সন্তুষ্ট হবেন।

শরৎচন্দ্র কি জীবনে প্রেমে পড়েছিলেন? শরৎচন্দ্রের জীবনীকাররা এ কথা বলতে পারেন নি। লেখক তখনই প্রেমের কথা লেখেন, যখন তাঁর নিজের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়। শরৎচন্দ্রের বাল্যরচনার মধ্যে শুধু দেখি, দেবদাস প্রেমে পড়েছিল। দেবদাসের সে সময়ের মানসিকতা শরৎচন্দ্রের মনের মানসিকতা। শরৎচন্দ্র এ কথা প্রবীণ বয়সে ভাষণ প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন। তরুণ সাহিত্য সেবীদের রচনার গুণাগুণের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আজ আমার যে বয়স তোমাদের মত ভালবাসার কথা হয়ত লিখতে পারব না, ভালবাসার কথা লিখবার একটা বয়স থাকে সে বয়স আমি পেরিয়ে গেছি। এতেই বোঝা যায়, শরৎচন্দ্র যে বয়েসে ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন সে সময়ে ভালবাসা দিয়ে রচনাই তাঁর কলমে এসেছিল। পার্বতী দেবদাসের প্রেম ছিল নির্মল। 'বাল্যের খেলা' পরিণত বয়সে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এই যে প্রেম, পরস্পরকে নিবিড় করে পাওয়া, এ প্রেম আজকে বিরল। পার্বতী গভীর আত্মপ্রত্যয় দিয়ে দেবদাসকে ভালবেসেছিল বলেই তো পরে সাথীকে বলতে সাহস করেছিল, 'যাকে ছোটবেলা থেকে জানি সে যে কত আপনার এ তোমাকে কি বোঝাব?'

শরৎচন্দ্র সেখানে পার্বতীর এই যে বিবাহিতা জীবনের পরেও এই সব কথা মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, তিনি সে যুগে বসে প্রেমকে কত বড় আসন দান করেছিলেন। পার্বতীকে আমরা দ্বিচারিনী আখ্যা দিতে পারি। বিয়ের পর তো মেয়েরা স্বামীর মধ্যেই সুখ খোঁজে। ঠিক এমনি আর একটি চরিত্র হেমনলিনী। সেও তো বলেছিল, 'তোমরা জোর করে আমার বিয়ে দিলেও আমি তো কখনও তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করি নি।' পার্বতী শ্বশুরবাড়ীতে কর্ত্তব্য করেছিল কিন্তু মন তার দেবদাসময় হয়েছিল। হেমনলিনীরও তাই। গুণেন্দ্রকে ছাড়া সে আর অন্য পুরুষকে ভাবে নি। তবু তো সাংসারিক জীবনে এই সব নারীদের মনুষ্য সমাজ ক্ষমা করে না। তারা বলে, 'যে কোন কারণই থাক, বিয়ে হবার পর মেয়েরা আর অন্য কাউকে মনে রাখবে না।'

শরৎচন্দ্র যে সমস্যা সে যুগে তুলেছিলেন, এ যুগে তা বিরল নয় কিন্তু তার প্রয়োগ পরিকল্পনা অন্য। এ যুগে সেই নিবীড় প্রেম বড় একটা দেখা যায় না। দেখা গেলেও খুবই স্বল্প। প্রেমের গুরুত্ব কমে গেছে বলে কেউ গভীর ভাবে প্রেম করলে অন্যে বিশ্বাস করে না। তাই বিয়ের পর মেয়েরা পূর্বপ্রণয়ীকে মনে রাখলে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে লোকে তাকে ব্যাভচারিণী বলে।

ব্যভিচার প্রসঙ্গ যখন আলোচনা হবে, তখন এ সম্বন্ধে বলা যাবে। শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনার মধ্যে পবিত্র প্রেমের নজীর দেখা যায়, 'দত্তার' মধ্যে। নরেন ও বিজয়া পরিণত বয়েসের যুবক যুবতী। তবু নরেন প্রেম সম্বন্ধে যতখানি অজ্ঞ, বিজয়া নয়। নরেন জীবনে আসার আগে বিজয়ার সঙ্গে বিলাসেরই প্রেম ছিল। বিলাস সত্যিই ভালবেসেছিল। যদিও অবচেতন মনে বিজয়ার বিষয়ও তার কাম্য ছিল। নরেন আসার পর বিজয়ার মধ্যে দু'টি পুরুষের ছায়া পড়ে। বিয়ের আগে কুমারী মেয়ের মনে অজস্র পুরুষের ছায়া পড়লেও সমাজ সে নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ সব জায়গায় এ কালেও মেয়েদের স্বাধীনতা প্রচুর। মনের মানুষ নির্বাচন করার জন্যে একাধিক পুরুষের সঙ্গে ওঠাবসা করলেও কেউ দোষ ধরে না। বিজয়াও সেইভাবে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞানসেবী, আত্ম ভোলা ধরণের মানুষ নরেন্দ্র বহুদিন বিজয়ার মনের কথা বুঝতে পারে নি। নরেন্দ্রর মত চরিত্র এ যুগেও বিরল নয়। তবে নরেন্দ্রর মত বোকা লোকদের এ যুগের মেয়েরা ভাল বাসে কিনা খুবই চিন্তার বিষয়। আমরা নারী চরিত্র পর্যালোচনা করে দেখেছি, মেয়েরা সাহসী, বেপরোয়া, বুদ্ধিমানদেরই বেশী পছন্দ করে। সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি নারীদের কাছ থেকে। আমার এই ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য। তবু আপাতঃ দৃষ্টিতে যা দেখি, এই ধরণের ছেলেরাই বেশী কলকে পায়। যাই হোক শরৎচন্দ্র কোন নায়ককেই খুব একটা সাহসী করেননি। সম্ভবত নিজের চরিত্র। নিজের চরিত্রটি যে ঐ নরেনের মতই ছিল। আত্মভোলা, ভাবুক, অন্যমনস্ক। বিজয়া বার বার তাকে আহ্বান করে, তবু বুঝতে পারে না বিজয়া তাকে ভালবাসে কিন্তু অপরে খুব তাড়াতাড়িই বিজয়ার মনোভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিল। তাই জ্বরের ঘোরে বিজয়া নরেনকে কাছে টানলে, রাসবিহারী, বিলাস দুজনেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র দত্তা লেখবার সময়ে কাকে লক্ষ্য করে বিজয়া চরিত্র এঁকেছিলেন জানি না। তাঁর জীবন সার্থক। এমন পবিত্র প্রেমের নজীর বুঝি আর কোন রচনাতেই নেই। কারণ বিজয়া বিধবা নয়, সধবা নয়, একটা গোটা কুমারী মন।

যার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ভাল বাসবার। আর মিলনও খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। নরেন্দ্র যখন জানতে পারল, বিজয়া তাকে ভালবাসে, সে মুহূর্ত্ত কল্পনা করলে মনে পুলকই জাগে। বিজয়া অধোবদনে কাঁদছে, নরেন্দ্র অনুতাপে পুড়তে পুড়তে আক্ষেপ করে জানাচ্ছে, 'আমি একবারও বুঝতে পারি নি। তুমি আমাকে ভালবাসো।'

একালে এরকম বোকা নায়ক খুব দেখা যায় না। তবে লেখকের চিন্তাধারার ওপর সবই নির্ভর করে। একালে বসেও লেখক কাহিনী বুনতে গিয়ে এমনি নায়ক করতে পারেন কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া দরকার।

শরৎচন্দ্রকে সে যুগে অশ্লীল সাহিত্যিক বলতে কেউ কার্পণ্য করেননি, কারণ সহজ সুন্দর পবিত্র প্রেমের রূপ আঁকতে গিয়ে তিনি যে সব নর নারীদের তুলে ধরেছিলেন, নরের কথা থাক্, নারীর প্রেম খুব সহজ গ্রাহ্য ছিল না। কেন তিনি এদিকে ঝুঁকলেন, আমরা তার কোন তল পাই না।

তবে সমাজ ভাঙার মন্ত্র যে তাঁর হৃদয়ে ছিল সে তো প্রথম থেকেই ধরা পড়েছে। সমাজকে তিনি ভেঙ্গেচুরে নতুন সমাজের ইঙ্গিতে ফোটাতে চেয়েছিলেন। তাই সহজ প্রেমমূলক উপন্যাস একটাও লেখেন নি। 'প্রেমের যে আসন পাতা আছে ভুবনে' সে কথা জেনেও তিনি জানতে চান নি। তাই প্রেম এনেছেন নর নারীর জীবনে কিন্তু তার রকমভেদই প্রধান প্রাধান্য পেয়েছে। মাধবীর মধ্যে প্রেম এনেছেন, সে বিধবা। বিধবা হলেও ভালবাসার অধিকার তার আছে সে কথা বিস্মৃত হন নি। পার্বতী কুমারী হয়ে ভালবাসল, তার পরিণতি ভালবাসারই জয় হল কিন্তু অন্য তার রূপান্তর 'স্বামী'র সৌদামিনীর প্রেম দেখান নি, যৌবনের অন্ধ মোহ তার মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন। সেখানে দেহেরই কান্না দেখিয়েছেন। এই দেহের কান্না চরিত্রহীনের সাবিত্রী, সতীশ, কিরণময়ীর মধ্যে দেখিয়েছেন। তবে এ প্রেম নয়। শুধু সরোজিনীর মধ্যে একটু প্রেমের ছোঁয়াচ ছিল কিন্তু সে চরিত্র না ফোটার জন্যে তাকে লোকে স্বীকার করে না। পরিণীতায় ললিতা শেখরকে ভালবাসত শুধু অভাগিনীর নিজের অবস্থা ভাল নয় বলে। পরে যে প্রেম নীরবে ঘটে সেটা মাল্যদানের জন্যে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ভালবেসেছিল কিন্তু সেটা পবিত্র প্রেম নয়, রাজলক্ষ্মী তার পঙ্কিল অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্যে।

এই যে শরৎচন্দ্র প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়েছেন, কোনটাই সহজ সুন্দর সোজা সরল প্রেম নয়। যে প্রেমে নরনারী আপন হতে পারে, অথচ সমাজ

চোখ রাঙাবে না। অবশ্য বলা যেতে পারে, পবিত্র প্রেম সবগুলিই। বিধবা, সধবা, কুমারী, পতিতা যারাই ভালবাসুক, তাদের প্রেমই পবিত্র। ভালবাসার অধিকার সবার আছে, সে প্রেম যে ভাবেই আসুক। প্রেম তো বাইরে ঘুরে বেড়ায় না, সে হৃদয়ে বিরাজ করে। বুকের মধ্যে থেকে দগ্ধ করে। পল্লী সমাজের রমা রমেশকে যে কত ভালবাসত, তার তুলনা নেই। তবু তাদের মিলন হল না। এমন নিষ্ঠুর পল্লীর সমাজ। এই সমাজ আজ নেই। সমাজ হয়ত আছে কিন্তু মানুষ অত সমাজকে গ্রাহ্য করে না। সে তার আপন অধিকার ছিনিয়ে নিতে এতটুকু দ্বিধা করে না।

শরৎচন্দ্র সেই সমাজের মানুষ ছিলেন বলে সমাজের এই অনুশাসনগুলি তাঁকে বড়ই মর্মপীড়া দিত, তাই নারীর বেদনা তাঁর মর্মমূলে গিয়ে বার বার আঘাত হেনেছিল। শরৎচন্দ্র নিজেই দেখেছেন তাঁর দিদির চরিত্র। যিনি শ্রীকান্তে অন্নদাদি হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন কিন্তু দিদির মত সহনশীলা রমণী তিনি একটিও দেখেন নি। যে স্বামী ধর্ম ত্যাগ করে সাপুড়ে নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াত, তাঁকেও ক্ষমা করেছেন, এবং পাতিব্রত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনা পড়ে এটাই ধারণা হয় তিনি নিজেই কোনদিনও সংস্কার ত্যাগ করতে পারেন নি। অথচ সংস্কার ত্যাগ করে হিন্দু সমাজকে নস্যাৎ করার জন্যে তাঁর কি অদম্য আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহটাই প্রতি লেখার মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

নারী যত স্বামীর অত্যাচারেই অত্যাচারিত হোক, তবু তাকে স্বামীর ধর্মই মেনে নিতে হবে। না মানলে সমাজ তাকে কুলত্যাগিনী, পাপিষ্ঠা, পতিতা আখ্যা দেবে। শরৎচন্দ্রের নারীরা কেঁদেছে, বুকে ভালবাসা নিয়ে বিলাপ করেছে, শরৎচন্দ্র তাদের কিছুতে বেরতে দেন নি। অভয়ার পরিবর্তনে শ্রীকান্ত কিছুতেই তাকে মেনে নিতে পারেনি। স্বামী কিরকম ধরণের লোক ছিল শ্রীকান্ত জানত, তবু শ্রীকান্ত সেই স্বামীর ঘরেই অভয়াকে প্রত্যাশা করেছিল।

ব্যভিচারিণী তখনই, যখন নারী স্বামী সংসর্গ ত্যাগ করে। শরৎচন্দ্রও নারীর এই ব্যভিচারকে কিছুতে মেনে নিতে পারেন নি। রোহিণী কি অভয়াকে কম ভাল বেসেছিল? কিন্তু তবু তো রোহিণী পরপুরুষ। অভয়া যখন স্বামীর অত্যাচার, রোহিণীর ভালবাসা পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি আমাকে কোন্‌টা নিতে উপদেশ দিচ্ছ?' তখন শরৎচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। অভয়া জোর গলায় বলেছিল, 'আমি জানি তোমার মনোভিপ্রায় কি? কিন্তু

এও জেনে রেখো, আমাদের যে সন্তান আসবে, তোমরা না মেনে নাও, আমি তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাব।'

এই যে নির্ভীক অভয়া, এ যেন একালের এক রক্ত মাংসের নারীর স্বরূপ। যে আপন ভাগ্য নিজেই চিনে নেয়। সমাজকে পরোয়া করে না। লোকে কি বলবে সে কথায় কান দেয় না। সেই জন্যে তো রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'অভয়া বুঝি শিক্ষিতা ?' শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে এই শিক্ষিতা নারীর ছাপ অন্যভাবে পড়েছিল, সেটাও আমরা তাঁর বহু রচনাতে দেখেছি। শিক্ষিতা হলেই বুঝি দাপটটা একটু বেশি মাত্রায় এসে যায়। এ কালে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। অন্যায় নয়, ন্যায়ের মধ্যে দিয়ে তাদের নিজেদের প্রয়োজনটা তারা খুব অল্পায়াসেই সম্পন্ন করতে পারে। অভিভাবকদের অযথা অন্যায় দাপট আর চলে না। তারাও বলে, 'ও তো বড় হয়েছে, পড়াশুনা শিখেছে, ওর মতামতটা তো ফেল্না নয়।'

তাহলে প্রেম নামক বস্তুটির এত অবহেলা হবে কেন ? সমাজ তো নিজেদের হাতেই। তবে এ যুগে সামাজিক রীতিনীতির চেয়ে অন্য অনেক বাধা এসে সংসারের ওপর ভর করেছে, সে অর্থনীতির প্রশ্ন।

এ চিরকালের দরিদ্র দেশ। অর্থ ভাগ্য কোনদিনও দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি। একটি গল্প দিয়ে এ অংশ বোঝাবার চেষ্টা করি। সেদিন আমার এক পরিচিত যুবক নিতাই এসে মুখ শুকনো করে আমার পাশে এসে বসল। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করি। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার হে ? এমন বিরস বদন কেন ?' আমি জানতাম ও একটি মেয়েকে ভালবাসে। এবং মেয়েটিও ওকে ভালবাসে। কিন্তু বিয়ের বাধা, ওদের দরিদ্র পরিবার। বাবা মারা গেছেন অনেকদিন। দুই ভাই বোনে কোনক্রমে সংসার চালায়। ও মুখ তুলে বলল, 'স্বাতী বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।' স্বাতী অর্থাৎ ওর বোন ভাস্বতী।

কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতে ও বলল, স্বাতী একটি ছেলেকে ভালবাসত। আমরা সকলেই জানতাম কিন্তু মা স্বাতীর এই মেলামেশা পছন্দ করত না। দিনরাত মায়ের সঙ্গে খেঁচাখেঁচি লেগেই থাকত। স্বাতীও বলত, 'আমি কি চিরকাল তোমাদের সংসারে পড়ে থাকব ? আমারও কি সাধ আহ্লাদ নেই ?' সত্যি কথা, স্বাতীর সাধ-আহ্লাদের কথা ভেবে আমারও বুক শুকিয়ে যেত। ভাইবোনগুলি এতই ছোট যে বড় হতে এখনও দশ বছর। এই দশ বছর আরো

টানলে কি স্বাতীর শরীরে কিছু থাকবে? কিন্তু এ সব কথা মনে মনে বলতাম। কখনও স্বাতীকে বলবার সাহস হয় নি।

কিন্তু এ কথা যে স্বাতীও জানত, গতকাল তার প্রমাণ পেলাম। হঠাৎ দুপুরবেলা বাড়ীতে ফিরে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মুখে বলল, আমি জানি তুমি আশীর্বাদ করবে না। তবু এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আজই আমাদের রেজিস্ট্রি হয়েছে, চললাম। মা তো আশীর্বাদ করলই না, আর যে সব কথা বলে স্বাতীর মৃত্যু কামনা করতে লাগল কেউ শুনলে কানে আঙুল দিত।' নিতাই তারপর কপাল টিপে ধরে বলল, 'আমি যে কি করি?' ওকে কোনদিক দিয়েই সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। কর্ত্তব্যের চেয়ে বড় আগে জীবন। স্বাতী যে কাজ করেছে অন্যায় নয়। ওর মাও যে গালাগালি দিয়েছে অন্যায় নয়। তবে অন্যায় কার? অন্যায় বোধ হয় আমাদের এই কালের।

এই রকম ভাস্বতীর মত মেয়েরা এ কালের বলি। শরৎচন্দ্র এদিকে তাকিয়ে কোন উপন্যাস লেখেন নি। অবশ্য সে কালে এ ধরণের সমস্যা প্রধান ছিল না। তবে চিরকালের দরিদ্র দেশ। দরিদ্র মানুষকে প্রধান করে কেন গল্প লেখেন নি জানা যায় না। তিনি নিজেও তো অর্থের জন্যে কম কষ্ট করেন নি। এফ. এ. পরীক্ষায় কুড়িটা টাকা যোগাড় হল না বলে তিনি পরীক্ষা দিতে পারলেন না। মামার বাড়ীতে একান্ত অনাদরের মত তাঁকে মানুষ হতে হয়েছিল। সামান্য চাকরীর জন্যে তাঁকে বর্মায় গিয়ে থাকতে হয়েছিল।

সেই মানুষ দারিদ্র্যের কোন ছবি লেখায় ফুটিয়ে তুললেন না। কেন? এ সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকাররাও প্রায় নীরব। তাহলে কি এই ধারণা করে নিতে হবে, তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে দারিদ্র্যকে ঘৃণাই করেছিলেন? অনুমান ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। যিনি এত বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, যাঁর চোখে কিছুই এড়াত না, তাঁর এই ভুল এ তো ভাবা যায় না। যাই হোক, গরীব এই দেশ, চিরকালই গরীব। মানুষের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সবই নির্ভর করে স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর। বরেণ্য লেখক এদিকটায় মুখ ফিরিয়ে থাকলেন বলে আমরা অনেক বড় জিনিস হারালাম।

রোমান্স তখনই জমে, যখন ইচ্ছা মত খরচ করতে পারা যায়। তাঁর নায়ক নায়িকারা সকলেই অল্প বিস্তর বিত্তশালী ছিল। কেউ কিছু কিছু অসুবিধায় পড়েছিল কিন্তু তা নিয়ে বড় সংঘাত ঘটেনি। নরেন পিতৃঋণের বোঝা নিয়ে দেউলে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার একটি বহুমূল্যবান মাইক্রোস্কোপ ছিল যার

দাম কম নয়। শুধু বলা যেতে পারে, অরক্ষণীয়া গল্পে জ্ঞানদাকে লেখক দরিদ্র করেছেন কিন্তু সেও তার বিয়ের পরিণতি ঘটাবার জন্যে। আর জ্ঞানদা যদি কুরূপা না হত, তাহলে কি অতুল ঐভাবে তাকে অবহেলা করত ?

শরৎচন্দ্রের দোষের বিচার করবার জন্যে আমরা আলোচনায় বসি নি। তাঁর মানসিকতার পর্যালোচনা আমাদের কাম্য। এ কালের লেখকও খুব একটা এই সব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন, এ আমাদের গরীব দেশ। বাপ অর্থের জন্যে যোগ্যপাত্রে মেয়ে দিতে পারে না বলে কত রূপসী সুন্দরী মেয়ের অনাদরে বিয়ে হয়। শরীরে যৌবনের অঙ্কুর ফুটছে অথচ পুষ্টি অভাবে তাব বৃদ্ধি হয় না। প্রথম সন্তান জন্মদান করে মা বুকের দুধ যোগাতে পারে না। কারণ স্বামীর আয় তেমন নেই বলে। এর কিছুটা ইঙ্গিত আমরা পাই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বে। কাশী যাবার পথে শ্রীকান্তই কলকাতাব অফিস যাত্রীদের দেখে রাজলক্ষ্মীকে যেতে যেতে বোঝাচ্ছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিও এদিকে ছিল কিন্তু সে দৃষ্টি ব্যাপক হয়ে প্রকাশ হল না।

বৈচিত্র্য কম। পাঠক পড়বে না? এ কালের লেখকরা যেমন ভাবেন, শরৎচন্দ্রও কি তাই ভেবেছিলেন? ঘটনার পর ঘটনা না ঘটালে পাঠকের চিত্ত উত্তপ্ত হবে না। আর নর নারীর জীবন ভাবনা, সেখানে শুধু হৃদয়ই বড়, হৃদয়ের কারবার দেখালেই পাঠক তার মধ্যে সমাহিত হবেন, সেখানে অর্থ কষ্ট এ সব তুচ্ছ ব্যাপার ঢুকলে পাঠকের মেজাজ পাওয়া যাবে না বলেই কি সেই বরেণ্য লেখকেরও ধারণা হয়েছিল ?

একালের যেমন লেখকরা নায়ককে বেশী করে শুঁড়িখানায় পাঠায়। আর নায়িকা সেই মাতাল স্বামীকে কাঁধে করে ট্যাক্সি থেকে নামায়। আর নায়ক সারারাত্রি প্রলাপ বকে সকালবেলা উঠে তাডাতাড়ি স্নান খাওয়া করে নিয়ে অফিস রওনা হয়।

নায়িকা হয়ত যাবার সময়ে বলে, 'তাড়াতাড়ি ফিরবে তো!' নায়ক এমন দৃষ্টিতে তাকায়, নায়িকা আর কথা বলতে পারে না। যদিও নায়িকা শিক্ষিতা কিন্তু সে আর কি করবে? ভালবেসে বিয়ে করেছিল, নায়কের এ প্রকৃতি তো তার জানা ছিল না।

আমাদের প্রধান বক্তব্য ছিল প্রেম। প্রেম আমাদের এ কালের সাহিত্যিকদের কলমেও নীরব। শরৎচন্দ্র যেমন দারিদ্রকে পরিহার করেছেন, এ কালের লেখকরাও

প্রেমকে খুব বেশী প্রাধান্য দেন না। একটা ছেলে একটা মেয়ের জন্যে প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছে এ উপন্যাস ধ্যুস কেউ পড়বে না।

তাহলে প্রেম সাহিত্যের পাতা থেকেও চলে গেল। নরনারীর মন থেকেও বিদায় নিল। তাহলে প্রেমের স্থান কোথায়? আমরা কি তবে সেই অতীতের প্রেমের দিকে তাকিয়ে থাকব? প্রেম নামে এক ইতিহাস ছিল, আগে-কার নরনারীরা খুব প্রেমে পড়তেন। এখন এসব অচল। মশাই প্রেম যে করব প্রেম করবার সময় কোথায়? অর্থের পিছনে সারাদিন এমনিই ঘুরতে হয় যে ওসব ভাববারও সময় পাই না। এই যে সময়ের ভাবনা, কোমর বেঁধে প্রেম করবার পরিস্থিতি নিয়ে এগিয়ে চলা, একেই কি বলে প্রেম? প্রেম বস্তুটির এমনিই অবস্থা দেখে আজ সত্যিই কান্না পায়। তবে কি হৃদয় শুকিয়ে গেল? নর নারীর মনে আর প্রেমের ছোঁয়া লাগে না? ও কি তবে বাতিলের দলে? সাহিত্যও বলে না, এ কালের নর নারীও প্রেম করে না। সুতরাং প্রেম বাতিলের দলে।

আসলে ওসব কিছুই নয়। প্রেম ঠিকই আছে! নদীর ধারে, গাছতলায়, গলি খুঁজিতে, মাঠে ময়দানে, রেঁস্তরায় সর্বত্রই জোড়ায় জোড়ায় দেখা যায়। তারা পরস্পরকে হৃদয় বিনিময়ও করে, তবে তার প্রকাশ একটু বদলে গেছে। আগে যেমন প্রেমের টানে কার যে কখন কাকে ভাল লাগছে কেউ জানতো না, একমাত্র অন্তর্য্যামী ছাড়া। এখন প্রেমটা চাকরীর ইণ্টারভিউর পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিশোর কিশোরীরা যদি বা ভাল লাগার ওপর নির্ভর করে, যুবক যুবতীরা সেদিকেই ঘেঁসে না। কোন যুবকের অর্থ ভাগ্য ভাল, ভাল চাকরী, বিদেশী ডিগ্রী নিদেন পিতৃ সম্পত্তি থাকলে প্রেমের বাজারে দামী বলে বিকোয়। তেমনি যুবতীর বেলায় সুন্দরী হলে নাইণ্টি পার্সেণ্ট নম্বর পাবার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি তার সঙ্গে পিতৃ দৌলত যুক্ত হয় তাহলে আর কথাই নেই। এই ভাবে প্রেমটাকে ভাগ করতে হল বলে আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বস্তুতান্ত্রিক জগতের সবটাই যে মেকানিক্যাল পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এতো আর অস্বীকার করা যায় না। শরৎচন্দ্রও চরিত্রহীনে উপেন্দ্রর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'শ্বশুরের টাকার কথাটাও তো ভুললে চলবে না। সুরবালার বাবা অগাধ টাকার মালিক, সুরবালা সেই জন্যে উপেন্দ্রকে বলেছিল, 'তুমি কোর্টে রোজ হাজিরা দিতে যাও কত পাও? আমার সামনে রোজ হাজিরা দিও আমি তোমায় মাসে আড়াইশ টাকা দেব।' কিন্তু তবু শরৎচন্দ্র প্রেমের ক্ষেত্র এইভাবে প্রকাশ করেন নি। তাঁর প্রেম আরও

জোয়ালো আর নিষিদ্ধ পথে বিচরণ করেছে। যাদের প্রেমে কোন অধিকার নেই তারাই প্রেম করেছে। আর সমস্যার পর সমস্যা সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে। পতিতা ভালবেসে দেউলে হয়ে গেছে। বিধবা ভালবেসে চোখের জলে ভেসেছে, সধবা ভালবেসে সতীত্ব কলঙ্কিত করেছে। শরৎচন্দ্র যেটুকু কুমারীদের ভাল বাসিয়েছেন, তাদেরও সহজভাবে মিলন ঘটান নি। এই যে বরেণ্য লেখকের মানসিকতা প্রেম সম্বন্ধে, আমরা তার উত্তরে কি বলব?

প্রেম কি তবে ব্যভিচারের প্রথম সোপান? এইভাবে যদি আলোচনা হয়, তাহলে তো প্রেমকে গলা টিপেই মারতে হয়। প্রেমের যে সুষমা, কাব্যের সুষমার মতই তো তার অবস্থান। যার বুকে ভর করে, সে কি ক্ষিপ্ত হয়, না কল্পনার রঙে জগতকে রঙীন করে দয়িতাকে পাবার জন্যে দেহমন সমর্পণ করে? সমাজ জীবনে প্রেমের সোজা সরল পথ কুমারীর মনে প্রেম জাগলে সে প্রেম অবৈধ নয়, তার মূল্য অনস্বীকার্য। এ প্রেমে জগৎ মধুময় হয় পাখী গান গায়, গাছে ফুল ফোটে, আকাশে চাঁদ ওঠে। যদি নরনারীর জীবনে কোন বাধা না থাকে, তাহলে মিলন সার্থক হয়। কিন্তু প্রেম কি তবে পাত্রপাত্রীর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন দেখে জীবনে আসবে? বৈধ-অবৈধর চিন্তা করে তারপর তার আসন বিস্তার করবে? এ ভাবে করে না বলেই শরৎচন্দ্র প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁর রচনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়েছেন। বাধা প্রচণ্ড বাধা। বৈধ প্রেমের চেয়ে অবৈধ প্রেমই তাঁকে আগ্রহ জাগিয়েছে।

বিধবার মনেও যে প্রেমের সঞ্চার হয়, আমরা প্রথম জানলাম তাঁর গল্পে।

মাধবী, রমা, হেমনলিনীর মত মেয়ে যে সমাজে অগুণতি, তা তিনিই দেখালেন। বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহ প্রচলন করবার জন্যে যে আন্দোলন জাগিয়েছিলেন সে এই যুবতী, কিশোরীদের অশ্রুসজল কাতর চাউনি দেখেই। আর শরৎচন্দ্র সেই বিধবাদের হৃদয়ের করুণ চিত্র মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এই দেখে আঁতকে উঠল কিন্তু অস্বীকার করতে পারল না।

প্রেম কিভাবে বরেণ্য লেখকের হাতে খেলা করেছে তাই লক্ষ্য করবার মত। অনূঢ়া মেয়েদেরও প্রেমের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছেন। পার্বতী দেবদাসকে ভালবেসে পেল না। না পেয়েছে পার্বতীরও তার জন্যে কোন মাথা ব্যথা দেখা গেল না। কিন্তু তার হৃদয়ের আয়নায় যার ছবি একবার আঁকা হয়েছে তাকে সরায় কে? পার্বতী দাপটের সঙ্গে বলল, 'যাকে ভাল বেসেছি আপন করে

নিয়েছি, তাকে আমার মন থেকে সরায় কে ?' একটি বিবাহিতা মেয়ের মনের আকাশে যে অন্য পুরুষের ছায়া ধরা থাকল, সে তো দ্বিচারিণী কিন্তু তাকে দ্বিচারিণী বলবার স্পর্দ্ধা কার ? এ তো পার্বতীর প্রেমেরই জয়।

পরিণীতাতে ললিতাও সেই প্রেমেরই আসন পূর্ণ করেছে। ভালবাসা হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে মনের মধ্যে ছায়াপাত করত। কিন্তু যখনই গিরীন এল, আর তার অযথা মেশামেশি দেখে কিশোরী ললিতার মনে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল, আর শেখরের অযথা অভিমানে একেবারে হৃদয়ের মধ্যে নিটোল রূপ পেল। তারপর আর গোপনতার বেড়া থাকল না, পরস্পরের হৃদয়ের মাঝে ধরা পড়ে গেল। আর তখনই শেখর খেলাচ্ছলে মাল্যদান করে ফেলল। কিন্তু এই খেলা যে কত বড় খেলা, শেখর জানত না বটে কিন্তু ললিতার অজানা ছিল না। কে বলে শরৎচন্দ্র প্রেমের উপন্যাস লেখেন নি ? এ সব প্রেম তবে কিসের প্রেম ? নরনারীর হৃদয়ের কারবারে কি এই মহামূল্য সওদার বেচাকেনা হয় নি ? চন্দ্রনাথ খুড়োর ওপর রাগ করে কাশী বেড়াতে গিয়েছিল, সরযূ তখন খুবই ছোট কিন্তু সেই ছোট সরযূ কি বিবাহিত জীবনের পর স্বামীকে ভালবাসে নি ? শুধু সে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিতে ভয় পেয়েছিল, কারণ মায়ের ঘটনা তাকে বিড়ম্বিত করেছিল।

শরৎচন্দ্র নারী সত্তার ওপর বেশী বিচরণ করেছেন। নারী মনের বিভিন্ন অবস্থা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই নারী কখনও কুমারী, কখনও সধবা, কখনও বিধবা কখনও পতিতা। সব অবস্থার সঙ্গে তিনি মোকাবিলা করেছেন। পুরুষের আর জীবন কি ? অর্থভাগ্য, স্ত্রীভাগ্য, যশভাগ্য এই হলেই জীবন তাদের পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু নারীর অবস্থা কখনও এক থাকে না। তাই তাঁর কলম নারীর জন্যেই চিন্তিত ছিল।

'স্বামী' গল্পে সৌদামিনী কুমারী ছিল কিন্তু কুমারী মনে জমিদার নন্দনের ছায়া পড়ল। যে বয়সে মন একটু ছোঁয়াচ চায়, কাছে যেতে চায়, কেউ জড়িয়ে ধরুক তাও মন চায়, সেই চাওয়া পূর্ণ করেছিল নরেন। তাকেই তো প্রেম বলা হবে কিন্তু যখন সদুর বিয়ে হল, স্বামীকে দেখে তার মন স্বামীর দিকেই ঝুঁকল কিন্তু মন তার নরেনের জন্যেও পড়ে থাকল। তারপর স্বামী, নরেন দু'জনের প্রেম পাল্লায় তুলে সদু দেখল, স্বামীর পাল্লাই ভারী হয়ে উঠেছে। এখানেও সেই পার্বতীর মত সদুর অবস্থা। তবে দেবদাসকে পার্বতী যতখানি ভালবেসেছিল, সদু নরেনকে ততখানি ভালবাসে নি। আর নরেনের চাওয়াটা প্রেমের পর্যায়

পড়ে না, তার চাওয়াটা দেহকেন্দ্রিক প্রেম। সেইজন্যে শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত পবিত্র প্রেমের নজীর আনলেন স্বামীর সঙ্গে মিলন টেনে।

আগেই উক্ত হয়েছে, দত্তার বিজয়া ও নরেনের প্রেম। পতিতা নারীর প্রেমের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, চন্দ্রমুখীর প্রেম। তবে এটা যেন একটু জোর করেই ঘটানো হয়েছে। দেবদাস ঘৃণা করেছিল বলে চন্দ্রমুখী প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করব। বারবনিতা নারী যে ভালবাসে, সে অভিজ্ঞতা নিশ্চয় শরৎচন্দ্র আহরণ করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রমুখী যেভাবে নিজের রূপ-যৌবনের বেসাতি ছেড়ে দিয়ে এক পুরুষে মন সম্পূর্ণ করেছিল, সে সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থেকে যায়। তবে দেবদাসের টাকা ছিল, পতিতা নারী টাকা পছন্দ করে, আর নিজের স্থায়িত্ব। সে চন্দ্রমুখী দেবদাসের কাছ থেকে পেয়েছিল। চন্দ্রমুখীর মত একেবারে জাত বেশ্যার দেখা আর শরৎ সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। যাই হোক এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনার ইচ্ছা আছে। পতিতা নারী বলতে কারা? যারা ঘর ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে থাকে এবং যে কোন কারণেই হোক দুর্ভাগ্যের শিকার হয়। এই ধরণের চরিত্র চন্দ্রনাথে সরযূর মা'র। রাখাল দাসকে নিশ্চয় আমরা বিস্মৃত হই নি। যে রাখাল মদ্যপ, মিথ্যাবাদী, অভদ্র, তাকে ভর করে সরযূর মা কি ভাবে ঘর ছেড়েছিল বিস্মিত হতে হয়। এ কি তবে প্রেম? এই ধরণের প্রেম শুধু গল্প উপন্যাসে সম্ভব না বাস্তব জীবনেও ঘটে? অবশ্য নারী চরিত্র বড়ই দুর্জ্ঞেয়। কখন যে নারী কাকে ভর করে নারী নিজেই তা জানে না। সে কথা তো শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে সবিতার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'আমি রমণীবাবুর কাছে এই তের বছর কেন থাকলাম আমি নিজেই জানি না।' তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নারীর বাইরেটা স্থির, ভেতরটা অস্থির। সে নিজেই জানে না সে কখন কি করে? আমরা জানি, নারী সহজে ভালবাসে না কিন্তু যখন বাসে সে ভালবাসার তুলনা হয় না।

শরৎচন্দ্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নারী চরিত্র পযবেক্ষণ করেছিলেন। জীবনের তাঁর প্রায় সময় তাতেই ব্যয় হয়ে গেছে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল যে তিনি গল্পের আকারে প্রকাশ করেছেন, অন্তত নারীরা তার প্রতিবাদ করেনি, তাতেই মনে হয়, মেয়েদের নিজেদের স্বভাবের দর্পণে তারা ক্ষুব্ধ নয়। আজও তাঁর বহু উপন্যাস নিয়ে শিক্ষিত নারীদের মধ্যে আলোচনা হয়, তারা কই absurd বলে তো ফেলে দেয় না? যাই হোক আমরা পতিতার প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করছি।

পতিতাও যে মানুষ, মানুষ নয় মেয়েমানুষ, তাদেরও যে আশা আকাঙ্খা আছে, সে কথা শরৎচন্দ্রই প্রথম দেখালেন। শুভদায় ক্যাতায়িনী হারাণকে ভালবেসে দশ টাকা দিয়েছিল না রাগ করে দিয়েছিল তাও আমরা জানি। 'টাকা যখন নেই কেন এসব জায়গায় আসো বলো তো, যাও দশ টাকা দিচ্ছি ছেলে বৌকে গিয়ে খাইও আর পারত এ সব জায়গায় এস না।' পতিতা হলেও যে নারী তার মনে দয়া মায়া আছে এ কথা জেনেই শরৎচন্দ্র কাতুর মুখ দিয়ে ঐ কথা প্রকাশ করেছিলেন। কেন সাবিত্রীকে আমরা দেখি না, সাবিত্রীর কথা ছেড়ে দিই, মোক্ষদা তো বড় বাড়ীর মানুষটিকে এতটুকু ঘৃণা করে নি। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের প্যাটার্ণ প্রায় এক কিন্তু তাদের বিভিন্ন ভূমিকার জন্যে তাদের ব্যবহারও পালটে গেছে। যে যেমনটি তার মুখে তেমন কথা দিয়েছেন। বরং যে সব নারী সমাজে অপাংক্তেয়, তারাই যেন ভালবাসায়, সেবায়, মমতায় অনন্যা হয়ে উঠেছে। এরা যে কত ভাল এই দেখাবার জন্যে যেন শরৎচন্দ্র উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু সে যে গল্পের মধ্যেই থেকে গেছে এ আজ আমরা দেখি। সাবিত্রীর মত সুন্দরী যুবতী ভদ্রঘরের ঝি দেখলেও আমরা ঝিই বলি, তাকে আর কোন আসন দিই না। বরং কিরণময়ী আমাদের কাছে সমবেদনা পেয়েছে। তার প্রেম যে সার্থক হল না এর জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করেছি। লক্ষ লক্ষ কিরণময়ী আমাদের সমাজে ছড়িয়ে আছে কিন্তু একটিও সাবিত্রীর দেখা পাই না। পেলেও তাকে স্বীকার করবার জন্যে এই আধুনিক সমাজও বসে নেই। কামিনী বাড়ীওয়ালী যখন কিরণময়ীকে বেশ্যা বলে আখ্যা দিল, তখন কিরণময়ী চমকে উঠেছিল। কেন? কিরণময়ী কি ধীরে ধীরে বেশ্যাই হয়ে যাচ্ছিল না? এ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করব। শুধু এইটুকুই এখানে বলা যেতে পারে, এই ভাবেই তো মেয়েরা বেশ্যা হয়ে যায়। বেশ্যা তো জন্মের পরই হয় না। শরৎচন্দ্র এখানেই কিরণময়ীকে থামিয়ে দিয়েছেন, অন্য কেউ হলে হয়ত কিরণময়ীকে বারাঙ্গনালয়ে পাঠিয়ে দিত। নারী ভালবাসে সে বুঝেই হোক বা অবুঝেই হোক যৌবনের উদ্দামতা তাকে অস্থির করে, তখন সে সামনে যাকে পায় তাকে ভর করে। এর নাম প্রেম কিনা আমরা জানি না। তবে প্রচলিত অর্থে তাকে প্রেমই বলা হয়। নারী সেই প্রেমে যে কোন পুরুষের ওপর তার যৌবনের ক্ষুধা মেটায়, সেই পুরুষ যদি ভদ্র, বিশিষ্ট, ভালবাসায় মুগ্ধ হয়, নারী বেঁচে যায়, তার ঘর সুন্দর হয়, নয়ত তার স্থান ঐ বারাঙ্গনালয় ভবনে। এই ভাবেই চিরকাল চলে আসছে। শরৎচন্দ্র এই কাল ভাঙতে চেয়েছেন। বিধবারা সমাজে কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্য

অবলম্বন করবে। কিন্তু যে বিধবা যুবতী সুন্দরী, তার আশে পাশে মৌমাছির দল ঘুরে বেড়াবেই। কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে সেই মৌমাছিদের। পদস্খলন হবেই। আর যারা এই পদস্খলনের জন্যে দায়ী তারাই পঞ্চায়েত আহবান করে বিচার করবে সেই বিধবা কুলটার। শরৎচন্দ্র যেন বারবনিতালয়ে গিয়ে গিয়ে প্রতিটি মেয়ের কাছ থেকে তাদের পদস্খলনের গল্প শুনে শুনে নারীদের কল্পনা করেছেন। তাদের লাঞ্ছনার ইতিহাস কলমে তুলে এনেছেন।

'নিষ্কৃতি' গল্পের শৈলজাও নারী কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব যে কত বড় ছিল, সে কথা ভাবাও যায় না কিন্তু তার এক দিক বড় দুর্বল ছিল, সে হল তারা পরের অন্নে প্রতিপালিত। কিন্তু সে কথা বড়জা সিদ্ধেশ্বরী ও বড়ঠাকুর গিরিশ স্বীকার করে না। যেন শৈল না থাকলে এ বাড়ীর সচল সংসার কানা হয়ে যাবে এই মনে হয়। সিদ্ধেশ্বরী ছোটজাকে আপন কন্যার মত ভালবাসত। বড়ঠাকুর গিরিশও তাই কিন্তু তার ভালবাসা অপ্রকাশ ছিল। তারপর যে সংঘর্ষ ঘটল, সেই নিয়ে গল্প। এবং পরিণতি এতই সুন্দর যে চোখে জল রাখা যায় না। এই ধরণের প্রেমের উপাখ্যান শরৎচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব। নর নারীর হৃদয় যে শুধু দয়িতের আকাঙ্খায় ভালবাসা প্রকাশ করে না, সংসারে হৃদয় অনেকভাবেই প্রকাশ হয়, এ উপন্যাস তার প্রমাণ। এও শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। একান্নবর্তী পরিবার দিন দিন ভাঙনের পথে দেখে বিন্দুর ছেলে, বামের সুমতি, বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় নি। আজ আর একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায় না। আর সে ভালবাসাও নেই। রামলালের মত দুষ্টু ছেলে অবশ্য দেখা যায় কিন্তু নারায়নীকে তারা ভালবাসে না। এখনকার রামলালেরা তাদের দুষ্টুমির পথ পরিবর্তন করেছে।

শরৎচন্দ্র নারী মুক্তি নিয়ে কি আন্দোলন করেছিলেন, তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসই তার প্রমাণ। শেষ প্রশ্ন যেন লেখকের শেষেরই প্রশ্ন। শেষ বয়েসের লেখা। প্রকাশ হয় ১৯৩১ সালের মে মাসে। আর তিনি এতদিন যে সব নারীদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন, কমল যেন তাদের প্রতিনিধি হয়ে এসে সভ্য সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চেয়েছে। বিবাহ কি? কিছু নয়। বিবাহ দিয়ে সমাজকে বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আসলে কি সে বাঁধা পড়েছে? মানুষের মনকে যতই মন্ত্র দিয়ে, ধর্ম দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করা হোক সে বাঁধা মানে না। সমাজের চিরন্তন প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে যেন কমল দাঁড়িয়ে সমাজকেই শাসিয়েছে। 'তোমরা সভ্য ভব্য মানুষ, সুন্দর পোষাক পরে, মার্জিত ভাষায় কথা

বলে যে সমাজকে বুকে আঁকড়ে রেখেছ, দেখো সে আসলে কিছু নয়, সেও তোমাকে মুখ ভেংচাচ্ছে।' কমল নিজের জন্ম ইতিহাস যেভাবে অবলীলাক্রমে বলে গেল, অজিত সহ্য করতে পারে নি কিন্তু পাঁকেই যে পদ্ম ফোটে, এ তো আর কারুর অজানা নয়। কমল অসামান্য রূপের অধিকারী, নারীর রূপ তার একটা বড় সার্টিফিকেট, তাকে যে কেউই ফেলতে পারবে না সে তা জানত, তাই শিবনাথের চলে যাওয়াতেও তার মনে কোন অনুতাপ আসে নি। শুধু বেদনা সৃষ্টি হয়েছে। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস লিখে বলতে চেয়েছেন, যার মন যেখানে বাঁধা পড়ে, তার সেখানেই স্বর্গ, সমাজ টমাজ ও সব দুর্বলের ভরণ, আসলে যারা সবল তারা সমাজ মানবে না।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমরা হয়তো এক মত হতে পারব না, কারণ মানুষ যদি একটা নিয়ম ধরে না চলে তাহলে সে তো স্বেচ্ছাচারিতা থামাতে পারবে না। নিয়মশৃঙ্খলা না থাকলে কি সংসারে মঙ্গল সাধন হয়? তবে এইটুকু আমরা উদার মনে গ্রহণ করবো, জাত-বেজাত জন্ম ইতিহাস এ সব দেখে মানুষ বিচার করা উচিত নয়। মানুষ মানুষই, তার ব্যবহার, তার প্রকৃতি সেটাই মানুষের স্বরূপ। এই স্বরূপই মানুষকে চিনিয়ে দেবে তাকে নিয়ে ভবিষ্যতে ঘর বাঁধা যায় কি না। সংসারে এই মানুষেরই প্রয়োজন, যার ভেতরে আছে অফুরন্ত হৃদয়, যে সেবায়, ধর্মে, জ্ঞানে, মমতায় মানুষ জন্মের সার্থকতা প্রমাণ করবে।

শরৎচন্দ্রের কাল আজ গত। মানুষের সমাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এক একটা প্রজন্ম গত হচ্ছে, আর মানুষের মূল্যবোধ দারুণভাবে পালটে যাচ্ছে। শরৎচন্দ্র যার জন্যে অভিযান করেছিলেন, সে উদার সমাজের রূপ যেন দিনের পর দিন সেই সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে।

আমরা নর নারীর জন্ম নিয়ে মাথা ঘামাই না। প্রথমে একটু চমকানি আসে, তারপর সহজভাবেই আমরা সব কিছু মেনে নিই। মেনে নেওয়ার মধ্যে কোন বিকার সৃষ্টি হয় না। আমরা তাদের ঘরে সহজে খানাপিনা করি এবং তাদের বন্ধুত্ব কামনা করে আনন্দের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাই। শহরে এটা একেবারেই সহজ হয়ে গেছে, শুধু গ্রামে এখনও ঘোঁট হয়, তা সে হয়তো ধীরে ধীরে একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। আর আমরা হয়ত দেখব, নর নারীর জন্ম ইতিহাস, অতীত নিয়ে কেউই কোন চিন্তা করছে না, তার ব্যবহার, তার স্বভাব, তার জীবনমানই সকলের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে।

প্রেমটা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবনে যেমন উদ্দেশ্যমূলক প্রেম ছিল, তার

রূপান্তর ঘটবে। প্রেমের টানেই নর নারী পরস্পরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। এই প্রজন্মের ইঙ্গিত হয়ত এখনও চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সে কালের আর বুঝি দেরি নেই। আমরা এই বরেণ্য লেখকের ভাবনা, চিন্তা, দুঃখ, বেদনা, বিশেষ করে তাঁর নারীজাতির ওপর যে কাতরতা তিনি প্রকাশ করেছেন, সেই নারীজাতির মুক্তি বুঝি আর দূরে নেই। প্রেম দিয়েই যে প্রেমকে পাওয়া যায়, এ যেন ধীরে ধীরে নরনারীর মধ্যে জেগে উঠছে। তাই বলব, প্রেম আর ইতিহাস হয়ে থাকবে না। সামনে যা ঘোলা জলের স্রোত চলেছে, সে স্রোত চলে গেলে নির্মল জলই পাওয়া যাবে। তবে তার জন্যে আমাদের আরও কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্যই মানব মনের আসল প্রশান্তি।

শরৎচন্দ্র বার বার তাঁর প্রায় রচনায় বাল্য প্রেমের নজীর তুলেছেন, এটা তাঁর নিজস্ব মানসিকতার একটা দুর্বল অংশ। বাল্য প্রেম না থাকলে কি পরিণত বয়সে নর নারী পরস্পরকে ভালবাসে না? প্রেম তো সেজে গুজে আসে না, সে যে [illegible] কার ওপর ভর করে শরৎচন্দ্র তো নিজেই জানতেন। তবে কেন পিয়ারী বাঈজী শ্রীকান্তকে দেখে বাল্য প্রেমের নজীর তুলল। আর শ্রীকান্তরও মনে পড়ে গেল, এই মেয়েটাই একদিন তাকে বৈঁচিফুলের মালা পরিয়ে দিত। এসব কল্পনা না করে যদি শ্রীকান্তর সাহস দেখে পিয়ারী বাঈজী তাকে ভালবাসত ক্ষতি কি ছিল? নারী সে বাঈজী, পতিতা, সধবা, বিধবা যাই হোক, সে তো নারীই। নারী ধর্মে নারীরা সাহসীকেই বেশী ভালবাসে। শ্রীকান্ত ঐ গভীর রাত্রে সবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যে শ্মশানে গিয়েছিল, সেই দুঃসাহসই তো কোমল নারীর মনে প্রেমের সঞ্চার করে। কিন্তু শরৎচন্দ্র বোধ হয় এই সাহসে অত বড় একজন নামকরা বাঈজীকে এক দুঃস্থ বাউণ্ডুলে লোকের প্রেমে ফেলতে সাহস করেন নি। তাঁর বাস্তব বুদ্ধি তাঁকে পীড়িত করেছিল, সেইজন্যে পূর্ব পরিচয়ের জের টেনে এনেছিলেন। লেখক যখন গল্প বানান, তাঁর মাথার মধ্যে ঘোরে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি পাঠক বিশ্বাস করবে কি না! কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে একজন শক্তিমান লেখক, তাঁর এ দুর্বলতা খুবই অক্ষমার যোগ্য।

অবশ্য এটা বলা যায়, তিনি শ্রীকান্তকে দিয়ে দীর্ঘ এক ভ্রমণকাহিনী ফেঁদেছিলেন। সেখানে রাজলক্ষ্মী প্রধান চরিত্র। একটি নটীর মনের প্রেম, বার বার সমাজের বাইরে চলে গিয়েও যে সমাজে ফিরে আসতে চাইছে, এই মানসিকতার ওপর রূপ দেবেন বলেই ঐ বাল্য প্রেমের নজীর তুলেছেন।

বিদেশে গেলে যেমন চেনা লোক দেখলে পরমাত্মীয় মনে হয়, আর তার সঙ্গে ওঠাবসা করতে যেমন কোন দ্বিধা জাগে না, তেমনি রাজলক্ষ্মীর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আমরা কি রাজলক্ষ্মীকে ব্যভিচারিনী বলবো? না, কারণ দৈহিক আকাঙ্ক্ষা যখন তার মনে ভয় জাগিয়েছে, তখনই সে শ্রীকান্তকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 'যাও তুমি চলে যাও, আমার ছেলে বঙ্কু রয়েছে না?' আবার বঙ্কু, রতনের সামনেও রাজলক্ষ্মী নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে নারীর মনে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় এই অংশই তার প্রমাণ। এই যে বাঈজীর মানসিকতা ও এক সাধারণ গৃহস্থ নারীর মানসিকতা দুয়ের মাঝখানে রাজলক্ষ্মী নিজের সংঘাতময় জীবন নিয়ে তবু মাঝে মাঝে যে সব বাধা ত্যাগ করেছে, সমাজ মানে নি, লোক লজ্জা দেখে নি, নিজের চাহিদা পূরণের জন্যে ছুটে ছুটে গেছে, এর তুলনা হয় না। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলেছে, 'তোমার অসুখ শুনে আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকব, এ কেমন করে বললে তুমি?'

অনেকে শরৎচন্দ্রকে বলেন, ইমোশনাল রাইটার। সেন্টিমেণ্ট জাগিয়ে মানুষের মনে সুড়সুড়ি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলব, নর নারীর প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা না থাকলে কি মানব জন্ম সার্থক হয়? সংসারের সর্বক্ষেত্রেই তো ঐ সব কোমল অংশই খেলা করে। বাপ মা যদি সন্তানকে স্নেহ না করেন, তাহলে সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠন, তার বড় হওয়ার পথ সুগম হয় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি ভালবাসার নিগূঢ় বন্ধন না থাকে, শুধু শয্যাই যদি তাদের প্রধান হয়, সে সম্বন্ধ কি চিরদিন থাকে? মানব সমাজের হৃদয়ই বড়। সেই হৃদয়ের সন্ধানে ডুবুরী হয়ে শরৎচন্দ্র সমুদ্রের তলা থেকে মুক্তো তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। তার জন্যে একটু ইমোশন, চোখের জল, আর সেন্টিমেণ্ট তো অবশ্যই দরকার। শিল্পী যেমন নিজের কল্পনার ছবি প্রকাশ করার সময়ে নিজের হৃদয়ের ছবিই তুলে ধরেন, তেমনি লেখকের মনও সেই হৃদয় সন্ধানী। নিজের ভেতর কান্নার উৎস না থাকলে কি অপরকে কাঁদানো যায়? কোন এক বড় লেখকের লেখায় পড়েছিলাম, আগে গল্পটা ভাববে, তারপর গল্পের চরিত্রগুলি। তারপর সেই সব চরিত্রের গভীরে ঢুকে যাবে। হজম না করলে চরিত্রগুলি ঠিক ঠিক ভাবে কলম দিয়ে বেরিয়ে আসবে না। শরৎচন্দ্র শুধু হজম করেন নি, তার পুষ্টিটাও শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তারপর কলম ধরেছেন। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেন স্বামী স্ত্রীর এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধই উত্তরকালে সংসারে সমস্ত মঙ্গল এনে দেবে, এই তাঁর মনে

হয়েছিল। স্বামী স্ত্রী নাও যদি হয়, নর নারী স্বামী স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে একমনে এক ধ্যানে সারাজীবন কাটিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও তাই ছিল, তাই শেষ জীবনে তাঁর মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। নারী সুখী হয় তখনই, যখন সে মনের মত সঙ্গী পায়। ঈশ্বর পুরুষকে দিয়েছেন বহু স্বাধীনতা, সে ইচ্ছে করলে বহু নারীর সঙ্গে তার ভোগ লালসা মেটাতে পারে কিন্তু নারীর বেলায় সে সব চলবে না। নারীকে এক পুরুষে মন রাখতে হবে। একরকম বাধ্যতামূলক সে নীতি।

এ সব নিয়ে একালের শিক্ষিতা মেয়েরাও আন্দোলন গড়ে তোলে। পুরুষের বেলায় সাতখুন মাপ, আর আমাদের বেলায় যত শাসন! কিন্তু ঐ পর্যন্ত। শিক্ষিত নারী তার বেশি এগোতে পারে না। সংস্কারাচ্ছন্ন মন, বিবেকের আঘাতের জন্যে তাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। সে সমস্যা নিয়েও শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' লিখেছেন। নারী যে কোন কারণে পা ফসকালেই তার আর সমাজে ফেরা হয় না। ফিরতে চাইলেও নারী নিজেই সরে দাঁড়ায়। 'আমার দেহ অপবিত্র হয়ে গেছে, আমি নষ্ট হয়ে গেছি, এ দেহ ভাল কাজে লাগবে না।'

এ সংস্কার আজও নারীর মনে। তাই স্বামী স্ত্রীর বন্ধনই অচ্ছেদ্য বন্ধন। যারা এই বন্ধন পায় না, সে সব নারীর জীবন ভাবনা সাহিত্যও ভাবতে পারে না।

শুভদা হারাণকে এত ভালবাসত কিন্তু তার ভালবাসা যেন বাধ্যতামূলক, হিন্দু নারীর আর কোন গতি নেই বলে যেন সে ভালবাসত। আবার ললনা বিধবা হয়ে মুক্তির সন্ধানে কলকাতায় যেতে চাইল। কেন চাইল? সে দেহ বিক্রী করে সংসারের উপকার করবে। এখানে ললনার মত মেয়ে সংসারে যেমন বিরল নয়, শুভদার মত স্বামী অনুরাগিনী কম দেখা যায় না। তবে সেকালে হয়ত এমনি স্বামী অনুরাগিনীই বেশি দেখা যেত। যে স্বামী মদ্যপ, নেশাখোর, মিথ্যেবাদী, সংসারের জন্যে একটুও ভাবে না। এ কালে অত ভক্তির উৎকর্ষ চোখে পড়ে না। বরং অন্যরূপ দেখা যায়। শুভদার মত মেয়েরা এ যুগে আত্মহত্যা করে।

'সতী' গল্পে নির্মলা হরিশের পাদোদক ভিন্ন জলগ্রহণ করত না, সেই নির্মলা স্বামীকে সন্দেহের বিষে জর্জরিত করত। স্বামী মাঝে মাঝে বিদ্রোহ জাগাতে যেত, আবার স্ত্রীর ওপর সমবেদনায় নিজেই ক্ষমা করত। নর নারীর জীবনে সমস্যা অনেক। এ সমস্যা যতদিন মানব জন্ম থাকবে, থেকেই যাবে। বরং

আরও নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং তা সমাধানের চেষ্টা হবে। তবে প্রেম যদি তার কোমল উপস্থিতি জাহির করে, সে নর নারীর হৃদয়ে নিত্য বিচরণ করে যায়, দৈহিক সুখকে প্রাধান্য না দেয়, তাহলে এ সব সমস্যা আর মাথা তুলে দাঁড়াবে না। আমরা সাধারণ জীবনে তো সংসারের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে প্রেমকেই সম্বল করি। একের জন্যে অপরের যে মমতা থাকে, সে তো বন্ধনের জন্যেই সৃষ্টি হয়। অনেকের মুখে শোনা যায়, বিশেষ করে পুরুষ বলে, 'সারাজীবন এক নারীকে নিয়ে কাটানো, বড় একঘেয়ে লাগে।' নারীর মুখ দিয়ে এ কথা বেরোয় না, কিন্তু তারও কি মনে এ কথা জাগে না? জাগে বৈকি? কিন্তু করার তো কিছু নেই। য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে সেই জন্যে বিবাহ বিচ্ছেদ চালু আছে, ওরা সমাজের এই একঘেয়েমিতাকে পরিহার করেছে। একজন নারী যেমন দশ পনেরোটা স্বামী অক্লেশে পালটাতে পারে, এ দেশের নারী পারে না। এ দেশ ভাল না ওদেশ ভাল এই আলোচনা করলে কোনই সমাধান হয় না। স্বামী পালটালে সুখ আসে কি না এ দেশের নারী ভেবে পায় না। বরং সে নিজেই অতীতকে ভুলতে পারে না বলে জ্বালায় মরে। ওদেশের নারীর মত বর্তমান নির্ভর এ দেশের নারী নয়। এ সব চিন্তা এই অ.ত আধুনিক কালে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। আর এর উত্তর এই দেশের সনাতন ধারাকে নস্যাৎ করে বিপ্লব আনতে পারছে না। শরৎচন্দ্র এই সমস্যার কিছুটা ইঙ্গিত শেষপ্রশ্নে আনবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে বঙ্গদেশে নয়, বঙ্গদেশের বাইরে সেই সুদূর আগ্রাতে চলে গেছেন। নারীকে যেভাবে তিনি হাজির করেছেন, সে অন্য এক নতুন সমাজের নারী। যে পুরুষের দৈহিক আকাঙ্খাকে খুব বেশি আমল দেয় না। দৈহিক সম্পর্ক যদি ঘটে ঘটুক না, মুহূর্ত আসে, সে মুহূর্ত অনেক সময়ে ভালোর ছদ্মবেশে আসে, আবার খারাপও হয়ে যায়। বিবাহ দিয়ে যে সম্বন্ধটাকে আমাদের শাস্ত্রকাররা বাঁধবার চেষ্টা করেছেন, আসলে মনের মিল থাকলে বন্ধন কি করবে? এ প্রশ্ন আজও, এমনকি ভবিষ্যৎকালেও এর সমাধান হবে না। তাই প্রেমের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রেম দিয়ে বন্ধন দৃঢ় হলে কোন বন্ধন-ই দরকার হয় না। আমরা সেই প্রেমের সাধনাই করব কিন্তু দিন দিন নৈতিক, সামাজিক বিবর্তন যেভাবে মূল্যবোধ পালটে দিচ্ছে প্রেমের স্থান কতখানি দৃঢ় থাকবে এ সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। একটা গল্প দিয়ে প্রেমের শেষ কথাটা বলার চেষ্টা করি। একদিন আমার এক জানাশুনা ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে গেছি। গিয়ে হতবাক, সেই বিল্ডিংয়ের তেতলায় কি যেন

গোলমাল হয়েছে, পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা দেখেও হতবাক হলাম। ঐ তেতলায় একটি মেয়ে সামনের ফ্ল্যাটের একটি বাউণ্ডুলে ছেলের প্রেমে পড়েছিল। ওরা গোপনে খুব ঘোরাঘুরি করত, সিনেমা দেখত। একদিন ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে কার একটি খালি বাড়ীতে তোলে। মেয়েটি বুঝতে পারে ছেলেটির মতলব। সে কোন রকমে পালিয়ে আসে। তারপর ছেলেটি ভীষন রেগে গিয়ে কয়েকটি মস্তান ছেলে নিয়ে মেয়েটির ফ্ল্যাটে আক্রমণ করে। মেয়েটির বাবা বেরিয়ে আসে, 'কি চাই ?'

'মন্দিরাকে চাই।'

'কেন ?'

'ওকে আমি বিয়ে করব।'

মেয়েটির বাবা ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে বলেন, 'কি কর তুমি ?'

'কিছু না। আগে কলেজে পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি।'

প্রিয়নাথবাবু খুব ধৈর্যের সঙ্গে ছেলেটিকে বলেন, 'তা বিয়ে করবে যে খাওয়াবে কি ?'

'আমি এসব জবাব আপনাকে দিতে রাজী নই।'

প্রিয়নাথবাবু বলেন, 'আমার মেয়ে অথচ জবাব দিতে চাও না ?'

'না, ওকে আমি ভালবাসি। ওকে আমি নিয়ে যাব।'

মন্দিরা তখন আতঙ্কে ঘরে বসে কাঁদছে। প্রিয়নাথবাবু ভেতরে গিয়ে মন্দিরাকে ডেকে আনলেন, ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, 'এ তোমায় নিয়ে যেতে চায়, যাবে ?'

মন্দিরা মাথা নেড়ে বলল, 'না বাবা।' কিন্তু ছেলেটি সে কথা শুনল না, মন্দিরার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। প্রিয়নাথবাবু বাধা দিলে অন্য একটি ছেলে তাঁর মুখের ওপর ঠাস্ করে একটা চড় মারল। বলল, 'বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে একেবারে লাশ নামিয়ে দেব।' কিন্তু এই সময়ে মন্দিরার মা ভেতর থেকে স্বামী ও মেয়েকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ছেলেটির রাগ আরও বেড়ে গেল, ছেলেটি ও ছেলেটির বন্ধুরা খুব কিছুক্ষণ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করল, শাসাল, গালাগালি দিল, তারপর চলে গেল।

ভেতরে মন্দিরাকে তার বাবা-মা খুব জেরা করতে লাগলেন। কিন্তু মন্দিরা চোখের জলে একটা কথাই বলল, 'বাবা আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

মন্দিরার মা বললেন, 'লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, কোথায় তোকে পাঠাব ? আর ঐ

ছেলে কি আমাদের আস্ত রাখবে? আমি তখনই বলেছিলাম, এসব করিস্ না, ঐ ছেলেকে লাই দিলে কি সে চুপ করে থাকবে? এখন মাথায় উঠেছে।'

মন্দিরা বলল, 'লাই আমি দিই নি মা।'

মা বললেন, 'আর মুখ নাড়িস্ না মন্দিরা। কত তোকে মানা করেছি, হাজার হোক ও তো ছেলে। নিজের ক্ষমতার কথা ভুলে গেছে। এখন বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়েছে।'

'আমি ওকে বিয়ে করব না মা।' মন্দিরা কাঁদতে কাঁদতে বললো। 'ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। যেমন তুই মেয়ে, ঠিক হত কিন্তু এক পয়সা রোজগার করবার মুরোদ নেই।' মন্দিরার বাবা বলল, 'যাক্ গে যাক্। এখন কি করা যায় তাই বলো।'

মা বললেন, 'কি আর করবে, ওকে আমার বোনের বাড়ী খড়দহে দিয়ে এস।'

'কি বলব?'

মা চিন্তা করে বললেন, 'বলবে ক'টা ছেলে পিছনে লেগেছে, সেইজন্যে রেখে গেলাম। একটা ছেলে দেখতে বলবে।'

মন্দিরার বাবা সেই দিনই মেয়েকে খড়দহে রেখে এলেন। কিন্তু খবরটা কি করে যেন সেই ছেলেটি পেয়ে গেল। পরদিন সন্ধ্যের সময়ে প্রায় কুড়িটি ছেলে নিয়ে এসে মন্দিরাদের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ফেলল। ঘরের মধ্যে ঢুকে বাবা মাকে এমন মার মারল প্রায় আধমরা। কে একটি ছেলে ছুরি তুলেছিল, মন্দিরার প্রেমিক বলল, 'থাক্, মেরে ফেললে পুলিশের ঝামেলা প্রচুর।'

'কিন্তু তোর ফিঁয়াসেঁ?'

মন্দিরার প্রেমিক বলল, 'চুলোয় যাক্। আর একটাকে কি ধরে নিতে পারব না।'

বন্ধুরা হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

এর পরদিন ওদের ফ্লাটে পুলিশ এল। মন্দিরার বাবা-মা হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকেই পুলিশ এসেছিল।

আমার জানাশুনা ভদ্রলোক গল্পটা বলে বললেন, 'মশাই বয়স্থা মেয়ে ঘরে রাখাই ঝামেলা। প্রিয়নাথবাবুর মত নিরীহ লোকও শিকার হলেন।' আমি তখন সে সব কথা ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম ঐ ছেলেটির কথা। এরা কি ধরনের দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে? কিন্তু এ কি সত্যিই প্রেমিক? প্রেমের টানেই এতখানি এগিয়েছিল? কিন্তু অন্তরাত্মা বলল, 'সে সব হলে তো অন্যরকম হত।

এটা একটা দৈহিক সুখের আকর্ষণ। মেয়েটিকে ভোগ করবার জন্যে ছেলেটি উন্মাদ হয়েছিল।'

এ ধরনের সমস্যা শরৎচন্দ্রের কালে বোধ হয় ছিল না কিন্তু এই সমস্যা এখন এ কালে খুবই মাথা চাড়া দিয়েছে। এর জন্যে দায়ী অর্থনৈতিক চাপ। ছেলেটি যদি কোন চাকরী করত, তাহলে তো সমস্যা দেখা দিত না কিন্তু ওর যৌবন এসেছে, যৌবনের তাড়নায় সে তার চাহিদা পূরণ করতে চায়। তাই বলব, একালে এমন সব সমস্যা এসে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, যা সাহিত্য নাগাল পাচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা চিরকালই থাকবে, যতকাল মানব জীবন সচল থাকবে। সাহিত্যিক এই সব সমস্যাগুলি তুলে ধরে জাতির কাছ থেকে এর প্রতিকার চাইবে। ঐ ছেলেটির মানসিকতা, তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অথচ যৌবনের কান্না এ তো ছেলেটির দোষ নয়। সোজা সরল গতিতে ওর জীবনে যা প্রয়োজন এসেছে কিন্তু প্রয়োজন মেটাবার সামর্থ্য ওর নেই। একে প্রেমও বলা যেতে পারে, আবার যৌবনের চাহিদাও বলা যেতে পারে কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্যে মানুষ কিছু করতে পারে না। লেখক তাঁর লেখায় এই সব গল্প এনে তার আলোচনা করতে পারেন। এখানে লেখকেরই দায়িত্ব। মানুষ তো নিমিত্ত মাত্র। মানুষ আলোচনা করতে পারে, সমাধানের পথ তার জানা নেই।

একে ব্যভিচার আখ্যা দেওয়া যাবে না কারণ এ তো অবৈধ সংসর্গ নয়। তবে এ কি? এ একালের একটা নতুন আনকোরা সমস্যা। নারী যেমন সময়ে বিয়ে না করতে পেলে তার মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না, তখন বৈধ অবৈধর প্রশ্ন এসে যায়, তেমনি পুরুষের বেলাতেও তাই। এ সমস্যা আগে অন্যভাবে তার রূপ প্রকাশ করত, এখন অন্য ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এখন বিবাহের বয়স বাড়ানো হয়েছে। উত্তর ত্রিশের আগে ছেলেদের বিয়েব কথা ভাবা হয় না, বিশ বছর উত্তীর্ণ না হলে মেয়েব বিয়ের কথাও আমরা ভাবি না কিন্তু সে জন্যে কাল মানুষের বিচারের ওপর বসে থাকবে না। সে তার আপন মোহিনী শক্তি প্রকাশ করে যাবেই। আর সে চিরকাল তাই করে এসেছে। আমরা শুধু তার নতুন সমস্যার শিকার হয়ে কখনও সাহিত্যে, কখনও সভায় আলোচনাই কবে যাব। কোন সমাধানেই আসতে পারব না।

শরৎচন্দ্রের কালে যে সমস্যা ছিল, সে সমস্যা এখন দিক পরিবর্তন করেছে। আর করেই যাচ্ছে। মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে। ভ্যালুজের দিকে মন চলে যাচ্ছে। আগামী সাহিত্যিকদের কর্তব্য এই সব মূল্য বোধের ওপর চিন্তা করে নর নারীর সমস্যাগুলি তুলে ধরে আলোচনা করা। অবশ্য প্রেম সেখানে প্রধানই হবে। প্রেমের টান না থাকলে কোন সমাধানই সহজবোধ হবে না।

ব্যভিচার

শরৎচন্দ্রের মানসিকতা আলোচনা করতে গিয়ে এ প্রসঙ্গ যে তাঁকে বাদ দিয়ে আলোচনা করা যায় না। ব্যভিচার কি? না, নরনারীর স্খলন। যুগে যুগে ব্যভিচার নিয়ে সাহিত্য শিল্পে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। সমাজ জীবনেও তার উপস্থিতি বহু যুগ ধরে। নারীকে পুরুষ যত শাসনের মধ্যে রাখতে চেয়েছে, সে বারবার সেই শাসন ভেঙেছে এবং আজও সে ভেঙেই চলেছে। কেন? এর জবাব কেউ দিতে পারে না। ব্যভিচার মানে অবৈধ প্রণয় ও যৌন সংসর্গ। নীতির বিরুদ্ধে গেলেই সেটা ব্যভিচার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। নারীকে এই নিয়ে অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু নারীকে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কড়া শাসনে রাখতে চাই সেটাও কি যুক্তি নির্ভর? পুরুষের বেলায় ব্যভিচারের প্রশ্ন আসে না কারণ পুরুষ চিরকাল স্বাধীন, প্রথমত তার দৈহিক কোন পরিবর্তন নেই, দ্বিতীয়ত তার সঙ্গে নারী দেহের মত কোন মাতৃত্ব সৃষ্টি হয় না। এ সব অবশ্য আমাদের মনের ভ্রম। ঈশ্বর নারী পুরুষ দুজনকেই সৃষ্টি করেছেন। দু'জনের নীতিগত কাঠামো আলাদা। একজন সৃষ্টি করে, একজন সৃষ্টির আঁধার হিসাবে কাজে লাগে। পুরুষ না হলে যেমন মানব সৃষ্টি হয় না, নারী না হলেও সৃষ্টি ব্যাহত হয়। বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছুই দান করেছে কিন্তু এই মানব সৃষ্টির কোন বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারে নি। তাই নারী পুরুষের পরস্পরের মূল্যও এ জগতে একই ভাবে তাদের দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু এইখানে আর একটি প্রশ্ন এসে উদয় হয়, নারী তবে এত অবহেলিত কেন? তার উত্তর, পৃথিবী জন্মের পর থেকেই পুরুষই নিয়ন্ত্রিত করে আসছে সব কিছু। পুরুষের বিবেক বুদ্ধি চিন্তা ধারার কাছে নারী বরাবর মাথা নত করে এসেছে। সে জেনে এসেছে, তার নিয়ন্ত্রণকর্তা পুরুষই। পুরুষের খেয়াল খুশির ওপর তাকে চলতে হবে। এই ভাবে পুরুষের খেয়াল খুশি নিয়েই কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সমাজ, সংসার, শাস্ত্র, ইতিহাস সবকিছু তৈরি হয়েছে। আর নারীর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, এই সব শাস্ত্র যা বলেছে, সেই সনাতন রূপ। সুতরাং তারাও এরই আবর্তে নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু একবারও তাদের ধারণা হয় না, এই সব বেদ, পুরাণ ধর্মগ্রন্থে যা সব লেখা হয়েছে, তা পুরুষের। পুরুষ নিশ্চয় নারীর গুণাগুণের কথা ব্যাখ্যা করে লিখবে না। বরং এইভাবেই

পুরুষের রচিত নিয়ম দিয়েই পুরুষ নারীকে শাসন করে এসেছে। আর এই শাসন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

পুরুষ আগে হাতিয়ে নিয়েছে অধিকার, তার রাজত্বে নারী শুধু অনুরক্ত প্রজা। প্রজার বিদ্রোহ পুরুষ কঠোর হাতে দমন করেছে। এই ভাবেই চলে আসছে অনাদি অনন্তকাল ধরে। নারী তাই বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হয় পুরুষের গড়া রাজত্বে। ব্যভিচার নামে অপরাধটাও পুরুষেরই সৃষ্টি। নারী তাই ব্যভিচারিনী হলে পুরুষ কঠোর হস্তে তার সাজা দেয়। যুগ যুগ ধরে নানা গ্রন্থের মধ্যে পুরুষ তাই ফলাও করে লিখে এসেছে নারীর সতীত্বের কি মহিমা? তারা ব্যভিচারিনী হলে কি শাস্তি? নারীরও সেই জন্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, সতীত্বই বুঝি নারীর আসল ধর্ম। ব্যভিচার পাপ, পাপের শাস্তি চরম, আর সেই পাপ করলে কোন ক্ষমা নেই। কিন্তু নারী একবারও ভাবে নি, সে পাপ করায় কে? পুরুষই তো! নারীর রূপ এও ঈশ্বরের সৃষ্টি কিন্তু সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে পুরুষই তো নারীকে টানে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী পুরুষের কোন নিজস্বতা ছিল না, পুরুষ যে কোন নারীর সঙ্গে দৈহিক মিলন করতে পারত এবং সন্তান জন্মালে তার পালনের ক্ষমতা নারীরই। নারী কখনও দাবী করত না, সন্তান পালন যে জন্মদান করেছে তাকে করতে হবে। এও পুরুষের পরিচালন ক্ষমতা। শারীরিক বলে পুরুষ নারীর চেয়ে অনেক বলশালী। এটা ঈশ্বরের দান, নারী তাই সবলের হুমকিতে মাথা তুলত না। তারপর সেই বন্যতা ধীরে ধীরে তরল হয়, ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করে পুরুষ। সেই আইন করল, পুরুষ প্রয়োজনে অনেক নারী সংসর্গ করতে পারবে কিন্তু নারীকে এক পুরুষে খুশি থাকতে হবে। কেন থাকতে হবে এই নিয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচিত হল, এখনও সেইভাবে রচিত হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় দুটি অমূল্য গ্রন্থ বলে প্রচারিত রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যে নারীর সতীত্বই প্রচার করা হয়েছে। নারী সেই পড়ে কেঁদেছে, আর নিজেকে শাসন করেছে। সীতা, সাবিত্রীকে সৃষ্টি করে দেখানো হয়েছে নারীর সতীত্বের কি মহিমা? সীতা যখন জনম দুখিনী, তখন নারী দুঃখ পাওয়ার জন্যে শোক করবে কেন? সীতার মত দুঃখী তো অন্য নারী নয়। সীতার দুঃখ চোখের সামনে ধরে নারীকে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা এই পুরুষই শিখিয়েছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী কিন্তু দ্রৌপদীর লজ্জা এই পুরুষই নিবারণ করেছে। দ্রৌপদীকে নিয়ে যত না আন্দোলন, সীতা সাবিত্রীর মহিমা নিয়ে ততই আন্দোলন হয়েছে। কেন? দ্রৌপদীর মত পঞ্চ স্বামী যেমন ঘেন্নার বস্তু, তেমনি সীতার সতীত্বের প্রমাণ দিতে অগ্নিতে প্রবেশ তার

চেয়ে মহৎ পরিকল্পনা। ভীষ্মদেব আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যে, সেটায় পুরুষের ক্ষমতা দেখানো হয়েছে কিন্তু কাশীরাজের তিন মেয়ে অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকার যৌবন জ্বালা দেখিয়ে কি নারীকে এই বোঝানো হয় নি, তুমিও ওদের মত হবে না। তাই ব্যভিচার কথাটার তাৎপর্য যেভাবে এসেছে, এরই পিছনের একটা আলোচনা পরিস্ফুট হল। আমরা শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারীদের ব্যভিচারের আলোচনায় বসেছি। শরৎচন্দ্রও তো এই মানব সমাজের বিশেষ করে নারীদের মানসিক পর্যালোচনা করেছিলেন। তাঁর কলমে নারীদের বিভিন্ন সমস্যার মানসিকতা যেমন ফুটেছে, তেমনি যারা মহৎ ও মনীষী তাঁরাও এই নারী মনের কান্নাই প্রকাশ করেছেন।

সৃষ্টির আবহকাল থেকে নারী নির্যাতিত হয়ে আসছে। ওদের কথা কেউ শোনে না। ওদের সেই নীরব আর্তির ইতিহাসই তো মহৎ মানুষের মনের মধ্যে ধরা পড়েছে। আর নারী ব্যভিচারিনী কেন হয়, তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে মহতীরা দেখিয়েছেন, নারীর অপরাধ গৌন, অপরাধই নয়। যারা অপরাধ বলে প্রচার করেছে, তারা নারীর বিরুদ্ধ মানসিকতায় শিকল পরাতে চেয়েছে। স্বাধীনতা হারালে যেমন মানুষ মরীয়া হয়ে ওঠে, নারীও স্বাধীনতা পাবার জন্যে দিনের পর দিন চেষ্টা করে এসেছে কিন্তু কে তাদের স্বাধীনতা দেবে? পুরুষ শাসিত দুনিয়ায় নারীর মতের কোন মূল্য নেই। এই ভাবে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যভিচার। নারীও মাঝে মাঝে নিজের নিরুপায় অবস্থার জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমরা সেক্সপীয়রের রচিত হ্যামলেটের মধ্যে দেখি, হ্যামলেটের মা গারটুডের ব্যবহার। কাকা ক্যালুডিয়াসের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে সে ডেনমার্কের সিংহাসন পাইয়ে দিয়েছিল। হ্যামলেট যখন মৃত পিতার আত্মার কাছ থেকে মায়ের ব্যভিচারের কাহিনী শুনল, তার মানসিক অবস্থা নিয়ে সেক্সপীয়র নানা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন। মায়ের এই জঘন্য আদিম লিপ্সা হ্যামলেট পুত্র হয়ে কিভাবে লোকের কাছে প্রচার করবে। মানব জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে মানব জীবন গঠিত। নারী এই মানব জীবনের বাইরে নয়, সেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। হ্যামলেটের মায়ের মানসিকতা যা তা লোভেরই পরিচয় দেয়। ডেনমার্কের সিংহাসনে ক্যালুডিয়াস বসলে গারটুডের সুবিধে হবে। কি সুবিধে হবে? নারী বুঝেছিল, তার ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করবে। নারী ভালবাসার কাঙাল, তার সূক্ষ্ম মনের কোথায় বীণা ঝঙ্কার দেয় সে তা জানে না। হ্যামলেট যখন তার মাকে দায়ী করল, মা কি কেঁদে হ্যামলেটকে বুকে

ধারণ করতে চায় নি? সেখানে নারী নারীত্বের চেয়ে মাতৃত্বকে বড় বলে জেনেছিল।

এ সব ঘটনা উল্লেখ করে মহতী মানুষেরা নারী জীবনের মনের দর্পণ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কেউ যদি খুন করে, কেন খুন করল, তার পিছনে যেমন একটা উদ্দেশ্য থাকে, নারী তো উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় ব্যভিচারিনী হয় না। তারও একটা যুক্তি আছে কিন্তু তবু যে যুক্তিই থাক, নারীকে আমরা ব্যভিচারিণী দেখলে ঘৃণা করি। আর সে চিরকালই বোধ হয় করে আসব।

পাশ্চাত্য দেশেও নারী মুক্তি আজ এসেছে কিন্তু পূর্বে নারীর এই অবৈধ সংসর্গ নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়ে গেছে। নারীরা যুক্তি দেখিয়েছে, 'আমাদেরও কামনা বাসনা পুরুষের চেয়ে কম নয়, তবে পুরুষ যখন বহুমিলনে দোষী হবে না, তবে নারী কেন হবে?' তাই বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে। ব্যভিচারের চেয়ে বাপু তোমরা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিযে অন্য পুরুষ গ্রহণ কর, ব্যভিচার ঘটিয়ে সমাজকে কলুষিত কর না। নারীর ব্যভিচার যেন একজন মানুষ খুন করার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ বলে পুরুষ সমাজ মনে করে। সত্যি কথা, 'আমি একটি নারীকে বিশ্বাস করে আমার ঘর, সন্তান, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেব, আর সে আমার সব ভোগ করে অন্যের সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হবে? আমরা কিছুতেই নারীর এই অবাধ ও অবৈধ সংসর্গ বরদাস্ত করতে পারব না।' বঙ্কিমচন্দ্র যখন কৃষ্ণকান্তের উইল লিখেছিলেন, রোহিণীর ব্যভিচার তিনি সহ্য করতে পারেন নি। আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মন এইভাবে চিবকাল ঘৃণা করে এসেছে নারীর অবৈধ সংসর্গ। কিন্তু এ তো গেল পুরুষেব দিক দিয়ে নারীর অবৈধতা কিন্তু নারীকে আমরা কিভাবে বিচার করেছি? স্বামীর স্ত্রীবিয়োগ হলে বা স্ত্রী রুগ্ন হলে তাকে ত্যাগ করতে পারে। শবৎচন্দ্র শেষপ্রশ্নে শিবনাথকে সেইভাবে চিত্রিত করেছিলেন কিন্তু স্ত্রীর স্বামী বিয়োগ ঘটলে আমরা স্ত্রীকে আর এক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দিই না। কেন? বরং বলি, মাছ, মাংস ত্যাগ করে একাহারী হয়ে নিষ্ঠার মধ্যে জীবন যাপন কর। একি নারীর ওপর আমাদের নীরব বলাৎকার নয়? এইভাবে নিষ্ঠুর নিয়মগুলি বলবৎ করে নারীকে তার সহজ প্রবৃত্তি থেকে আমরা সরিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

যারা এই নিয়মগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মানে, সমাজ তাদের আদর্শ নারীর আখ্যা দেয। আজও সেইভাবে দিয়ে আসছে কিন্তু এভাবে যে আর চলবে না, তারও ইঙ্গিত এই অত্যাধুনিক যুগে একটু একটু করে ভাঙনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

নারীর মনে আজ জ্ঞানের আলো প্রবেশ করেছে। যুগ যুগ ধরে পুরুষের এই গড়া সমাজের বিরুদ্ধে নারী তার ঝাণ্ডা তুলে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সে নির্বাণের আলো আরও কত বছর পরে জ্বলবে সে কেউ জানে না, কারণ নারী নিজেই সংস্কার মুক্ত নয়। সে এখনও পিছনে তাকিয়ে নিজের বিবেককে সংযত করে। নারী নিজেই বলে, তোমরা পুরুষেরা সাতখুন মাপ, আমাদের একটুকুও কেউ সহ্য করবে না। কে করবে না, সে কথা নারী বলতে পারে না, কারণ তার বিবেকই তার পরম শত্রু।

আমরা দুনিয়ার নারী সমাজের কথা বলতে বসিনি। মোটামুটি ভারতীয় নারীর কথাই এখানে বলার উদ্দেশ্য। বিশেষ করে বাংলার নারীর কথা। বাঙালী মেয়েরা এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য নারীর চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের জীবন চিন্তা করে এসেছে। সীমন্তে সিঁদুর একবার পরলে যে সে সিঁদুর পতির আয়ু পর্যন্ত সীমন্তে জ্বলজ্বল করে, পতির সেবাই যে তাদের ধর্ম, এই চিন্তা করে সে আজীবন পতি-ধ্যানেই নিজেকে সংযত করে রাখে। এই ধরণের মেয়েদের সংখ্যা যেমন বাঙ্গালী সমাজে কম নয়, ভারতীয় তথা সমস্ত পশ্চিম উপকূলের নারীদের মধ্যেও দেখা যায়। তবে হিন্দু সমাজের নারীদের মত যে বিবেকের দংশন, অন্য সমাজের মধ্যে তত টা নয়। ব্যভিচার শব্দটা সেইজন্যে হিন্দু নারীদের ঘাড়ে বেশি করে বিজ্ঞাপনের মত ঝুলে থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশের মায়েদের মেয়েরা ভাল স্বামী যোগাড়ের জন্যে মেয়েদের নির্বিবাদে ডেট্ করতে পাঠায়। মায়েদের কথার প্রতিবাদ করলে মায়েরা বলে, 'ওমা সে কি কথা? মেয়ে ডেট্ না করলে বর জুটবে কেমন করে?' আমাদের মেয়েদের মায়েরা মেয়ে বড় হলে সাবধান করে বলে, 'খুকি তুমি ভুলে যেও না, তুমি বড় হয়েছ?' অর্থাৎ মেয়েদের শরীরে যেই পরিবর্তনগুলি আসতে শুরু করল, মা তাকে সচেতন করে দিল। তারপর মেয়েই একদিন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। সে জানল, 'আমার কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়?' সহজ সুন্দর সরল জীবন মেয়ে পেল তো তার জীবন আর অন্যদিকে বাঁক নিল না? কিন্তু যদি সহজ সুন্দর সরল জীবন না পায়? তখনই সামাজিক কতকগুলি বিধিনিষেধ তাকে চোখ রাঙাতে থাকে। ব্যভিচার প্রসঙ্গটা এইভাবেই সমাজে চালু হয়ে গেছে। মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট স্বামী যদি কেউ পায়, সে কি ভাবে এক মনে পতিসেবা করতে পারে? তাছাড়া মেয়েদেরও তো একটা চাওয়া পাওয়া আছে, না তাদের ওসব নেই? সে জড় পদার্থের মত শুধু পুরুষের স্বেচ্ছাচারের দাস হবে? দাসী শব্দটা এই সমাজই চালু করেছিল। 'আমি তো তোমার শ্রীচরণের দাসী।'

বললে পুরুষ যেমন বিগলিত, নারীও বিগলিত হয়, যদি তার প্রভু মনের মত হয়

নারী ব্যভিচারিণী হয় তখনই, যখন তার মনের আকাঙ্খা পূরণ হয় না। আগে মন, তারপর দেহ। রামকৃষ্ণ বলে গেছেন, 'ওরে তোরা নারী পুরুষের দৈহিক মিলনকে মলমূত্রের মত মনে করবি।' কিন্তু তিনি সাধক ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সাংসারিক মানুষের মেলে না। সাংসারিক মানুষ স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তিতে নিজে উন্মাদ হয়, অথবা সংসারের দোকানপাট তুলে দিয়ে চলে যায়। যৌন বিকার প্রাপ্ত নারীদের নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। কারণ সে নারীর সংখ্যা সংসারে সংখ্যাধিক্য নয়। আর তাদের ব্যভিচার নিয়ে যে আন্দোলন হয়, সেটাও আলোচনার মধ্যে পড়ে না। আমাদের প্রধান বক্তব্য, সাধারণ সুস্থ ভাল নারীও কেন ব্যভিচারিণী হয়? নারী সবচেয়ে বেশি দুর্বল, সে ভালবাসায় বুভুক্ষ। বহু প্রবঞ্চক, বহু কেন, প্রায় সব পুরুষই নারীকে অধিকার করবার জন্যে ভালো ভালো কথা ঝুলি থেকে বের করে প্রয়োগ করে। একটা গল্প এই প্রসঙ্গে বলা যাক্।

একটি সুখী দম্পতি। ধরা যাক্ তাদের দুজনের নাম রবি আর কৃষ্ণা। ওরা সুখে ঘর সংসার করত। দুজনেই শিক্ষিত, দুজনেই চাকরী করে। কেউ কাউকে অবিশ্বাস করে না। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, স্বাস্থ্য, রূপ, কণ্ঠস্বর সবই ভাল। যাকে বলে অন্যে ঈর্ষা করতে পারে। সে ঈর্ষা করছিলও কিন্তু কৃষ্ণা রবিকে এত ভালবাসে যে সে স্বামী গরবে গরবিণী হয়ে সব প্রতিবোধ জয় করত। মেলামেশা তাদের মধ্যে ছিল, অফুরন্ত আড্ডা দিত তারা। বন্ধুবান্ধব তাদের ঘরে এসে আর উঠতে চাইত না। এমনও হত রাত প্রভাত হয়ে যেত, তবু তাদের গল্প শেষ হত না। কৃষ্ণা বুঝত, উপলক্ষ্য সে কিন্তু এই নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না। বরং সে মনে মনে নিজের সম্বন্ধে আনন্দই বোধ করত, তার রূপমুগ্ধর দল কত? আর তারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে চাতক পাখীর মত তারই কাছে হা জল হা জল করে বসে থাকত।

রূপসী যৌবনবতী নারী মাত্রেই এই ধরণের রূপমুগ্ধদের দেখলে নিজের রূপের গর্বই বোধ করে, কৃষ্ণাও সেইভাবে গর্ব অনুভব করত। কিন্তু হঠাৎ কৃষ্ণার সেই গর্ব একটু একটু করে অন্যদিকে মোড় নিল। মনের সুস্থ চিন্তাধারায় অন্যের ছায়া পড়ল। স্বাভাবিক। মন তো কাঁচের পেয়ালা। স্বামী গরবিণী কৃষ্ণা তবু অটল রইল, কিন্তু যে এসেছিল সে অনীশ, নারী ভোলাতে ওস্তাদ। এমন সব

কথার জাল বুনলো, কৃষ্ণা অভিভূত হয়ে গেল। স্বামী, প্রেমিক, দুটি পুরুষের ছায়া তার মনের মধ্যে খেলা করতে লাগল। সে আরও শুনল স্বামীর অনেক দোষ, স্বামীর দোষগুলি যা তার অজ্ঞাত ছিল, হয়ত দেখেছিল খেয়াল করেনি, সেগুলি বড় হয়ে উঠল। তুমুল ঝগড়া লেগে গেল স্বামীর সঙ্গে। রবি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারল না। প্রেম চলে গেল, বিশ্বাস কলঙ্কিত হল। কৃষ্ণা কি করবে ভেবে পেল না। বরং সে চোখের জলে ভেসে এই ভাবল, ছি ছি এতদিন সে লম্পট দুশ্চরিত্র লোকের ঘর করেছে? কৃষ্ণা যখন মরীয়া, সেই অনীশ এসে সামনে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'চল আমরা অন্যত্র ঘর বাঁধি।' অনীশ বেকার, অনীশ রবি নয়, তবু সেই মুহূর্তে অনীশই কৃষ্ণার মনের নাগাল পেল। এক ঘর ছেড়ে কৃষ্ণা আর এক ঘরে গিয়ে ঢুকল। রবির চিন্তা আর মনে স্থান দিল না। বরং রবির কথা মনে এলেই সে নিজেকেই সব চেয়ে বোকা ভাবে। এতদিন ঐ লোকটিকে সে কি ভাবে বিশ্বাস করেছিল?

এদিকে অনীশ মনে মনে বেশ খুশি। কথায় বলে না, একটু বুদ্ধির খেলা দেখালে অর্ধেক রাজত্ব পরমা সুন্দরী রাজকন্যাকে পাওয়া যায়, তেমনি অনীশ বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে পুরো রাজত্ব আর চাকরী করা সুন্দরী রাজকুমারী পেল। দিন এই ভাবে চলতে লাগল। অনীশ, কৃষ্ণা, কৃষ্ণা অনীশ। যৌবনের উন্মাদ খেলায় কিছুদিন কেউ আর কোনদিকে তাকাল না। তারপর উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এলে হঠাৎ কৃষ্ণার চৈতন্য হল, অনীশ তো রবি নয়। রবি শিক্ষিত, মার্জিত, চাকুরে, সে জায়গায় অনীশ কিছু নয়। অনীশ তার টাকা ভোগ করতে চায়, তাকে ভোগ করতে চায়। কৃষ্ণা নিজের ভুল বুঝতে পারল। তখন তার ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা। কেঁদেও সে কূল কিনারা করতে পারল না।

এর নাম কি? মোহ না নারী মনেব দোমনা ভাব। নারী নিজেই জানে না, সে কখন কিসে খুশি হয়? হয়তো যেটা ভাল, সেটার বিচার না করতে পেবে খারাপটাকেই ভাল বলে তুলে নেয়। তার পরিণতি তো কৃষ্ণার কথা শুনলেন। কৃষ্ণা শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, সর্বগুণান্বিতা, তবু তার বিচার শক্তিতে ভুল হল কেন? শরৎচন্দ্র নারী মনের ডুবুরী হয়ে নেমে এই ধরণের নারী চরিত্র গৃহদাহতে এনেছেন। অচলাও তো শিক্ষিতা ছিল। ভালবাসার খেলায় মহিমকেই স্থান দিয়েছিল এবং সুরেশ হঠাৎ এসে অর্থের ঝনঝনানি দেখিয়েও ভালবাসা থেকে একচুল তাকে টলাতে পারে নি কিন্তু তারপর কি হল? সুরেশ একজন অস্থির চিত্ত পুরুষ, আবেগে অনেক কিছুই অসভ্যতার মত করে বসল কিন্তু তবু সুরেশই

হল অচলার আপন। এই যে নারী মনের দ্বিবিধ অবস্থা, এটা কি? নারী বিচার করতে পারে না কেন? সে হীরা ফেলে কাঁচ তুলে নেয় কেন? তারপর বোঝার পরে অনুতাপে পোড়ে কেন? এই ধরণের নারী যেন বর্তমানে খুবই দেখা যায়। তবে কি বলব, নারীও মোহের শিকার হয়? তার চোখের সামনে যে মোহ সঞ্চার করতে পারে সেই তার মনে ছায়াপাত করে? সম্ভবত তাই। লম্পটও কেন নারীর কৃপা পায়? তার স্পষ্ট উত্তর, নারী স্বভাবের এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অনুভূতি কাজ করে যার কোন স্পষ্ট উত্তর নেই। আর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত। মুহূর্তে মুহূর্তে যেমন দুনিয়া পালটায়, মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের মনের ওপর অনেক ছায়াপাত ঘটে। মুহূর্তের মূল্য অনেক বেশী। আজ যে মন আনন্দে পাগল, কাল সে মন বিষাদে ভারী। অচলার মনেও এই মুহূর্তগুলি বেশি কাজ করেছিল। যে সুরেশের টাকা দেখেও অচলা গরীব মহিমকে ভোলে নি, সেই মহিমকে আঘাত করতেও এতটুকু তার বাজেনি. মহিমকে সে ভালবাসত, সুরেশকে বাসত না, সুরেশের অনেক কিছুই তাকে ঘৃণা জাগাত। তবু সুরেশকেই সে প্রাধান্য দিত। মাঝে মাঝে এক একটা মুহূর্ত এমন আসে, যা কেউ জানে না কি ঘটে যায়? পরিবেশ, পরিস্থিতি সেখানে আমূল পালটে যায়। অচলা অনেক সময় নিজেই অভিভূত হয়েছে, এ সে কি বললো? এসব কথা বলা তো তার উচিত হয় নি! আবার মনে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, অপরের অবহেলাই তার অবচেতন মনে ঢুকে যুক্তি খাড়া করে এই সব বলেছে। তারপর আরও একটি চরম স্বভাব, নারী বড় ঈর্ষাকাতর, সে যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে অন্য নারীর আলাপ, সে পছন্দ করে না। এটাও নারী স্বভাবের একটা বিশেষ দিক। আর সেই স্বভাবে বহু নারী নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। 'সতী' গল্পে হরিশের জীবন বিষময় করেছিল নির্মলা। অথচ কোন কারণ ছিল না। যাই হোক্ আমাদের বক্তব্য ছিল ব্যভিচার। অচলা কি ব্যভিচারিণী? কৃষ্ণা অনীশকে ছেড়ে যখন রবির পায়ের ওপর কেঁদে গিয়ে পড়ল, আমরা কি কৃষ্ণাকে ব্যভিচারিণী আখ্যা দেব? সমাজ অবশ্য তাই বলবে, নারীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নারী করবে? সমাজ উদার নয়, সে অন্যায়ের প্রতিফল চরমভাবেই দেয় কিন্তু সাহিত্য তা করে না, নারীর পুরো চেহারা মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরে। অচলার মত নারী যে শুধু ভাবেই, যার মন স্থির নয়, অথচ বুদ্ধি, বিবেক, শিক্ষা সবই আছে। শরৎচন্দ্র এমনি একটি নারী চরিত্র পরিবেশন করে দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক নারীর মন। কোথাও এতটুকু বলেন নি, অচলা তুমি খারাপ, বরং তার সংস্কার,

তার শিক্ষা, তার বিচার করার ক্ষমতা তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন, তার অস্থির মনের গতি কি? অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ের মনের প্রগতি কি? সুরেশের শরীর খারাপ দেখে যেমন অচলা তাকে তাদের সঙ্গে বাইরে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আবার সে কথা সুরেশ সর্বসমক্ষে রাষ্ট্র করতে সে আড়ালে সুরেশকে ভৎর্সনা করেছিল। সুরেশ তো পুরুষ। সে যদি এই সব ভেবে একটা চরম কাণ্ড করে বসে, এ কি অন্যায়? সুরেশ বুঝবে কেমন করে অচলার মন একবার তাকে ঘৃণা করে, একবার তাকে আপন করতে চায়। আবার এও দেখা যায়, সুরেশ যখন তাকে নিয়ে পালালো, অচলা ক্ষিপ্ত হল। সে যদি বলি, আমাদের কঠিন সমাজের জন্যেই অচলা ক্ষিপ্ত হয়েছিল তাহলে কি ভুল বলা হবে? আগেই বলা হয়েছে, আমাদের হিন্দু সমাজের অনুশাসনগুলি হিন্দু নারীরা ত্যাগ করতে পারে না। তাদের অক্টোপাশের মত তা জড়িয়ে থাকে। অচলারও জড়িয়ে ছিল। অচলাও ব্রাহ্ম মেয়ে হয়ে সংস্কার ত্যাগ করতে পারে নি। তাই বহুদিন ধরে তার অতীতটাই তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই যে নারী মন। একবার সংস্কারে জর্জরিত হয়ে সে থেমে যায়, আবার মনের টানে এগিয়ে চলে। ভালবাসা পাপ নয় কিন্তু সেটা বৈধতার মধ্যে থাকলে সুষমা দান করে, আর অবৈধ হলে সেটা ঘৃণ্য হয় কিন্তু এই বৈধ-অবৈধ বিচার করেই কি মানুষ ভালবাসে?

এমন অনেক প্রশ্নের জবাব মেলে না বলেই সাহিত্যিক গল্পের আকারে সেই সব তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করবার চেষ্টা করে। প্রাচীন সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্ন উঠত। সেক্সপীয়র তার নাটকে নারীকে কোথাও ক্ষমা করেন নি কিন্তু বার্নার্ড'শ ক্ষমা করেছেন, বরং তাঁর পাত্রীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'Oh how Silly the Law is! Why can't I marry them both · well, I love them both.' এই যে নারীর দাবী, এ কি অস্বীকার করা যায়? কই আমরা তো ইচ্ছে করলে অনেক নারী বিবাহ করতে পারি। অনেক নারী বান্ধবী, রক্ষিতা নানাভাবে তাদের আখ্যা দিয়ে নিজেদের ভোগের স্পৃহা তৃপ্ত করতে পারি। নারীদের বেলা এই অনুশাসন কেন? নর নারীর জীবন ভাবনাকে নিয়েই সাহিত্য এগিয়ে চলেছে। সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি নর নারীর জীবন ভাবনাকেই কেন্দ্র করে। সে শুধু কাজ করে মানব জীবনের গতি প্রগতি দেখে। মানুষের চিন্তাধারা যেমন পালটাচ্ছে, সাহিত্যের গতিও পালটাচ্ছে। সাহিত্য যেন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ, প্যাটার্ণ, রস সব পালটাচ্ছে। আগে এত সুক্ষ বিচার দেখা যেত না। সংস্কৃত ও পুরাণ গল্পে আমরা পাই দুরকম চিন্তা। যেমন পুরাণ

ধর্মের ছক ফেলে নর নারীর অশ্লীল দিকটাই দেখিয়েছে। সেখানে রেখে ঢেকে কিছু বলে নি। রসটাই সেখানে মূল উপজীব্য ছিল।

সংস্কৃতে দেখেছি, প্রাকৃতিক বর্ণনা, বন্যকুমারী রাজার প্রেমে অভিভূত হয়ে নিজের জীবন যৌবন উৎসর্গীত করেছিল। কালিদাসের শকুন্তলা তার দৃষ্টান্ত। তারপর ধীরে ধীরে গল্প তার প্যাটার্ণ পালটাতে লাগল। অর্থনীতির দিকটা অনেকের চোখে পড়ল। নীতির দোহাই দিয়ে জীবনকে অস্বীকার করা গেল না। আর্থিক, পারিপার্শ্বিক দিকটাও সাহিত্যে আসা উচিত। মনীষী ট্রট্স্কি অর্থনৈতিক চিন্তার দিকটা তুলে ধরলেন। লোকে অবাক হয়ে গেল, এদিকটাও সাহিত্যে আসে নাকি? কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকরা যে সাহিত্য জুড়ে ছিল, সে যুগ চলে গেল। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির যে সংঘাত তার অর্থনীতির দিক, সমাজ তত্ত্বের দিক, সর্বোপরি মানুষের কর্মের দিক সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সেই দিকের ছবি আঁকতে বসলেন। তখনই খুঁটিয়ে দেখার প্রশ্ন এল। তারপর ধীরে ধীরে সমাজের মানুষের খুঁটিনাটির চেহারা সাহিত্যে এনে ফেললেন আমাদের সাহিত্যিকরা। শরৎচন্দ্র সেই সময়ের লেখক। তিনি শক্তিধর পুরুষ। সমাজের কতকগুলি জঘন্য নিয়ম মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে মানুষের সুন্দর মনটাকে নষ্ট করা হচ্ছে দেখে তিনি সেই সব তুলে তুলে দেখাতে লাগলেন। প্রথমে তাঁকে কেউ স্বীকার করল না। তারপর নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে, আর যা সাহিত্য বলে আঁকা হয়েছে তা অস্বীকার করতে না পেরে তখন হৈ চৈ লাগিয়ে দিল।

সে সময়েই শরৎচন্দ্র ব্যভিচারের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করলেন। যাদের তোমরা ব্যভিচারিণী বলো, তারা কি সত্যিই ব্যভিচারিণী? ব্যভিচার শব্দের সংজ্ঞা কি? স্খলন। যাদের ব্যভিচারিণী বলছ, কেন বলছ দেখো। তিনি নারীর মনের মধ্যে ডুবুরী হয়ে নেমে গেলেন। কত কম বয়েসে তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে এল দেবদাস। পার্বতী কি ব্যভিচারিণী? সমাজ বললো, 'হ্যাঁ, সে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে মনে রেখেছে।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'না, পার্বতী তো সামাজিক অনুশাসন বজায় রেখেই তার মনের মানুষকে মনে রেখেছে। তোমরা মনের মধ্যে নিশ্চয় সমাজের অনুশাসন ঢোকাতে পার না।' শরৎচন্দ্র দেবদাস লিখেছিলেন আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে। এই পঁচাত্তর বছর ধরে সমাজ অনেক পালটে গেছে। আজ অর্থনৈতিক চাপ অনেক প্রবল, সমাজও তার তল পায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাজনীতি

আমাদের মূল্যবোধ পালটে দিয়েছে। এখন বাঁচার চিন্তায় মানুষ বহু নীতিকেই বিসর্জন দেয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিদেশী লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের আমরা উল্লেখ করতে পারি। ব্যক্তির ওপর যে সমাজ শক্তির বিচারহীন পীড়ন, আর মঙ্গলহীন নীতির বিরুদ্ধে মানব মনের বিদ্রোহ, এটা ঐ সমাজ শক্তির কতকগুলি অনীতি-মূলক শাসনের বিরুদ্ধে নতুন এক আলোকপাত করেছেন। তাঁর অঙ্কিত একটি ব্যঙ্গ শ্রেষ্ঠ চরিত্র Jerome Coignard এর মধ্যে দেখতে পাই, সে বলেছে, নীতির সঙ্গে ভগবানের কোন সম্বন্ধ নেই। পৃথিবীর সমস্ত দুর্নীতির মধ্যে ধর্মের দোহাই আছে। এটা আনাতোল ফ্রাঁসের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ। ভগবানই মানুষকে কুকর্ম করতে বলেছে। এই যে দাপটের সঙ্গে প্রকাশ, এও আজকের যুগের মানুষের মনের সাহসের পরিচয়। কতকাল আমরা ঘুণধরা কতকগুলি জঘন্য সমাজের নিয়ম মেনে মেনে ক্ষত বিক্ষত হব? তার চেয়ে দাপটের সঙ্গে ওসব ত্যাগ করাই শ্রেয়। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ওকে তুমি চুমু খেয়েছ?' ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ।' 'কেন খেয়েছ?' 'ওকে দেখে আমার ভাল লেগেছে বলে।' স্পষ্ট উত্তরে রাগ হবে কিন্তু ভাল লাগা তো অস্বীকার করা যাবে না? মা জিজ্ঞাসা করল, 'রচনা ঐ ছেলেটাকে নিয়ে দিনরাত কি গল্প করিস রে?' রচনা বলল, 'ও এলে আমার কিরকম ভাল লাগে।' 'ওকে কি তাহলে তুই বিয়ে করবি?' রচনা একটু ভেবে বলল, 'এখনও ভাবি নি।'

এই যে পরিবর্তন এটা বহু আগে ছিল না। এই পরিবর্তন বহু বিপ্লবের পর এসেছে। মানুষের ভাল লাগার ওপর সমাজ যে অনুশাসন চাপিয়ে দিয়েছিল, তার লয় আর কেউ ঠেকাতে পারে নি। ঠেকাতে পারবে কেমন করে? আমরা সাহিত্যে কেন, চোখের সামনে কি দেখছি না? মা এবং বাড়ীর সবাই জানে, তাদের বাড়ীর মেয়েটি কিভাবে রোজগার করে আনে। দুপুরবেলা সেজেগুজে পরীটি হয়ে বেরিয়ে যায়। মা জিজ্ঞেস করে, 'কখন ফিরবি রে?' মেয়ে হেসে বলে, বেরবার সময় আমি আমার দাস, ফেরবার সময় কি আমি আমার? মা শুকনো মুখে বলে, 'সবাই কাজ করে দশটা পাঁচটা। তোর কাজ এমন লক্ষ্মীছাড়া কেন রে?'

মা জেনেও ভাবতে চায় না সেই জঘন্য কথাগুলি। সংসারে টাকা দরকার। টাকা না হলে সংসার চলবে না। তবে এই মেয়েটির ভাই, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে গিয়ে টাকা যোগাড় করতে পারে নি। এখন পাড়ার চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়। সেখানেই সে জেনেছে তার বোন কি করে?

ও ওসব গায়েই মাখে না। বরং বোনকে দেখলেই ব্লাকমেল করে। 'দিদি তুই কি করিস্ আমি জানি।'

বোন বলে, 'কি করি?'

'সে কি মুখে বলতে হবে?' আঠারো বছরের ভাই খ্যা খ্যা করে হাসে।' 'দে পাঁচটা টাকা।'

বোন তাড়াতাড়ি ব্যাগ ঘেঁটে টাকা দিয়ে সরে পড়ে। ওর লজ্জা করে। নারী লজ্জা কিন্তু ও কাদের জন্যে এই লজ্জাকে ত্যাগ করেছে? আজ আর এসব মেয়েদের ব্যভিচারিনী বলা যাবে না। কারণ আগে বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে। তারপর সতীত্ব নিয়ে লড়াই করবে। তবে কি এ সব মেয়ের মনে সম্ভ্রম হানির কোন গ্লানি জাগে না? হয় তো জাগে কিন্তু সেটা এই বলে তারা মন থেকে তাড়ায়, 'আমি যদি দেহ বেচে টাকা না উপায় করি, তাহলে এরা বাঁচবে কেমন করে? এই বাঁচা ও বাঁচানোর যে চেষ্টা সেটাই বর্তমানে সত্য। যুগ পালটাচ্ছে। মূল্যবোধ পালটে যাচ্ছে। দারিদ্র্যতা নিয়ে ভগবানের ওপর নির্ভর করে গুমরে গুমরে মরে যাওয়া এ আর কেউ চায় না। লড়াই করে বাঁচার নামই জীবন। ঈশ্বর একটা অচেতন মনে খেলা করে বটে কিন্তু তার ওপর কেউই নির্ভর করতে চায় না। সত্যবাদিতার যুগ, ধর্মের যুগ এ সব আজ অস্তমিত। কেন? কারণ সত্য পথে চলে, ধর্মকে নির্ভর করে বাঁচার পথ তো সুগম হয় নি, বরং সত্য ও ধর্ম এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে, যা চোখের জলই সম্বল করেছে। তখন থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে চলেছে। অবক্ষয়কে তারা মেনে নেয় নি। লড়াই করে বাঁচতে হবে। রাজনীতি যত না বিপ্লব এনেছে, সমাজ যেন আরও বিপ্লব এনেছে। বাড়ীর মেয়েটি বাড়ীর কোন দুরবস্থায় 'আমি নারী কি করতে পারি' বলে বসে থাকে নি বরং সব লজ্জা সব সম্ভ্রম ঐ বাড়ীর সেলফে তুলে রেখে দাপটের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। সনাতনধর্মীরা এই নিয়ে কিছু কানাকানি করে কিন্তু এই ভেবে চুপ করে যায়, এ সব বলতে গেলে তো তাদের বাঁচবার পথ সুগম হবে না, অগত্যা চুপ করে যাওয়াই ভাল। বরং মেয়েদের পড়াশুনা শিখিয়ে কি হবে, এই রেওয়াজ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। পড়াশুনা শিখলে নারীকে আর সম্ভ্রম বিক্রী করে অর্থোপার্জন করতে হবে না, তারা অফিসে, আদালতে, কারখানায় সসম্ভ্রমে পুরুষের পাশে বসে কাজ করতে পারবে। নারী শিক্ষার এই যে প্রয়োজন ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে চালু হয়ে যাচ্ছে এর পিছনেও তো ঐ বাঁচার প্রশ্ন। তাহলে দেখা

যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের কাল আজ অস্তমিত। সমাজ যে নীতির দোহাই দিয়ে মানুষের বাঁচার পথ আটকে রেখেছিল, সে সমাজনীতি মানুষই ধীরে ধীরে ধ্বংস করেছে। ঠিক মানুষ নয়, কাল। কালই মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির পরিকল্পনা এনেছে। নীতির শক্তিকে ধ্বংস করেছে, আর কি ভাবে বাঁচা যায় তার সহজ পন্থা শিখিয়ে দিয়েছে। সাহিত্য এই মানুষদের মনের মধ্যে ঢুকে তাদের মনের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করার চেষ্টা করে। আজ আর সহজ সাধারণ সোজা সরল জীবন কারুরই নেই। বাঁচার লড়াইয়ে কখনও গভীর অন্ধকারে, কখনও জটিল পথে জীবন ঘোরাফেরা করে। কিন্তু লক্ষ্য ঐ বাঁচা। শরৎচন্দ্রের আমলে জাতের দোহাই দিয়ে অনেক মানুষের গলা টিপে মারা হত। যারা মিথ্যা কথা বলে, ছল, চাতুরীর আশ্রয় নেয়, সমাজ তাদের ভাল চোখে দেখে না। শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকরা তখন এদের কথাই বড় বড় করে লিখে সমাজকে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বামুনের মেয়ের গল্পে গোলোক চাটুয্যেকে এই ভাবেই শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন। কি জঘন্য চরিত্র এই গোলোক চাটুয্যের। এই 'বামুনের মেয়ে' লেখবার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কথাবার্তা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এখন তুমি কি লিখবে ঠিক করেছ?' শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে'র পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আর কুলীন ব্রাহ্মণদের নিয়ে ঐ সব লেখার চিন্তা করছ কেন? ও কাল তো আর এখন নেই।' শরৎচন্দ্র তখন গোলোক চাটুয্যেরা যে সমাজ থেকে এখনও যায় নি তার কথা বলেছিলেন। তারপরই রচিত হল 'বামুনের মেয়ে।' আমরা দেখলাম, সত্যিই কুলোধিপতি গোলোক চাটুয্যেরা যেন এখনও সংসারের বিরাট অংশ নিয়ে তাদের প্রতাপ ঘটিয়ে চলেছে। কুলের গর্ব হয়তো গেছে কিন্তু মানুষের সেই আদিম পাটার্ণ সে একইভাবে আছে। ফর্মটা শুধু পালটেছে। গোলোক চাটুয্যেরা সংসার থেকে আজ বিদায় নিয়েছে বলা যায় না। তারা দুর্বলের গলা টিপে আজও মারছে। আজও ছল, চাতুরী, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে কি ভাবে মানুষদের কব্জা করা যায় তার ফিকির খোঁজে। এরাই অর্থ ছড়িয়ে বেকার ছেলেদের ভাগ্য কিনে দুষ্কর্মে ঠেলে দেয়। প্রচুর বারাঙ্গনালয়ের আসল অংশীদার এরাই। ডাকাতী, রাহাজানী, ব্লাকমার্কেট প্রভৃতির সঙ্গে এই সব গোলোক চাটুয্যেদের দল। আইন, আদালত, দেশের শাসন এদের কিছুই করতে পারে না। যার টাকা আছে, স্বপক্ষে আইনও তার কুক্ষীগত। কুলীন ব্রাহ্মণ হয়ে যখন গোলোক চাটুয্যে ছাগল, গরুর ব্যবসা করতে দ্বিধা করে নি, আশ্রিতা

শালীর ইজ্জত নিয়ে নিরাপরাধ এক আত্মভোলা প্রিয় মুখুজ্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে একবারও ভাবে নি, শরৎচন্দ্র এই গল্প লেখবার আগে তাই দাপটে কবিকে বলেছিলেন, 'কুলীনত্ব গেছে বটে কিন্তু গোলোক চাটুয্যেরা সংসার থেকে এখনও বিদায় নেয় নি।'

একথা যে কতখানি সত্যি, আজও আমরা তাকিয়ে সেটা উপলব্ধি করতে পারি। যুগ পালটাচ্ছে। মূল্যবোধও বেড়ে যাচ্ছে। সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু গোলোক চাটুয্যেরা বিদায় নেয় নি। বরং আরও তাদের নিত্য নতুন প্রকাশের ভূমিকা সংসারের এক বড় অংশ অধিকার করে নিচ্ছে। এই গোলোক চাটুয্যেরা খুঁজে খুঁজে বের করছে সমাজের কি কি দুর্বল অংশ। যেই দেখল কোন সংসারে অর্থকষ্ট, দেবতার ছদ্মবেশে গিয়ে সে বাড়ীর ছেলেটাকে টেনে আনল, নয়ত মেয়েটাকে। ছেলে হলে তাকে গুণ্ডা, বদমাইস করে সমাজের বুকে ঠেলে দিল। এই প্রসঙ্গে একজনের কথা মনে পড়ে একজন বিখ্যাত ধনীর অধীনে একজন ভদ্র বিশিষ্ট উচ্চ শিক্ষিত বিনয়ী লোক কাজ করত। তাকে প্রথমে পাঁচশ টাকা দিয়ে বহাল করা হল, তারপর সেই ধনী বিনয়ী লোকটিকে ডেকে বলল, 'আমি কিছু গোপন কাজ আপনার থ্রু দিয়ে করব।' বিনয়ী লোকটি চুপ করে রইল। ধনী বলল, 'কিন্তু এসব গোপন করতে হবে।' বিনয়ী লোকটি হয়তো কিছু ভাবত কিন্তু দেখল, তার বেতন ডবল হয়ে গেছে। এই ভাবে এগিয়ে চলল দুষ্কৃতকর্ম, দুষ্কৃত কর্মের সংখ্যাও বাড়তে লাগল, আর বিনয়ীর মাইনেও দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ হয়ে গেল। প্রচুর টাকাও সে এমনি উৎকোচ হিসাবে পেল। বিনয়ী কিন্তু সেই বিনয়ীই হয়ে রইল কারণ তার স্বভাব সে পালটাবে কেমন করে? কিন্তু জীবন মান অনেক উঁচুতে উঠে গেল। সংসারে যে পরিবারের সে কর্তা সে পরিবারও এই উন্নতিতে সচকিত হল। তাদেরও জীবন-মান উচ্চগামী হল। রুটি ছাড়া যে পরিবাবের জলযোগ হত না, সেখানে ব্রেকফাস্ট টেবিলে রুটি, মাখন, ডিম, কলা ইত্যাদি পরিবেশিত হতে লাগল। গাড়ী ছাড়া কেউ এক পা চলে না। গরীব দেখলে নাক সিঁটকোয়। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই হল। কিন্তু হঠাৎ সেই ধনী ধরা পড়ে গেল কিন্তু ধনী তো আগেই একজন শিখণ্ডীকে খাড়া করে রেখেছিল। ইতিমধ্যে বিনয়ী কবে ব্যবসাব অংশীদার হয়ে গেছে সে জানে না। ধনী নির্বিবাদে পুলিশের হাতে সেই বিনয়ীকে তুলে দিল। দেখা গেল যা কিছু দুষ্কর্ম ঐ অংশীদার করেছে। ধনী তার কিছুই জানে না।

এই ভাবে সমাজে বন্ধু ভাগ্যহারা বেকার যুবকও এই সব ধনীর শিকার হয়। এরা জানে, ধরা পড়লে সাজা তারাই পাবে, সমাজের এই উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের কিছুই হবে না। বামুনের মেয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২০ সালে। আজ থেকে ছেচল্লিশ বছর আগে। সে সময়ে গোলোক চাটুয্যের যে মানসিকতা, আজ তার চেয়ে বেড়েছে বৈ কমেনি। বর্তমানে লেখকরা এই গোলোক চাটুয্যেদের সমাজের চোখে তুলে ধরছেন। এদের আরও প্রতিপত্তি যে বেড়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এই লেখকদের লেখাতেই দেখা যায়, কি ভাবে গ্রাম থেকে গ্রাম তোলপাড় করে মেয়ে এনে শহরে ব্যবসায় লাগানো হয়। মন্দিরে মন্দিরে পাণ্ডারা যেমন ধর্মের দোহাই দিয়ে সরল ভক্তর মনে সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি করে তেমনি ধর্মের দোহাই দিয়ে আমরা আরও দেখি, সাধারণ মানুষ, ধনীশ্রেণী এই ধর্মের দোহাইটাকে ব্যবসার মূলধন করে পথে পথে নিত্য পূজা, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভরং চালিয়ে চলেছে। আর ভক্ত মানুষ কোন সন্দেহকেই মনে স্থান না দিয়ে নির্বিবাদে পূজা দিয়ে যাচ্ছে। দেবতাকে ভয় করে না, দেবতার প্রসন্ন কৃপা প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, এমন লোকের সংখ্যা বিরলই বলতে গেলে। সংসারে বাস করতে গেলে আপদ-বিপদ আছেই। সেই সংসারী মানুষ হয়ে কার বুকের পাটা এত প্রশস্ত যে সে দেবতাকে অবজ্ঞা করবে? সুতরাং মানুষের এই ধর্মের সেণ্টমেণ্টকে অবলম্বন করে অর্থোপার্জনকারীর দল পথে পথে পূজার আয়োজন করল কিন্তু পিছনে খোঁজ করুন, আসল পরামর্শদাতা ঐ গোলোক চাটুয্যের দল। সাহিত্যে আমরা এও দেখছি, গ্রামে একজন সুন্দরী সুবেশা মধ্য বয়স্কা যুবতী হয়তো আগে বহু ঘোড়েল জীবনের ভেতর দিয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তাকেই ভার দেওয়া হল দুঃস্থ পরিবার থেকে সুন্দরী মেয়েগুলিকে চাকরী পাবার লোভ দেখিয়ে শহরে পাঠিয়ে দিতে। এই ধরণের চরিত্র আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পেয়েছি। বাড়ীর ঝি, দাসী, দাইদের দিয়ে ঘরের বৌ টেনে পথে নামানো হত। তবে তার মধ্যে ছিল নিছক যৌনবিকার, অন্য কোন উদ্দেশ্য মনে বাসা বাঁধেনি। এখন ঐ বাঁচার প্রশ্ন নিয়ে সমাজের মানুষেরা আর এক খেলায় মেতেছে। শহরে গেলে অনেক টাকা উপায় হবে, এ কথা যেমন একজন উন্নতশীল বেকার যুবক চিন্তা করে, যুবতীর চিন্তাও তাই কিন্তু কজন যুবতীকে আমরা দেখি অফিসের টেবিলে বসে কাজ করছে?

এ সব কথা আমরা বারবনিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে। ব্যভিচারিণী শব্দের গুরুত্ব আর গুরুত্ব দিয়ে ধরা হচ্ছে না।

যেন-তেন-প্রকারেণ বাঁচার চেষ্টাই বড় চেষ্টা। চুরি করা ভাল, কিন্তু ধরা পড়লে যে শাস্তি হবে সে কথা জেনেও তো কেউ চুরি করা ছাড়ে না, কারণ সে জানে, এই বৃত্তি ছাড়া তার আর কোন বৃত্তি জানা নেই। বরং এই ধরণের মানুষ এই ভেবে পরিতাপ থেকে বাঁচে, ঈশ্বর আমাকে এই করতে পাঠিয়েছেন, এই আমাকে করে যেতে হবে। এই চোর, বেশ্যা, সমাজ দুষ্কৃতকারীর দল সবাই যেন আজকের মানুষের একটা নতুন প্যাটার্ন। চোর যেমন চুরি করতে ভয় পায় না, বেশ্যাও দেহ বিক্রয় করতে লজ্জা পায় না। বরং সে দাপটে পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে বলে, 'তোমার আছে তুমি দেবে না কেন? আমি যে তোমায় আনন্দ দিলাম তার কোন মূল্য নেই?' এ কথা জাত বেশ্যা বলে না। অ্যামেচারদের মুখে এই সব কথা ফোটে। হয়তো তাকে পরে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি যে এই সব করছ বিয়ে করবে না?' সে হেসে বলল, 'বিয়ে করব না কেন? আমার তো বর ঠিক আছে। সঞ্জয়দা একটা চাকরী পেলেই এ ব্যবসা ছেড়ে দেব।' 'তখন সংসার করতে পারবে?' 'কেন পারব না?' 'সঞ্জয়দা জানে?' 'জানবে না কেন? তাকে তো আমি কিছু গোপন করি না।'

এটা যে সাহিত্যিকের কোন গল্প নয়, সত্যি কাহিনী, এ কথা বিনয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই ভাবেই সমাজ পালটে যাচ্ছে। সঞ্জয় যেমন ভাগ্যাহত যুবক, মেয়েটিও তাই কিন্তু ওদের মিলন কেউ ঠেকাতে পারবে না। ওরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। ওরা ঐ সব মেকী সেন্টিমেণ্টকে আর প্রশ্রয় দেয় না। এই ভাবেই এ কালে মূল্যবোধ পালটে যাচ্ছে। তাই ব্যভিচার শব্দটা একদিন পৃথিবী থেকে যে লুপ্ত হয়ে যাবে, এব আর কোন দ্বিমত নেই। এর জন্যে আমবা পরিতাপ করতে বসব না, কারণ পরিতাপ শেষ। নারী পুরুষ উভয়েই যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, এ কথা অবিসংবাদীভাবে যে সত্য, সে কথা ধীরে ধীরে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর পুরুষ যেমন সৃষ্টি করেছেন, নারীকেও সৃষ্টি করেছেন। নারীর আলাদা যে ভূমিকা আছে, সংসারে তার মূল্য কম নয়। এবং নারী যে ধীবে ধীরে সংসাবের অনেকখানি জুড়ে বিরাজ করছে এও অস্বীকার করা যায় না। এই সত্য আলোর মত প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তাই এ যুগের সাহিত্যিক এখন অন্য সমস্যার দিকে মন দিয়েছে। তার আখ্যানভাগে নারী চরিত্র গৌণ নয়, বরং তার প্যাটার্ণ পালটে যাচ্ছে। নারী অবহেলিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত যে সব প্রসঙ্গ আসছে তার রূপ অন্য, তার সমস্যা অন্য, তাকে সমাজে আরও যাতে জায়গা করে দেওয়া যায়, তারই চেষ্টা সাহিত্যিকের কলমে।

সাহিত্যিককে যুগস্রষ্টা হতে হবে। শরৎচন্দ্র যুগস্রষ্টা পুরুষ ছিলেন। তিনি সে যুগের সামাজিক অবনতিগুলি যেভাবে দেখেছেন, তুলে নিয়ে এসে প্রকাশ করেছেন। সে যুগে সতীত্ব, এক পুরুষে নারীজাতিকে সন্তুষ্ট থাকা, স্বামীই স্ত্রীর ধ্যানজ্ঞান, স্বামী গত হলে স্ত্রীলোকের আর কোন অন্য চিন্তা মনে স্থান দেওয়া চলবে না। গ্রাম্য পরিবেশ, গ্রামের কতকগুলি কুসংস্কারাছন্ন দাম্ভিক সমাজকর্তা, বিষয় নিয়ে পরিবারের মধ্যে কুট-কচালি, এক বাড়িতে বহু নারীর এক সঙ্গে থাকায় কি বিষময় ফল, সেও তাঁর কলমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পল্লীসমাজে বেনীমাধবকে আমরা দেখেছি, তার দাপটে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর ভ্রাতৃবধূও বেনীমাধবের শয্যাসঙ্গিনী হতে দ্বিধা করে নি, এই বেনীমাধবরা সে যুগে সমাজের এমন এক জায়গা নিয়ে বিরাজ করত, যাদের তুলে ধরতে শরৎচন্দ্র একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। সে যুগের বেনীমাধরা যে একেবারে সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে, এ আমরা বলতে পারি না। পল্লীসমাজের বেনীমাধব, দত্তার স্বাথান্বেষী রাসবিহারী, তবে এদের আমরা চরিত্রহীন দেখি নি, এই বাঁচোয়া। দেনা পাওনার জীবানন্দও কম লম্পট ছিল না। এদের সামনে রেখে শরৎচন্দ্র এদের কীর্তিকলাপের কাহিনী সবিস্তারে প্রকাশ করেছেন। এই সব উপন্যাসে যে সব নারী চরিত্র ছিল তাও লক্ষ্য করার মত। পল্লীসমাজের রমা বাল্যবিধবা, রমেশকে ছোটবেলা থেকে ভালবাসত কিন্তু সেই রমেশ যখন বাবার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেশে এল তখন থেকেই নাটক শুরু। রমা নিষ্ঠাবতী, রমার চারিত্রিক কৌলিন্য উচুপর্দায় রেখেও শরৎচন্দ্র তাকে গ্রামের দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারেন নি, গ্রাম্য মানুষ রমাকে ব্যভিচারিনীর আখ্যা দিয়েছে। শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন, রমা রমেশকে ভালবাসত বটে কিন্তু গ্রামের লোক যা বললো সে তা নয়। ভালবাসা নিশ্চয় অন্যায় নয় কিন্তু ব্যভিচারিনী বলা হয় কখন? যদি স্বামী ছাড়া নারী অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে তখনই তো! রমেশ তো রমাকে বলেও ছিল, 'তুমি যে কাউকে না নিয়ে আমার ঘরে এসেছ এখন যদি আমি কিছু করি?' কি কার? অর্থাৎ সেই যৌন সংসর্গ। যেটা নিয়ে সমাজে এত কুট-কচালি। কিন্তু রমা রমেশের কাছ থেকে এমনি ব্যবহার আশা করে না বলেই তো সেই বিশ্বাসে রমেশের ঘরে এসেছিল। সংসারে অনেক মানুষ এমনিই চলে ফিরে বেড়ায় বলেই সংসারটা একেবারে নরকে পরিণত হয় নি। রমেশদের মত স্বাধীনচেতা যুবক আছে বলেই এখনও নারীদের একটু নিরাপদ জায়গা মেলে। তারা নিশ্বাস নিতে পারে। এমনি দেনা পাওনার মধ্যে অলকার চরিত্রও বিশ্বাস

যোগ্য। গ্রামের সবাই জেনে গেল, সে পূজারিনী, সে নিষ্ঠাবতী, বিবাহ বা পুরুষসংসর্গ তার নিষিদ্ধ কিন্তু যখন মাতাল, লম্পট জমিদারের ঘরে রাত্রিবাস করল, তাকে খারাপ বলতে এতটুকু দ্বিধা করল না। অবশ্য সাধারণ চোখে খারাপই প্রতিপন্ন হয়, কারণ জমিদার জীবানন্দর যে চরিত্র, সে চরিত্রে একটি যুবতী সুন্দরী নারীকে বাগে পেয়ে ভোগ করবে না এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে? সাধারণ চোখ তো অতো গভীরে প্রবেশ করে না। সে সাধারণ দৃষ্টিতে যা দেখে তাই উল্লসিত হয়ে প্রকাশ করে। শরৎচন্দ্র এখানেই দেখিয়েছেন, মানুষ কত সহজে নারীকে ব্যভিচারিনী আখ্যা দিতে পারে। সে যাই হোক, অলকা যে ব্যভিচারিনী নয়, সে আমরা দেখেছি বরং সে তাব নারী সত্তা বিকশিত করে জীবানন্দকে সেবা দিয়ে বাঁচিয়েছে, পরে পুলিশ মাজিস্ট্রেটের হাত থেকে রক্ষা করেচে কিন্তু বিনিময়ে কি পেয়েছে? নারীর যে আসল সম্ভ্রম সে হারিয়েছিল। শরৎচন্দ্র এখানে প্রথমে অলকার মধ্যে নারীর আসল ধর্ম সেবা প্রকাশ ক'রেছেন। তারপর বিপদগ্রস্তকে বুক দিয়ে পড়ে বাঁচিয়েছেন। এটাও নারীর মধ্যে কাজ করে তিনি দেখেছেন কিন্তু অলকাব যা গেল সে তো সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর। তখন একটা গল্প প্রকাশ করে জীবানন্দকে অতীতে তার স্বামী ছিল বলে প্রকাশ করেছেন। স্বামী না হলে তো অলকাকে আর কোনদিক দিয়ে বাঁচানো যায় না। নারী যদি নিজেই স্বীকার করে আমি স্বইচ্ছায় জমিদার গৃহে রাত্রি বাস করেছি তাহলে তো ব্যভিচারটাও স্বীকার করে নিতে হয়। স্বইচ্ছায় রাত্রিবাস যখন, তখন জমিদারের প্রতি তার একটা আকাঙ্খা জেগে উঠেছিল। আর জমিদার যা করেছে, সে সানন্দে তা মেনে নিয়েছে।

অলকা তাই বলেছিল গ্রামের প্রধানদের। প্রধানরা তার অকপট সত্য কথায় মর্মাহত হয়েছিল। তাবপর পরিণতি সবাই জানে, লম্পট জীবানন্দ সমস্ত লাম্পট্য ত্যাগ করে অলকার জন্যেই উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। এই যে নারী সত্তার নীরবে দান, এও সে যুগে নারীর প্রধান গুণ দেখে শরৎচন্দ্র দেনা পাওনা উপন্যাসেব মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আমরা কি এ যুগে নারীর এই গুণের কোন হদিশ পাই না? সে কথা এখানে আর আলোচনা কবব না, কারণ যারা নারী তাঁরা এর জবাব দেবেন। এ কাল তো আমার আপনার চোখের সামনেই রয়েছে। সে কথা লেখার মধ্যে প্রকাশ করার চেয়ে দৃষ্টি মেলে দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্র কি নারীকে বিশেষ চোখ দিয়ে দেখেছিলেন? বিশেষ চোখ বলতে কি? নারী যা নয়, তার মূল্যায়ন! তবে কি নারীর যে ধর্ম তাঁর প্রতিটি

লেখায় প্রকাশিত সেটা তাঁর নারী ধর্মের প্রতি অযথা মমতা প্রকাশ! এ কথা যে ঠিক নয় তাও আমরা দেখি। সে যুগের নারীরা যেমন অলকার মত মনের জোর নিয়ে এগিয়েছিল, এ যুগের নারীরা সেই মন নিয়েই বিরাজ করে। শুধু তাদের ধরণ একটু পালটে গেছে। না' হলে আমরা এ যুগেই তো পাই, দুঃস্থ বাড়ীর সব ভার মাথায় নিয়ে নারীই তো নিজের দেহকে পণ্য করে পথে বেরিয়ে পড়ে। এও দেখা গেছে, অফিসের বড়সাহেব অনেকদিন ধরে সুলতার ওপর দৃষ্টি রেখেছে। কিন্তু তাকে বাগে পাচ্ছে না। সুলতা যে বোঝেনি তা নয় কিন্তু সে কেন এই লালসার মাঝে নিজেকে বিকিয়ে দেবে? কিন্তু হঠাৎ এমনি একটি ঘটনা ঘটল যা তার সব শপথ ভেঙে দিল। দুঃস্থ বাড়ী। আয় করে একমাত্র সে নিজে। ছোট ভাইয়ের এমন অসুখ করল যায় যায় অবস্থা। টাকা দরকার। অনেক টাকা। টাকা না হলে ভাইকে বাঁচানো যাবে না।

সুলতা চোখে অন্ধকার দেখল। হঠাৎ ওর স্মরণে পড়ল অফিসের বড় সাহেবের কথা।

একদিন সে অফিস যাবার আগে খুব সাজল। মা জিজ্ঞাসা করল, 'সুলতা আজ এত সাজছিস্ কেন রে?'

সুলতা মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। একটা সুন্দর উত্তর তার মুখে এসে গিয়েছিল, মা আজ আমি মরতে চলেছি কিন্তু সে কথা সে বলল না। অফিসে বড়সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমায় কিছু টাকা দিতে পারেন?'

বড় সাহেব অভিভূত। মেঘ না চাইতেই জল। পুলকিত হয়ে তাড়াতাড়ি ড্রয়ার খুলে এক গাদা নোট সুলতার দিকে এগিয়ে দিল। সুলতা সেগুলি ব্যাগে পুরে বলল, 'কখন আপনার সঙ্গে আমায় যেতে হবে?'

শরৎচন্দ্রের কালের যে নারীরা অলকা হয়ে সমাজ সংসারের মাঝে নিজেদের মেলে দিয়েছিল, এ কালে যে তারা আরও কত ভয়ঙ্করের মধ্যে নিজেদের মেলে দেয় উপরের একটি দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। অলকাকে শরৎচন্দ্র এগিয়ে দিয়েছেন, সেবা, ধর্ম, ইজ্জত যা প্রয়োজন বিলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তারপর তাকে বাঁচানোর জন্যে জীবানন্দকে স্বামী হিসাবে খাড়া করেছেন কিন্তু একালের সাহিত্যিক সুলতার মত চরিত্রকে বাঁচানোর জন্যে বড়সাহেবের সঙ্গে বিয়েও দেয় না, বা তাকে বাঁচবার কোন চেষ্টাই করে না, কারণ সুলতারা বাঁচে না। তাদের বাঁচবার পথ কোথাও খোলা নেই। তারা চোখের জলে ভেসে জনারণ্যে মিশে যায়। আমরা

এমনিভাবে বহু স্থূলতার দেখা পাই, যারা নাচতে নেমে আর ঘোম্‌টা টানে না। তারা জানে, দুনিয়াতে টাকার দাম বেশি। আমার যত টাকা হবে, আমি ততো ওপরে উঠে যাব। সেই টাকার জন্যে তারা হোটেল, রেঁস্তরায়, পথে ঘাটে সর্বত্র নিজেদের রূপ বিকশিত করে ঘুরে বেড়ায়। এমন, পরিবারও দেখা গেছে, স্বামী নিজে থেকে স্ত্রীকে অন্যের আপার্টমেণ্টে পৌছে দেয়, এবং বলে যায়, 'আমি এক ঘণ্টার পর অমুক জায়গায় তোমায় রিসিভ করব।' এই যে স্বামীর মনে কোন বিকার নেই, এর পিছনে ঐ টাকার মোহ। আর নারীও যেন খুব অল্প আয়াসেই বুঝে গেছে, ঐ বস্তুটি দান করলে সুখে স্বচ্ছন্দে সে সংসার করতে পারবে। তাহলে কথাটা বুঝুন, ব্যভিচার শব্দটার আজ কোথায় স্থান হয়েছে?

আপনি হয় তো এ সব জানেন না বলে আমার এই বীভৎস বর্ণনায় খুবই বিরূপ হচ্ছেন কিন্তু আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করি, আমার কথার সত্যাসত্য প্রমাণের জন্যে একটু চোখ মেলে দেখুন, তাহলেই এর স্পষ্ট উত্তর পাবেন। এটা কোন লেখকের কবি কল্পনা নয়, এটাই এখনকার রূঢ় বাস্তব। বাস্তব না হলে তো লেখক তার কলমে সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু সমাজ যে পথে যতখানি গভীরে ঢুকে গেছে তার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে যে শক্তির দরকার সাহিত্যিকের সে শক্তি বড়ই সীমিত। সেইজন্যে আরও শক্তির দরকার। নারী সেই আগের মতই মমতা নিয়ে বিরাজিত কিন্তু সে মমতার ধরণটা শুধু পালটে গেছে। সতীত্ব নিয়ে আমরা যে আগে ভীষণ মাতামাতি করতাম, সেই সতীত্বের জন্যে এখন আর নারীরা অত মাথা ঘামায় না, বরং ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ইস্‌ আমি সতীত্ব রক্ষা করব, আর আমার স্বামীটি উড়বেন। ওটি হবে না। সে সব কাল আর আজকে নেই।' বলেই দেখা গেল সেও দাপটে অন্য কাউকে নিয়ে ঘুরতে লাগল। মদ খেল, আনন্দ করল। সংসার ভাঙল, যাক্‌ ভেঙে যাক্‌। যে সংসারে শুধু টানা পোড়েন, কোন আনন্দ নেই। সে সংসার থেকে কি লাভ? এই যে adjustment এর অভাব থেকেই সংসারে ভাঙন ধরে যাচ্ছে। নারী তার আপন অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছে, সে আর নীরবে কিছুই সহ্য করতে চায় না। তার মনোভিপ্রায়ও অবিদিত নয়, সে চায় মনের মত স্বামী। আরও একটু বাড়িয়ে যদি বলি, সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি নারীদের কাছ থেকে। স্বামী যদি স্ত্রীর অধীন না হয়, তার কর্তৃত্ব মেনে নেয় না, তাহলে সংসারে বিপ্লবের সম্ভাবনা কেউ আটকাতে পারবে না। এটাও কেন হল তার সুন্দর সমাধান লক্ষ্য করা যায়। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ অতীতে আমরা বড় নির্মমভাবে প্রকাশ

করেছি। স্ত্রীকে কোনই অধিকার আমরা দিই নি। তাকে প্রয়োজনে ভোগ্যা হিসাবে, আর রাধুনি, দাসী, ও সন্তান ধারণ ও পালন হিসাবে ব্যবহার করেছি। স্ত্রী কতকাল যে নির্যাতন ভোগ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। নির্যাতিতরা একদিন মাথা তুলবে এ কেউ ভেবে পায় নি। শরৎচন্দ্র যেন লেখার মধ্যে এইটুকু নীরবে প্রকাশ করে গেছেন। তোমরা যতই তাদের সংসারে হেয় করে রাখো, তারা যে হেয় নয় এ কথা একদিন বুঝবে।' তাই বলা যেতে পারে, নারীজাতির জন্যে শরৎচন্দ্রের বেদনা এ অস্বীকার করা যায় না। আমরা শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর মধ্যে দেখেছি, সে বাঈজী ছিল, নাচ, গান ও দেহ বিক্রী করে অগাধ অর্থ উপার্জন করেছিল, কিন্তু সে ভালবাসায় মোহে মরেছিল। ভালবাসা যে এ সবের সঙ্গে জড়িত নয় সেটাই দেখা গেল। জগতে যে যাকে ভালবাসে সে যে স্বর্গীয় দান, এ কথা ঐ বরেণ্য লেখকের কলমে বার বার প্রকাশ পেয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ যুগে যে সব নারীরা উপায়ন্তর না দেখে দেহ বিক্রী করে তাদের হৃদয় ঐ দেহের সঙ্গে সঙ্গে অপবিত্র হয় না। রাজলক্ষ্মীও তো শ্রীকান্তকে বলেছিল, 'আচ্ছা, তোমরা কিছু করলে দোষ হয় না। আমরা কিছু করলে তোমরা কেন আমাদের নরকে ঠেলে দাও?' এই রাজলক্ষ্মীর সেদিনের প্রশ্নের উত্তর কি একালেও কেউ দিতে পারবে? এ কাল কি এখনও এত উদার হয়েছে?

আগেই তার জন্যে বলা হয়েছে, কিছু কিছু একালের ঘটনা। তবু মনে হয় এখনও আমরা অতো উদার হতে পারি নি। কোথায় যেন সংস্কারে বাধে। গোলোক চাটুয্যের শালীকেও তো শরৎচন্দ্র সংসারে রাখতে পারেন নি, তাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা একালের নারীদের কোথাও পাঠাতে পারি না, কারণ কাশী, বৃন্দাবন আর আগের মত নারীদের বাঁচবার জায়গা *পুরে হ্ন, হয় না। এখন নারীরা এখানেই থাকে* আর সংসারের মধ্যে লড়ালড়ি

শরৎচন্দ্রোয়। সেইজন্যে সাহিত্যিকের চিন্তাধারা ভিন্নমুখী হয়েছে। মেলে দিয়েছিল ছিল ভালবাসার রসদ, একালের কলমে ওঠে ব্যষ্টির সঙ্গে দেয় উপায়ের একবার চেষ্টা, অর্থনৈতিক অবনতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আর সেবা, ধর্ম, [illegible]স আনন্দ পায় তার মূল্যায়ন। ব্যভিচার শব্দটা বাদ দিয়ে জন্তে জীবা[illegible]কথনও দেখান, শক্তির সঙ্গে দুর্বলের সংঘাত, কখনও নারী মত চরিত্রকে [illegible]নের দেনা পাওনা নিয়ে বিভেদ, কখনও আরও দূরে চলে বাঁচবার কোন্ সেমার মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দেন। আর মানুষের মাঝে ডুবুরী

র আগুনের খোঁজ পান, সে আগুন শরৎচন্দ্র দেখেন নি।

শরৎচন্দ্রের কলমে দারিদ্র্যতা পরিস্ফুট ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র বিচরণ করেছে। কিন্তু দারিদ্র্যতা যে কত নির্মম, সে একালেও বেশি করে দেখা যায়। আর আমরা তা সচক্ষে দেখি। শরৎচন্দ্রের কালে যে দারিদ্র্যতা ছিল না তা নয়, তিনি নিজেই তার শিকার হয়েছেন। তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য দিক দিয়ে চলাফেরা করেছে। তিনি জীবনকে অন্যদিক দিয়ে দেখেছেন। কিন্তু জীবনের কতখানি জুড়ে যে এই আর্থিক যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণায় কি ভাবে মূল্যবোধ ভেঙে পড়ে, কোন রচনাতেই তা পাওয়া যায় না। শুধু মহেশ গল্পে গফুরের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে প্রকাশিত কিন্তু এখানে দারিদ্র্যের চেয়ে মহেশের মানসিকতা ফোটানোর জন্যেই যেন দারিদ্র্যতা প্রকাশ করেছেন। মহেশ ক্ষুধার জ্বালায় কাতর, একটু ফ্যানও গফুর দিতে পারে না, এই যন্ত্রণা যে গফুরের মধ্যে কি কষ্টের সৃষ্টি করেছে, সেটাই চিত্রিত করতে চেয়েছেন। হিন্দুরা গরুকে ভগবতী বলে কিন্তু মুসলমানরা গরু কেটে খায়, ওদের কাছে গরু একটি খাদ্য বস্তু। কিন্তু মুসলমানও যে গরুকে আপন সন্তানের মত ভালবাসে, সেটাই এখানে লেখকের দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল গফুরের মধ্যে দিয়ে। এই দারিদ্র্যতার জন্যে গফুর যে কষ্ট করেছে, সেই কষ্টটা মানুষের মধ্যেও ছিল কিন্তু শরৎচন্দ্র সেদিকে ফিরেও তাকান নি। তাকালে তিনি নিজেও দেখতে পেতেন, এই গরীব দেশ এক মুষ্টি অন্নের জন্যে কত কিছু করে।

সে যাই হোক, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এদিকে ফেরে নি বলে আমাদের কোন আক্ষেপ নেই। তিনি হৃদয়ের লেখক, মানুষের হৃদয়ের কোথায় কতটুকু হাহাকার জমে আছে তার খোঁজ করেছেন। নারী তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। নারী-মনের নানামুখী সংঘাত নিয়ে তাঁর কলম সরস হয়েছে। আর নারী যে সংসারে কত মঙ্গল আনতে পারে সেটা তিনি বার বার তাঁর বিভিন্ন রচনায় দেখিয়েছেন। আমরা 'নববিধান' ও 'অনুরাধা' গল্পে দুটি নারী চরিত্র দেখি। নববিধানে ঊষা ও অনুরাধা গল্পে অনুরাধা এই দুটি নারী গ্রাম্য নারী কিন্তু এদের মানসিকতা, বলিষ্ঠ নারীত্বের কাছে সভ্য সমাজের নর-নারী হার স্বীকার করেছে। শরৎচন্দ্র বোধ হয় তখন শহরের লেখাপড়া জানা মেয়েদের সঙ্গে গ্রাম্য মেয়েদের তফাৎটা কোথায় সেটাই দেখছিলেন। ঊষা যেভাবে দ্বিতীয়বার স্বামীর ঘরে এল, সপত্নী পুত্রকে যেভাবে আপন করে নিল, শহরের পড়াশুনা জানা মেয়ে হলে কি সেইভাবে নিত? নিত না। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্যে শরৎচন্দ্রের নববিধান লেখা। তেমনি অনুরাধাও কুমারকে যেভাবে আপন করে নিল, বিজয়ের প্রেমও তো সেইভাবে

অনুরাধা অতি সহজে পেল। সেখানে তো বিলেত ফেরৎ বিজয়ের মনে কোন সংস্কার জাগল না! বরং মানুষ যে বাঁচবার জন্যে সংস্কার, মোহ, রুচি সব ত্যাগ করতে পারে এটাই শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন। মানুষ কি চায়? ভালভাবে বাঁচতে। সেই ভালভাবে বাঁচার জন্যে তার সামনে যে সংস্কারগুলি তাকে আঘাত করে, সেই সংস্কারগুলি থেকে মুক্ত হবার জন্যেই মানুষ চেষ্টা করে যায়। শরৎচন্দ্র মানুষের হৃদয়ে যে সংস্কারগুলি দেখেছিলেন তার মুক্তি আনার চেষ্টা করেছেন। একালের সাহিত্যিকও সেই কর্ম করে যায় কিন্তু একালের সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি আরও অন্যভাবে কাজ করে। আমরা প্রেম সম্বন্ধে লেখার সময়ে আলোচনা করেছি, এ যুগে প্রেমের স্থান বড়ই অকিঞ্চিৎকর। প্রেমটা কাজ করে কিশোর কিশোরীর মনে। সেটা নিছক যৌবনের খেলা। তারপর প্রেমের স্থান যে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় একালের মানুষ সেটা বলতেই পারে না। অস্থির ও ভঙ্গুর কাল এটা। অস্থিরতা নিয়ে মানুষ শুধু ধৈর্য হারাচ্ছে। অপেক্ষা করার ক্ষমতা তাদের নেই। সঙ্গে সঙ্গে পাওনাটা না পেলে চিৎকার, চেঁচামেচি, মারামারি, প্রয়োজনে খুনও কেউ করে ফেলে। এই যে হতাশা মানুষের মধ্যে ভর করেছে, কেন? এত অস্থির হয়ে উঠল কেন মানুষ? এর মূল্যায়ন করতে গেলে কোন সমাধানই সঠিক হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের সাহিত্য এগিয়ে চলেছে। এরকম হতাশা শুধু আমাদের দেশে নয়, সমস্ত পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই হতাশার জন্যে মানুষ আরও আনন্দ খুঁজছে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সমস্ত মাদকদ্রব্য, দেহবিলাস প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে যোগ সাধনায় মানুষ লেগে গেছে, যদি এর মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু আনন্দ কি এতই সহজ? এমনি আনন্দের সন্ধান এ দেশের মানুষও খুঁজে ফিরছে। তাই হতাশাকে চাপা দেবার জন্যে সস্তা আনন্দ, সিনেমা, থিয়েটার, তার ওপরে যারা উঠতে পারছে তারা সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, এল. এস. ডি. ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের স্মরণ নিচ্ছে। তারপর তো যথেচ্ছভাবে নর-নারীর মধ্যে দেহবিলাস আছেই।

এই যে মানুষের হতাশা, এর পরিত্রাণ কি করে হবে? এর উত্তর এই মুহূর্তে দেওয়া যাবে না। তাই সাহিত্য শুধু ক্ষণমুহূর্তের জীবন আঁকছে। সামগ্রিকভাবে কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না। এ দৈন্যতা সাহিত্যিকের নয়, এ দৈন্যতা সমাজের। সন্তান বাপ মায়ের বিচার করছে। ছাত্র শিক্ষকের ভেদাভেদ থাকছে না। গার্জেনিপণা ঘুচে গেছে। এটা ভাল কি খারাপ সে আলোচনা মুলতুবি থাক্। হয়তো ভাল, হয়তো নয়। অভিভাবক যে সব সময়ে ভাল করে, এ

কেউ বলতে পারবে না। তার খেয়াল খুশির ওপর অনেক সময় মন্দটাই হয়। আবার ভালও যে হয় সেটাও তো দেখা গেছে। মাথার ওপর একজন না থাকলে নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে যাওয়া যে কত ঝুঁকির সে তো প্রতি পদে পদে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অভিভাবকহীন সংসারে শৃঙ্খলা কিছুতেই থাকে না, এও তো কম ক্ষতি নয়। এই জন্যেই বোধ হয় হতাশার কাল এসে গেছে।

মানুষ নিজে বড় একা। তার সারাজীবনের প্রায় অংশ শূন্যতায় ভরা। এই শূন্যতা বড় যন্ত্রণাদায়ক। সেদিন এমনি একটি শিক্ষিত যুবতীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। সে একটি অফিসে কাজ করে। বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিয়ে কেন করবে না জানি। সমস্ত সংসার দেখতে দেখতে তার বয়স আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছে আর বিয়ে করবার স্পৃহা নেই। তার সঙ্গেই কথা হচ্ছিল। মনোবীণা বলল, 'আচ্ছা, আজকাল কোন গোলমাল হচ্ছে না কেন?' তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে একটু হাত ঘুরিয়ে কথা বলে। বলল, 'বুঝতে পারছেন না, সব সময়ে চতুর্দিকে একটা প্রচণ্ড গোলমাল হলে বেশ মনটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আর কি হবে কি হবে একটা সংশয় সৃষ্টি হলে দিনগুলি দারুন উত্তাপে কেটে যায়।'

তাকে আরও নাড়া দেবার জন্যে বোকার মত মুখ করে বলি, 'ঠিক তো বুঝতে পারলাম না।' সে হাত পা নেড়ে বলল, 'বুঝতে পারলেন না। এই বেশ একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল, ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল, দু' চারটে লাশ পথে পড়ল, গরম গরম সব কথা কাগজে লেখা হল। কাগজওয়ালা কাগজ দিতে দেরী করলেই তাকে মার মার করে ওঠা।'

বললাম, 'সে তো ইংরেজ রাজত্বে ঘটত। এক একটি মুভমেণ্ট হলেই শহর গরম হয়ে উঠত।'

মনোবীণা বলল, 'সে রকম কোন মুভমেণ্ট নয়।' তারপর হেসে বলল, 'আমি রাজনৈতিক কোন মুভমেণ্ট বলছি না। একটা কিছু হলেই যেন ভাল হয়। এই সমান সরল জীবন ভাল লাগে না।'

মনোবীণার কথা নিয়েই বলা যায়, সে কি বলতে চেয়েছিল। ঐ শূন্যতাকে পরিহার। ঐ হতাশাকে গলায় দড়ি দিয়ে কড়িকাঠে টাঙিয়ে রেখে সে উত্তাপ নিয়ে বাঁচতে চায়। এই মেয়েটির চারিত্রিক শুচিতা আমার জানা আছে। এ যদি ঠাণ্ডা মেজাজের না হত, ঝঞ্ঝাটকে অবলম্বন করত, তাহলে উত্তাপের জন্যে

তাকে বাইরে তাকাতে হত না। সে তো নিজেই উত্তাপের খনি। উত্তাপ বিলিয়ে উত্তাপ চাইলে আর হতাশাকে ভর করতে হত না। মনোবীণা পারে না বলে অন্য নারী পারে না তা তো নয়, এই উত্তাপের জন্যেই শীলা, রমা, গায়ত্রী, চন্দনা প্রভৃতি মেয়েরা কলেজ, স্কুল, অফিসের গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে আনন্দের সন্ধানে। আমাদেরই এ যুগের লেখকের লেখায় পড়েছি, ভাই বোনের কলেজের মাইনা দিতে পারে না বলে বোন কলেজ যাবার নাম করে একজন মহিলার বাড়ী গিয়ে ওঠে। মহিলা প্রাইভেট যোগাযোগে খদ্দের যোগাড় করে দেয়। রেটও প্রায় মন্দ নয়। সঙ্গে ঘুরলে এক রেট, সিনেমা দেখলে এক রেট, গায়ে হাত দিলে এক রেট কিন্তু শোবার কথাতেই মেয়েটি বেঁকে দাঁড়ায়। তবে শাঁসালো খদ্দের হলে তার অভিমত পালটে যায়। এ লেখকের লেখা। তাই গুছিয়ে বলা কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি অতো বাধাবাধি দেখা যায়? শহরের চতুর্দিকে একটু ঘুরলে আপনিও দেখতে পাবেন, পুরুষ আনন্দের জন্যে অর্থ ছড়িয়ে আনন্দ খোঁজে, আর নারী অর্থ ও আনন্দ দুই পাবার জন্যে খদ্দের ধরে বেড়ায়। নারীর একদিকে আনন্দ, আর এক দিকে অর্থ। অর্থ মূল্যও কম নয়। সে অর্থ দিয়ে কোন নারী তার শখ চরিতার্থ করতে পারে। কেউ সংসারের জোয়াল টানে। কেউ বিলাসের উপকরণ কেনে। নারী বুঝে নিয়েছে তার দাম কত? কেউ কেউ হেসে বলে, 'আমি তো পুরুষের কাছে ফসফরাস।' 'ফসফরাস?' 'কেন ফসফরাস কথাটা বুঝতে পারলেন না, অন্ধকারে যে আলো জ্বালায়!' 'আমরা অন্ধকার শূন্যতাকে পরিহার করবার জন্যে আলো জ্বালাই, প্রাণে উত্তাপ সৃষ্টি করি বলেই তো জীবন আবার সচল হয়।' লেখক এই ফসফরাসের গল্প লিখেই পাঠকের মনে আনন্দ সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্র সেকালে বসে 'আঁধারের আলো' লিখেছিলেন। পতিতা বিজলীর মনে ভালবাসা সৃষ্টি করে সত্যেনকে আকর্ষণ করেছিলেন। সত্যেন আগে এই রূপবতী রমণীর সাহচর্য পেয়ে পুলকিত হয়েছিল, কিন্তু যখন জানল সে পতিতা, তার ঘৃণা সে রোধ করতে পারল না। এ কালের সত্যেনরাও এই বিজলীদের ঘৃণা করে কিন্তু সত্যেনের মত ফেলে চলে আসে না। তারা বিজলীর শরীরের উত্তাপ নিয়ে, দেহের রহস্য জেনে তারপর ফিরে আসে। কারণ সে জানে, আমি তো একে নিয়ে ঘর বাঁধছি না, ক্ষণিক সুখের জন্যে এদের প্রয়োজন, সেই ক্ষণিক সুখটুকু পাথেয় করে আমার জীবনের আয়ু দীর্ঘতর হবে। সেইজন্যে একালের সত্যেনরা অন্য জগতের মানুষ। একালের সত্যেনরা পবিত্রতার চেয়ে বাঁচার চিন্তাই করে।

কিন্তু এই বাঁচা যে কত কষ্টকর, সে ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। এই বাঁচার জন্যেই সবাই লড়াই করে চলেছে। আর তার জন্যেই সংসারে শুধু অশান্তি। কেউ কাউকে মানে না। কেউ কারুর কথা শোনে না। ক্ষোভ, বিক্ষোভ, মারামারি একটা বিসদৃশ জীবনের শুধু টানা পোড়েন। এই ভঙ্গুর যুগের মাঝে বসে আজ শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে গিয়ে খুব লজ্জার সঙ্গেই বলতে হয়, বরেণ্য লেখক যে ভালবাসার স্রোত মানুষের মধ্যে বইয়ে দিয়েছিলেন সে ভালবাসা কোথায় গেল? তিনি যে শুধু ভালবাসা দিয়েই সমাজকে দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। নিষ্কৃতির সেই বড-জা বিশ্বেশ্বরীর মন কোথায় গেল? বাইরে অভিমান ভেতরে কাতরতা, গিরীশ যে আত্মভোলা মানুষ, সেও শৈলজাকে কত ভালবাসত। এই যে মানুষগুলি সমাজে ছিল, শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন বলেই তো সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন কিন্তু এ মানুষগুলি কি একেবারেই দুনিযা থেকে বিদায় নিল? বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুল যে ভাইকে ভালবাসত, সেই গোকুল কোথায় গেল? শরৎচন্দ্র নর-নারীর প্রেমের ক্ষেত্র শুধু দেখান নি, স্নেহ, মমতা, প্রীতির এমন যোগসূত্র দেখিযেছিলেন, যা আজও লোকে পডতে পড়তে চোখে জল রাখতে পারে না। অভযা স্বামীকে না পেয়ে রোহিনীকে ভর কবেছিল, নিঃসন্দেহে তা ব্যভিচাব কিন্তু সেই ব্যভিচারের গোডার কথা ভাবলে আর অভযাকে খারাপ মনে হয না। একালেও ব্যভিচারের পিছনে হয়তো যুক্তি আছে কিন্তু সে যুক্তি সাহিত্যের কলমে উঠে এলে আমরা তাও মেনে নিই। কারণ যুক্তি ছাড়া কোন ঘটনা ঘটতে পারে না সেটা অভযাব মত হলে আবও ভাল।

অভয়া স্বামীকে পাবাব জন্যে সুদূর বালুচর থেকে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিল। স্বামীকে পাওযাব চিন্তাই তাব ছিল। এই স্বামী পাওবার মধ্যে স্ত্রীলোকের নির্ভরতা, নিবাপত্তাও বলা যেতে পারে। ভালবাসা পরের কথা। নারীর স্বামী ছাডা কোন গতি নেই বলে অভযাব এই বিরাট ঝুঁকি নিযে আসা। তার পরেব ঘটনা সকলেই জানেন। কিন্তু অভয়া *নিরুপায় হয়েই তো রোহিনীকে মেনে নিয়েছিল।* না হলে রোহিনীর চাওয়াকে কি সে প্রশ্রয দিয়েছিল? শরৎচন্দ্র ব্যভিচার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে কত যুক্তি দেখিয়েছেন। একালে এতো যুক্তির অবতারণা করতে হয না। স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'তোমাকে আমার ভাল লাগছে না।' 'কারণ?' স্ত্রী স্বামীর দোষের কথাগুলি ধারাপাত মুখস্তর মত বলে গেল, কিম্বা স্বামী স্ত্রীর দোষের কথাগুলি সেইভাবে বলে গেল। তারপর মিউচুয়াল সেপারেশন বা সর্বসমক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তারা

আবার ঘর বাঁধল কিন্তু সেখানেও কি তারা সুখী? পরের স্বামী-স্ত্রী সম্পূর্ণ দোষ মুক্ত? তাই শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্ন লিখে কমলের মত একটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করে সামাজিক বিধিনিষেধগুলি তোপে উড়িয়ে দিয়ে বিবাহটাকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। সেই সময়ে এই নিয়ে প্রচুর সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। আমরা অনেক চিঠিপত্তর ঘেঁটে দেখেছি, শরৎচন্দ্র এখানে নিরুত্তর থেকেছেন, এবং বলেছেন, 'আমি ভুল করি নি। কমলকে ঠিকই আঁকা হয়েছে।' আজ আমরা দেখি, কমল ঠিকই বলেছে, 'যে কোন মতে বিয়ে হলেই কি জোর করে দাম্পত্য জীবন যাপন করা যায়? বিবাহ না হলেও ক্ষতি নেই।' তার এই স্বেচ্ছাচার ধরণের অভিমত শুনে শিক্ষিত মানুষেরা কমলের নারীত্বের কৌলিন্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। অবশ্য সেখানে কমলের জন্ম ইতিহাস খুব শুচিতার মধ্যে ছিল না। এখানে বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র বোলড্ এ্যাটেমপ্ট করেও সংস্কার মুক্ত নয় বলে কমলের জন্ম ইতিহাস অমনি ঘোরালো করেছেন। একটি সহজ সাধারণ শিক্ষিত মেয়ে কি এমনি বিপ্লব আনতে পারত না? কমলের জন্ম ভাল নয় বলেই সে সভ্য সমাজের মেকী আদর্শ ভেঙে দিতে চেয়েছিল, এভাবে আঁকতে গেলেন কেন? তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই এ চরিত্র এঁকেছিলেন কিন্তু কমল নিজের দুর্বলতা নিয়ে সমাজের প্রচলিত নীতি ভাঙতে গেল। কেন? একালে তো আমাদের ঘরে ঘরে সহস্র কমলের দেখা মেলে। কই তাদের জন্ম ইতিহাস তো অমন পাঁকের মধ্যে সৃষ্টি হয় নি? আর যারা পাঁকের মানুষ তাদের আমরা এমনিই এড়িয়ে চলি। তারাও সভ্য সমাজের সভ্য মানুষদের মধ্যে ঢুকতে চায় না, আমরাও তাদের জায়গা দিই না। সেইজন্যে শেষ প্রশ্নের কমল যতই বড় বড কথা বলে থাক্, আমরা জানি, তার বাপের পরিচয় আমরা কখনও মেনে নেব না। শরৎচন্দ্র এ জায়গায় যে কত ভুল করেছিলেন, সে কথা আজকের মানুষের জীবন দেখে বেশি করে বুঝতে পারা যায়। নীতির লড়াই, বিবেকের লড়াই, সামাজিক বিধি নিষেধ না হয় বাদ দেওয়া গেল কিন্তু আজকের কমলরা শরৎচন্দ্রের কমলের মত যে ভাঙছে, শুধুই ভাঙার খেলায় মেতেছে এ আর অস্বীকার করা যায় না।

যেমন কমল বলেছিল, 'মনের মিল না হলে বিবাহের মন্ত্র দিয়ে বেঁধে রাখা হাস্যকর।' এ কথা আজও নারীর মনে খেলা করে। এবং মনের মিল যেন বড় বেশি লঘু হয়ে গেছে, এও আমরা দেখতে পাই। নিক্তির ওজনে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা যেন পরিমাপ করা হয়। ভালবাসা শব্দটারই কোন গুরুত্ব নেই, শুধু

পাওয়া আর দেওয়ার প্রশ্ন। সে যৌন মিলন হোক বা আর্থিক অসঙ্গতি। হয়তো স্ত্রী সংসারে বেশি দেয়, সে অর্থও হতে পারে, সেবাও হতে পারে। সে জায়গায় স্বামীর দেবার ক্ষমতা কম। স্বামী সংসার সম্বন্ধে উদাসীন, কিম্বা তার একটু উড়নচণ্ডী ভাব। ব্যাস্ লেগে গেল খণ্ডযুদ্ধ। যারা যুদ্ধ পছন্দ করে, দিনরাত যুদ্ধ করে যায়। যারা তা পছন্দ করে না নীরবতা ধারণ করে যে যার পথ ঠিক করে নেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের কথাই ঠিক। কমল যা বলেছিল, অন্যায় নয়। দাম্পত্য জীবনে যদি মনেরই মিল না থাকল, তবে বিবাহের বন্ধন সেখানে কি সৃষ্টি করবে? এ সব কথাগুলি খুবই উচ্চমার্গের কথা। সাধারণ মানুষ এ সব ভাবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ সংঘাতও যে এড়াতে পারে না সেটাও তো দেখা যায়।

চিন্তাশীল মানুষ, মানুষের এই হৃদয় সংঘাতের সন্ধান পেয়েই তাঁর অন্তর্নিহিত স্বরূপটি তুলে ধরেন। শরৎচন্দ্রও শেষপ্রশ্নে সেই সংঘাতটি তুলে ধরেছিলেন। তখন সমালোচকরা পড়ে বলেছিলেন, 'এঁ, হেঁ, না, না, এ কি সব লেখা হচ্ছে।' শরৎচন্দ্র যেমন গল্পের মধ্যেও প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন, তাঁর আশে পাশেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। কিন্তু তিনি মুচকি হেসেছিলেন। শেষপ্রশ্ন বহু বছর আগে লেখা হয়েছে, লেখক কল্পনা করেছিলেন সে অনেক কাল হয়ে গেল কিন্তু তিনি যে কমল চরিত্র সৃষ্টি করে তার মুখে বড় কথা দিয়েছিলেন, আজ কি সে খুবই মিথ্যা? দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখক সেদিন কি বসে ভবিষ্যতের কমলদের দেখতে পান নি? আজ আর সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কমল বলেছিল, বিবাহ কিছু নয়, মনের বন্ধনই সব। এখন তো আমরা পরিষ্কার তাই দেখি। নারায়ণ শিলা সাক্ষী রেখে, সানাই বাজিয়ে, হাজারখানেক লোক খাইয়ে যে বিয়ে হল, সে বিয়ে ছ'মাসের মধ্যে বিচ্ছেদে পরিণত হল। সেদিন একটি খবরের কাগজের সাংবাদিকের কমলে এই প্রশ্ন উদয় হয়েছিল। তিনি আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা এতো বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে কেন?' সাংবাদিক জানলেন, প্রতিদিন গড়ে দুটি করে বিবাহ বিচ্ছেদের কেস আদালতে ওঠে। আর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে নারীই বিবাহ বিচ্ছেদ চায়। শেষ প্রশ্নের কমলের কথা মনে করুন, শিবনাথ খবর না দিয়ে চলে যাবার পর কমল কি রকম রেগে উঠেছিল? আশুবাবু অসুস্থ শিবনাথকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেও কমল রাজী হয়নি। তবে কি একালের নারীরা বিচ্ছেদের মধ্যে কমলের শিবনাথের মতই বেইমান পুরুষদের দেখে? সম্ভবত তাই। না হ'লে এতো বিচ্ছেদের

হিড়িক লেগে যাবে কেন? এতো ক্ষোভ কেন সৃষ্টি হবে? সম্বন্ধ করে বিয়ের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, সেখানে অজানা থাকে বলে দু'জনের মনের মিল হয় না। কিন্তু পরস্পরকে জানার পর দু'জনের সমর্থনে যে বিয়ে হয়, সে বিয়েও এক সময়ে নাকচ হয়ে যায় কেন? এ সম্বন্ধে এই ধরণের দম্পতিকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, অভিযোগ নারীই করে পুরুষের বিরুদ্ধে। কারণ বিয়ের আগে পুরুষ যে সব আশ্চর্য প্রদীপের খোঁজ দিয়েছিল, তাতেই নারী পুরুষকে রাজপুত্র মনে করেছিল, তারপর বিয়ের পর চোর ধরা পড়ে গেল। নারীর স্বপ্ন ভেঙে গেল।

শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্নেও কমলের মধ্য দিয়ে এমনি ইঙ্গিত কি দেননি? কমল কি শিবনাথকে শুধু তাকে ছেড়ে যাবার জন্যে ঘৃণা করেছিল? না, শিবনাথের ভাঁওতা তাকে হতাশা এনে দিয়েছিল। আমরা ব্যভিচার নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। কমল কি ব্যভিচারিনী? এ প্রশ্নের যেমন মীমাংসা হয়না. একালের কমলরা ব্যভিচারিনী নয়। মনের মত মানুষ না পেলেই মানুষ পালটাতে হয়। মনের দৈন্যতায় বিবাহের মন্ত্রের জোরে জোর করে ঘরে থাকতে কেউ চায় না। লোক দেখিয়ে সংসার হয় না বলে সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে। তাই ব্যভিচার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মন হচ্ছে ঠুনকো পেয়ালা, কত সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের মধ্যে নরনারী পরস্পরের কাছে চিরজীবন বাঁধা থাকে। ভালবাসাই সেখানে নিগূঢ় বন্ধন কিন্তু সে ভালবাসার ভিত আজ দৃঢ় নয়, তাই হিসাব নিকাশ সব সময়েই গোলমেলে হয়ে যায়। তাই এ যুগে নারী পুরুষের জীবন বড় অশান্তির জীবন। সে অশান্তি চলছেই। তবে কি আমরা বলব, নারী প্রগতির হাওয়ায় গা ভাসিয়েছে বলে মিলন ক্ষণস্থায়ী হচ্ছে? সেটাও যে এক ক্ষেত্রে সত্য, এটাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ নারী আর পুরুষের অত্যাচার নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে না। নারী জানে, তার মূল্য পুরুষের চেয়ে কম নয়। পুরুষ এতকাল যে সব অত্যাচার করে এসেছে, নারী তা চোখের জলে মেনে নিয়েছে। এখন বরং সমাজে পুরুষের চেয়ে নারীর অধিকার সবচেয়ে বেশি বলে প্রকাশ পেয়েছে। নারীর একদিকে আছে রূপ, সে রূপ বিলিয়ে অন্যকে বশীভূত করতে পারে। দ্বিতীয়, নারী শিক্ষিত হয়ে চিন্তার বলিষ্ঠতায় পুরুষকে তর্কে পরাজিত করতে পারে। পুরুষ আর যুক্তির অবতারণা করে নারীকে হারাতে পারে না। সেইজন্যে পুরুষের চিরকালীন আধিপত্যে ঘুণ ধরেছে বলে পুরুষ নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। তাই সংঘাতও এড়ানো যায় না। এসব

যুক্তিগুলি হয়তো সঠিক নাও হতে পারে, তবে কিছুটা যে এই, সে কথা সহৃদয় পাঠক অস্বীকার করবেন না। তাই একালের বুদ্ধিসম্পন্ন নরনারীর সম্বন্ধে বিচার করতে যাওয়াও মূর্খামি। নারী প্রগতির যুগে নারী স্বাধিকার বলে এগিয়ে চলেছে। সতীত্বের ধ্বজা তুলে তাদের আবার অন্তঃপুরে চালান করা যাবে না। বরং পুরুষই একদিন অন্তঃপুরে চালান হবে। আর নারী বাইরে দাঁড়িয়ে শাসিয়ে বলবে, 'কি আমাদের যে বড় নির্যাতন করেছিলে? এবার তোমরা বসে কাঁদো, আমরা আর তোমাদের কথা শুনব না।' সেদিন যদি আসে, খুব কি অবাক লাগবে? শরৎচন্দ্র নারী চরিত্রের বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে পরোক্ষে কি এই কথাই বলেন নি?

শরৎচন্দ্র সেকালে বসে নারী মনের আরও অনেক যন্ত্রণার দৃশ্য দেখেছেন। চরিত্রহীনে কিরণময়ীর সমস্যা। কিরণময়ী একটি ভদ্রঘরের মেয়ে। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তার শরীরে যৌবন এসেছিল। যৌবনের ক্ষুধাও তার কম ছিল না কিন্তু কি পেল? যার সঙ্গে তার বিয়ে হল, সেই হারাণবাবু তাকে ছাত্রী ছাড়া জানল না। হারাণবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি, বইয়ের ভেতর থেকে রস খুঁজতেন, আর স্ত্রীকে সেই পাঠ্য বইয়ের জ্ঞান দান করতেন। একবারও বুঝতেন না, রূপসী সুন্দরী, যৌবনবতী এই নিরস জ্ঞান চায় না, এখন যা তার আকাঙ্ক্ষা সে তার দেহের সঙ্গে কেন্দ্রীভূত। স্বাভাবিক। বয়েসের একটা সন্ধিলগ্নে যেমন পুরুষের মধ্যে যৌবনের উদ্দামতা আসে, নারীও সেই উদ্দামতাব শিকার হয়। তখন যদি তার সেই ক্ষুধা না মেটে সংসারে সে মঙ্গল চায় না। কিরণময়ীও তাই মঙ্গল চাইল না। আমরা দেখেছি চরিত্রহীনে কিরণময়ীর মানসিকতা। সে অনঙ্গ ডাক্তারের মত নারীলোলুপ কামোন্মত্ত পুরুষকেও অবলম্বন করতে দ্বিধা করে নি। সংসারে এই হয়। আমরা বাইরের চোখে নারীর রূপ, সৌন্দর্য, হাসি, কৌতুক, বাচালতা দেখে ভুলি। আর তার এতটুকু দুর্বলতা দেখলে বলি, 'মেয়েটা কি জঘন্য চরিত্রের?' কিন্তু একবারও অতলে ডুব দিয়ে ভাবি না, মেয়েটার কোথায় অভাব? মানুষের চাওয়া পাওয়া দেহসুখ যৌনাকাঙ্ক্ষা আমাদের দেশে খুব নিম্নমানের চিন্তা বলে মনে হয়। এ সব নিয়ে আলোচনা করলেই রুচিশীল মানুষ নাক সিঁটকে ওঠে। কিন্তু একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না, সংসারে সবচেয়ে বিপর্যয় এই অভাব থেকেই ঘটে। স্বামী স্ত্রীকে যেভাবে চায়, সেই ভাবে না পেলে সে অন্য মনে বাসা বাঁধে। তখন সংসার সুখের হয় না। কিরণময়ীর চরিত্রও শরৎচন্দ্র সেইভাবে দেখিয়েছিলেন। সে যুগে ছিল সংস্কারের প্রশ্ন। এ

যুগে কি একেবারে তা নেই? অন্তত ভাল নারীর ক্ষেত্রে পদস্খলন একেবারেই ঘটে না কিন্তু তার পরিবর্তে কি হয়, সংসারে থেকেও সে নারী নিষ্প্রাণ, কাষ্ঠপুত্তলীবৎ, কলের পুতুলের মত শুধু চলে ফিরে বেড়ায়, না আছে তাতে প্রাণ না আছে তাতে আনন্দ। এ স্বভাব ঐ ভাল মানুষ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যারা সাহস প্রকাশ করতে পারে, মানে বিদ্রোহিনী, যেমন শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী, সেই নারীর সংখ্যা যখন হারাণবাবুর মত অন্যমনস্ক স্বামী পায়, তারা ব্যভিচারিনীই হয়। তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা স্পষ্টই বলে, 'স্বামী যখন আমার দিকে ফিরে তাকায় না, আমার অভাব মেটায় না, তখন আমার কি কর্ত্তব্য?' এই যে নারী মনের সমস্যা শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর মত এক নারী সৃষ্টি করে প্রকাশ করেছেন, এ কালেও নারী সেই সমস্যার যূপকাষ্ঠে পড়ে এখনও বলি হয়। তাহলে কি এই সব নারীদের বলবো আমরা ব্যভিচারিনী? বলতেই হবে। কারণ অন্তরে ডুবুরী হয়ে আর কে নামে? বাইরের প্রকাশটাই আসল! বাইরের চোখে স্ত্রীকে অন্য পুরুষে লিপ্ত দেখলেই আমরা তাকে ব্যভিচারিনীই বলি। শরৎচন্দ্র জৈবিক ক্ষুধায় কাতর, যাকে বলে over sex, এই ধরণের নারীর চরিত্র আঁকেন নি। কেন আঁকেন নি, তার একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। প্রথমত শরৎচন্দ্র একটু puritan ধরণের লোক ছিলেন। কোন প্লটেই তিনি নরনারীর সহবাসের দৃশ্য দেখান নি। ইঙ্গিত করে সরে গেছেন। এটা অবশ্য আর্টের ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান।' পাতার পর পাতা বর্ণনা দিলেই কি সেটা পড়তে খুব ভাল লাগে? তবু যদি তাঁর মধ্যে যৌনাবেগের সস্তা বর্ণনা দেবার লোভ থাকত, ওরই মধ্যে তিনি তা দিতেন। যেমন ইঙ্গিতময় করেছেন গৃহদাহর মধ্যে। সুরেশ তো একেবারে উন্মাদ ধরণের এক দুঃসাহসী পুরুষ। সে অনেককিছুই অচলার সঙ্গে করতে পারত। বুকেও হাত দিতে পারত, জড়িয়ে ধরে তার কাপড় টানাটানি করতে পারত কিন্তু সে শুধু অতর্কিতে অচলাকে চুমু খেয়েছিল। চুমুর ব্যাপারটা বললে আমাদের মনে পড়ে যায় 'পরিণীতা'র ললিতা ও শেখরের কথা। এর আগেও এই বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চুমুর ওপরে যেতে চান' নি। আর যখন একান্তই দেখাতে হয়েছে সুরেশ ও অচলার সহবাস, সেটা রামবাবুর চোখ দিয়ে অচলার পরদিনের ভোরের চেহারায় দেখিয়েছেন। নারীর যে সহবাসের পর কি চেহারা হয় তারই একটি সুন্দর বাস্তব বর্ণনা: 'সুরমার মুখ মড়ার মত সাদা, দুই চোখের কোণে গাঢ় কালিমা, এবং কালো পাথরের গা দিয়া ঝরণার ধারা নামিয়া আসে ঠিক তেমনি দুই চোখের কোণ বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।'

এই বর্ণনায় বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে যৌনমিলনের আনন্দ না থাকলে কি জঘন্য চেহারা হয় ?/ অর্থাৎ অবৈধ মিলনের মধ্যে যে আনন্দ কিছু নেই, সেটাই বলার চেষ্টা। শরৎচন্দ্র এইটুকু ছাড়া আর বাড়তি কিছু প্রকাশ করেন নি। এই ইঙ্গিতটুকু করেই তিনি সুরেশের উদ্দামতার পরিসমাপ্তি টেনেছেন। এতেই বোধ হয় যে নারীর over sex সম্বন্ধে লিখতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। তিনি যে নারীর এই বিশেষ স্বভাবটি জানতেন না তা নয় কিন্তু তাঁর নিজের প্রকৃতি ছিল নারী দরদী। নারীর মনের অভাবটুকু সহৃদয়তার সঙ্গে নিজের অন্তরে ধারণ করে লোকচক্ষুর গোচরে আনা। কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, অচলা প্রভৃতি নারীদের যে অভাব, সেটা প্রচলিত অর্থে সমস্ত ভদ্র নারীর মনের অভাব। অস্বাভাবিকও নয়, আবার স্বাভাবিকতার উর্ধ্বেও নয়। রাজলক্ষ্মী ভাগ্যদোষে পিয়ারী হয়েছিল কিন্তু তার মন এক পুরুষেই ছিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পাবার জন্যে মাঝে মাঝে কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিন্তু কোন সময়ে সংযম হারায় নি। এই যে সংযম রক্ষা, এটা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সংযম কিন্তু এই সংযম নারীর ক্ষেত্রে কি সাধারণভাবে আশা করা যায় ? তখনই বলতে হয়, কবির এ শুধু কল্পনাই, বাস্তব ক্ষেত্রে এমন নারীর দেখা পাওয়া যায় না। নারীর একবার পদস্খলন হলে সে যে আবার ফেরার চেষ্টা করে সত্যি কথা কিন্তু সে কি ফিরতে পারে ? যখন আমরা দেখছি পিয়ারী শ্রীকান্তের দেখা পাওয়ার পরেও সে আপন ব্যবসা বিস্মৃত হয় নি। এই যে মানসিকতা, এটাই কেমন যেন ধোঁয়াটে লাগে। অবশ্য নারী ভালবাসলে সব ত্যাগই স্বীকার করতে পারে। যেমন আমরা বারাঙ্গনা ভবনে দেখি, বারাঙ্গনারা অর্থের জন্যে ব্যবসা করে কিন্তু একজন করে মনের মানুষ রেখে দেয়। জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারা যায়, বাহ্, ওরা তো ব্যবসার জন্যে আসে। আমাদের বাবু বুঝি একজন থাকবে না।' এই বাবুর জন্যে তারা নিজের অর্জিত অর্থ থেকে তাদের খাওয়ায়, পরায়, মদ কিনে দেয়। তার সব সুখ তারা ব্যয় করে। এই সব বাবুদের দেখেই কি শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর মানসিকতা তৈরি করেছিলেন ? শ্রীকান্তর জন্যেও রাজলক্ষ্মীর বেদনা ছিল। রাজলক্ষ্মী বলত, 'আমার টাকা কি তোমার টাকা নয় ?'

একটি বারাঙ্গনালয়ের বারাঙ্গনাও তার বাবুকে সেই কথা বলে, 'আমার টাকা কি তোমার টাকা নয় ?' যে বাবু নির্লজ্জ, সে মেয়েমানুষের টাকাতেই জীবন চালায়, আর যার বিবেকে বাধে সে নিজে কিছু উপায় করে। শ্রীকান্ত এই শেষের জাতের মানুষ ছিল। আমরা শ্রীকান্তকে এইভাবেই দেখেছি। কারণ শরৎচন্দ্র

পতিতা মেয়েদের চিন্তা নিয়ে তাদের উদ্ধারের পরিকল্পনা করে গেছেন। রাজলক্ষ্মী তো আপাতদৃষ্টিতে পতিতাই। তার পতিতা বৃত্তি বাদ দিলে তো সে একটি ভাল মেয়ে। ধর্মকর্ম করে সে তার পাপ স্খালন করতে চাইত। বারাঙ্গনা নারীদেরও সেই এক অবস্থা। ঘরে ঠাকুর দেবতার ছবি তারাই বেশি রাখে। গঙ্গা স্নান, পূজার্চনা, প্রত্যহ সন্ধ্যের সময়ে পটের নিচে মাথা ঠেকিয়ে ধূপ ধুনা গঙ্গাজল ছড়া দিয়ে তারপর খদ্দেরের মনোরঞ্জন করে। ওদের জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় ওরা বলে, 'ওমা ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি না করলে খদ্দের আসবে কেন?'

'তাহলে ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি কর শুধু খদ্দেরের জন্যে?'

যে মেয়েটি স্পষ্ট বক্তা, সে বলে, 'শুধু খদ্দেরের জন্যে কেন? জীবনে কত পাপ করছি।'

এই সব বারাঙ্গনাদের কথা শুনেই কি শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মী চরিত্র সৃষ্টি করেন নি? তিনি বেঁচে থাকলে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দিতেন জানিনা কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মানসিকতার সঙ্গে যে বারাঙ্গনাদের মেলে এর আর দ্বিমত নেই। রাজলক্ষ্মীও যেমন শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি, তেমনি বারাঙ্গনালয়ের এক একজন বারাঙ্গনা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে যে কত কাঁদে সে কে জানে? শরৎচন্দ্র এদের কান্না শুনেছিলেন, এদের অন্তরের ব্যথা বুঝেছিলেন, তাই এদের সমাজে স্থান করে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হতভাগী এই সব মেয়েরা, তাদের নিয়ে শুধু আলোচনাই হয়, কেউ তাদের সমাজে স্থান দেবার চেষ্টা করে না।

এই যে কিছুক্ষণ আগে over sex নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যে সব নারী এক পুরুষে খুশি থাকে না, যাদের বহু পুরুষ দরকার হয়, তারা বারাঙ্গনা ভবনে আসুক, বহু পুরুষ নিয়ে মজা লুটুক, অর্থ, আনন্দ দুই ভোগ করুক। সে সব নারী যেমন মনের দিক থেকে কোন কষ্ট পায় না, পুরুষও তাদের কাছে গিয়ে আনন্দই লুটে নিয়ে আসবে। বারাঙ্গনা ভবন তাদের নিয়ে চির আনন্দে থাকুক কিন্তু যে সব নারী একটা ভুলের জন্যে ভুলের মাশুল দিতে এখানে আসে, তাদের নিয়ে শরৎচন্দ্রও যেমন সারাজীবন কষ্ট পেয়েছেন, আমরাও কষ্ট পাই। রাজলক্ষ্মী তাদেরই মত একজন। অর্থ সে অঢেল উপায় করেছিল, রূপ, যৌবন, নাচ, গান সবই তার ছিল, অকাতরে তা বিলিয়ে উপায় করেছিল অজস্র কিন্তু একদিনের জন্যে কি সে সুখী হয়েছিল? শরৎচন্দ্র এই সব নারীর ইতিহাস বলতে চেয়েছেন, আমরা এই সব নারীর কথাই ভাবি। যারা এই জীবন মনে প্রাণে চায় নি, অথচ

ঈশ্বর তাদের এই জীবনই দিয়েছেন। ঈশ্বরের ওপর দোহাই দিয়ে কি আমরা নিজেদের দোষ স্খালন করব? ঈশ্বর কি বলে দিয়েছেন, নারীর একবার ভুলত্রুটি হলে তাকে আর ঘরে নেবে না? ভগবান তো সবার ভেতরেই আছেন। নারী, পুরুষ উভয়েই তো ভগবানের সন্তান। একটি ঘটনা উল্লেখ করি। মেয়েটিকে ফুঁসলিয়ে এক যুবক এই বারবণিতালয়েই তুলেছিল। কদিন খুব ফূর্তি করল। মেয়েটিকে বোঝাল, 'হঠাৎ ঘর পাওয়া তো মুস্কিল, তাই এখানে এসেছি, ঘর পেলে চলে যাব।' অবলা মেয়েটি তাই বুঝল। কিন্তু মাঝে মাঝে মেয়েটি যুবকটিকে ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। আর বিয়ের প্রস্তাব তুলত।

যুবকটি বলত, 'সব হবে। দাঁড়াও আগে ঘর পাই।'

এই সময়ে মেয়েটি অন্তসত্বা হল। এই খবরটি শোনার পর যুবকটি পালাল। তারপরের কাহিনী আর আপনাদের কল্পনা করে নিতে অসুবিধা হবে না কিন্তু কল্পনার পরেও যে এক কল্পনা থাকে সেই কথাটিই বলি। মেয়েটির নাম তৃষ্ণা, মফস্বলেব মেয়ে, পড়াশুনাও শিখেছে। যুবকটি পালাতে সে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। সেই বাড়ীর অন্য মেয়েরা তাকে কিছু বললো না। শুধু মুচকি হাসল। কারণ তাদের তো এসব জানা আছে। এ তো আর নতুন নয়।

কদিন ধরে তৃষ্ণা খুব কেঁদে একদিন কান্না ভুললো। একটা উপায় তো কিছু করতে হবে? এ বাড়ীর যে কর্ত্রী তার কাছে গেল। তাকে জানালো, 'আমি বাড়ী যাব।' মেয়েটিকে দেখে বহু অভিজ্ঞা কর্ত্রী বলল, 'বাড়ীতে তোমায় নেবে?'

তৃষ্ণার কথাতেই জানা গেল, তার বাবা সে অঞ্চলের একজন ডাক্তার। সে-ই একমাত্র মেয়ে। মেয়েকে তিনি ফেলবেন না। কর্ত্রীর মেয়েটির প্রতি লোভ হয়েছিল, কারণ তৃষ্ণা যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। ব্যবসা করলে বেশ পয়সা আয় হত। তবু তো কর্ত্রী মানুষ, দয়ামায়াহীন সংসারে কেউ নয়। কর্ত্রী বলল, 'যাও। তবে তোমার বাবা যদি ঘরে স্থান না দেয় বিন্দুমাসিকে ভুলো না।'

কর্ত্রীর নাম বিন্দুবাসিনী। তৃষ্ণার সঙ্গে বিন্দুমাসি একটি লোক দিল। বিন্দুবাসিনী সে সময়ে কি বিচক্ষণ জহুরীর মত হেসেছিল? সে কথা আমরা জানি না।

লোকটি দিয়ে চলে এসেছিল। কিন্তু দুদিন পরে তৃষ্ণাই কাঁদতে কাঁদতে এসে বিন্দুবাসিনীর পায়ে আছড়ে পড়ল। তার কান্নার মধ্যে জানা গেল, বাবার একমাত্র মেয়ে সে, তবু বাবা ঘরে জায়গা দিল না। বলল, 'কুলটা মেয়েকে আমি ঘরে স্থান দেব না।'

আমি মা।

মা বলল, 'যার সঙ্গে পালিয়েছিলে সেখানেই যাও। আমরা তো সমাজে বাস করি বাপু।'

বিন্দুবাসিনী বহু অভিজ্ঞার মত শুধু হাসল। তারপর তৃষ্ণার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। তৃষ্ণার কান্না যেন আর থামে না। সে কাঁদছে তার পরবর্তী পরিণতির চিন্তায়। শ্যামলদা যে তাকে এই নরককুণ্ডে ফেলে যাবে সে একবারও ভাবে নি। কিন্তু মেয়েটির কি দোষ? সে ভালবেসেছিল, ঘর বাঁধতে চেয়েছিল কিন্তু যার হাতে পড়ল, সে অন্যগ্রহের লোক। এই যে, গ্রহান্তরের মানুষ, এদের কথা কে বলবে? তারপর তৃষ্ণার গর্ভের সন্তান এখানেই প্রসব হল। কর্ত্রী টাকা খরচ করল, তারপর যখন কর্ত্রী তৃষ্ণাকে ব্যবসায় নামতে বললো তৃষ্ণা বেঁকে দাঁড়াল। তার নারী মনে তখনও ভাল জীবনের চিন্তা।

কর্ত্রী বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি ব্যবসা করবে না, তবে তোমার জন্যে এতগুলি টাকা খরচ করলাম কেন?'

সত্যি কথা, কর্ত্রী না থাকলে তৃষ্ণা বাঁচত কি করে? তারপর তৃষ্ণাই বলল, 'বিন্দুমাসি, তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। কিন্তু তবু আমায় একটু সময় দাও। আমি তো কিছু পড়াশুনা জানি, যদি অন্য কিছু পাই দেখব না?'

বিন্দুবাসিনী বলল, 'আচ্ছা।' কিন্তু তারও একটু সন্দেহ ছিল। বিন্দুবাসিনীর জীবনে তো কম অভিজ্ঞতা ছিল না। মেয়েটা একটু চারিদিক ঘুরে ফিরে আসুক তারপর নিজের ইচ্ছাতেই এ ব্যবসায় নেমে পড়বে। অভিজ্ঞতার ফল তো তার জানা আছে এই ভেবে সে তৃষ্ণাকে ছেড়ে দিল। তৃষ্ণা ভালভাবে বাঁচবার জন্যে চাকরীর সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। এক একদিন ঘুরে আসে, আর বিন্দুবাসিনী তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু হল?' তৃষ্ণা মাথা নাড়ে। কিন্তু তৃষ্ণার এই চাকরী খুঁজতে গিয়ে যা অভিজ্ঞতা হতে লাগল, তার চেয়ে এই বারাঙ্গনালয়ে থেকে দাপটের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে পারে। চাকরী দেবার নাম করে অধিকাংশই ভদ্রলোকেরা তাকে অন্য জীবনের ইঙ্গিত দেয়। একদিন এমনি একটি চরম ঘটনা ঘটল, যার পর তৃষ্ণার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পালটে গেল। কদিন আগে একটি অফিসে ইন্টারভিউ দিয়েছিল, ইন্টারভিউ যিনি নিয়েছিলেন সেই মিঃ মুখার্জির ব্যবহার তার ভাল লেগেছিল, সহৃদয় ভদ্রলোক, পরের দুঃখে কাতর, তৃষ্ণার অবস্থা শুনে তিনি চোখে জল রাখতে পারেন নি। যদিও তৃষ্ণা বানিয়ে তার দুঃখের কাহিনী বলেছিল। বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, ছোট ছোট ভাই বোন,

বাবা পন্থ। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছিলেন সেই মিঃ মুখার্জি। অফিসে যেদিন জয়েন করল, ঘটনাটা সেই দিনই ঘটল। ঘরে ঢুকতে মিঃ মুখার্জি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলেন। তৃষ্ণা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবার আগেই দু'খানি সবল হাত এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

বিন্দুবাসিনী শুনছিল, বলল, 'তারপর ?'

তৃষ্ণা বলল, 'তারপর আর কি ? আমারও হাতখানি তার ভারী গালে গিয়ে পড়ল।'

বিন্দুবাসিনী আর ওসব কথায় গেল না, বলল, 'এবার ব্যবসায় নামবে তো !'

তৃষ্ণা চুপ। বিন্দুবাসিনী বলল, 'দেখলে তো, অভিজ্ঞতা তো সঞ্চয় হল !'

তৃষ্ণা মাথা নাড়ল কিন্তু তৃষ্ণার কেন সংশয় আমরা জানি। প্রতিটি হতভাগী মেয়ে এমনি সংশয়ে শুধু ভেবে চলে কিন্তু ঐ ভাবা পর্যন্ত, সমাধানে তারা আর আসে না। তারপর ডুবে যায় অতলে। এই অতলের মানুষ ঐ বারবনিতালয়ের মেয়েরা। এই অতলের মানুষ ছিল রাজলক্ষ্মী। প্রথমে নামার আগে বহু চোখের জল ফেলেছিল। তারপর যখন অতলে নেমে গেছে, আর ভাবে নি। নিজের অন্তরে অন্ধকার নিয়ে বাইরে রোশনী জ্বালিয়েছে, খদ্দেরদের মনে আনন্দ জাগাবার জন্যে কত ধরণের ছলাকলা করা যায় তারই অভ্যাস করেছে। চাঁদের আছে চৌষট্টি কলা কিন্তু এই সব মেয়েদের ? সেই অভাগী মেয়েদের কথা আর একটু সবিস্তারে বলবার অন্যত্র চেষ্টা করব। মেয়েরা শরীর বেচে বারাঙ্গনালয়ে কিন্তু তাদেরও একটি আলাদা মন আছে। সেই মনের জন্যে তারা শ্রীকান্তের মত লোককে পোষে। তাদের ভালবাসা দেয়, স্ত্রীর মত তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। শরৎচন্দ্র এমনি ভালবাসার মানুষ দেখে সেই মানসিকতার ওপর ভর করে নিজের জবানীতে শ্রীকান্তকে তৈরি করে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। নারী দেহ যাকে দান করে, ভালবাসা যে তাকে দেয় না, এই বারবনিতালয়ের মেয়েরা যেমন সত্য, তেমনি সাধারণ জীবনেও বহু মেয়ে স্বামী পুত্র নিয়ে সারা জীবন ঘর করে কিন্তু মন দেয় না সেও তেমনি সত্য। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কিন্তু এটাই নারী মনস্তত্বের নিয়মের আসল কথা। এই মনস্তত্বের ওপর নির্ভর করে শরৎচন্দ্র দেবদাস উপন্যাস রচনা করেছিলেন। পার্বতী কর্তব্যের খাতিরে স্বামীগৃহে গেছে কিন্তু মনের দৌলতে দেবদাসই তার পুরুষ। বন্ধু জিজ্ঞাসা করতে দাপটে তাই বলেছিল, 'যাকে ছোটবেলা থেকে জানি, সেই তো আমার আপন। তাকে ভুলব কেমন করে ?' পথ নির্দেশের হেমনলিনী ও গুনিনকে এই কথা বলেছিল।

'তোমরা জোর করে আমার বিয়ে দিলে কি হবে? আমার যে স্বামী সে তো আমি জানি।' নারী মনের এই মনস্তত্ব বড়ই আশ্চর্য মনে হয়। আমরা কি এই সব নারীদের ব্যভিচারিণী বলবো? হয় তো বাইরের চোখে তাই বলতে হবে কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে? শরৎচন্দ্র এই নারী মনেই ডুবুরী হয়ে নেমে গিয়ে নারী মনের ঘোরালো ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদ্ধার করেছেন। আজ আমরা তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে সেই সব রহস্য জানতে পারি। যদি এসব ঘটনা সত্য না হত, তাহলে প্রতিবাদ নিশ্চয় হত। আর তাঁর রচনার এই বহুল প্রসারও আটকে যেত। তাই নয় কি?

সেকালের বারবনিতা

শরৎসাহিত্যে বারবনিতাদের সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে আমরা সেকালের বারবনিতাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। শরৎচন্দ্র এদের সাহিত্যে তুলে আনলেন কেন? এদের নিয়ে কখনও কেউ তো কিছু বলে নি। কি সাহিত্যে কি লোকচক্ষে চিরকাল তারা অপাংক্তেয় থেকেছে। অথচ পুরুষের একমাত্র অবসাদ বিনোদনের জন্যে এরাই চিরকাল প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। মন্দিরে মন্দিরে যেমন ছিল দেবদাসীরা, রাজপ্রাসাদে রাজনটীরও অভাব ছিল না। তেমনি এক একজন রাজার বিলাসভবনে অসংখ্য সুন্দরী যুবতী নারীর সমাবেশ দেখা যেত। তারা না থাকলে রাজার রাজ্যশাসনও ভালভাবে চলত না। এই প্রসঙ্গে আমরা ফরাসী বুরবঁ সম্রাটদের কথা বলতে পারি। বুরবঁ কুলকলঙ্ক তিনজন সম্রাট চতুর্দশ লুই, পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই যে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের দেশের মুঘল বাদশাহরা তাদের কাছে ম্লান। পুরুষের জীবনে আগে প্রয়োজন অর্থ, তারপর বিলাসজীবন। বিলাস জীবনকে কেন্দ্র করে নাচ, গান, মাদকদ্রব্য, খানাপিনা তার সঙ্গে প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর লাস্যময়ী যৌবনোন্মত্তা নারী। যে নারীর যৌবন উদ্দাম কমনীয় লাস্য শরীর দেখে পুরুষের ইন্দ্রিয় উদ্দাম হয়ে উঠবে। বাদশাহ বা সম্রাটদের কথা আলাদা, তাদের চাহিদা একটু অতিরিক্ত হবেই কিন্তু সাধারণ মানুষ যার অর্থ আছে, যার সঙ্গতি একটু বেশি, সেও যথেচ্ছ নারী সঙ্গ নির্বিবাদে কামনা করে। এটা স্বাভাবিক অর্থে নিন্দনীয় নয়। পুরুষের কাছে নারীর পূজা এটা ঈশ্বরেরই দান। না'হলে নারীর এই যে রূপ, সৌন্দর্য, কমনীয় দেহলতা কি কাজে লাগে? ফুলের যেমন সৌন্দর্য আছে বলে ফুল সবার কাছে আদৃত, তেমনি নারীরও আদর পুরুষের কাছে সৃষ্টির জন্মকাল থেকে। সেই আদরের রকম ফেরে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই নারীকে বেশি আদর দিতে গিয়ে যৌন সম্পর্কেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সেইজন্যে ফরাসী ভাষায় সেই মধুর জ্ঞানার্জ্জনকে বলা হয়, 'doux savoir'। চতুর্দশ লুই ষোল বছর বয়েসে প্রথম মধুর জ্ঞানার্জ্জন করেছিলেন। তৎকালীন অসীম ক্ষমতাশালী কার্ডিন্যাল ম্যাৎসারীমের ভাইঝি সুন্দরী অলিং ম্যানসিনিকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সেই ষোল বছর বয়সেই চতুর্দশ লুই যে খেলা শুরু করেছিলেন তার তুলনা হয় না। মা রানী এ্যান ছেলের এই কাণ্ড দেখে প্রমাদ গুণলেন। মাদাম গু

বোভে নামে একজন পরিচারিকাকে নিযুক্ত করলেন ছেলেকে ভাল শিক্ষা দেবার জন্যে কিন্তু সে ভাল শিক্ষাই দিল। চতুর্দশ লুইয়ের দ্বিতীয় শিকার হল অলিম্পের বোন মারী ম্যানসিনি। চার বছর ধরে তাদের খেলা চলল। তারপর চতুর্দশ লুইয়ের বিয়ে হল। কিন্তু রানী মারিয়া টেরেশার সাধ্য ছিল না স্বামীকে নিজের কাছে বেঁধে রাখার। এই ধরণের বিকৃত যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বড় একটা দেখা যায় না। তবে রাজা বাদশাহদের প্যাশন একটু উগ্র ধরণের। যাই হোক্ চতুর্দশ লুই যেভাবে নারীসঙ্গ করেছিলেন, ইতিহাসে তাঁর নাম যৌনবিকারপ্রাপ্ত পুরুষ হিসাবে অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর সাহচর্যে যে সব নারী এসেছিল যথাক্রমে লুইসা ত্ব ল্যা ভ্যালিয়ের, মাদাম ফ্রাঁসোয়েস ত্ব মঁতেস্পাঁ, মাদাম মাঁতেনঁ প্রভৃতি সুন্দরী ধার্মিক নারী কিন্তু চতুর্দশ লুইয়ের প্রবৃত্তির হাত থেকে তাদের বাঁচবার কোনই উপায় ছিল না। তারপর তাঁর প্রপৌত্র পঞ্চদশ লুই, তিনি আবার যে ধরণের উদ্দাম জীবন যাপন করলেন, মহান লেখক ফ্ল বেযারের কল্যাণে আমরা তাঁর অদ্ভুত জীবনের সন্ধান পাই। তাঁর প্রধানা রক্ষিতা ছিল মাদাম ত্ব ব্যারী। যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন বারবনিতা, মধ্য জীবনে ছিলেন চরিত্রহীন এক কাউণ্টের পত্নী এবং সর্বশেষে পঞ্চদশ লুইয়ের পঙ্কিল জীবনের নিত্য সহচরী। গল্প আছে, তিনি সম্রাটের শয্যাপার্শ থেকে নগ্ন হয়ে উঠতেন এবং উপস্থিত গণমান্যদের বাধ্য করতেন তাঁর পোষাক পরতে সাহায্য করতে। আরও শোনা যায়, তিনি সম্রাটের জ্ঞাতসারেই তাঁর এক যুবক ভৃত্যের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন খোলা-খুলিভাবে। এই যে নারী, পুরুষের দুর্বলতার সুযোগে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করে, এটা স্বাভাবিক অর্থে নারীর এক অন্য স্বভাবের পরিচয়। পুরুষের এই দুর্বল স্বভাব বুদ্ধিমতী ও সাহসী নারীর কবলে পড়লে সে তার সদ্ব্যবহার করে। এটা যৌন সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত নয়। যে নারী বুদ্ধিমতী ও ধূর্ত স্বভাবের সে পুরুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয়। পঞ্চদশ লুইয়ের রক্ষিতা মাদাম ত্ব ব্যারীও এই সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি এই সম্রাটের অত্যাধিক প্যাশনের খোঁজ পেয়ে নিজেকে ছাড়াও বহু সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে এসে তাঁর কাছে সরবরাহ করতেন। সম্রাটের মৃত্যু হয় এই কারণের জন্যেই। এক বসন্তরোগপ্রাপ্ত চাষী মেয়ের সঙ্গে সম্ভোগকালে তাঁর শরীরে বসন্তরোগ প্রবেশ করে। এই চক্রান্ত ঐ ধূর্ত মহিলা মাদাম ত্ব ব্যারীর। এমনি আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের। তিনি মেহেরউন্নিসার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার বিবাহিত জীবন তচনচ করে দেন। তারপর তাকে পাবার জন্যে মরীয়া হয়ে ওঠেন। প্রথমে

এই নারী কিছুতে এই সম্রাটকে ক্ষমা করতে পারেন নি। হোক না বিবাহিত জীবনের পূর্বে প্রণয়। নারী বিয়ের আগে যা ভালবাসাবাসি করে, বিয়ের পর কিছু নয়। এক্ষেত্রে মেহেরউন্নিসা ভারতীয় নারীর আদর্শ মেনে নিয়েছিল কিন্তু সংসারে কে কবে নারীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে? জাহাঙ্গীরেরই জয় হল। মেহেরউন্নিসা নতুন নাম নিয়ে পিছনের সব ভুলে গেল। এই যে নারীর আর একটি স্বভাব, এও ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে। জাহাঙ্গীর-মহিষী হয়ে নূরজাহান এক এক করে সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা নিজে অধিকার করেন। আর জাহাঙ্গীর রূপমুগ্ধ কামোন্মত্ত পুরুষ, তাঁর স্থান হয় বিলাস কক্ষে। বিলাসের জীবনে ভাসতে ভাসতে মুঘল সম্রাট একদিন অকর্মণ্য হয়ে যান। তাঁকে অকর্মণ্য করার জন্যে নূরজাহানের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। জাহাঙ্গীর সরাবহীন জীবনযাপন করলেই সরাবের পেয়ালা মুখে তুলে দিতেন, সুন্দরী যুবতীর অভাব যাতে না হয় তার জন্যে সর্বদাই যুবতী মেয়ে মজুত থাকত। পুরুষও যেমন নারী ভোগের চিন্তায় নারীকে ছলে বলে কৌশলে অধিকার করে, নারীও যে সেই আক্রোশের সুযোগ পেলে তার প্রতিশোধ নেয়, পঞ্চদশ লুইয়ের রক্ষিতা মাদাম দ্য ব্যারী ও জাহাঙ্গীর মহিষী নূরজাহানই তার প্রমাণ কিন্তু এঁরা ছিল বড় ঘরের বড় কন্যা। এরা যে সুযোগ পেয়েছে, সাধারণ নারী কি সে সুযোগ পায়? যেমন ষোড়শ লুই অকর্মণ্য ও অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল বলে তাঁর স্ত্রী মারী আঁতোয়ানেতে নিজেই মধুলোভী মক্ষিকার শিকার হয়েছিলেন। এই সব কারণে ফরাসী বিপ্লব হয়।

এ সব কথা বলার কারণ, নারী সমাজে কে কেমন তার শাসন অধিকার করতে পারে, সে সম্বন্ধেই কিছু বলা। পুরুষের হাতে নারী নির্যাতন এ নারী সৃষ্টির কাল থেকে। আদম ইভ্‌কে দেখে আর স্থির থাকতে পারে নি, কারণ ইভের সৃষ্টি আদমের জন্যে। ইভ্ যদি সৃষ্টি না হ'ত, আদমের শূন্য জীবন কেউ ভরাতে পারত না। এই যে নারী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য, তার প্রয়োগ সংসারে কিরকমভাবে হয়ে চলেছে সেই নিয়ে আমাদের বক্তব্য। বিশেষ বিশেষ নারীকে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখি, তাদের কীর্তিকথা সবিস্তারে জানি বলে তাদের তুলে ধরতে পারি কিন্তু যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্যাতিতা হয়ে শুধু কেঁদেই জীবন হারায়, তাদের কথা আর কে বলবে? কেউ কখনও বলে না বলেই নারীর দুঃখও লাঘব হয় না।

মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রার জীবন নিশ্চয় আমরা বিস্মৃত হই নি। তার রূপবহ্নিতে রোম অধিপতি জুলিয়াস সিজার, অ্যাণ্টনী প্রভৃতি শক্তিশালী পুরুষ

কিভাবে তাদের শক্তি ও প্রাণ হারিয়েছিল তা আমরা দেখেছি। নারী তার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্তে তার রূপের জাল ফেলে যে পুরুষ ধরে এ আর কারও অজানা নয়। এদের আমরা বারবনিতা বলব কিনা জানি না, তবে এরা অন্য ধরণের নারী। কতকগুলি পারস্পারিক অবস্থার সঙ্গে এরা সমঝোতা করে এই জীবনে নেমে পড়ে। দুঃখ এদেরও আছে, বেদনায় নীল এরাও হয়, তবু এরা মনের দিক দিয়ে একদিকে সান্ত্বনা পায়, কারণ তারা নিজে জেনে শুনে বিষ পান করে।

আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, ব্যবহারিক জীবনে বারবনিতার অবস্থান সেই নারীজন্মের প্রথম থেকে। এক পুরুষ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের ছায়াপাত ঘটলেই আমরা নারীকে সেই আখ্যা দিয়ে থাকি। এমনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, সন্দেহবশে আমরা কলঙ্ক দিয়ে বসলাম। নারী এই কলঙ্কেই অর্ধেক নষ্ট বলে প্রতিপন্ন হল। নষ্টনারী এই কথাটি নারীর কাছে যে কত বড় অসম্মানের নারীমাত্রেই তা জানে। আর সেই অসম্মানের চিত্র বার বার সাহিত্য শিল্পে প্রকাশ করে নারীকেই আমরা সচেতন করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, নারীকে এই পঙ্কে নামায় কে? নারী নিজে নেমেছে এমন ইতিহাস কোথাও দেখা গেছে কি? এ দৃষ্টান্ত বিরল। কোন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিকও দেখাতে পারবেন না, নারী স্বেচ্ছায় নিজে নষ্ট হয়েছে। অতিরিক্ত যৌন বিকারপ্রাপ্ত নারীর কথা আমাদের আলোচ্য নয়, কারণ তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। Pervated Lady যেমন আছে, Pervated পুরুষের সংখ্যাও বিরল নয়। তবে পুরুষ সংস্কারহীন বলে তার প্রবৃত্তি বল্গাছেঁড়া হরিণের মত ধাবিত হয়। এই পুরুষের বিভিন্ন চক্রান্ত নিয়েই যা কিছু বলা।

এই পুরুষই যুগে যুগে সাহিত্য, শিল্প. কাব্যগাথা সৃষ্টি করেছে আর নারীর পতনের কাহিনী নানাভাবে চিত্রিত করেছে। আমরা পুরাণের মধ্যে দেখতে পাই কল্পিত ইন্দ্রের রাজসভায় মেনকা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরারা নৃত্য করত। এই অপ্সরাদের বহুবল্লভা হবার বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না কারণ ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্য গীত না হলে রাজসভার মর্যাদা পূর্ণ হত না। তখন ছিল সোমরস। সে রস পান করলে অতিরিক্ত উন্মত্ততা জেগে উঠত। তারপর মুসলমান রাজত্বে তার নাম হল সরাব। এখন মদ, কেউ কেউ ভদ্রভাষায় বলে ড্রিঙ্ক। সে যাই হোক। সেই সোমরস পান করে স্বর্গের দেবতারা অপ্সরাদের অঙ্কশায়িনী করত। পুরাণে আরও দেখা যায়, এক একজন শ্রেষ্ঠ মুনিবর নারীর বিলোল কটাক্ষে মুগ্ধ হয়ে তপস্যা ত্যাগ করে নারীভোগে উন্মত্ত হয়ে উঠত।

যে দেশ বেশী আনন্দ বিনোদনে জীবন যাপন করতে চায়, সে দেশে পতিতালয়ের সংখ্যাই বেশী। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, প্যারিস প্রভৃতি দেশের মানুষ বেশিই আনন্দ চায়, সেই জন্যে সেখানে পতিতার সংখ্যাই বেশি। আমাদের দেশে পতিতার উৎপত্তি সেই একই কারণে, তবে দেখা যায় কতকগুলি বিবিধ ও চমৎকার কারণ তাব মধ্যে নিহিত আছে। কতকগুলি ধর্মের অনুশাসনের জন্যে নারীদের প্রকাশ্যে দাঁড করানো হয়, তারপর তাদের ওপর যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। নারী নিরুপায হয়ে সেই ধর্মের বলি হয়। সব দেশে চিরকাল পুরুষ অতিরিক্ত আনন্দ বিনোদনের জন্যে নারীকে প্রলোভিত করেছে, বলপ্রয়োগ করেছে, নারী নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে, তাদের অত্যাচার, তারপর তারা অপরাধ ভুলতে না পেরে দেহ ব্যবসাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। পতিতাবৃত্তি যদি বলি নারীর অপরাধ বোধ থেকে চালু হয়েছে, তাহলে কি সেটা বলা অত্যুক্তি হবে ? নিশ্চয় নয়। সেই অপরাধই নারীর জীবনে চরম। সব দেশের নারীরা এক কথাই ভাবে। অবৈধ সংসর্গ করার পর সে যদি বিয়ে না করল, নারী আর সহজ জীবন যাপন করতে চায় না। এ সব দিক থেকে নারীকে আমরা খুবই সৎ বলতে পারি। গোপন রেখে নারী অন্যের সঙ্গে বিয়েতে বসতে পাবে। সে না বললে স্বামী জানবে কেমন করে ? কিন্তু নারী বিবেকের দংশনে কিছুতেই সহজ হতে পারে না। আবাব এও দেখা গেছে, নারী একবার সতীত্ব হারালে, সে নিজেই নেমে যায় নরকে। এই সব কারণে পতিতার উদ্ভব হয়। আমাদেব দেশের পতিতাবৃত্তি ব্যবস্থা আরও চরম। মুসলমানদের মধ্যে ওসব বালাই নেই। নাবীদের দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা চালু আছে বলে মুসলমান রমণীরা পতিতাবৃত্তি খুব কমই গ্রহণ করে। তবে যে সব রমণী অতিরিক্ত পুরুষ সঙ্গ চায় তাদের কথা আলাদা। অতিরিক্ত পুরুষসঙ্গ চায়, তার সঙ্গে অর্থ, বিলাস ব্যসন যাদেব কাম্য তারা পতিতাবৃত্তি সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু তাদের নিয়ে আমাদের কোন কথা নয় কিন্তু যারা চায় না ? যারা সমাজের অনুশাসনে বাধ্য হয়ে পতিতা জীবন গ্রহণ করে ?

মনোবিজ্ঞানীরা তাদের নিয়েই নানাকথা বলেছেন। আমাদের দেশ আবার সে যুগে ছিল ভীষণ ধর্মভীরু। একে তো হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা সব ধর্মের ওপরে। তার ওপর ব্রাহ্মণধর্ম। সে যুগে এই ধর্মের গোঁড়ামাই সংখ্যাতীত পতিতার উদ্ভব করেছিল। দেশের মধ্যে মুসলমান রাজত্ব। ব্রাহ্মণরা জাতির শ্রেষ্ঠ হয়ে প্রবল-ভাবে ধর্মরক্ষা করে যাচ্ছে। মুসলমান বাদশাহের চরেরা এদিক ওদিক ঘুরে

বেড়াচ্ছে। মেয়েরা অন্তঃপুরেই আসীন কিন্তু তাদের তো পুকুরে স্নান করতে যেতে হয় ও বাইরেও বেরতে হয়। আর কার বাড়ীতে ক'টি সুন্দরী যুবতী আছে তাদের অজানা নয়। চর পুকুর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে পাল্কী নিয়ে বসে থাকল। পুকুরে যুবতী দেখেই মুখে কাপড় বেঁধে পাল্কীতে তুলে দিল।

এইভাবে সেকালে নারীদের লুণ্ঠন করা হত। হিন্দুধর্ম তাদের আর ঘরে নেবে না। তখনই দেশের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই সব পরিত্যক্ত নারীদের হিন্দুধর্ম নেবে না। সমাজ পরিত্যক্ত এরা। বৈষ্ণব ধর্ম এগিয়ে এল তাদের গ্রহণ করতে। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সেজে তারা সমাজে জায়গা করে নিল। কপালে তিলক কেটে, গলায় কন্ঠি দিয়ে মালাবদল করে তারা ভিক্ষের দ্বারা সংসার চালাত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সময়ের মানুষ। কিন্তু সেই বৈষ্ণবধর্ম আজ অস্তমিত, কিন্তু কেন? সেটা জানা যায় না। সেটা থাকলে বোধ হয় এত পতিতার উদ্ভব হত না।

কিন্তু যত সমাজের মধ্যে এই সব অত্যাচার হতে লাগল, হিন্দুরা ধর্মকে যেন আরও বেশি চেপে ধরতে লাগল। ধর্ম গেল, ধর্ম গেল বলে রব উঠল। বৈষ্ণব গুরু নিমাই একবার হরি বলো বলে খোল করতাল সহযোগে দেশ মাতিয়ে তুললেন, আর হিন্দু প্রধানরা শাস্ত্রের নিগূঢ় অনুশাসন খুঁজতে তালপাতার পুঁথি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। আর ওদিকে ম্লেচ্ছদের তাণ্ডব। টাকার থলি নিয়ে গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে লাগল যুবতীদের সন্ধানে। যাদের টাকার নেশা আছে তারা গোপনে নবাব বাদশাহের চরদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে লাগল। এমনি বহু ঘটনা সেকালের বই ঘেঁটে পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে কদিন ক'টি ম্লেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ও তাকে সে কথা চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করছে। কিন্তু জোরে সে কথা আলোচনা করতে পারছে না। রাজার চর। পোষাক দেখেই তো প্রতীয়মান হয় তার গুরুত্ব আছে। পায়ে নাগরাই, মাথায় টুপি, গায়ে জরি দেওয়া ওয়েস্টকোট। গোঁফে তা দিতে দিতে সুর্মা আঁকা জুল জুল চোখে চায়। গ্রামের সকলেই বুঝতে পারল মিঁযা কিসের সন্ধানে এসেছে। কেউ খাতির করল, কেউ বিরক্ত হয়ে উপেক্ষা করল কিন্তু প্রকাশ্যে অতটা সাহস করল না কেউ প্রতিবাদ করতে। শুধু বাড়ীর যুবতী মেয়েদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ হল, অন্দরের গোপন জায়গায় তাদের সরিয়ে রাখা হল। দৃশ্যটা কল্পনা করুন সেই যুবতীদের। যেন বলি হবার আগে মুরগী যেমন থরথরিয়ে কাঁপে তেমনিভাবে তারা দিন যাপন করতে লাগল কিন্তু গ্রামের আপন লোক যদি শত্রুতা করে, তাহলে গ্রামবাসী যায়

কোথায়? রাজার চর কেমন করে জানবে গ্রামে ক'টি সুন্দরী মেয়ে আছে? ঐ যে মিঁয়ার হাতে জরির কাজ করা থলিতে মোহর ঝনঝনাচ্ছে, ওটাই সবচেয়ে নষ্টের গুরু। লোভ কি সামলানো যায়? এই ভাবেই সেকালে অর্থের জন্যে বহু মারাত্মক কাজ সংঘটিত হয়েছিল। গ্রামের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে বাড়ী থেকে সরিয়ে লোকালয়ের বাইরে ভাঙা শিবমন্দিরের শিবের পিছনে লুকিয়ে রাখা হল। বাড়ীর দু'জন ছাড়া কেউ জানল না কিন্তু তিনজন কি ভাবে হয়ে গেল সেই অজ্ঞাত। বাতাসেরও যে চোখ আছে সেটাই বুঝি প্রমাণ হয়। তবে এই বলা যেতে পারে, যে সন্ধানী সে ঠিকই খোঁজ রাখে। লোভের ইতিহাস তো কম দিনের নয়। থলি ভরা মোহর দেখে যে মেয়েটি কাকা বলত, হোক্ না ভাইঝি সম্পর্ক, টাকার কাছে কি ভাইঝি বড়? মহাদেবের পিছনে মুরগী জবাই চিন্তা নিয়ে মেয়েটি অন্ধকার ভাঙা শিবমন্দিরে রাত কাটাচ্ছিল। না পারছে নড়াচড়া করতে, না পারছে একটু পা ছড়িয়ে বসতে। শোবার কথা তার ভাবনার মধ্যে নেই। প্রাণ যেখানে যায় যায়। প্রাণের মায়াই বড় মায়া। সেখানে ঘুম কি আসে? এরই মধ্যে খস্খস্ শব্দ হলেই আতঙ্ক। মেয়েটির চোখ দুটি বড় হয়ে ওঠে। কান সতর্ক হয়। এমনি সতর্কতার মধ্যেই ঘন অন্ধকারে হঠাৎ পাশ থেকে তার মুখের ওপর কে যেন মোটা কাপড়ের আচ্ছাদন ফেলে দিল। চিৎকার বেরবার আগেই মুখ চেপে ধরল। তারপর যথারীতি গ্রামের বাইরে যখন সেই মেয়ে গিয়ে পৌঁছল, বুঝল তার আর পরিত্রাণ নেই। মুখের আবরণ সরে যেতে চাঁদের আলোয় তার গ্রাম সম্পর্কের কাকাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। কাকা তখন রাজার চরের হাত থেকে মোহরের থলি নিচ্ছে।

মিঁয়া সাহেব সেই কাকার হাতে থলিটা দিয়ে হঠাৎ মাটিতে এক দলা থুতু ফেলে দিল, বলল, 'বেইমান নিজের গ্রামের মেয়েকে ধরিয়ে দিতে লজ্জা করল না? তোর এ টাকা কি কাজে লাগবে রে?' বলে মিঁয়া সাহেব চলতে লাগল। এই মিঁয়া সাহেব রাজার অধীনে চাকরী করে। এর কাজ গ্রাম গঞ্জ থেকে মেয়ে ধরে সরবরাহ করা। কিন্তু গ্রাম গঞ্জের এইসব মানুষদের ব্যবহারে সেও হতচকিত।

এই হচ্ছে আমাদের সেকালের মানুষের রীতি ছিল। সেকাল আর একালে কোন প্রভেদ নেই। এখনও মানুষ অর্থের জন্যে এমন সব জঘন্য কাজ করে, যা খাতার পাতায় লেখা যায় না। এই যখন দেশের অবস্থা, সেই সময়ে জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষেরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়ে নিজেদের সামাজিক নিয়মগুলি

কঠোর করায় মন দিলেন। শোনা গেল, নবাবের বিলাস ভবন থেকে সুশীলা পালিয়ে গেছে। সুশীলা গ্রামে আসতেই সমাজ প্রধানরা মাথা নাড়ল, 'না না তোমায় আর আমরা ঘরে নেব না।' সুশীলা বলল, 'আপনারা বিশ্বাস করুন, আমার কিছু খোয়া যায় নি। এমন কি নবাব বাড়ীতে জল পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। আমি সাতদিন উপবাসী ছিলাম।' কিন্তু কে শুনবে কার কথা? বাবা মা-ও মায়া ছেড়ে দিয়ে মাথা নাড়ল, 'না বাপু, নবাব যখন ধরে নিয়ে গেছে তখন তোমায় আমরা স্বীকার করতে পারব না। আমাদের সমাজে বাস করতে হবে তো!' এমনি বহু মেয়ে নিজেদের বাড়ীর কথা ভুলতে পারত না বলে কত কষ্ট করে উদ্ধার পেয়ে পালিয়ে আসত। যারা নবাব কর্তৃক উচ্ছিষ্ট হত, তারা আর বাড়ীমুখো হত না। ওখানেই কোথাও পতিতাবৃত্তি ধারণ করে সমাজের অবিচার চোখের জলে ভুলে অন্য মানুষ হয়ে যেত। এই যে নারীর ওপর অবিচার তার ইতিহাস এই ভারতবর্ষে কম দিনের নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা আগে উল্লেখ করেছি মুঘল বাদশাহদের কথা। বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা একবার ভাবুন। আপনাদের সেও অজানা নয়। নবাব সিরাজদ্দৌলাও সারা দেশ ঘুরে কিভাবে যুবতী নারী নিয়ে এসে বিলাস জীবন যাপন করত। সে ইতিহাসও খুব অজানা নয়। ইংরেজরা অবশ্য সেইসব ইতিবৃত্ত ফলাও করে প্রচার করেছে। তারা দেশবাসীর কাছে নবাবকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে বাড়িয়ে বলেছিল, কিন্তু একেবারে তো তা মিথ্যা নয়। তার বিলাস জীবনের কথা তো আমরা সবিস্তারে জানি। হীরাঝিল বলে একটি রমণীয় প্রমোদ প্রাসাদই ছিল বিলাস জীবনযাপনের জন্যে। ফৈজীর কথা নিশ্চয় কেউ ভোলে নি। যার অবমাননায় সিরাজ তাকে ঘরে বন্ধ করে মেরেছিল। এই ফৈজীর কথা স্টুয়ার্ট সাহেবের 'History of Bengal' বইতে আছে। ফৈজী দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহর রঙমহল থেকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদে সিরাজের প্রাসাদে এসেছিল। সেই ফৈজী ভিন্নদেশী মেয়ে হয়ে নারীর অবমাননা দেখে সিরাজের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি আওরৎকে আওরৎ মনে কর না। তাদের ইচ্ছাকে কোন ইনাম দাও না। তোমার মত মরদকে আমি নফরৎ করি।' এই যে ঘৃণা, এ কি সব নারীর মনের ঘৃণা নয়? নারী কি শুধু পুরুষের ভোগের জন্যে পৃথিবীতে এসেছে? এদের কি প্রয়োজন শুধু এই জন্যে? পুরুষ চিরকাল যেমনি রাগ প্রকাশ করেছে, সিরাজও তার বাইরে নয়। প্রথমে মিনতি জানিয়েছিল। মহব্বতের কথা বলেছিল, তার উত্তরে উদ্ভিন্নযৌবনা ফৈজী দেহে

জোয়ার তুলে হেসে বলেছিল, 'মহব্বত! মিঁয়া তুমি করবে মহব্বত। তুমি তো নারীর সঙ্গে একটাই কাম করতে শিখেছ।' তারপরই সংঘটিত হয়েছিল ফৈজী হত্যা। তাকে ঘরে বন্ধ করে মারা হয়েছিল। কেউ যদি পূর্ণ বিবরণ জানতে চান লেখকের 'সিরাজের ফৈজী' পড়বেন।

এই যে অহঙ্কারী পুরুষ, এমনি পুরুষ কি অনেক নয়? নারীর এই ঔদ্ধত্য কি ক্ষমার যোগ্য? যারা চিরকাল লাঞ্ছনাই পেয়ে এসেছে, তারা প্রতিবাদ করবে এই কি কেউ চায়? প্রতিবাদ কেউ কোনদিন করেনি। নারী জেনে এসেছে এমনিভাবে তাদের চিরকাল অবহেলাই প্রাপ্য হয়েছে, সুতরাং অবহেলাই নিতে হবে। আর মাথা তুললে সতীত্ব নিয়ে কুটকচালি শুরু হয়ে যাবে। সে বড় ভয়ঙ্কর অপরাধ। বিনা অপরাধে বদনামের পরিণামও তো ভীষণ। এমনি আর এক নবাব সরফরাজ খাঁ যখন যুদ্ধে হেরে গেল, তার প্রাসাদ থেকে হাজার খানেক নারী উদ্ধার করা হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ভারতবর্ষে নারীর চিরকালই সুন্দর সম্মান! এইভাবেই তারপর পশ্চিম দেশ থেকে বাণিজ্যের ছদ্মবেশে পর্তুগীজরা এসে পৌঁছল, গ্রামকে গ্রাম লুণ্ঠন করে তারা মেয়ে ব্যবসা শুরু করল। প্রকাশ্য দাসবাজার সৃষ্টি করে হুগলী, সপ্তগ্রাম উপনিবেশে মেয়ে কেনাবেচা করতে লাগল। দিল্লীর হারেমে ছিল নারীর সংখ্যা অগুণতি। দুজন নারী একবার স্বাধীনতার জন্যে দিল্লী থেকে পালিয়ে পর্তুগীজ দস্যুদের জাহাজে উঠে পড়েছিল। তারপর তারা যথারীতি হুগলীর বাজারে বিক্রী হয়ে যায়। সম্রাট শাহজাহান তখন দিল্লীর সিংহাসনে বসে। তিনি পর্তুগীজদের জানালেন, 'আমার দুজন বাঁদী দিল্লীর প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সম্ভবত তারা তোমাদের উপনিবেশে গিয়ে লুকিয়েছে। যদি তাদের ফেরৎ না দাও তোমাদের উপনিবেশ তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে।' পর্তুগীজ সর্দার সারা উপনিবেশ খুঁজে তাদের হদিশ পেল না। কত মেয়ে প্রত্যহ জাহাজে আসে, তাদের কে কখন কিনে নিয়ে যায়, তার খোঁজ কে রাখে? বঙ্গদেশের সুবাদার কাশীম খাঁ জুয়ানীর চিঠি এল। 'সম্রাটের নির্দেশ মেয়ে দুটি ফেরৎ না দিলে হুগলী উপনিবেশ তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে।' এ তো মহাজ্বালা হল! দুটি নয়, একটি মেয়েই হুগলী উপনিবেশে দাসবাজারে এসেছিল। পথে একটি দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ইজ্জত হারিয়ে বিষ খেয়েছিল। সেই মেয়ে হীরার এই উপনিবেশে নিজেকে লুকিয়ে রাখা কি যে কষ্টকর হয়েছিল, এই নিয়ে একটি অশ্রুসজল কাহিনী। এই লেখকের 'ক্রীতদাসী' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি।

নারী চিরকালই নানাভাবে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে কিন্তু তারা বাঁচতে পারে নি। প্রথম কথা ঈশ্বর তাদের অপরিমিত শারীরিক বল দেননি, তারা আত্মরক্ষা করতে পারে না। এইখানেই তারা অর্ধেক হার স্বীকার করে। সেদিন এমনি একটি বিদেশী ছায়াছবিতে নারীর লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করলাম। কোনও এক উপনিবেশে বাইরের লোকের খুব সমাগম হয় এবং তারা নানা কু-কার্যের মতলবে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ তারা একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছে, একটি যুবতী মেয়ে তাদের সামনে পড়ল। তারা নানারকম অশ্লীল কথা ছুঁড়ে দিতে লাগল। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে সরে পড়বার মতলব করল কিন্তু পারল না, হঠাৎ একযোগে সেই লোকগুলি আক্রমণ করল। মেয়েটি যে যুযুৎসু জানত ঐ লোকগুলি জানত না। মেয়েটি আত্মরক্ষার জন্যে হাতের আর পায়ের কসরতে লোকগুলিকে ঘায়েল করতে লাগল। লোকগুলি ছোরা, রিভলবার নিয়ে তাকে আক্রমণ করল। মেয়েটি আহত হল, ক্ষতবিক্ষত হল, কিন্তু হার স্বীকার করল না। শহরের চতুর্দিকে সে ছুটে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য দেখা গেল, সেখানকার অধিবাসী কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না। সম্ভবত জেনে শুনে ঐ লোকগুলির খপ্পরে পড়তে চায় না বলেই নিরুত্তর রইল। মেয়েটিও মরীয়া। একাই অতগুলি লোকের মহড়া নিল। শেষে এক পতিত খামার বাড়ীর একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিল। তখন তার স্কার্ট ছিঁড়ে গেছে। বুকের লজ্জা উন্মুক্ত। রক্তাক্ত সারা শরীর। ক্লান্তি অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছে। এই সময়ে হঠাৎ সে চমকে উঠল, খামার ঘরের চতুর্দিকে বড় বড় জানলার কাঁচগুলি ভেঙে দুর্বৃত্তরা ঢুকে পড়েছে। চতুর্দিক দিয়ে তারা সেই মেয়েটিকে ঘিরে ধরল। মেয়েটি বুঝল আর বাঁচা যাবে না। এই নারীপিশাচেরা তাকে খুবলে খাবে। তখন ? ইজ্জত হারানোর চেয়ে প্রাণ হারানো সবচেয়ে সুখের। ইতস্তত তার চোখ ঘুরল, হঠাৎ হাতের কাছে একটি কাঁচের ফলা চোখে পড়ল। মুঠি ভরে তা তুলে নিল। বক্ষ লক্ষ্য করে তা ঢুকিয়ে দিল।

মেয়েটি খুবই সাহসিনী সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যুযুৎসু যদি না জানত, বহু আগেই এই দুর্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছিত হত। আর তার পরিণাম কি হত নিশ্চয় বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। ঐ অতগুলি পুরুষের নির্লজ্জ প্রবৃত্তির কাছে একটি শক্তিহীনা দুর্বল মেয়ে যেভাবে অত্যাচারিত হত, তারপর তার আর উঠে বসার ক্ষমতা থাকত না। হয়ত ঐ পাশবিকতায় মারা যেত। এইভাবেই যে মেয়েরা অনাদিকাল থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসছে, এ আর বলার দরকার

হয় না। যাই হোক আমরা যে কথাটা বলতে বসেছি, এই অত্যাচার শুধু দুর্বৃত্তরা করে ক্ষান্ত হয়নি। আমাদের সমাজ প্রভুরা আরও নির্মম হয়েছেন। যখন তাঁরা দেখলেন, নারীদের এমনিভাবে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, তখন নিজেদের অন্তঃপুর পাহারা না দিয়ে উলটে কড়া কতকগুলি নিয়ম জারী করে বসলেন। বাল্যবিবাহ দাও। ভূমিষ্ঠ হবার পর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দাও। অন্তত বিবাহিত জেনে তাদের ওপর অন্যের দৃষ্টি পড়বে না। এটা যে কত বড় ভ্রান্ত ধারণা, সমাজ প্রভুরা পরেও তা দেখেছিলেন। বিবাহিত জেনে তাদের লুণ্ঠন হবে না, এ এক হাস্যকর পরিকল্পনা। যুবতী হলেই হল সে বিবাহিত না কুমারী কে জানতে চায়? তখন সতীত্বের ধ্বজা উঠল। সতীত্ব গেলেই পতিত। বিনা দোষে কত সতী মেয়ে যে চক্রান্তে পড়ে অসতী নাম নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সমাজপ্রভুদের কঠোর বিচারে কোন এক গণেশ মুখুজ্যের বৌ অসতী নাম নিল। কারণ, গণেশ মুখুজ্যের বৌ সুন্দরী, তার ওপর গ্রাম্য-প্রধানদের দৃষ্টি ছিল। শুধু একটা ছল খুঁজছিল। একদিন গণেশ মুখুজ্যের বৌ পুকুর থেকে গা ধুয়ে আসছে, কার সঙ্গে যেন কথা বলেছিল। ব্যস্ গ্রাম্যপ্রধানরা ভালমানুষ গণেশকে ডেকে বিধান দিল, 'ঐ বৌ ত্যাগ কর। কারণ, সে অসতী। তার অনেক খারাপ স্বভাব আমাদের চোখে পড়েছে।' গণেশ নিরুপায় হয়ে সতীসাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করল।

স্ত্রী জানাল, 'আমি কোথায় যাব?'

তখন গ্রাম্যপ্রধানরা অনেক গবেষণা করে গ্রামের পশ্চিম দিকে একটা ঘর তুলে দিল। অসতী মেয়ের কাছে সবাই যেতে পারে, গণেশের বৌয়ের কাছে গ্রাম্যপ্রধানদের যাবার আর কোন বাধা থাকল না। এইভাবে নিজেদের দেশের লোকেরাই নিজেদের দেশের মেয়েদের নানা অনুশাসন সৃষ্টি করে তাদের নিচে নামিয়েছে। গণেশের বৌ যদি বলত, 'আপনারা এসব কি বলছেন? আমায় খারাপ বলতে আপনাদের লজ্জা করে না?' এ কথা কি ঐসব মেয়েরা বলেনি কিন্তু কে শুনবে তাদের কথা? তাই সতীত্বের ধ্বজা তুলে সমাজ প্রধানরা নিজেদের দেশের মেয়েদের ইচ্ছে করে নিচে নামিয়ে দিল। কারণ তারাও নিজেদের আদিম প্রবৃত্তিকে থামাতে না পেরে এইসব সমাজের অনুশাসনগুলি শুধু মাথা খাটিয়ে সৃষ্টি করেছে। কেন আমরা কি ভুলে গেছি শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বামুনের মেয়ের গোলোক চাটুয্যেকে?

সে যাই হোক সহমরণ প্রথার কথাই ধরা যাক না। কিশোরীর সঙ্গে আশী

বছরের বৃদ্ধের বিয়ে হল। আশী বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহতে কোন আপত্তি নেই। কারণ সে পুরুষ, তার অগুণতি বিয়ে করার অধিকার আছে। এটাও লক্ষ্য করবার মত। সমাজ-প্রভুরা নিজেরা পুরুষ, তাই পুরুষের জন্যে কোন অনুশাসন নেই। পুরুষ যত খুশি বিয়ে করতে পারে। এটাও সেই পুরুষের আদিম প্রবৃত্তিকে বজায় রাখার একটা আলাদা ফিকির। তারপর বৃদ্ধ মারা গেল। আর ঐ কিশোরী মেয়ে যে সবে যৌবন পেয়েছে, তার মনে কত আশা আকাঙ্ক্ষা, তাকে বৃদ্ধের সঙ্গে চিতা সাজিয়ে জ্যান্ত তুলে দেওয়া হল। আমাদের দেশের এই জঘন্য নিয়ম দেখে এ দেশে ইংরেজরা এসেও চোখের জল রাখতে পারেনি।

জবচার্ণকের কথা নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে। যাকে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই ইংরেজ এই সহমরণ থেকেই একটি মেয়েকে বাঁচিয়ে তাকে নিয়ে সারাজীবন ঘর সংসার করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা আমাদের মেয়েদের যেভাবে নির্যাতন করেছি, অন্যদেশের লোকও চোখের জল রাখতে পারেনি। এই নির্মম অনুশাসনের কোপে পড়ে কি যে নারকীয় কাণ্ড দিনের পর দিন ধরে হত, সে আর বুঝিয়ে বলা যাবে না। কচি ডাগর মেয়েটি জ্বলন্ত চিতা দেখে ভয়ে কাঁদতে লাগল, কিম্বা চিৎকার করে বলল, 'আমি ঐ চিতায় উঠে পুড়তে পারব না। আমার বড্ড ভয় করছে, আমায় তোমরা ছেড়ে দাও।' সে পালাতে গেল কিন্তু তার শ্বশুর বাড়ীর লোকজন তাকে ধরে জ্বলন্ত চিতার ওপর ঠেলে দিল। আর তার সঙ্গে ঢোল করতাল জোরে জোরে বেজে উঠল।···কত মেয়ে এমনিভাবে ছুটে পালিয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। পুকুরের মধ্যে ডুবে থেকেছে। শুধু একটু বাঁচবার চেষ্টা। ধর্মের নামে নারী নির্যাতনের এই ফিকির এই দেশে ছাড়া বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশে এত প্রকট ছিল না। রাজা রামমোহন রায় সেই সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ককে দিয়ে আইন পাশ করিয়ে এই অত্যাচার বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু এ তো গেল অনুশাসনের বিরুদ্ধে কোন উদার মানুষের নারী সপক্ষে কিঞ্চিৎ উদারতা।

আমরা এবার সেকালের বারবনিতা প্রসঙ্গে 'হুতোম প্যাচার নক্সা' থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি করছি। ইংরেজ আসার পর আমাদের দেশের লোকেরা কেমন জীবন যাপন করত সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করি। ইংরেজ রাজত্ব পেয়ে যেন আমাদের ভেতরের অল্প জাগা প্রবৃত্তিগুলি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে দিল। ওরা দেখাল সংস্কারের হাতে বলি হয়ে আমরা

নিজেদের জীবনের ভোগটাকেই নষ্ট করছি। ওরাও নষ্ট করল না, আমরাও নষ্ট করলাম না। দেদার পিও, দেদার ভোগ কর। এক ধরণের মোসাহেব জুটল, ভাগ্য ফেরানোর জন্যে তাদের ভেতরে দারুণ ছটফটানি। হেন কাজ নেই তারা না করতে পারে। ইংরেজও সেই সুযোগ নিল। তারপর দেখা গেল, কত বাড়ীর যুবতী নারী সাহেবদের হাবেলীতে গিয়ে ঢুকছে। আর তারা কেউ কেউ এই শহরের ভাল ভাল বাড়ীর মেয়ে বা বউ কিম্বা কোন গ্রাম থেকে আনা হয়েছে। সাহেবরা এই সব লোককে পরে রায়বাহাদুর, রায়সাহেব খেতাব দিয়েছে। আগেও আমাদের দেশের মানুষের কোন নীতির বালাই ছিল না, পরেও দেখা যায় নি। মুসলমান আমলে যেমন বাদশাহের চর মোহরের থলি নিয়ে ঘুরত, আর গ্রাম সম্বন্ধে খুড়ো সে লোভ সামলাতে পারে নি, ইংরেজ আমলে সেই লোভেই ভাবীকালের রায়বাহাদুররা সেই অন্যায়ের দোসর হয়েছিল। যে সব মেয়েরা ইংরেজ প্রভুদের কাছে উচ্ছৃঙ্খল হত, তাদের পরবর্তীকালে স্থান কোথায় হয়েছিল? সোনাগাছি, রামবাগান, জোড়াসাঁকো, মেছুয়াবাজার, হাড় কাটা, চোরবাগান, চাঁপাতলা, জানবাজার, ভবানীপুর প্রভৃতি বহু পতিতালয়ের উৎপত্তি এই সময়ে এই কারণে। এসব পতিতালয় কিছু কিছু এখনও আছে। তবে তাদের শুরু সেই সময়ে। দেশের হাওয়া অনুযায়ী মানুষও যে পরিবর্তিত হয়, সে সময়ে সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল। এক ধরণের বড়লোক তখন সৃষ্টি হয়েছিল, তারা ঠিক সেই ইংরেজ প্রভুদের মত। ইংরেজরাও তাই চাইছিল। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলে তো বুদ্ধিটায় আর পাক খায় না, তাই নেশা জাগিয়ে দিল ইংরেজ প্রভুরা। তখন শহর, পল্লীগ্রামে ঘন ঘন সব উৎসব হত। আর সেই উৎসবে দেদার মদ ও মেয়েমানুষ। হুতোম প্রথম একটি নক্সা দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই প্রথম মানুষের আপনার মুখ আপনি দেখার গোড়া পত্তন।

হুতোম বড় দুঃখে দেশের মানুষের স্বরূপ ব্যঙ্গচ্ছলে লিপিবদ্ধ করেছেন। মদের ফোয়ারা যেন গ্রামে-গঞ্জে-শহরে যত্রতত্র পুষ্পবৃষ্টি করত। কি ধনী, কি গরীব, স্ফূর্তিই যেন সবার উপরে। কোন একটা উৎসবের হুজুগ হলেই হল, কদিন তাই নিয়ে শহর মেতে থাকত। সে সরস্বতী পূজাই হোক বা চড়ক উৎসব হোক্। বাড়ী বাড়ী সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এ ছোট ছেলে-মেয়েদের আনন্দ নয়, বুড়োদের আনন্দ। প্রত্যহ সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ম দ দোকানে সবসময়ে ভীড় থাকত, উৎসব হলে তো কথাই নেই। হুতোমের বর্ণনাতেই দেখা যায়, 'চিৎপুর যেন সকল

মানুষের প্রাণকেন্দ্র ছিল। চিৎপুরের দিকে দৃষ্টি যাওয়া মানে বিশেষ নারীদের প্রতি লুব্ধ মানুষের আকর্ষণ।' সে আকর্ষণের যে কত রকমফের ছিল হুতোম তার মাঝে মাঝে বর্ণনা দিয়েছেন। ইংরেজ সরকার মানুষের এই আদিম চাওয়াতে কোনই রাশ টেনে ধরে নি, বরং নিজেদের দেশের মত মানুষের নৈতিক চরিত্র গোল্লায় যাক্ এই চেয়েছিল। আমরা সেই যুগেই দেখতে পাই, সারা কলকাতা জুড়ে সে এক নারকীয় দৃশ্য। এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে, এত বারাঙ্গনাদের আমদানী কেমন করে হল? রাতারাতি মেয়েগুলো কি সব ঘর ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে দিল? তারও উত্তর একটা আনুমানিক বলা যায়, এর পিছনে সেই আগের জের। মুসলমান রাজত্ব শেষ হল, সে সময়েই ধীরে ধীরে বারাঙ্গনার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি। তারপর তো আমাদের নানান সমাজ শাসন। উত্যক্ত হিন্দু নারী। তারপর সুবিধাবাদী মানুষের দল। অর্থের জন্য এদেশী মানুষ যে কত খারাপ কাজ করতে পারে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। চরিত্রের বালাই তো এদেশের মানুষের কোনদিনও ছিল না, ইন্ধন যোগালো এসে ইংরেজ প্রভুরা। বারাঙ্গনা ভবন রমরমে হয়ে উঠল। যে বড়বাজারের মুদি দোকানী সেও পকেটে কিছু রেস্ত নিয়ে 'ও টেঁপী দোর খোল' বলে মেয়ে লোকের দ্বারে গিয়ে ঢুকল, তারপর টেঁপীর খনা গলার গান শুনতে শুনতে গেলাসে চুমুক দিতে লাগল, নেশায় যখন একেবারে চোখে সপ্ত রঙ দেখল, তখন টেঁপীকে দেবী জ্ঞানে তার পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল। টেঁপীই যেন দোকানীর ইহজীবনের সব। দেবী সেই তালে দোকানীর বুকে সুড়সুড়ি দিয়ে অনেক হাতিয়ে নিল। 'এই দিনসে তুমি যদি আমায় দু'জোড়া মানতাসা না গড়িয়ে দাও তাহলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।'

দোকানীর তখন তুরীয় অবস্থা। সে সেই মেজাজে টেঁপীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'দেবো দেবো কেন অতো অভিমান করছিস? তোকে কি গলার হারটা দিই নি? তুই না বড় বেইমান টেঁপী, তোকে না দেবার আমার কি আছে বলতো!'

এই যে মানুষের আদিম অবস্থা, দোকানী শম্ভু দাসের ঘরে বৌ, ছেলেপুলে সবই আছে। তবু ঐ টেঁপীর কাছে মাঝে মাঝে না এলে শম্ভু দাসের যেন দিন চলে না। শম্ভু দাসদের মত মানুষের মন জানবার ক্ষমতা এদেশের শাসক প্রভুদের পুরোমাত্রায় হয়েছিল। শুধু শম্ভু দাস কেন আহিরীটোলা, সিমলা, বহুবাজার, ভবানীপুর, তালতলা প্রভৃতি অঞ্চলের খানদানী ঘরের মানুষেরা এই শম্ভু দাসের মত জুড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে মেয়ে মানুষের বাড়ী যেত। সে সময়ে 'কলকাতার বাবু' বলে একটা রবও উঠেছিল। এই সব বাবুরা বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় পর্যন্ত

পড়েছে কিনা সন্দেহ কিন্তু কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী, গলায় চাদর, পায়ে পাম্প, কানে আতর, মাথায় টেরি বাগিয়ে ইয়ার বকসী নিয়ে সন্ধ্যেবেলা চলত মেয়েলোকের বাড়ীতে। সেখানে সারারাত হুল্লোড় করত, মদ খেত, গান শুনত, মেয়েমানুষ ভোগ করত, যদি পছন্দের মেয়ে মানুষ হয় তাহলে তাকে বাঁধা করে রাখত। বাঁধা মানেই সে বাবুর কেনা হ'য়ে গেল। তখন কামিনী সুন্দরী বাবুর বুকে মাথা দিয়ে, পাঞ্জাবীর সোনার বোতাম ছুঁয়ে আদো আদো ভঙ্গিতে বলত, 'বাবু, আমায় একটা বাড়ী করে দেবে তো?' বাবু যদি খুবই মজে থাকে, তাহলে মেয়ে মানুষের একখানা গোটা বাড়ী হয়ে যেত। বাড়ী, গাড়ী, গয়না, টাকা পয়সা তখন এক একটি মেয়েমানুষের অনেক হয়ে গিয়েছিল। এমন কি এই মেয়ে মানুষের জন্যে এক একজন ধনী ফতুর হয়ে গিয়েছিল। তাদের বাড়ীর মেয়েরা স্বামীদের এই বার টানে নিজেরা চোখের জলে ভাসত, তারপর তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। অভ্যস্ত মানে তারাও অন্য দিকে মন দিল। কর্তা সন্ধ্যে বেলা ইয়ার বকসী নিয়ে চলে গেলে সে তার মনের মানুষ ডাকিয়ে আনাত। সাহায্য করত ঝি। কিম্বা জোয়ান ভৃত্যও অনেক সময়ে বাড়ীর কর্ত্রীব ভালবাসার লোক হত।

এই সময়ে দেখা যায়, বাবুরা নিঃসন্তান হত। অত্যধিক মদ ও বারনারী সঙ্গদানে তাদের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা লোপ পেত। সেইজন্যে বংশরক্ষার জন্যে দত্তক নিত। আরও এক বীভৎস ঘটনার নজীর দেখা যায়, স্ত্রী সন্তান সম্ভাবনা হলে বাড়ীতে উৎসব লেগে যেত। ভাবত সে সন্তান বাবুর। আসলে যে বাবুর সন্তান উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই, সে বাবু জানে না। এই ভাবে সেই যুগে এই শহরে কত ঘটনা যে ঘটত তাব ইয়ত্তা নেই। যাই হোক, আমাদের প্রসঙ্গ সেকালের বারবণিতা। মানুষের চারিত্রিক বর্ণনা দেওয়া নয় হুতোম সে যুগে এই কলকাতাকে দেখে বহু গান রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটি গান এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই গান থেকেই বোঝা যায় সেকালের কলকাতার সমাজ।

'আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাঁসে বলিহারি ঐক্যতা,
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী বদমাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুড়ী সোনার বেনের কড়ি,
খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোল পাতা।

হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,
পথে হেগে চোখ রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।
গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাবে, তফাৎ থাকাই সার কথা।'

এই যে উনবিংশ শতকে কলকাতায় অবস্থা, এর শুরু সেই বল্লাল সেনের আমল থেকে। তখন থেকেই উচ্চ জাতের ভড়ং শুরু হয়েছে, তখন থেকেই ভেতরে পচ্ ধরতে শুরু করেছে। আমি বড়, তুমি ছোট! আমি ক্ষীর খাব, তুমি দেখবে। আমি মানুষের মাথায় পা দিয়ে চলব, তুমি আমার পায়ের তলায় লুটবে। এই যে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, এখান থেকেই শুরু হয়েছে বিপ্লব। যারা উঁচু শ্রেণীতে আরোহণ করেছে, তারাই আত্ম অহঙ্কারে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছে। দেখা গেছে এই সব উচ্চ শ্রেণীর লোকেদেরই ঘর ভেঙেছে বেশি। হুতোমের এই কলকাতায় সেই সময়ে ব্রাহ্মণদের যে অধোগতি দেখা গেছে, তা আর লিখে বোঝানো যায় না। হুতোম ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্য জাগে, যখন বেশ্যাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণরা পূজো করতে যায়, তারা যেন বর্তে যায়।' টাকা পয়সা ভাল আমদানী হবে এই ভেবে তাদের আনন্দ। যাদের এত টাকার শখ, তারা অত জাতের দোহাই দেখাতো কেন? বেশ্যার হাত থেকে টাকা নিতে তাদের জাত যেত না? হিন্দুয়ানীর এই যে ধর্মের ভড়ং এই ভড়ংয়েই তো হিন্দুয়ানী লোপ পেতে বসেছে। সেই উনবিংশ শতকে হুতোমও হিন্দুয়ানীর অহংকারকে সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে আর একজন লেখক নিশাচরের (ভুবন মুখোপাধ্যায়) বর্ণনায় পাই। 'তখন এই কলকাতায় গলিতে গলিতে গেরস্থ বাড়ীর পাশাপাশি বারাঙ্গনারা বাসা নিয়ে ছিল।' তাঁরই বর্ণনায় দেখি, 'এক চিৎপুরের কিছু অঞ্চলে উঁচু জাতের বারাঙ্গনারা বাস করত, বাদ বাকী সর্বত্র খুবই নিচু মানের মেয়েলোক দেখা যেত।' ভবানীপুরের এক জায়গার বর্ণনায় দেখা যায়, 'ভবানীপুর রঙরঙে! রকমারি দরমাঢাকা বারাণ্ডারা যেন বরকামান কামিয়ে ও মুখ তেলা করে বেরিয়েচে; তাহাদের চিরপরিচিত বেড়ারা আজ পাইখানা ও রন্ধনগৃহের আশ্রয় লয়েছে। প্রিয়সখা বারাণ্ডার আদুড় গা দেখে, নববধূরা দুঃখে হাসতে হাসতে, এক একখানি ছেঁড়া বেতের ত্রিপদী পেতে তাহাদের মানরক্ষা কচ্চেন। বধূদের গিলটির তাবিজ, জসম, বারাসত ও বালাপরা

দক্ষিণ হস্তেরা বারাণ্ডার রেলের ধারে ঝুলচে। তাঁহাদের পায়ে পচা রবারের দেড় পাটি জুতো, মোজার উপর কালো কালো কাদার ডায়মনকাটা চার পাঁচ গাছি মল; নাকে বিলিতী মুক্তো আঁটা বিবিযানা বারকুসী নথ, কানে সাদা সাদা তিন তিনটি তবলকি দেওয়া গিল্টীর বড বড তিন চারটা দোলন মাকৃড়ি। মাথায় ফিরিঙ্গী খোঁপা ও কাঁটা দেওয়া বিজকুড়ী ফুলের বেহদ্দ বাহার। ফুলেরা কাঁটা পরে যেন সকণ্টক মৃণাল উপরিস্থ পদ্মিনীরে উপহাস কচ্চে। পরিধান শান্তিপুরে কালো ডুরে ও নীলাম্বরী। কারু কারু তদুপরি এক একখানি ৯০ সালের ট্যাসেল্‌দার সবুজ নেটের ওড়না। কেহ কেহ ঠিক শ্রীবৃন্দাবনের গোয়ালিনী সেজে বসে গ্যাচেন, পোষাকের নিম্নভাগ জানুদেশ অতিক্রম কর্ত্তে লজ্জিত হচ্ছে। কোন দিকে রুপোবাঁধা, হুঁকোতে ধূমপান চলেচে, কেহ কেহ খেলোতে সাধ মিটাচ্চেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সকলের আহার জোটে নাই, ওষ্ঠাধরসংলিপ্ত তাম্বুলরাগই অনেকের ভোজনের শেষ পরিচয়। এক একটি বধূর রূপেরও সীমা হয় না। যদি দয়ার সাগর (।) মিউনিসিপালিটী ও লাইটিং ট্যাক্সের প্রসাদে নগর ও উপনগরের গলির ভাপা বাড়ির দেয়ালের গায়ে ও সাইনবোর্ডের খুঁটির উপর শতকরা ফীটে এক একটি মিডমিডে তেলের আলোর লাইন না বসানো থাকৃতো, বধূদের মুখগুলি নীচে থেকে দেখলে স্পষ্ট বোধ হতো যেন, এক একটি বাদুড় অধোলম্বী হয়ে বারাণ্ডার কাঠ ধরে তুলচে এক একটা পাঁজির শিবকাটা ক্ষদন্তী গ্রহ তাহাদিগকে পড়তে দিচ্চে না।'

নিশাচরের এই বর্ণনা দেখে মনে হয়, এই সব বধূরা খুবই নিম্নমানের মেয়েমানুষ। তারা জানত, তাদের ঘরে বড বাড়ীর ধনীরা আসবে না। আসবে দোকানী, গাড়োযান, ভিস্তিওযালা, ঝাড়ুওয়ালা প্রভৃতি। তা দব প্রাপ্য খুবই অল্প, সেই অল্প পেযে তাদের জীবনমান এই অবস্থা ছাড়া আর পরিবর্তিত হবে না। তাদের রূপের বর্ণনায এই বোধ হয তারা একেবারে ছোট জাতের ঘর থেকে এসেছে। হয়ত তারা পল্লীগ্রামের বাজারের পাশে খোলার ঘরে বাস করত। শহরের বাবু বিলাসের লোভে পড়ে শহরে এসে বাসা নিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর যাকে ওপরে উঠতে দেবে না, তারা শহরে আসুক আর গ্রামে থাকুক। নিশাচরের এই বর্ণনায আরও মনে হয়, ছোটজাতের এই সব মেয়েরা কোনদিনও ঘর সংসারে সুখী হয় নি। আজকের তাদের জীবন মান দেখে সেদিনটাও অনুমান করা যায়, ওদের স্বামীরা চিরকালই স্ত্রীপ্রেমিক নয়। ঘরে বউ রেখে বাইরে মেয়েছেলে রাখা যেন ছোটজাতের একটা রীতি। ছোটজাত বলে কোন

ঘৃণা নয়, রীতিটাই বক্তব্য। রীতি যে নীতিতেও পরিণত হয় তাও দেখা গেছে। এদেরই স্বামীরা স্ত্রীদের দায়িত্ব খুব কম পালন করে।

এক হাঁড়ি মদ বা তাড়ি গিলে এসে স্ত্রীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে তাকে মারধোর করা যেন বীরত্বের নমুনা। কিম্বা এও দেখা যায়, স্ত্রীকে কেটে টুকরো করে আর এক মেয়েছেলে নিয়ে ঘর বাঁধা এ যেন এদেরই ঘরে বেশি দেখা যায়। সেই ঘর থেকে যদি নারী ছটকে গিয়ে দেহ ব্যবসা করে সে কি অন্যায়? বরং ভালই বলতে গেলে। নারী দেহ ব্যবসা করে বড় যন্ত্রণায়। হ্যাঁ বলা যেতে পারে, নারী কি বিবাহিত জীবনে দেহদান করে না? সেও তো আপাত দৃষ্টিতে ব্যবসাই। হ্যাঁ এ কথাও বলা যেতে পারে। তবে সেটা ব্যবসা বলা যাবে না, এক পুরুষের সঙ্গে হৃদয়ের জানাজানি। বিনিময়ে খোরপোশের দাবী অবশ্য থাকে কিন্তু সে তো সংসারে হয়েই আসছে। সে জায়গায় এই ব্যবসাই নিত্য নতুন পুরুষের কাছে তাকে লজ্জা বিক্রয় করতে হয়। কত ধরণের পুরুষ আসে। কেউ রূঢ় মেজাজের, কেউ স্থুল প্রকৃতির, কেউ বেঢপ মাতাল, কেউ ডাকাত, কেউ চোর, কেউ খুনী। খুন করে করে এই সব জায়গায় লুকিয়ে থাকে মাস মাস। আর বারাঙ্গনাকে তার মদত করতে হয়। এখানে ভালবাসার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু দেনা পাওনা ও ভালবাসার অভিনয়।

নারী নিজেই জানে পুরুষ এখানে কেন আসে? অর্থের বিনিময়ে যৌনক্ষুধা নিবারণ করতে। তৃপ্তি পুরুষরা পায় কিনা সে তারাই জানে। তবে মদ খেলে যেমন ক্ষুধা নিবারণ হয় না, একটা উত্তেজনা জাগে, তেমনি নারীসঙ্গের মধ্যে সেই উত্তেজনা বোধ করে। পুরুষ সেইজন্যে আসে। আর নারী দেহ দেয়, বিনিময়ে বাঁচার রসদ পায়। সোজা সরল হিসেব। এর মধ্যে কোন কারচুপি নেই কিন্তু এই নারীরা দেহের বিনিময়ে যে অর্থ উপায় করে, তাতে কি সুখী হয়? আমরা বলব, হয় না। সব নারীই চায় ঘর বাঁধতে। স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করতে কিন্তু যারা পায় না, যারা এই সব জায়গায় এসে দিনের পর দিন ধরে লোকের মনোরঞ্জনে জীবন ব্যয় করে। তাদের যে কি জঘন্য জীবন এ আর লিখে বোঝানো যাবে না। কত নারীর হা-হুতাশ, দীর্ঘনিশ্বাস, চোখের জলে যে কত ইতিহাস লেখা হয়ে আছে কেউ জানে না। এ সব কথা আমরা একালের বারবনিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন আমরা আবার সেই সেকালের কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। নিশাচর সমাজের কুচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, '১২৪২ সালে পল্লীগ্রামে কোন বারাঙ্গনা ছিল না। ওখানকার লোক

বারাঙ্গনা শব্দের মানেই বুঝত না। একবার এক মিশ্র ব্রাহ্মণ একটি বারাঙ্গনা খুঁজতে গিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সে তা পায় না, অগত্যা কয়েকজন জেলেনী দিনে মাছ বিক্রী করত, আর রাতে নূতন ব্রতের অভ্যাস করত, তাদের সন্ধান পায়।' নিশাচরের এই কথায় আমাদের কিছু প্রতিবাদ আছে। প্রকাশ্যে রেজিস্টার বেশ্যা হয়ত মিশ্র ব্রাহ্মণ পায় নি, অপ্রকাশ্যে কিছু কি ছিল না? আর বেশ্যা শব্দের মানে বুঝত না পল্লীগ্রামের লোক, তাহলে নিশাচরের মিশ্র ব্রাহ্মণ খুবই অজ পাড়াগাঁয়ে তা খোঁজ করেছিল। অবশ্য সেকালের পল্লীগ্রামের সম্বন্ধে এই বলা যায়, বাইরের নিয়ে তো তাদের কোন আলোচনা ছিল না। নিজেরাই নিজেদের গ্রাম নিয়েই তারা ব্যস্ত। অর্থকষ্ট যেখানে প্রধান থাকে, সেখানে ও সব হুজুগ মাথায় আসেই না। তবে যাদের অর্থকষ্ট ছিল না, গ্রামের মধ্যে কেষ্টবিষ্টু, তাদের বংশধররা সুন্দরী বৌ বা মেয়ে পেলে কি ছেড়ে দিত? সে সব ঘটনা প্রধান নয় বলে নিশাচরের বর্ণনায় স্থান পায় নি। আর পল্লীগ্রাম থেকে পক্ষী ফসলিয়ে নিয়ে এসে শহরে রাখা খুবই সুবিধে। আর তাই রাখা হত। সে আজও রাখা হয়, সেদিনও রাখা হত। পল্লীগ্রামের কোন বাবুকে যদি এইভাবে কল্পনা করা যায়, তাহলে কি মিথ্যা হবে? গ্রামে কোন ভাল মানুষ গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে অপরূপ সুন্দরী বৌ এসে জুটল। গ্রামের সবারই চক্ষু সার্থক হল। মনে মনে একটা আনন্দ জাগা নিশ্চয় বাহুল্য নয়। প্রাণে বসন্তের বাতাস স্বাভাবিকভাবে বয়। নারীদের মনে ঈর্ষা জাগে কিন্তু পুরুষরা মনে মনে কি করে না, 'ঐ মেয়েটা যদি আমার বৌ হত?' যারা দুর্বল তারা এই বলে ক্ষান্ত হয় কিন্তু সবলরা অন্য কথা ভাবে। তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে সবল জমিদাররা। জমিদার তরুণ হলে সে-ই ষড়যন্ত্র পাকাত, নয়ত জমিদারের সুযোগ্য পুত্র। পুকুরে গিয়ে স্নান করা পল্লীগ্রামের মেয়েদের রীতি। এই পুকুরপাড়েই কত ঘটনা ঘটে গেছে বাংলার সাহিত্যই তার সাক্ষ্য। কত গল্পের শুরু এই পুকুর পাড় থেকে হয়েছে। সে যাই হোক, ব্রাহ্মণের সেই বৌকে দেখে জমিদারতনয় মনে মনে ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল। একটা ছিপ নিয়ে সেই বাবুপুত্র পুকুরের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকল। ওরই মধ্যে মেয়েরা গায়ে কাপড় দিয়ে স্নান করল। কোনরকমে কলসী ভরে চলে গেল। প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই, কারণ জমিদারের পুত্র, অর্থ ও প্রতিপত্তিতে সে গ্রামের সবাইকে কিনতে পারে। সে যাই হোক, জমিদার পুত্র ধীরে ধীরে মাছের চার ফেলতে লাগল। বৌটি একদিন জেনে ফেলল, ঐ লোকটি তার জন্যে আসে। জেনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার কি

গর্ব হল না? রূপের গর্বে তো সব মেয়েই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সে তার স্বামীর সঙ্গে লোকটাকে মেলাল। স্বামী সে জায়গায় তার কাছে বড়ই অকিঞ্চিৎকর মনে হল। তবু তো ব্রাহ্মণ কন্যা। স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের চিন্তা পাপ। একদিন রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'জানো গ্রামের জমিদারের ছেলে রোজ পুকুর পাড়ে বসে থাকে।' স্বামী নিদ্রামগ্ন হয়েছিল। সেই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?' স্ত্রী হেসে বলল, 'কেন তার আমি কি জানি?'

স্বামী ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু স্ত্রীর চোখে ঘুম এল না। তার মনে হাজার কল্পনা ভর করল। সেখানে সে দেখতে পেল, সে আর স্বামীর কাছে নেই। ঐ জমিদার পুত্রের পাশে শুয়ে আছে। তার পরণে একটা মোটা লাল পেড়ে কাপড় নয়, জরীপাড়ের ঝকঝকে বেনারসী শাড়ী। আর শুয়ে আছে ভাঙা নড়বড়ে তক্তপোশে নয়, পালঙ্কে। গায়ে এক গা গয়না। আর ঐ লোকটা খুব আদর করছে। এইভাবে যদি তার মনে স্বপ্ন জমে, আর পরে যদি ঐ জমিদার পুত্রের ইঙ্গিতকে সমর্থন করে তা কি অন্যায়? লোকে এ জায়গায় বলবে অসতী কিন্তু ভাল জীবনের দিকে যেতে কার না লোভ হয়? সেই লোভের জন্যেই জমিদার পুত্র একদিন নিজের জায়গা ছেড়ে ঘাটে এল। বৌটি তখন পুকুরে ডুব দিয়ে ঘাটের দিকে আসছে। গায়ে তার কাপড় লেপটে গেছে। সমস্ত শরীরটা যেন আদুল হয়ে গেছে। খুব লজ্জা জাগছে কিন্তু সেটুকু পুলকের মধ্যেই সমাধিস্থ। মেয়েটি দৃষ্টি নত করে চলে যেতে চাইল। যাবার জন্যে পথ খুঁজল।

জমিদার পুত্র কি ভেবে পথ ছেড়ে দিল কিন্তু বৌটির কানের কাছে পৌঁছে দিল, 'আমি কিন্তু তোমায় খুব ভালবাসি।' বৌটি চলে যেতে যেতে একবার ফিরে দেখল। ভেতরে ভেতরে তার একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। ভিজে কাপড়ের আড়ালে হৃদয়ের মধ্যে রক্তস্রোতে প্লাবন শুরু হয়েছে। সে প্লাবনে কি সুখ সৃষ্টি হয়নি? না, অসতী হওয়ার ভয় ছিল? তখনও ওর মধ্যে ভয় জাগেনি। বরং সুখ সুখ একটা আনন্দই খেলা করছিল। পরদিন আবার সেই একই রীতি। এবার জমিদার পুত্র কাছে গিয়ে হাত ধরল। বৌটির দৃষ্টি নেমে গেল। গণ্ড লাল হল। জমিদার পুত্র বলল, 'তুমি এত সুন্দর দেখতে! ঐ গরীব ব্রাহ্মণের কাছে কি পাও?' বৌটি কথা বললো না কিন্তু হাতের মধ্যে অন্য পুরুষের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে পড়ল স্বামীর হাত। স্বামীর হাতের স্পর্শে এত উন্মাদনা জাগে না। পরদিন সেই জমিদার পুত্র সামনের জঙ্গলে

বোটিকে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর তাকে কাছে টেনে নিল। বৌটির চোখ দুটি বুজে গেল। কানের মধ্যে শুনল, 'তোমার রূপের এভাবে মৃত্যু ঘটানো উচিত নয়।' বৌটিও চোখ বুজিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'তাহলে কি করব?' 'আমার সঙ্গে চলো। আমি তোমায় তার দাম দেব।'

তারপর ষড়যন্ত্র প্রস্তুত হল। গভীর রাত্রে স্বামী যখন ঘুমিয়ে আছে বৌটি বেরিয়ে পড়ল। একবার শুধু ইতস্তত করল কিন্তু ঐ যে রূপের দাম, নিজের মন, আর এই গরীব ব্রাহ্মণের কাছে সে কি পাবে?

আমরা বাইরের চোখে এই সব মেয়েকে বলি অসতী কিন্তু বৌটির মানসিকতা তো অস্বীকার করা যায় না। সে অপর্যাপ্ত রূপ নিয়ে ঐ গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে কেন থাকবে?

পরবর্তীকালে সাহিত্যিকরা এই ধরণের নারীর মানসিকতা প্রকাশ করে বাইরের ম[illegible]কে দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রও তাঁদের মধ্যে একজন কিন্তু আমরা এই সব মেয়েদেরই তো পরবর্তীকালে বারাঙ্গনা ভবনে দেখি। তারা যে অতীত গল্প বলে, সে কি এমনি ধরণের নয়?

যাই হোক এ তো গেল নারী মনের বিবিধ সমস্যার আলোচনা, আমরা আর একবার সে যুগে নিশাচরের চোখ দিয়ে পল্লীগ্রামকে দেখি। ১২৪২ বঙ্গাব্দে পল্লীগ্রামে বারাঙ্গনা ছিল না, তারপর উৎসাহীদের অনন্ত মেহনতে বারাঙ্গনাদের উৎপত্তি হল। এই বারাঙ্গনারা কোথা থেকে এল? নিশাচর বলেছেন, 'পল্লী গ্রামের ছেমোচাপা মেয়েগুলো পিতৃ ও শ্বশুরকুলে কলঙ্কপঙ্ক ও লজ্জা সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে দু'পা বেরিয়ে দাঁড়ালেই চিত্রগুপ্তের রেজিস্টারি খাতায় তাহাদের নাম উঠে যায়। রাম শ্যাম বাবা ঠাকুরেরা সেই সকল শুভ পুণ্যাহের (ফী) প্রসাদ পান।' এই যে আগে বলা হয়েছে জমিদার তনয়। এমান কোন রূপকুমারেরাই গৃহস্থ নারীর মনে ঢুকে তাদের তাতানোর কাজ করে। তারপর বাড়ীর বের করতে তাদের আর দেরী হয় না। তাদের যদি বলা হয়, 'ওহে তোমায় দেহ ব্যবসার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।' তারা কথনই রাজী হবে না। কেন হবে না? এই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য। নারীমন এমনিই। কে চায় ঐ জঘন্য দেহ ব্যবসা করে জীবন যাপন করতে?

সেকালের পল্লীগ্রামের বারাঙ্গনা প্রসঙ্গে নিশাচর তাদের যে সাজের বর্ণনা দিয়েছেন বেশ কৌতুকপ্রদ। 'তাহাদের মাথায় বেঙের ছাতার মত চাকা চাকা গিলটির ফুল খোঁপায় গোঁজা, আঁচলের রিঙে এক ডজন চাবি ঝুলোনো, কপালে

বিষ্ণুর হাতের চক্রের মত গোল গোল ফুলঘড়ির ফোঁটা, তার উপর এক এক রুইতন খয়েরের টিপ, দাঁতে রসাঞ্জন, চোখে কাজল, ঠোঁটে আকর্ণ পুঁই মিটুলি, গলায় চন্দ্রহার, নখে মেদিপাতা, পায়ে আজানু আলতা ও নাকে কাঠখড়ির তিলক ! ইহারা ফর্সা কাপড় পরে আদুড় গায়ে রাস্তায় বেরুলে বোধ হয় যেন কতকগুলি রুপো বাঁধা হুঁকো দাঁড় করান রয়েছে। এই সকল দেবীই কতকগুলি সৌখীন গাড়োয়ান, দরজী, মিঠাইকর, গুরুমশাই, জমিদার বাড়ীর রসুই ব্রাহ্মণ, দরওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, পেস্কার, বোল্‌দে, কিস্তিওয়ালা, ময়রা, গোয়ালা, কাছারির আমলা, মোক্তার, পেয়াদা, থানার মুনসী, জমাদার, বরকন্দাজ (কোন কোন স্থলে বড়কর্তা), গন্ধ বেনে, তাহাদের মুহুরী, কলু ও অকর্মণ্য হুজুরদের কলুষ নিস্তারিণী ! ঐ সকল বধূভবন আশ্চর্য প্রকারে শোভিত ও নানা রাগে রঞ্জিত। এক একখানি রামকুটির, তাহার মধ্যে পাতিক্ষেত্র, শ্মশানের ফেরত বালিশ ও রামকন্থা ! কপিশ বর্ণের মশারি, তাতে আ-লোহিত বর্ণের ছোট বড ছারপোকার ঝালর ! এক একখানি গৃহে তালি দেওয়া গণিরুথের চন্দ্রাতপ ! শহরের বারাঙ্গনা ভবনে যেমন এক একজন দাদাঠাকুর, মাসী, মেড়ুয়াবাদী দরওয়ান ও 'মা' থাকে, ইহাদের তাহা নাই। যাহাদের কিঞ্চিৎ অর্থবল আছে, তাহারা এক একজন 'মা' রাখে। তাহারাই দাদাঠাকুরী ও দরওয়ানী করে, আর মাঝে মাঝে তামাক সাজে। তামাক এক পয়সায় বারো মণ।

এর আগে শহরের গরীব বারাঙ্গনাদের বর্ণনা করা হয়েছে। এখন পল্লীগ্রামের নিম্নমানের বারাঙ্গনাদের কথা বলা হল। এরা ঠিক নিম্নমানের নয়, কিন্তু এরা গরীব। রূপ থাকলেও এদের সাহসের অভাব আছে। ভাল খদ্দের পেলে সাহসীরা তাদের সাহায্যে উঁচুতে উঠে যায়, তখন তারা শহরে চলে যায়। শহরে বাড়ী ভাড়া করে। গেটে দরওয়ান রাখে। ঘর সাজায়। খাট, আলমারী, ভাল বিছানা, রেডিও, পাখা। নিজের দেহে গয়না, ভাল কাপড় তখন আর সস্তা দামে বিকোয় না, দালালদের মারফৎ ভাল বাবু ধরে। সেই ভাল বাবুরা কেউ বনেদী বড়লোক, কেউ কোন দেশের মহারাজা। মহারাজা তার রাজপাট ছেড়ে দিয়ে বারাঙ্গনালয়ে পড়ে থাকে। এমনও ঘটনা দেখা গেছে, মহারাজা যথাসর্বস্ব বারাঙ্গনার পায়ে নিবেদন করে রাজ্যেই আর ফেরে না।

এই সব বারাঙ্গনাদের কীর্ত্তি কাহিনী ঐ চিৎপুর রোডে গেলে জানা যায়। তাদের নিজস্ব কত বাড়ী ঐ অঞ্চলে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সব বারাঙ্গনাদের বলে খানদানী। তাহলে দেখা যাচ্ছে পতিতাবৃত্তির মধ্যেও রকম ফের আছে।

কিন্তু আমাদের প্রসঙ্গ তা ছিল না, এই সব বারাঙ্গনাদের মন জানার চেষ্টাই আমাদের কর্ম। তারা কি সে সময়ে সুখী ছিল? সুখের হিসাব করতে বসলে মিলবে না কিছু। কারণ নারী এই পতিতা বৃত্তিতে যে সুখী হয় না সে বহু নারীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে। তাদের প্রশ্নও করা হয়েছে, 'তোমরা তো অনেক টাকা পাও, নিত্য নতুন গয়না তোমাদের অঙ্গে ওঠে। প্রতি রাত্রে নানান পুরুষের সংস্পর্শে নানান ধরণের আনন্দ পাও। তাহলে তোমাদের দুঃখ কি?' তারা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, 'দুঃখ কি? আমরা বুঝি এই চাই? প্রত্যহ নানান ধরণের ব্যাটা ছেলে এসে নানান হুজ্জতি করে। শরীরে ধকল হয় না! তার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ কি? এই বেশ্যা পল্লীতে থেকে সকলে আমাদের ঘৃণা করে। আমরা আর আমাদের কোন আত্মীয় স্বজনের কাছে যেতে পারি না। যাদের সঙ্গে মিশি, তাদের সঙ্গেও মিশতে পারি না। টাকা পয়সাই কি সব? এ দুঃখ কাউকে বোঝাবার নয়, এ কেউ বুঝবেও না।' বলতে বলতে তাদের চোখে জল এসে যায়। সত্যিকারের জল। ভারী বুক ক্রন্দনের ভারে ওঠা নামা করে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আবার প্রশ্ন করি, 'কিন্তু তোমরাই তো এই ধরণের জীবন যাপনের জন্যে এই পল্লীতে এসে উঠেছ।' উত্তর আসে সেই আগের স্বরে। 'আমরা উঠেছি না আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছে। স্বামী ভাত কাপড় দেবে বলে বিয়ে করল। ভাত কাপড় চুলোয় গেল. কেবল শরীরটা নিয়ে কিছুদিন খুব দাপাদাপি করল. তারপর হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। আর সে দাপাদাপিও নেই, নেই কোন উন্মাদনা। স্বামীর কোন তলই পাওয়া গেল না। তারপর দেখা গেল যে কোন কথায় চেঁচামেচি, ঝগড়া, তারপর মারধোর শুরু হল।' এমনি অভিযোগ প্রতিটি মেয়ের। শুধু দু' একটি অল্প বয়সী মেয়ে বলল, 'আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি। বিয়ে হবার কোনই উপায় ছিল না। তার ওপর নানান লোক হাত বাড়াতে লাগল। যৌবনের তৃষ্ণাকে দাবাতে না পেরে চলে এলাম। এখানে বেশ আছি। খাই দাই। নানা ধরণের লোক আসে। ভয় তো কিছু নেই। বরং ভদ্রবাড়ীতে থাকলে সর্বদা ভয় থাকত, জানাজানি হয়ে গেলে নানান অত্যাচার হত। কুলটা, কুলখাকী, কলঙ্কিনী নানা কথা শুনতে হত, ওর চেয়ে, একেবারে খানকী হয়ে গেলাম। আর কোন ভয়ই থাকল না।' মেয়েটি এই বলে হি হি করে হেসে উঠল।—'কিন্তু এ জীবন তো ভাল নয়?'

মেয়েটি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'কোন জীবনই বা ভাল। ঐ তোমাদের

ভদ্রবাড়ী ! ছি ! ওখানে যে সব মেয়েরা বাস করে, তারা কি মনে কর সতী ? দেখো গে যাও, স্বামীকে সামনে রেখে তারা কি করছে ? ওদের ঐ ভদ্র হওয়ার চেয়ে আমরা অনেক ভাল আছি। আমরা তো কারুর সঙ্গে বেইমানী করি না। আমরা ষ্ট্যাম্প মারা।'

এ আজকের কথা নয়। সেদিনের কথা। আজকের সঙ্গে তাদের কোন অমিল নেই। একই অভিযোগ তারা আজকেও করে। সেই পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ভদ্র স্বামী পাওয়া যেন তাদের কাছে খুবই দুর্লভ। তারপর এই পতিতা জীবন। ওরা তো সমাজকে বেইমানী করে নি। অত্যাচার, লাঞ্ছনা মেনে নিয়ে তারা নিঃশব্দে চলে এসেছে। এখানে সুখ নেই বটে কিন্তু স্বস্তি আছে। সমস্যা নিয়ে মাথা খারাপ করতে হয় না। পায়ে ধরে স্বামী, শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের অধীনতা স্বীকার করতে হয় না। এই যে সব অভিযোগ, এ অভিযোগ মনে হয় পতিতালয় সৃষ্টি হবার পর। না'হলে তো অত্যাচার আমরণকাল ধরে চলে আসছে। পুরুষের লাম্পট্যের ইতিহাস তো আজকের নয়। মানব জন্মের গোড়া থেকে। সে যুগে দেবদাসীদেব ধর্মেব দোহাই দিয়ে পুরোহিতরা গোপনে গ্রহণ করত। ধর্মের স্থানেই যেন যত বেশি অনাচার। নারীদের পতিতা তো পুরুষরা বহু আগে থেকেই করতে শুরু করেছিল। কতকগুলি সামাজিক কঠোর অনুশাসন সৃষ্টি করে আসলে নারীদের যথেচ্ছ ভোগ করবার প্ল্যানই সমাজ প্রভুরা সৃষ্টি করেছে। ওদের আদিমতাই তার জন্যে দায়ী। একদিকে দেশের মানুষ, অন্যদিকে বিদেশীদের লুণ্ঠন।

আর নারী দিনের পব দিন ধরে অন্তঃপুরে অত্যাচারিত হযে তারা একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। তারপর এল ইংরেজ সরকার। তারা দেখল, দেশের মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করতে পারলেই শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালান যাবে। এই ভাবে তারা আমেরিকা প্রভৃতি দেশকে করেছিল। ১৮৬০ সালে আমরা দেখতে পাই, লণ্ডনে পঁচিশ লক্ষ লোকের বাস, আশী হাজার বারাঙ্গনা। প্যারিসেও নব্বই হাজারের মত বারাঙ্গনাদের হিসাব পাওয়া গিয়েছিল। এই যে দুটি সভ্য দেশ বলে প্রচারিত, এদের অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয়, এরা কোন্ দিকে ঝুঁকেছিল। সেই সময়ে আমাদের দেশে সাহেব প্রভুরা দ্বিতীয় লণ্ডন করবে না একি আর ভাবা যায় ? তারপর তো তারা দেখল আমরা নারীর ব্যাপারে খুবই কঠোর। অথচ নারীকে বাইরে পেলে প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হয় না। ইংরেজ খুবই বুদ্ধিমান জাতি। নিজেও ঐ অন্তঃপুর ধরে টান দিল, আর দেশীয় লোককে তার সঙ্গী করল।

আমাদের দাম্পত্য জীবনে বহুদিন ধরে চিড় খেয়েছিল। নারী এক পুরুষে খুশি থাকবে। গোলমাল করলেই তাকে অসতী আখ্যা দেওয়া হবে। পুরুষরা অনেক বিয়ে করবে। তাদের বেলা কোন বিধিনিষেধ নেই। কুলীনরা কুলের ভয়ে কুল-অধিপতির সঙ্গে শুধু মেয়েকে উচ্ছুগু করে তাদের সারাজীবন পাহারা দিয়ে রাখবে। বিধবাদের কঠোরভাবে বৈধব্য জীবন যাপন করতে হবে। বাল্যবিবাহ শিশু অবস্থায় সংঘটিত হবে। তারপর স্বামী মারা গেলে সেই যুবতী মেয়ে কঠোরভাবে বৈধব্য জীবন যাপন করবে। হিন্দুর এই অনুশাসনগুলি যেন সমাজ-পিতারা বুঝে বুঝেই সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজরা এ দেশে এসে দেখল, নারীকে এদেশের লোকেরা আগেই অন্তঃপুরের বাহিরে চালান করেছে। এখন রেজিস্টারের খাতায় তুলে দিতে একটুও বিলম্ব হবে না। তারা শুধু আগুনটা একটু উসকে দিল। জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে গোটা সমাজটা। সমাজ আগেও ছিল, তবে সমাজের ভড়ং ছিল সেই ভড়ংটা ইংরেজ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। স্ত্রী শিক্ষার একটা ঢেউ তুলে নারীদের বুঝিয়ে দিল, 'তোমরা আন্দোলনে নাম।' আর পুরুষকে বলল, 'দাম্পত্য জীবন ভেঙে দাও। দেদার স্ফূর্তি কর।' ইংরেজ নানাভাবে লোকের হাতে টাকা জুগিয়ে দিল। মদ, নারী, আনন্দ স্ফূর্তিতে মানুষ একেবারে উঁচুতে উঠে গেল।

এইভাবে দেশে বাবু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। তারা দিনে পায়রা উড়িয়ে, রাতে জুড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে বাঈজী, বারাঙ্গনা মহল্লায় গিয়ে ঢুকল। নারীদের যা একটু আশ্রয় ছিল, তাও গেল। সুতরাং বারাঙ্গনালয় রম রম করে উঠল। সে সময় কলকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থান মিলিয়ে বারো লক্ষের মত অধিবাসী ছিল, কত বারাঙ্গনার উদ্ভব হয়েছিল ?' দেশের মানুষের হৃদয়ের ভেতরে যে আদিমতা দিন দিন নানাভাবে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল, ইংরেজ প্রভুদের কৃপায় সে পথ সরলীকৃত হল। দেশের যে কজন বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তি এর অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে পারলেন, তাঁরা মনে মনে খুবই আহত হলেন কিন্তু উপায় কি ? হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি যে আমাদের নারীদের এই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে সে আর অজানা থাকল না। এই যে কিছুক্ষণ আগে পতিতার মুখের সংলাপ শোনানো হয়েছে, 'ঐ ভদ্র জীবনে থাকার চেয়ে এ ভাল।' এ কেন হল ? আমাদের দেশ, য়ুরোপ নয় বা প্যারিস নয়। যেখানে রাত্রি কখনও রাত্রি থাকে না। সে দিনের মতই আলোকোজ্জ্বল। এ দেশ কি সেই প্যারিস বা লণ্ডন ? এখানকার নারী কি ওদের মত উচ্ছৃঙ্খল জীবন চায় ? কখনই নয়। ভারতীয় নারীর সেদিনের মানসিকতা দেখলে

প্রতীয়মান হয়, তারা বড় বেশি পুরুষ নির্ভর ছিল। অশিক্ষার বাতাস তাদের মজ্জায় মজ্জায়। তারা অন্তরে বড় দুর্বল, সহায়হীনা, সহজে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে কিছু করতে পারত না। প্রতিবাদ যেটুকু ছিল সে খুবই মৃদু। স্বামীর অধীনে এমনভাবে থাকত, স্বামী ছাড়া তাদের গতি নেই। সে যুগে পতিপ্রাণা ধর্মপ্রাণা নারীর অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। স্বামীর পাদোদক পান না করে তারা জলস্পর্শ করত না। দেবস্থানে স্বামীর আয়ু কামনা করত, নিজের মৃত্যু চাইত। তারা প্রার্থনা করত, 'স্বামীর আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হয়।' স্বামীর আগে স্ত্রী মারা গেলে তার পায়ে আলতা, মাথায় সিঁন্দুর রাঙা করে তাকে সতী হিসাবে প্রণাম জানিয়ে দাহ করা হত। এই যে নারীর প্রার্থনা, এর মধ্যে কি লক্ষ্য করা যায়? নারীর দুর্বলতা। স্বামী ছাড়া নারীর আর কোন অবলম্বন নেই। এমন কি স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ীতে চলে এলে, বাপ-মা আতঙ্কে তাকে আবার সেই অত্যাচারী স্বামীর কাছেই পাঠিয়ে দিত। বাপ মা ভাবত, এই মেয়ে যদি সারা জীবন বুকে বসে থাকে, তাহলে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে। এই ব্যাপারটা আজও আমাদের ঘরে আগের মতই মানা হয়। মেয়ে সারা শরীরে ক্ষত নিয়ে, এক কাপড়ে স্বামীর ঘর থেকে চলে এল। বাপ-মা জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে তুই যে হঠাৎ চলে এলি?' মেয়ে পিঠের জামা খুলে দেখাল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ঐ লোকটার ঘরে আমাকে যেতে বলো না।' বাপ-মা খুবই অসুবিধায় পড়ল। বিয়ে দিয়ে ভেবেছিল, একটা খরচ কমল কিন্তু এ যে ভয়ানক ব্যাপার। তারা নানাভাবে মেয়েকে বোঝাল। মেয়ে বলল, 'যে স্বামী আমায় চায় না, তার ঘর কি করে করি বলো?' এখন ডিভোর্স আইন হয়েছে। অনেকে ডিভোর্স করে। ডিভোর্স আইনটা যে নারীর এই অত্যাচারের জন্যে হয়েছিল সে আর বলে দিতে হবে না কিন্তু সব মেয়েরা কি ডিভোর্সের স্বপক্ষে? ভাল মেয়েরা ঐ স্বামীরই ঘর করতে চায়। ভারতীয় নারীর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষ যেন তার নিজেরই বিবেক দংশন। ভাল বাবা মাও চায় না, মেয়ে ডিভোর্স নিয়ে আর একজনকে বিয়ে করুক। অনেক মেয়ে বাধ্য হয়ে এই ডিভোর্স নিয়ে আর বিয়েই করে না। একা জীবন কাটানো এখন তো আর মুস্কিল নয়। কিন্তু সে যুগে একক জীবন, এ আর ভাবাই যেত না। সেই একক জীবনের কোন সুবিধা ছিল না বলেই ভয়ে ভয়ে স্বামীকে নির্বিবাদে মেনে নিত। স্বামীর শত অত্যাচারেও 'পতিই পরম গুরু' ধ্যান করত।

গুরু শব্দটা এসে পড়ল বলে একটা কথা মনে পড়ে গেল, সে যুগে স্ত্রীর বড় গুরু স্বামীই ছিল। আরও আশ্চর্য নিয়ম ছিল, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী সহবাসে যাবার আগে প্রণাম করে বিছানায় উঠত। তারপর সহবাসান্তে আবার প্রণাম করে নিচে নামত।

এই গুরু শব্দের চিন্তায় সমাজে আর একটি জঘন্য নিয়ম ছিল। 'গুরু প্রসাদী।' হুতোম তাঁর নক্সার বর্ণনা করতে করতে বৈষ্ণব তন্ত্রের গুরু প্রসাদীর কথা উল্লেখ করেছেন। সে যুগের গোঁসাই প্রভুরাও কিছু কিছু জঘন্য নিয়ম প্রবর্তন করে নিজেদের আদিম স্বভাবের তৃপ্তি সাধন করত। নতুন বিবাহ হলে স্বামী সহবাসের আগে গুরু প্রথম সেবা করে নিত। কি আশ্চর্য নিয়ম দেখুন। সামাজিক নিয়মের বন্ধনে পরোক্ষে নারীকে দুজন পুরুষের ভোগ্যা হতে বাধ্য করা হত। এইভাবে দিনের পর দিন গুরুপ্রসাদী হয়ে আসছিল। একবার মেদিনীপুরের একটি উপকথা দিয়ে হুতোম উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষাতেই বলি। 'বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ির সামনের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটি শিবের মন্দির, একটি শান বাঁধানো পুষ্করিনী, তাতে মাছও বিলক্ষণ আছে। ক্রিয়াকর্মে চক্রবর্তীকে মাছের জন্যে ভাবতে হতো না। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি, চাষের জমি, চাষের জন্যে পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচজন রাখাল-চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ নিয়ত নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্তীর উঠোনে দু'টি বড় বড় ধানের মরাই ছিল, গ্রামস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের বৃকভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরিহর চাটুয্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বয়স ১০।১১ বছরের বেশি ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি মেয়ে আনা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ ছিল। কেবল পাল-পার্বনে, পিটে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ব তাবাস্ চলতো।

ক্রমে হরিহর বাবু কলেজ ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হলো, সুতরাং চক্রবর্তী জামাইকে যাবার জন্যে স্বয়ং সহরে এসে বৃকভানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। বৃকভানু বাবু চক্রবর্তীকে কয়দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখলেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরিহরের সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। একজন দরওয়ান, একজন সরকার ও একজন চাকর হরিহর বাবুর সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো চক্রবর্ত্তীর সহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম ফেলে ছুটোছুটি করে জামাই দেখ্‌তে এলো। ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দ্যাখেনি, সুতরাং পালে পালে এসে হরিহর বাবুরে ঘিরে বসলো—চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগলো; এক দিকে আশ-পাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাচ্চে; এক পাশে কতকগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করাবার জন্য বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েচে—পিঁড়ের নীচে চারদিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিল; জামাই বাবু যেমন পিঁড়েয় পা দিয়ে বসতে যাবেন অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গ্যালো; জামাই বাবু ধুপ করে পড়ে গেলেন। শালী শেলোজ মহলে হাসির গর্‌রা পড়লো! (জলযোগের সকল জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির কালোজাম, ময়দা ও চেলের গুড়ির সন্দেশ, কাঠের আক, ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মার্কোসা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতি কষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু'চার শালা সম্পর্কেও জুটে গ্যালো; সহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাশা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গ্যালো।

বিবাহের পর পুনর্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন দু'ই জনেই বালক বালিকা ছিলেন, সুতরাং হরিহর বাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি! আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এডুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গবেন এবং এরপর যাতে স্ত্রী লেখাপড়া শিকে তাঁর চিরহৃদয় তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে। বাঙ্গালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া "মিস স্টো, মিস টমসন ও মিসেস বর্‌করলি ও লেডী লিটন, বুলুয়ার লিটন" হতে পারে না? বিলিতী স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফর্‌নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ও ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ক্রটি মাত্র। বাঙ্গালি সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না! বিদ্দেসাগরের স্ত্রী হয়ত বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—

স্নাফরিদের মাদুলি ও বালসির চর্ম্মামেত্তা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাই বাবুর মনে নানারকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ভাবতে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদের ডাকা-ডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো—দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েছে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন!

এদিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ির গিন্নিরা পরস্পব বলাবলি কত্তে লাগলেন যে, "তাই তো গা! জামাই এসেচেন, মেয়ে ও মেটের কোলে বছর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।" সুতবাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির করে প্রভুর বাড়ি খবব দিলে -প্রভু, ভুরী, খস্তি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদীর আযোজন হতে লাগলো।

হরিহরবাবু গুরুপ্রসাদীর কিছুমাত্র জানতেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত। বাড়িব সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড ও স্বর্ণালঙ্কাবে ভূষিত হয়ে বেডাচ্চে! তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীব সহবাসে বঞ্চিত হয়ে বয়েচেন! সুতরাং এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধূম?" ছোকরা বল্লে, "জামাইবাবু, তা জান না, আজ আমাদের গুরু প্রসাদী হবে।"

"আমাদেব গুরুপ্রসাদী হবে" শুনে হরিহরবাবু একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে গেলেন ও কি প্রকাবে গুরুপ্রসাদী হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তাবি তদ্বিরে ব্যস্ত রইলেন।

কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীব মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ শাক-ঘণ্টা ও ঝিঁঝি পোকার মঙ্গল শব্দেব সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দত্তাপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গেলেন। নববধূব বাসরে আমোদ করবার জন্যে তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন – হৃদয়বঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি। এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগ্‌লো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগ্‌লো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সতী হাসতে লাগ্‌লেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতব বড ধুম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাই-

বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরিহরবাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুকলেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উকি মাত্তে লাগলো!

হরিহরবাবু ছোঁড়ার কাছে শুনে এক গাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলে। প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন; কন্যাটি কি করে! "বংশপরম্পরানুগত ধর্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ" এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—সুড় সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, "বল, আমি রাধা তুমি শ্যাম" কন্যাটিও অনুমতি মত "আমি রাধা তুমি শ্যাম" তিনবার বলেচে এমন সময় হরিহরবাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে এই "কাদে বাড়ি বলরাম" বলে গোস্বামীকে রুলসাই কত্তে লাগলেন; ঘরের বাইরে ন্যাড়া বস্টুমরা খোল খত্তাল নিয়ে ছিল- প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুলসইয়ের চীৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগলো, মেয়েরা উলু দিতে লাগলো, কাঁসর ঘণ্টা শাঁখের শব্দে হুলস্থুল পড়ে গ্যালো। হরিহরবাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন। দারোগা ভদ্দরলোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়) তাঁরে অভয় দিয়ে সেদিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে তার পরদিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো "যা ইনি কেমন করে ঘরে ছিলেন!" শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে! সেই অবধি গুরুপ্রসাদী উঠে গ্যালো, লোকেরও চৈতন্য হলো; প্রভুরা ভয় পেলেন।"

এই যে সামাজিক বিধানগুলি ছিল, এগুলি কি? একি নারীদের পরোক্ষে ভোগ করার একটা ফন্দি ফিকির নয়? এসবগুলি লক্ষ্য করেছিল সাহেব প্রভুরা। তাই দ্বিতীয় লণ্ডন তৈরি করতে তাদের আর বেগ পেতে হয় নি। আর নারীরাও বহুদিন ধরে নির্যাতন পেয়ে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছিল, সামাজিক অনুশাসনের নামে তো তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, লুকোছাপার দরকার কি? তার চেয়ে খাতায় নাম লিখিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

প্রেমের মাধুর্য দিয়ে নর নারীর জীবন হোক আনন্দময়। তারা প্রেমের যন্ত্রণায় ফুলের মত বিকশিত হয়ে উঠুক, আবার মিলনের আবেগে পরস্পরের কাছে গিয়ে পৌঁছতে না পেরে অজস্র ধারায় রোদন করুক। আমরা দুর্গেশনন্দিনীতে তাই পেয়েছি। গড় মান্দারণের দুর্গেশ নন্দিনী, পাঠান দুর্গেশের নন্দিনী। দুজনেই দুর্গেশ নন্দিনী। তিলোত্তমা ও আয়েষা। দু'জনেই যুবতী। যুবধর্ম তারা পালন করেছে। তিলোত্তমা নীরব, তার অন্তর পোড়ে, মুখে কথা সরে না কিন্তু অনুচ্চার যা থাকে তাও অপ্রকাশ থাকে না। আয়েষা স্পষ্ট বক্তা হয়েও প্রেমের ক্ষেত্রে গোপনতাই অবলম্বন করেছে কিন্তু ওসমান খাঁর জ্বালায় তা প্রকাশ হয়ে গেছে। জগৎসিংহ তিলোত্তমার, আয়েষার ভালবাসার কোন প্রতিদান দেয় নি। এই যে ভালবাসার প্রয়োগধর্ম সে যুগে বসেও লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যে যাকে ভালবাসে, সে যে তাকেই চায়, তার আর কোন বিকল্প হতে পারে না, এ তখনই তাঁর কলমে উঠে এসেছিল। নরনারীর হৃদয়-সংঘাত, ভালবাসার আসল স্বরূপ লেখক নিজের মানসিকতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। মানুষ চিরকাল ভালবাসার কাঙাল। বিশেষ করে বিবাহ পূর্ব ভালবাসা ও বিবাহের পরের ভালবাসা। ভালবাসা না থাকলে এই সংঘাতময় কঠিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় না। সেই ভালবাসার কথা শোনালেন বঙ্কিমচন্দ্র। লোকে তাই তাঁর গুণগানে মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু বিমলার চরিত্র লেখক কেন আঁকলেন? বিমলা কি দ্বিচারিণী? বিমলা তো জীবনে কিছুই পেল না। তার আত্মত্যাগই তো সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। আমরা দেখতে পাই, বিমলা শূদ্রকন্যার গর্ভে জন্মলাভ করেছে। তার বাবা তার মাকে বিবাহ করে নি। বিবাহ করবার কোন সামাজিক রীতিও ছিল না। অবৈধ যৌন সংসর্গ আর কি। সেই অবৈধতাব ফলস্বরূপ বিমলার জন্ম কিন্তু সেও একদিন মহারাজা বীরেন্দ্র সিংহের কুহক জালে আবদ্ধ হল। তাকে পাবার জন্যে বীরেন্দ্র সিংহের চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা কিন্তু তিনি বিমলাকে বিবাহ করতে চাইলেন না। শূদ্রানীর গর্ভজাত জারজ সন্তানকে অঙ্কশায়িনী করা যায় কিন্তু বিবাহ করে তাকে সমাজে স্থান দেওয়া যায় না। তারপর সাব্যস্ত হল, গোপনে বিবাহ হবে কিন্তু কেউ জানবে না। পরিচারিকার মত রাজপুরীতে থাকতে হবে।

এই যে নারীর প্রতি সমাজের কঠোর শাসন। বিমলা কি অন্যায় করেছিল? তার জন্মের জন্যে কি সেই দায়ী? অথচ তাকে সমাজ যে লাঞ্ছনা দিল, তার স্বাভাবিক নারীত্বই তাতে অপমানিত হল।

এই ভাবেই নারী-মনের বেদনা সে যুগে লেখকের কলম দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। বিমলার যখন স্বামী মারা গেল, তখন সে নিজের পরিচয় জগৎসিংহকে পত্রোত্তরে জানিয়ে লিখছে, 'যুবরাজ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, একদিন আপনাকে পরিচয় দিব। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্যেই এখন আপনাকে এ পত্র লিখিতেছি। আমি বহুপ্রকার অবৈধ কার্য করিয়াছি। আমি মরিলে লোকে নিন্দা করিবে, কত শত খারাপ কথা বলিবে, কে তখন আমার কলঙ্কের কালি মুছাইয়া তুলিবে? এমন সুহৃদ কে আছে?

যখন লোকে বলিবে বিমলা কুলটা ছিল; দাসী বেশে গণিকা ছিল। তখন কহিবেন. বিমলা নীচ জাতি, বিমলা কুলটা মন্দভাগিনী, বাসনা দোষে অপরাধিনী, কিন্তু বিমলা গণিকা নহে। যিনি এখন স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তিনি অদৃষ্ট প্রসাদে ছিলেন আমার স্বামী। বিমলা একদিনের তরে নিজ প্রভুর নিকট বিশ্বাসঘাতিনী নহে।' এই যে আত্মপ্রকাশ, এ কী আত্ম হাহাকার নয়? আমরা অজানতে কত নারীর বাহ্যিক প্রকাশ দেখেই তাকে অসম্মানে ভূষিত করি। নারীর কুলটা নাম যেন খুবই সহজভাবে বলা হয় কিন্তু যে ভাল, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে, তার মনে যে কি বেদনা জাগে একবারও ভাবি না। বিমলা চরিত্র এঁকেছিলেন লেখক সেই যুগে বসে। তিনি কি বিমলার কান্না শুনতে পান নি?

আমরা বহু আগেই আলোচনা করেছি, যে ভাল তাকে ভালর সম্মান দেওয়া হবে। যে খারাপ তার যেমন কোন কিছু যায় আসে না তাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে না। যে গণিকা হয়ে মনের দিক দিয়ে কোনই দুঃখ পায় না। সমাজে সে পুরুষের মনোরঞ্জন করুক। বিমলার মত সতী সাধ্বী মেয়ে যে কত বাধা বিপত্তির মধ্যে বাস করেছে. তবু সে কখনও নিজের স্খলন ঘটায় নি। এই যে সংযম, এ কত কষ্ট করে আহরণ করতে হয়, সে বিমলার মধ্যেই দেখা গেছে। এমনি সতী সাধ্বী নারীর কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যেমন চোখের জল রাখতে পারেন নি, আমরাও রাখতে পারি না।

মনে আছে নিশ্চয়, হুতোমের কলকাতার সমাজ দর্শন ও নিশাচরের সমাজ কুচিত্র। সেই উচ্ছৃঙ্খল ও নারী নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যুগে বঙ্কিম দিলেন নারীর অন্তরের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করে। লোকে নারীর অন্তরের কথা জেনে হৈ-চৈ করে উঠল। তখন যে এই নিয়ে কোন আন্দোলন হয় নি হলফ করে বলা যায় না। নিশ্চয় আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু যা প্রকাশ হয়েছে তা তো মিথ্যা নয়? লোকেও মুখ ফিরিয়ে নারীদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'এদেরও মধ্যে এত কথা জাগে?' একটু একটু করে যেন চৈতন্য হতে লাগল। সাহিত্য মানুষকে যে কি শিক্ষা দেয়, এটাই এখানে দেখা গেল। আজকের মত সে যুগে অত গল্প উপন্যাসের ভীড় ছিল না। জীবনের খুঁটিনাটি আপনার মুখ আপনি দেখার সবে শুরু হয়েছে। তবু ইংরিজী জানা অহঙ্কারীরা এসব ভ্রূক্ষেপ করল না। বাবু সম্প্রদায় যারা, যারা বর্ণপরিচয় পর্যন্ত যায় নি তারা বিলাস জীবন নিযে থাকল কিন্তু সংসারে যে বিপ্লব ঘটতে লাগল সে এই উপন্যাসই মাধ্যম। গল্পের মধ্যে ঘটতে লাগল সমাজ চিত্র। নর নারীর মানসিকতা। রাতারাতি বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের হৃদয়েব গভীবে ঢুকে গেলেন। মানুষ তখন শুধু অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান কবে ফিবছিল। সে আলোর বর্তিকা হাতে জনসমাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আপনারা সে সময়ে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের কথা চিন্তা করুন। সমাজের কোন আসনে বসে তিনি হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের কথা বলতে বসেছিলেন? সেই হৃদয় তিনি সম্পূর্ণভাবে নারীর জন্যেই দান করেছিলেন। 'ওরে তোরা যাদের নির্বিবাদে আঘাত করে যাস্, তারা প্রতিবাদ করে না বলেই কি তোরা ভাবিস্ তারা নির্বাক?'

বঙ্কিমচন্দ্র তারপরই লিখলেন 'কপালকুণ্ডলা'। কপালকুণ্ডলা মনস্তাত্ত্বিক নারীর এক এক্সপেরিমেণ্টাল উপস্থাপনা। নারীকে যদি সমাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, নারীর মানসিক গঠন কেমন হয়? বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ছিলেন কবি। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থই ছিল 'ললিতা ও মানস।' সেই কবি মন তাঁর কাব্যের ছোঁয়ায় গদ্যে মানসী প্রিয়া কপালকুণ্ডলাকে সৃষ্টি করলেন। তাকে গড়ে তুললেন এক নিবিড বনের মধ্যে। একদিকে অখণ্ড প্রকৃতি, অন্যদিকে সমুদ্রকূলবর্তী নিবিড় বনভূমি। সেখানে এক নারী বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিচরণ করে বেডায়। সেখানে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে একটি যুবককে আনলেন। তাদের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মে রোমান্স গড়ে উঠল কিন্তু নারী মানব সংসারের ক্রিয়াকলাপ জানে না। যখন সে মানব সংসারে এসে উপস্থিত হল, লেখক তার মনটি কাব্য সুষমা মণ্ডিত করে অন্যরূপে প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই এক্সপেরিমেণ্ট উপন্যাসের মধ্যে নিজেই দেখতে চেয়েছিলেন, নারী মানব সমাজের বাইরে থেকে পরিবেশের গুণে কতখানি নারী ধর্ম পালন করে। দেখা গেল, পরিবেশের গুণেই সে মানব সমাজে নারীর যে রীতি-নীতি তার বাইরে তার আচরণ প্রকাশ করেছে। এই উপন্যাস রচনা করে লেখক নিজের কাছেই নিজের বিচারের মর্যাদা পেয়েছেন। কপাল-কুণ্ডলা আর যাই হোক, বন্যবিহঙ্গী, বনের মধ্যে লালিতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে,

নারী পরিবেশ অনুযায়ী তার নিজস্ব আসন ঠিক করে নেয়। এই পরিবেশের জন্যেই যে সমাজ সংসারে তার স্থান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত হয়, এ আর অযৌক্তিক নয়। নারী জায়া, জননী, নর্তকী, গণিকা, প্রেমিকা যে পরিবেশে যেমন সে, সেই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়।

শিল্পী তার আপন মানসিকতায় নারীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ আপন কলমে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। সে যে সমাজ বর্হিভূত নয়, সে তো খুব সহজেই বলা যায়। সমাজ তখন ভঙ্গুর। সমাজে নানা কুটকচালি। ব্যভিচার, স্খলন, বিলাস জীবন, ভোগ, পাণ্ডিত্যাভিমান, চুরি, জোচ্চুরি, রাহাজানি, অর্থের জন্যে মানুষ কি না তখন করেছে। সেই সময়ে লেখার স্রোতে মানুষের মন ফেরাবার চেষ্টা, এ যেন পরোক্ষে সমাজে মঙ্গল আনার চেষ্টা হয়েছে। কপালকুণ্ডলায় মতিবিবির চরিত্রই দেখুন। মতিবিবি পূর্ব জীবনে নবকুমারের বিবাহিত ছিল। কিন্তু ঘটনার পরম্পরায় সে হয়ে উঠল দিল্লী প্রাসাদের একজন সুন্দরী রমণী। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ বহু ওমরাহ। এমন কি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর পর্যন্ত তাকে ভালবাসে। তার কোন অভাব নেই। ধনদৌলত, অপর্যাপ্ত অলঙ্কার, অফুরন্ত বিলাস জীবন। ভোগেরও কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। সেই পদ্মাবতী হঠাৎ ঘটনাচক্রে নিজের স্বামীকে দেখল বঙ্গদেশে, অমনি তার নারী জীবনের পূর্ব স্মৃতি মনে পড়ে গেল। নারী যে তার স্বামীকে ভালবাসে, নারীর স্বামী ছাড়া প্রিয়তম কেউ নয়, পদ্মাবতীর তাই মনে হল। সে দিল্লীর সমস্ত ভোগ বিলাস, রাজসিক বৈভব ছেড়ে দীন এক দরিদ্র স্বামীর জন্যে বঙ্গদেশে চলে এল। এই চরিত্র চিত্রণে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র নারীর মানসিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। বিশেষ করে বাঙ্গালী মেয়ে যে স্বামী ছাড়া আর কোন প্রেমাস্পদকে আপন করতে পারে না, সেটাই আসল কথা। এমন কি বনবিহঙ্গী কপালকুণ্ডলার মধ্যেও সামাজিক নারী জীবনের আসল ধর্মটি দেখা গেছে। নারী অবিশ্বাসিনী বা অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি ঘটলে তাকে যে পুরুষ গ্রহণ করে না, কপালকুণ্ডলার মধ্যে দিয়েও সে কথা বলেছেন। এই যে নারী ধর্মের স্বরূপ চিত্রণ সে যুগে বসে বঙ্কিমবাবু বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা তো স্পষ্টই ধরে নেব পদ্মাবতী সতী নয়। ধরে নেব কেন? পদ্মাবতী যে সতীত্ব ধর্ম পালন করে নি, সে তো বঙ্কিমচন্দ্র বেশ ভালভাবেই দেখিয়েছেন। অবশ্য যে অবস্থার মধ্যে পদ্মাবতীকে বাঁচতে হয়েছিল, তাতে সতীত্ব রক্ষা করা যায় না। কিন্তু ভালবাসা? নারী দেহ দান করে যে ভালবাসে না, বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগেই

নারীর অন্তরের ধর্ম থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। এ কথা অনুসরণ করে বলা যায়, তবে কি বঙ্কিমচন্দ্র বারবনিতা নারীর মানসিকতা দেখে পদ্মাবতীর চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন? সম্ভব। কারণ তা না হলে পদ্মাবতী লুৎফউন্নেসা নাম নিয়ে যে জীবন যাপন করল, তার পরে তার স্বামীকে দেখে অমনি পালটে গেল কেন? এই প্রসঙ্গে যদি আমরা একটি দৃষ্টান্তকে তুলে ধরে আলোচনা করি নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বারাঙ্গনা ভবনের সব নারীই অবিবাহিত নয়, আর সে যুগে তো অধিকাংশ সধবা মেয়েরাই কোন কারণবশতঃ স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে ঐ সব ভবনে গিয়ে উঠত। সেই সব জায়গায় পুরুষ সেকালেও গোপনে যেত, একালেও যায়। হঠাৎ কেউ তার স্বামীকে সেই ভবনে দেখতে পেল। বেশ ছিল সব ভুলে। মনে ক্ষত থাকলেও বর্তমান জীবনের হুল্লোড়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ স্বামীকে দেখে সেটা মনে পড়ে গেল। অমনি নারী সব ফেলে দিয়ে সেই দরিদ্র স্বামীর পা চেপে ধরল। লুৎফউন্নেসাও সেটা করেছিল। কিন্তু নবকুমার ঘৃণায় তার হাত মাড়িয়ে চলে এসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কি এমনি নারী চরিত্র ঐ বারাঙ্গনা ভবনে দেখেন নি? না দেখলে কি ভাবে তিনি মতিবিবির চরিত্র আঁকলেন। মতিবিবি চরিত্রহীনা কিন্তু তার চাহিদা অমূলক নয়। তার চাহিদা সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু সেই পবিত্র চাওয়া মানব সমাজ স্বীকার করে না কারণ মতিবিবিদের মত নারীদের সমাজ চিরকাল ঘৃণা করে। সেই ঘৃণাই আজন্মকাল ধরে চলে আসছে। মনুষ্য জীবন সামাজিক জীবন। সংস্কার মুক্ত নয়। বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ বড়ই নির্মম। সেখানে ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ থাকে না। নবকুমারের কি ছিল? কিছুই না। সাধারণ এক গরীব ব্রাহ্মণ সন্তান। সেই ব্রাহ্মণ সন্তানের সমাজে যে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে, অপর্যাপ্ত দৌলতের অধিকারিণী মতিবিবির তা নেই। আরও এক নারী যে বনেই মানুষ হয়েছিল, বিয়ে কাকে বলে জানত না। প্রকৃতির আবহাওয়ায় তার নারীত্ব বিকাশ লাভ করে নি। যখন অধিকারী তাকে বলল, 'তোমায় বিয়ে করে এই যুবকের সঙ্গে যেতে হবে।' তখন এই বিস্মিত বন্যবালিকা বলল, 'কোন যুবকের সঙ্গে মিশতে তুমি আমায় নিষেধ করেছ। এই যুবকের সঙ্গে যেতে বলছ কেন?' অধিকারী তার উত্তরে বলেছিল, 'বিয়ে করে গেলে ক্ষতি হয় না।' এই যে অজ্ঞানী মেয়ে বিয়েও কাকে বলে জানত না, আর বিবাহিত জীবনের পর দাম্পত্য সহবাস, সে তো তার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। নবকুমারের বোন শ্যামা ইঙ্গিত দিতেও শেখে নি। আমরা ভেবেছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের

ভেতর দিয়ে সেই বন্যবালিকাকে বোঝাবেন, নর নারীর মধ্যে আসল সম্বন্ধ কি?' কিন্তু বিবাহিত জীবনের এক বছর চলে গেল, কপালকুণ্ডলার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছে করেই এদিক সম্বন্ধে নিরুত্তর" থেকেছেন। ও ব্যাপারটা গল্পে খুব একটা প্রয়োজন ছিল না কিন্তু যে বন্যবালিকা বিবাহ সম্বন্ধে জানত না। যখন প্রশ্ন রাখলেন অধিকারীর মুখ দিয়ে। তখন নবকুমারের মুখ দিয়ে বিবাহ পরের ব্যাপারটা উল্লেখ করলেন না কেন? এ ব্যাপারটা যে স্রষ্টার মনে জাগে নি সে তো অস্বীকার করা যায় না। তারপর এল অবিশ্বাসের প্রশ্ন। শ্যামার ওষুধ আনতে যাবার কথায় নবকুমার বাধা দিলে কপালকুণ্ডলা দাপটে বলেছিল, 'আমার সঙ্গে আসতে চাও কি আমাকে অবিশ্বাস করার জন্যে?' এই অবিশ্বাসের ব্যাপারটা কি শুধুই পুরুষের সঙ্গে মেশা, আর কিছু নয়?

বঙ্কিমচন্দ্র এই আখ্যানটি নারীর মানসিকতা দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন। এক্সপেরিমেণ্ট অবশ্য সার্থক। তবে নারীর মনের যে বাস্তব জিজ্ঞাসা, বন্যবালা কপালকুণ্ডলার মধ্যে সে জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি তাকে অসাধারণরূপে প্রকাশ করতে না পেরে সাধারণই করে ফেলেছেন। কপালকুণ্ডলা পদ্মাবতীর অধিকার নীরবে ছেড়ে দিয়ে বনেই চলে যেতে চেয়েছিল কারণ সে মনে করে, মানব সমাজে থাকার মত উপযুক্ত সে নয়। সে আজন্ম সেই কাপালিক সন্নিধানে মা কালীর ঐ ভয়ঙ্কর মূর্তির মাঝে নিজের নীরব পূজা নিবেদন করে এসেছে। একমাত্র নরবলি ছাড়া সেই আধিভৌতিক পরিবেশে সে তার ভৈরবী মূর্তিকেই স্মরণ করে। তাই শেষে পদ্মাবতীর কাছে কাপালিকের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে সে ফিরে যেতে সম্মত হয়। কেন? এই কেনর প্রশ্ন নিয়েই স্রষ্টা নারীর মানসিকতার ওপর কাজ করে এই আখ্যান সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে আমরা কপালকুণ্ডলার মধ্যে কি পাই? দুটি নারী চরিত্র। একটি নিষ্পাপ ও একটি পাপী। কিন্তু দুজনের মধ্যে চাওয়া পাওয়ার আকাশ পাতাল তফাৎ। একজন জোর করে তার চাওয়া ছিনিয়ে নিতে চায়, আর একজন কোন জোরই করে না কিন্তু দু'টি নারীই সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিতা। বন্যবালিকা বলে মানব সমাজ তার বিচার অবিচারের মাপকাঠি থেকে তাকে রেহাই দেয় নি। এমন কি কাপালিক তাকে মানুষ করে তাকেই সমাজের চোখে দুশ্চরিত্রা আখ্যা দিয়েছে। অবশ্য তার কথাতেই আমরা পাই, মা কালী তার পূজা নেয় নি, তার বাহু ভগ্ন করেছে কারণ তার ভেতরে ছিল দুষ্ট মতলব। সে কপালকুণ্ডলার প্রতি

আসক্ত ছিল বলে দেবী চামুণ্ডা তার এই পরিণাম সৃষ্টি করেছেন। এখন সে দ্বিধা করবে না, ঐ নারীকে বধ করে পাপের শেষ করবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর হাতে নারীজাতির এই প্রকাশ। রোমান্সের ছায়াতলে বসে তিনি পুরুষের লালসা ও সেই লালসার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান প্রকাশ করেছেন। সে সময়ে নারী যে অবস্থায় সমাজের কাছে মার খাচ্ছিল, স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেই তাঁর কলম নারীর মানসিকতা প্রকাশের জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল। যতই সমাজে নারীর মুক্তির জন্যে আন্দোলন হোক, মুক্তি কেউ দেবে না, কারণ বাইরের চোখে আমরা নারীর যে সব অন্যায় দেখি সে অন্যায়ই। তার বিচার বাইরে থেকে হয়ে যায়। নারী সতীত্ব হারালে তাকে সমাজে কুলটা নামই দেওয়া হয় কিন্তু যে সত্যিই সতীত্ব হারায় নি, তাকে কেন কুলটা নাম দেওয়া হবে? এই না-বলা কথাগুলিই পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। সেখানে তাঁর ভালবাসা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। নর নারী পরস্পরকে ভালবাসলেই সব দোষ পরস্পরে ভুলে যাবে। দেশে শান্তির আবহাওয়া বইবে। এই মনোভিপ্রায় বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। সেইজন্যে তিনি 'মৃণালিনী' গল্পে মৃণালিনীকে দিয়ে শুধু ভালই বাসিয়েছেন। তার সেই চরম ভালবাসা, একালেও মাঝে মাঝে নারীর মধ্যে দেখা যায়। মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র সে ভালবাসায় মুগ্ধ, সেই ভালবাসার জন্যে সে তার গুরুদেব মাধবাচার্যের কথাও অমান্য করেছিল, মাধবাচার্য দেশ থেকে যবনদের তাড়াবার জন্যে দুটি নরনারীর মিলনে বাধা দান করেন কিন্তু প্রেমের গতি এতই প্রবল যে সে বাধা বাধা হয়ে থাকে না, চূর্ণ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রেমেরই জয় হয়। এই যে প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতমূলক রোমান্স, এ সৃষ্টি করতে বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয় ছিলেন। এই রোমান্সের সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন দুষ্ট চরিত্র বোমকেশকে। এমনি দুষ্ট চরিত্র প্রায় তাঁর সব উপন্যাসে। তিনি গল্প সৃষ্টি করে দেখাতে চেয়েছেন, সংসারে যেমন ভালও আছে, তেমনি খারাপও আছে। ভালমন্দ নিয়েই সংসারিক জীবন কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে নারীর এত দুঃখ কেন, নারী কেন সংসারে নিজের ভূমিকা বজায় রাখতে পারে না। কেন তাকে সমাজ সংসার রসাতলে দেয়। তার জবাব স্রষ্টা দেন নি। নারীর বিভিন্ন ভূমিকা তিনি তাঁর গল্পে এনেছেন, যেমন মনোরমার চরিত্র। মনোরমা খুবই বুদ্ধিমতী ছিল। এবং সে তার বুদ্ধির বলে পশুপতির মত দুর্জনের মনেও প্রেমের বন্যা বইয়েছে। এই থেকে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে খুব সংস্কার-

মুক্ত মানুষ ছিলেন না। মনে প্রাণে ব্যভিচারকে ঘৃণা করতেন। পশুপতি যখন জানল, মনোরমা তার সেই বিবাহিত পত্নী, তখনই তার সঙ্গে সহবাস করবার জন্যে তৎপর হল কিন্তু তার আগে সে কেন মনোরমার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করল না? পশুপতির সংলাপে দেখেছি, সে মনোরমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। বিধবা বিবাহ সে করবে। নিজে শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করবে কিন্তু এ ছাড়া মনোরমাকে নষ্ট করার পরিকল্পনা তার নেই। পশুপতির চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, সে কি খুব ভাল? গভীর রাত্রে পুরুষের কাছে এক যৌবনবতী নারীর অবস্থানে কোন আদিম প্রবৃত্তি জাগে না, এ যেন কেমন বিসদৃশ মনে হয়। অথচ পশুপতি এক সময়ে সেই সুযোগ নিচ্ছে, তখন সে মনোরমাকে নিজের স্ত্রী জানার পরে। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে বসে এই উপন্যাস লিখেছিলেন, তখন পুরুষের চরিত্র কি এতই মহানুভব ছিল? যদিও পশুপতিকে আমরা পরে দেখেছি নিজের দুষ্কর্মের জন্যে আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। আর হেমচন্দ্রই বা কেমন? ভালবাসার পাত্রীকে সামান্য কারণে অসতী ভাবল? অবশ্য পরে নিজের দোষের জন্যে নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন রেখেছে। এই যে উত্তম পুরুষ চরিত্র, সে চরিত্রেও যে নারীর চারিত্রিক শুচিতার সম্বন্ধে স্পষ্ট নয়, সন্দেহ থেকেই যায়, এই মানসিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর। যতই আমরা উদার হই, নারীর শুচিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে সব সময় একটা সন্দেহ থেকেই যায়। তাই গিরিজায়া যখন হেমচন্দ্রকে ধিক্কার দিচ্ছে, 'তুমি মৃণালিনীর অযোগ্য নও, আমারও অযোগ্য।' নারী এ জায়গায় পুরুষকে চিরকালই ধিক্কার দিয়ে এসেছে কিন্তু পুরুষ কি সে ধিক্কার শুনে তার সন্দেহ ছেড়েছে? ছাড়েনি। মানব সমাজ যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে, সে যে তা ছাড়বে না স্পষ্টই বলা যায়। তবে এই আখ্যান রচনা যে যুগে হয়েছে, সে যুগের মানসিকতায় নারী পুরুষের এই আদান প্রদান সামাজিক জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই কারণে বলা যায়, নারীর মানসিকতা পুরুষের চোখের সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরার জন্যে স্রষ্টার কাছে সমগ্র নারীজাতিই ঋণী আছে। নারীও কি অন্যায় করে না? নিশ্চয় করে। তার রূপ, যৌবনই তো সেই অন্যায়ের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। এ বিধাতার দান। ফুলেরও তো সৌন্দর্য এক সময়ে নষ্ট হয়। তাই বলে কি ফুল গাছে ফুটবে না? কিন্তু সেই ফুলের সৌন্দর্য দেখে যে আমরা পুলকিত হই, তাকে পদদলিত করি কেন? এই পদদলন নিয়ে যা কিছু বক্তব্য। যে ফুলে দেবতার পূজা হয়, সে ফুল এক সময়ে পদতলে পিস্ট হয়। হায় ফুলের কি জীবন? এই

ফুলের মত জীবন কি নারীর নয়? নারীও তো পুরুষের কাছে কত আদর পায় কিন্তু আবার কত অনাদর পায়? কেন এই অনাদর?

বঙ্কিমচন্দ্র নারীর জীবনকে বিষবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুন্দনন্দিনী সেই বিষ ফল। স্রষ্টার মনেও যে নারীর রূপ ও যৌবন যন্ত্রণা দিত, এই আখ্যান রচনা তার প্রমাণ। কুন্দনন্দিনীর কিছু নেই কিন্তু অফুরন্ত রূপ যৌবন আছে। তাকে যে তারাপদর সঙ্গে কেন বিয়ে দিলেন এ অজ্ঞাত। বিধবা করলে কি কুন্দনন্দিনীকে আরও পাপিষ্ঠা করা যায়? না, সূর্যমুখী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাবার জন্যে এ কাজ করল? শেষেরটাই ঠিক সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর কাছে হেরে গেল। লেখক নগেন্দ্রর মধ্যে যে রূপতৃষ্ণা জাগিয়েছিলেন, সেটা স্বাভাবিকতার বাইরে নয়। সব পুরুষের মধ্যে সেটা জাগে। কিন্তু এই জাগাটাই অন্যায়। সংসারে এই জাগা নিয়েই যত বিপ্লব। জুলিয়াস সিজার অত বড় একজন যোদ্ধা ছিলেন, তবু কেন ক্লিয়োপেট্রাকে দেখে মুগ্ধ হলেন? সিজারের অবনতি তো ঐ রূপসী নারীর জন্যে। নগেন্দ্রর অবনতি কুন্দনন্দিনীর জন্যে। নগেন্দ্র এও বলেছে, আমি মরেছি। তার কারণ, তার অজানা নয়, সে কি করতে যাচ্ছে! অথচ প্রবৃত্তির হাত থেকে তার রেহাই নেই। এই যে নিয়তি, এর হাত থেকে কারুর রেহাই নেই। তবে কি বলব নগেন্দ্র লম্পট? কেন সে সূর্যমুখীকে ছাড়া কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসল? নগেন্দ্রকে যদি লম্পট বলা যায়, তাহলে জগতে তো সবাই লম্পট। নগেন্দ্রর আসক্তি নাহয় প্রকাশ হয়ে গেছে কিন্তু পুরুষ মাত্রেই তো তাকে লম্পট বলতে হবে। যে রূপ সৌন্দর্য পছন্দ করে না, তাকে কি মানুষ বলা যায়? একটি সুন্দরী নারীকে দেখে প্রত্যেক পুরুষই মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে। 'আহা ওকে যদি পেতাম!' যার সাহস নেই সে এগোয় না। কিন্তু যার সাহস ও সুযোগ আছে?

বিপ্লব তো সেইজন্যে ঘটে। রূপের বাহ্যিক প্রকাশটা দেখে পুরুষ যেমন এগোয়, নারীও কি এগোয় না? নারীও তো পুরুষের রূপে মুগ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর মধ্যেও রূপের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়েছিলেন। জগৎসিংহের বিশাল চেহারা, উন্নত ললাট, পোষাকের চমৎকারিত্ব দেখে তিলোত্তমা মুগ্ধ হয়েছিল। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল কিনা বোঝা যায় না। তবে সে বন্যবালিকা তার মধ্যে আসক্তি ছিল না বলে তার ভালবাসা প্রকাশ পায় নি। কিন্তু হেমচন্দ্রকে দেখে মৃণালিনীর তো তা হয় নি, বরং তার আসক্তি চরম হয়েছিল, হেমচন্দ্রের আঘাতেও সে আসক্তি টলে নি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, প্রেমাস্পদ বা

স্বামী নারীকে ত্যাগ করলে নারীর আর পৃথিবীতে কোথাও আশ্রয় থাকে না। গিরিজায়া যখন বলল, 'চলো আমরা ফিরে যাই।' মৃণালিনী গেল না। মৃণালিনী সেই সোপানপরি যুগ যুগ বসিয়া রহিল। এমনি মৃণালিনী কি সংসারে কম আছে? ওরা নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা করে না কিন্তু আপনজনের পাও ছাড়তে চায় না। ভালবাসা নিবিড় হলে উভয়ে উভয়ের ভেতরটা দেখে নেয় কিন্তু সংসারে সেই নিবিড়তারই তো অভাব। বঙ্কিমচন্দ্র ভালবাসা সৃষ্টি করে নরনারীর মধ্যে সেই নিবিড়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। পরোক্ষে নরনারীকে জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু সেই সৎ মনোভিপ্রায় কি সম্পূর্ণ কাজে লেগেছে? লাগলে আর এতকাল পরেও নারী পুরুষের মধ্যে সেই বিপ্লব দেখি কেন? নারী কেন চোখের জলে বারাঙ্গনালয়ে গিয়ে জায়গা নেয়?

আমরা সেকালের বারবনিতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছি। কেন করছি এ কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলা যাবে, যে যুগে বসে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, সে যুগেই আমাদের এই কলকাতা শহরে বারাঙ্গনালয়ের উৎপত্তি খুব বেশিভাবে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বারাঙ্গনাদের কথা কিছু বলেন নি। কিন্তু ইঙ্গিত তাঁর ছিল, দেবেন্দ্র কলকাতায় গিয়ে বখাটে হয়ে গেছে। দেবেন্দ্রর বখাটে হওয়া ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের মাধ্যমে একেবারে জীবনের শিকড়ে গিয়ে টান দিয়েছিলেন। মূলতঃ নারী পুরুষের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়েছেন। ব্যভিচারকে তিনি ঘৃণা করেছেন কিন্তু অন্তরের ভালবাসা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়েছেন।

নারী পতিতা জীবন কেন গ্রহণ করে? এর জবাব তিনি দেন নি কিন্তু পতিতা যাতে আর না হয়, তারই পরোক্ষ চেষ্টা তার লেখনীর সর্ব হৃদয় জুড়ে খেলা করেছিল। এই অন্তর্নিহিত ভাবটাই পরে শরৎচন্দ্রের মনে খেলা করে। তাই তাঁর লেখনী আরও জোরদার হয়। তবে শরৎচন্দ্রের মানসিকতা প্রকাশের আগে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করব। লেখক গড়েন তাঁর সৃষ্টিকর্ম। সে সৃষ্টি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসে। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা কোন পথে এগিয়েছিল, তাঁর সৃষ্টিকর্ম দেখেই তা প্রকাশ পায়। দেশে ইংরাজ শাসন। এদেশীয় মানুষ কিছু ইংরেজী জানার জন্যে ব্যাকুল। তারা ইংরেজি আদবকায়দা রপ্ত করতে লাগল। ধর্মও তার জন্যে ত্যাগ করল। তবে তারা মুষ্টিমেয়। আর বাকী মানুষ একেবারে অন্যরকম জীবন নিল। অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অর্থের উৎস সন্ধানে সরকার সাহায্য করল। ন্যায়

নীতির বালাই শিকেয় তুলে দিয়ে আর্থিক বলে নৈতিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য হারাল। প্রবৃত্তির যে কানাঘুষা এতদিন গোপনে ক্রিয়া করছিল, সেই প্রবৃত্তি একেবারে উন্মুক্ত করে দিল।

এই সময়ে বঙ্কিমের আবির্ভাব। তিনি সংস্কারমুক্ত নয় কিন্তু মানুষকে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্যে কলম হাতে তুলে নিলেন। দেশে একটিও এমন বলিষ্ঠ চরিত্র নেই, যাকে কল্পনা করে তিনি গল্প গঠন করতে পারেন। তখনই তাঁর স্মরণে এল, ইতিহাসের মাধ্যম সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। রচিত হল দুর্গেশনন্দিনী। আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা, কতলু খাঁ, ওসমান খাঁ, জগৎসিংহ। বিমলা যেভাবে কতলু খাঁকে মারল, তা অচিন্তনীয়। এই যে নারীর পুরুষের বিরুদ্ধে আক্রোশ, এ আক্রোশ কি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ধূমায়িত হয় নি? না'হলে তিনি বিমলার মত বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করলেন কেমন করে? বিমলা, পদ্মাবতী, মনোরমা প্রভৃতি চরিত্র যে বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছে করে সৃষ্টি করেন নি, সে তাঁর লেখনীর বলিষ্ঠতা দেখে বোঝা যায়। সৃষ্টিকারের ভেতরে যে নারীর জন্যে কাতরতা সৃষ্টি হয়েছিল, এ আর গোপন থাকে নি। তারপর সৃষ্টি করলেন, বিষবৃক্ষ। সংসারে এই বিষবৃক্ষ যে রোপণ হয়েই আছে তাকে সরাবে কে? তাকে স্রষ্টাও সরাতে পারে না। পারে শুধু কিছু দৃশ্য সৃষ্টি করে দেখাতে। যে তোমরা এই বিষবৃক্ষ রোপণ কর না। কিন্তু রোপণ কর না বললেই কি কেউ শোনে? কখন অজান্তে সেই দিকে মানব সমাজ এগিয়ে যায় কেউ জানে না। নগেন্দ্রও যে কুন্দনন্দিনীকে দেখে এগিয়ে গিয়েছিল, সে কি জানত তার পরিণাম এই হবে? ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী সবাই। কেউ ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে, কেউ পারে না। তবে না পারার সংখ্যাই বেশি। সে জানে আমি রসাতলে যাব, তবু কি ক্ষান্ত হতে পারে? যুগ যুগ ধরে নারী পুরুষের জীবনে এই হয়ে আসছে। বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েই চলেছে। রূপজ মোহে নারী পুরুষ একইভাবে বিদ্ধ হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রর বন্ধু হরদেব ঘোষালের সঙ্গে নগেন্দ্রর পত্র বিনিময়ে সেই কথা বলেছেন, রূপজ মোহ এত বলবান যে তাকে রোধ করা বড়ই মুস্কিল কিন্তু সে আসল ভালবাসা নয়। ভালবাসার আসল রূপ গুণের মধ্যেই প্রোথিত কিন্তু গুণ এত গভীরে থাকে যে তার প্রকাশ বড় দেরীতে হয়। অথচ সেই যথার্থ ভালবাসা। এই খাঁটি ভালবাসায় কেউ বিদ্ধ হলে সে ভালবাসা চিরন্তন হয়। এ যেন খুব তত্ত্বকথার মতই শোনাল। যে ভালবাসা হঠাৎ ঘটে তার দিকেই সকলে ঝোঁকে। সে রূপজ ভালবাসা। রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়া। নারী পুরুষের রূপ দেখে ভোলে।

পুরুষ নারীর রূপ দেখে। সংসারে এই রূপেরই জয় আগে। এইভাবে সংসারে বিপ্লব সর্বদা ঘটেই যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মানব জাতিকে সাবধান করে বলেছেন, 'নগেন্দ্রর মত সূর্যমুখীকে ভুলে কুন্দনন্দিনীতে নির্ভর কর না। তোমার অবস্থাও নগেন্দ্রর মত হবে।' ঔপন্যাসিক শুধু গল্প লিখে ক্ষান্ত হন নি। প্রকারান্তরে মানব সমাজকে শিক্ষাও দিয়েছেন। তাহলে নগেন্দ্রর মত সোনার সংসার একটি মাত্র কারণে ধ্বংস হবে। কিন্তু কে ভাবে এসব কথা? জগতের যদি সবটাই ভাল হত, তাহলে সে তো স্বর্গসুখতুল্য আনন্দ হত কিন্তু এ জগৎ তো স্বর্গতুল্য নয়। এখানেই স্বর্গ, এখানেই নরক। বরং নরকের দিকে মানুষের মন যত যায়, স্বর্গের দিকে নয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে মানবের যে উপকার করতে চেয়েছিলেন, সে উপকার কতখানি হয়েছে জানি না, তবে তাঁর প্রকাশে মানুষ যে সচেতন হয়েছে এ বলা যায়। আপনার মুখ আপনি দেখার মত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মানুষ নিজের চেহারা আপান দেখে নিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র আজও সেইজন্যে পাঠকের কাছে চির অমর। মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর নব নব অভিযান, নব নব অভিজ্ঞতার ফসলই প্রকাশ করে তিনি মানুষকে সচেতন করেছেন। বারাঙ্গনা ভবনে বা ধনীর বিলাসকুঞ্জে ঢুকে তাদের বলতে যাননি, 'ওহে তোমরা যা করছ, সে তোমার রসাতলে যাবার পথ' কিন্তু গল্পের মাধ্যমে আপন অভিজ্ঞতা মানব সমাজের সামনে তুলে ধরে সংস্কারবিহীন পথে মানুষকে যেতে মানা করেছেন।

বঙ্কিম অনুসরণে একটা কথাই আমাদের মনে আসে, নারী পুরুষের চিরন্তন এই দ্বন্দ্ব একি কোনদিনও রোধ হবে না? বরং একালের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, নারী-পুরুষের এই আসঙ্গলিপ্সা যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সে যাই হোক, হীরা ও দেবেন্দ্রকে মনে পড়ে। দুটি অদ্ভুত কুটিলমনা নারী পুরুষের চরিত্র। দেবেন্দ্র নব নব নারীসঙ্গ করে নিজের চিত্তচাঞ্চল্য দমিত করে, আর হীরা তার ইন্ধন জোগায়। এই দেবেন্দ্রর মত মনুষ্য চরিত্র সংসারে অসংখ্য। যারা ছলে বলে কৌশলে নারীদের অঙ্কশায়িনী করে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্রকে খানিকটা আমাদের চোখে নিরপরাধই করেছেন, তার স্ত্রী ভাগ্য মন্দ। স্ত্রী কুটিলা প্রকৃতি। কিন্তু স্ত্রী রূপসী সুন্দরী, এমন লোকও তো সংসারে ফাঁদ পেতে নারী ধরে বেড়ায়। দেবেন্দ্রর পাপচক্রে পড়ে কুন্দনন্দিনী জীবন হারাল কিন্তু সেটা না হয়ে হীরা সেই প্রণয়লিপ্সায় অন্ধ হয়ে কুন্দনন্দিনীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল, এখানে হীরার অন্ধ প্রণয় কুন্দনন্দিনীর জীবননাশ। অথচ

সব থেকে নিরপরাধ কুন্দনন্দিনী। তার মত সরল বালিকা খুব একটা দেখা যায় না।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তার মৃত মায়ের স্বপ্নাদেশে তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'তুই চলে আয়। এখানে থাকলে তোর জীবনে সুখ আসবে না।' এই কথায় আমরা বলতে পারি, কুন্দ মায়ের সাবধান বাণীতে যায়নি, কারণ তার বাঁচবার লোভ ছিল। পৃথিবীকে ভালবাসার লোভ ছিল। এমনি যদি নারী পুরুষকে ডেকে কোন জ্যোতিষী তাদের ভবিষ্যৎ বলে দেয়, তবু কি তারা সেদিকে ঝুঁকবে না? একেই তো বলে নিয়তি। যার যা জীবনে ঘটবে ঘটবেই। সেখানে মানুষের কিছু করণীয় নেই। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে শৈবলিনী কি করেছিল? সেও তো প্রতাপের রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। অথচ তার স্বামী সর্ব গুণান্বিত চরিত্রবান সাধক পুরুষ ছিলেন। কিন্তু সেখানে শৈবলিনী কি করল? শৈবলিনী নগেন্দ্রর মতই সংস্কারহীন পথে ছুটল। নগেন্দ্র প্রেমিক স্ত্রীকে ভুলে অন্য নারীতে আসক্ত হয়েছিল। আর শৈবলিনী দেবপুরুষ স্বামীকে ভুলে পূর্বপ্রণয়ীর জন্যে পাগল হল। দুজনেরই মনোভিপ্রায় এক। তবে দুজনে নারী ও পুরুষ। পুরুষ যেমন দুটি বিয়ে করলে অন্যায় নয়, স্ত্রীলোক দুটি বিয়ে করলে অন্যায়। তারও জবাব আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছি। স্ত্রীলোকের দুটি স্বামী হলে সন্তানের পিতৃ পরিচয় কিভাবে প্রকাশ পাবে। সুতরাং পুরুষের দুজন স্ত্রী শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রের দোহাই না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকের দুজন স্বামী সত্যিই অসুবিধে। স্ত্রীলোক কার সন্তান গর্ভে ধরল সে কেমন করে জানবে তাই সতীত্বের দোহাই দিয়ে তাদের নিবৃত্তি করা হয়েছে কিন্তু সে দোহাই কি হৃদয় শোনে? মন যারে চায়, তার দিকে যে মন ছুটে যায়, একে রুখবে কে? নারী পুরুষ ভেদাভেদ কি মন শোনে? পুরুষের সমস্ত অধিকার আছে নারীর নেই। অথচ নারীর মধ্যেও তো কামের প্রকাশ আছে। সে পুরুষের মত কম নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের চেয়ে বেশিই দেখা যায়। অথচ তাকে সতীত্ব অটুট রাখার হুকুম দান করা হয়। এই যে সতীত্বের হুকুম দিয়ে নারীমনে লাগাম পরানোর চেষ্টা, সে লাগাম কি সম্ভব? বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে হতচেতন করে নরকদর্শন করিয়েছেন। পরোক্ষে কি তিনি পাঠিকাকে নরকদর্শন করান নি? যারা শৈবলিনীর উপাখ্যান পড়েছে, তারা কি মনে মনে শিহরিত হয় নি? আমরা কল্পনা করতে পারি, হয়েছে কিন্তু তাতে কি পাঠিকার সতীত্ব বজায় থেকেছে? আমরা বলব, না। কারণ, অন্তরে সংস্কার আষ্টেপৃষ্টে থাকলেও ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা কারো নেই। ইন্দ্রিয়

কেউই সংযত করতে পারে না। সে কি নারী কি পুরুষ। বন্যার জলের মত একবার যদি চিত্তচাঞ্চল্য ঢুকে পড়ে সে প্লাবন ঘটাবেই। তবু কেন এই আলোচনা? সে বিবেক সচেতনতা। কিন্তু সেই বিবেক সচেতনতায় প্রতাপ, শৈবলিনী কেউই কম ছিল না। শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছিল, 'তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাও।' কেন? শৈবলিনী জানতই, সে পাপ করছে। প্রতাপের রূপে মুগ্ধ হয়ে সে স্বামীর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছে। অথচ প্রতাপ চলে গেলেও সে সুখী হবে না। সংসারে এই চিরন্তন হয়ে আসছে। নারী নিজের পাপের গুরুত্ব চিরকাল বুঝেছে কিন্তু তবু কি পাপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে? সরে দাঁড়াতে পারে নি বলেই সে নিজেই ক্ষতবিক্ষত।

সেইজন্যে এক বারবনিতার কথায় বলি, 'তোমাদের সংসারে গিয়ে থাকা বড়ই বাঁধা। এই কর না তাই কর না, ভীষণ ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটাতে হয়। এখানে ওসব নেই। খদ্দেরের মনোরঞ্জন করি। খাই দাই ঘুমিয়ে থাকি।'

সত্যিকথা। সাংসারিক জীবনে বাস করতে গেলে বিশেষ করে নারীকে অনেক সাবধানে পথ চলতে হয়। পুরুষেরও সাবধানতা দরকার কিন্তু নারীর যে আরও সাবধানতার প্রয়োজন। তার বিশ্বাস স্বামীর কাছে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদ, বাবা মা সবার কাছে। এই পরিমণ্ডলকে খুশি করতে পারলে তবে তার জীবন সুখের হবে। সেইজন্যে তাকে সচেতন হয়ে পা ফেলতে হয়। এ যে কি বিষময় জীবন নারী মাত্রেই তা জানে। তাই যুগে যুগে নারী জীবনই আলোচিত হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই নারী জীবনের চিন্তায় লেখনী ধারণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন আখ্যানে নারীর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা দেখিয়েছেন। তবে তাঁর মূলতঃ চিন্তা ছিল রোমান্স। রোমান্সের ক্ষেত্রে তিনি ব্যভিচারের প্রশ্ন আনেন নি। ব্যভিচার ঘৃণার সঙ্গে ত্যাগ করেছেন। রোমান্সকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা সেই বরেণ্য লেখকের কাছে আমাদের থেকেই যায়, নর নারী কি ক্ষেত্র বিশেষে ভালবাসা দান করে? জাত, কুল, মান, বিবাহিত নয় এমন জেনে কি নর নারী উভয়ে প্রেমে পড়ে? প্রণয় ঘটা কি এতই সহজ? অবশ্য তিনি যেমন জগৎসিংহ তিলোত্তমার মধ্যে প্রণয় দেখিয়েছেন, আবার আয়েষার প্রণয়ের কোন মূল্য দেন নি। কিন্তু কেন? আমাদের তো মনে হয়, আয়েষার মনে ঈর্ষার হোমানল জেলে ওদের নির্মল প্রেমে বাধাদান করতে পারতেন। আয়েষা নীরবে সরে গেছে ওদের সামনে থেকে। এতেই মনে হয়, লেখকের মানসিক গঠন ছিল বৈধতার মধ্যে পবিত্র প্রেমের স্বীকৃতি দান

করা। আয়েষার মত মতিবিবিও তার পুরনো প্রেমকে জ্বালাতে চেয়েছিল কিন্তু সেও পাত্তা পায় নি। আমাদের বাস্তব জীবনে কি এমন সহজ কিছু ঘটে? বরং এই তো বেশি দেখা যায়, যারা অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয় তাদের জোরই বেশি। তারাই সংসারের সব কিছু লণ্ড ভণ্ড করে জিতে নিতে পারে। গল্প সুন্দর পরিসমাপ্তিতে শেষ হবে এমনি চিন্তা মনে ধারণ করলে বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল হয় না। পাপ সে পাপই। পাপের জন্যে যে নর নারী তার প্রকৃতি সঙ্কুচিত করবে এতো বড় একটা দেখা যায় না।

আজ এত বছর পরে সেই সাহিত্য সম্রাটের মানসিকতা পর্যালোচনা করতে যাওয়া খুবই অন্যায়। তিনি যখন উপন্যাস লিখে বাস্তব সামাজিক জীবনের ওপর আলোকপাত করতে চেয়েছিলেন, তখন আশে পাশে কোন রচনাই তার সামনে ছিল না কিন্তু তিনি শক্তিতে তো নিজেই নিজের কাছে বিরাট ছিলেন। তবে মনের সংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেন না কেন? সেখানে তাঁর সনাতন মনটি এমনি চেপে ধরে রইলেন যে, লেখক হয়ে উদার মনটি তাঁর প্রকাশ হল না। হ্যাঁ বলা যেতে পারে, লোক সাহিত্য সৃষ্টি করে সমাজকে রসাতলে না যেতে দিয়ে সমাজকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাই তিনি করেছিলেন কিন্তু একটা প্রশ্ন যে বরাবরই থেকে যায়, সে হল জগৎ কি এতই সহজ সরল?

জগৎ যে সোজা সরল পবিত্র নয়, আমরা একালে বসেও দেখি। সেকালেও কম বিপরীত ধর্মী ছিল না। মানুষ সেকালে নিষিদ্ধ জীবনের দিকে বেশি ঝুঁকেছে, একালেও সেই আছে। বরং একালের সাহিত্যে তার দর্শন মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। সেকালের দর্শনে তার নিরুপায় উল্লেখই ছিল। মাঝে মাঝে খণ্ড চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু সে জলের দাগের মত তা মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে। তবে একটা চিন্তা করে আমরা সান্ত্বনা পেতে পারি, এই বরেণ্য লেখকই ছিলেন বঙ্গ ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক। তাঁর ত্রুটি তাঁর ত্রুটি নয়, বরং আত্ম সংযম বলা যেতে পারে কারণ যে সময়ে তিনি সামাজিক আলেখ্য সৃষ্টি করার জন্যে কলম ধরেছিলেন, তখন দেশের মানুষের জীবনের কোন চরিত্র ছিল না। দেশ তখন এমন একটা ভাবের ঘোরে দিনরাত মত্তপ হয়ে আছে যে, সে জীবনের দর্শন প্রকাশ করলে জনচিত্তজয়ী সাহিত্য হত না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র, দেশকে সামনে রেখে চলে গিয়েছিলেন সুদূরে। দেশের মানুষ যখন তাঁর লেখা পড়ল, ভাবল আরব্য উপন্যাস পড়ছে কিন্তু পড়তে পড়তে মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে তাদের জ্ঞানোদয় হল। ঘৃণ্য

এক সমাজের দুর্গন্ধময় পরিবেশে এক অভিজাত যৌবনবতী রমণী যখন তার কোমল মনে ঐ লেখনীর মর্মোদ্ধার করল, তার হৃদয় পুলকিত হল। রোমান্সের নদীতে হাবু-ডুবু খেতে খেতে তার চিত্তের সমস্ত মালিন্য ঘুচে গেল।

এই চিন্তাটাই বোধ হয় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মনে উদয় হয়েছিল। সেইজন্যে তিনি রোমান্টিক লেখার দিকেই বেশি মন দিয়েছিলেন। বীভৎস রসের দিকে নয়। সেই বীভৎসের কাণ্ডারী হলেন পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র যে আমাদের মতই চিন্তা করে নিয়েছিলেন, সেটা তার লেখনী দেখেই মনে হয়। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন, আমি কতদিন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নকল করেছি কিন্তু নকল করলে যে লেখা হয় না সেটা পরে আমার বোধগম্য হয়েছে। লেখক লেখেন তার জীবন দর্শন অনুযায়ী। লেখকের লেখা বাইরের প্রকাশ কিন্তু তার সম্পূর্ণ মনটিই জীবনী চিত্র সৃষ্টি করে প্রকাশ হয়ে যায়। বঙ্কিম যে জীবন-দর্শন প্রকাশ করেছিলেন, তৎকালীন সমাজে সেই তাঁর ভাবরূপ। আমরা আজ এত বছর পরে তার ভাবরূপই লেখনী থেকে পাই। তাতেই মনে হয়, তিনি নারী পুরুষকে সত্য, ধর্ম, তিতিক্ষার পথে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। পাপীকে বলেছিলেন দূর হও, পূণ্যকে বলেছিলেন তুমি পৃথিবীতে সম্রাট হয়ে বেড়াও। সেইজন্যে রোহিনী নামে রমণীকে কুলটার বেশ পরিয়ে তাকে নীরবে হত্যা করেছিলেন। তার নৃশংস হত্যা সমাজে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। সে সমাজে রোহিনীর মত নারী হৃদয় জ্বালা নিয়ে নীরবে মরে গেছে, তবু মনের দুয়ার ভয়ে খোলে নি। পাছে গোবিন্দলালের গুলি এসে বুকে বেঁধে। কিন্তু একটা কথা এই রোহিনীর মত মেয়েদের সপক্ষে উদ্ধৃত হয়, গোবিন্দলালের গুলির ভয়ে কি রোহিনীর মত মেয়েদের হৃদয়জ্বালা যায়? যায় না। রোহিনী বিধবা ছিল। সে সময়ে দেশে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল। রোহিনী বিধবা বিবাহের নামে কানে আঙ্গুল দিয়েছিল কিন্তু হৃদয় যন্ত্রণা রোধ করতে পারে নি। এই যে হৃদয় যন্ত্রণা নারীর জীবনে এর উপশম কিসে? পুরুষের হৃদয় যন্ত্রণা হলে সে যা খুশি করতে পারে কিন্তু নারীর হৃদয় যন্ত্রণায় কোন উপশমের ব্যবস্থা নেই। তাহলে ঈশ্বরকেই এর জন্যে দায়ী করতে হয়। 'হে নিষ্ঠুর ঈশ্বর তবে পুরুষের মত নারীর হৃদয়ে একই যন্ত্রণা দিলে কেন? তার যখন যন্ত্রণা উপশমের কোন সাত্বিক উপায় নেই, তখন সে যন্ত্রণা তো তোমারই তুলে নেওয়া উচিত।' ঈশ্বর তোলে নি বলেই মানুষ নানা ভয় প্রদর্শন করে সে যন্ত্রণা রোধ করতে চেয়েছে। কিন্তু একি শৈশবের ছেলে ভুলানো খেলা? যে

নানান রংচঙে খেলা দেখিয়ে পরিণত বয়স্কাদের চুপ করিয়ে রাখা হবে? তাই নারী বার বার বীভৎসতার মধ্যে গিয়ে জগতে গল্পই ঘটিয়ে চলেছে। এর কোন পূর্ণ সমাধান নেই বলে শুধু আলোচনাই করা যায়, সঠিক কোন উত্তর দেওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি ওদের জন্যে নিজস্ব একটি সমাপ্তি টেনে দিয়ে পৃথিবী থেকে তাদের বিদায় করে দিয়েছেন। 'নে তোরা যা। তোদের জন্মও যেমন হওয়া উচিত হয় নি, মৃত্যুও তোদের ঘৃণ্য ভাবেই হওয়া উচিত।' এই বলে স্রষ্টা দুটি নারীকে একজনকে বিষ খাইয়েছেন। একজনকে তারই প্রেমাস্পদকে দিয়ে গুলি করিয়েছেন। বিষবৃক্ষের কুন্দ কত সরলা অবলা ছিল কিন্তু তার যে অফুরন্ত রূপ ছিল, সে রূপে বশ হয়ে নগেন্দ্র সাধ্বী স্ত্রী, সোনার সংসার ভুলল। সেইজন্যে কুন্দকে স্রষ্টা ঘৃণাভরে বিষের মোড়ক তুলে দিলেন। আর রোহিণী গোবিন্দলালে মজে ছিল। গোবিন্দলাল ছাড়া আর কাকেও জানত না। তাকেও দেখালেন, কে এক অজানা লোক, তার সঙ্গে সে রাত্রিবেলা [illegible] করতে যাচ্ছে। রোহিণী যদি এমনি হত নিশ্চয় গ্রামে থাকতে সে বহুকে পেত কিন্তু তা তো নয়। স্রষ্টার ঘৃণাই তাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল।

এই যে স্রষ্টার ঘৃণা গল্পের মধ্যে রূপ ধরে সৃষ্টি হয়েছে, এ কি বাস্তব জীবনে ঘটে? আমরা বলব, ঘটে না। এটা স্রষ্টারই কল্পনা। পাপীর সাজা হওয়া উচিত। কিন্তু যে মানসিক যন্ত্রণায় পুরুষ নারীর দিকে এগোয়, পুরুষের কেন কোন সাজা হয় না? বঙ্কিমচন্দ্রও তার সমাধান করলেন না। নগেন্দ্র পাপের যন্ত্রণায় সূর্যমুখীকে ফিরে পেল। সে সুখী হল। জগৎ তাকে কোনই শাস্তি দিল না। বরং মনে মনে বলল, যা অন্যায় করেছ, করেছ আর কর না। শুধু গোবিন্দলালকে দ্বাদশ বৎসর লোকালয়ের বাইরে সন্ন্যাস জীবন দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হল। সংসারে সে আর ফিরতে পারল না। স্রষ্টা গোবিন্দলালের উপর একটু রূঢ় হয়েছেন কিন্তু রোহিণীর ওপর এতটুকু দয়া দেখালেন না।

আমরা তাঁর দোষ গাইব না। জগতে চিরকাল এই হয়ে আসছে। আমরা অবলা নারীজাতির প্রতি চিরকাল বড়ই নির্দয় ব্যবহার করি কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর সন্ধানে, সেকালে কোনই সমাধান হয় নি। শুধু নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করে নারীকে আরও ভয় দেখান হয়েছে। নারী হৃদয় যন্ত্রণা রোধ করতে না পেরে অন্যায় করেছে। সমাজ আরও কঠোর হয়েছে। নারী তিতিবিরক্ত হয়ে তখন পতিতালয়ে চলে গেছে। এমনও কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে,

নারীর পাপকে ক্ষমা না করতে পেরে তাকে উন্মুক্ত স্থানে সবার সামনে মাটিতে ফেলে পিটিয়ে মারা হয়েছে। পুরুষ শাসিত এই পৃথিবীতে তাই নারীর অনেক অভিযোগ পুরুষের বিরুদ্ধে। আজ নারীর অনেক অভিযোগ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই, তাতে স্বভাবত খুব রাগ হয় কিন্তু পিছনের দিকে তাকিয়ে কি আমরা এর উত্তর পাই না? নির্যাতিতা নারী যখন গল্পে উঠে এল তখনও সে নির্যাতিতা। যখন গল্প গাঁথা হয় নি, তখনও নির্যাতন ভোগ করেছে। আর আজও তার নির্যাতনের শেষ নেই। তবে সে নির্যাতনের ধারার পরিবর্তন হয়েছে। সে গল্প পরে প্রকাশ্য।

নির্যাতন যে শেষ হবে না, সে বেশ ভালভাবেই বোঝা যায়। নারীর এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যা খুবই ঘোরালো। সে নানা আলোচনা করেও সমাধান করা যায় না। তবে উদার হওয়া যায়। উদারতা প্রকাশ করে কঠোরতা একটু কমালেই নারী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। সেই মন্ত্রই মানব মনের মধ্যে সঞ্জীবিত হওয়া উচিত। একটু করুণ হলেই বিচারের মাপকাঠি লঘু হবে। তখনই তাদের ভেতরের কষ্টটা জানা হযে যাবে। তারও যে কিছু বক্তব্য আছে, এ তো অজানা নয়।

সেই বক্তব্যের সন্ধানেই যেন পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। কি লিখব এ কথা যখন তারমধ্যে তোলপাড় করছিল, সেই সময়ে আমাদের মতই উক্ত কথাগুলি তাঁর মধ্যে এসেছিল। সে সব কথা আলোচনা করবার আগে একবার তাঁর কিশোর জীবনে আবার আমরা ফিরে যাই। বাবা ছিলেন একজন লেখক। লেখা তাঁর কোনদিন প্রকাশ হয় নি কিন্তু লেখার শখ তাঁর ছিল। সেই শখের অনুপ্রেরণাটি বাবার থেকেই শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন। তারপর বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, হরিদাসের গুপ্তকথা তাঁর মধ্যে জলসিঞ্চন করে। শরৎচন্দ্রের কথা বলতে গেলে বার বার একটা কথাই মনে আসে, কি অসম্ভব দারিদ্রতার মধ্যে তাঁর এই শিল্পী মানসটি সঞ্জীবিত হয়েছিল? সে সব কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এখন আলোচনা করব তিনি বহু গবেষণা করে, বঙ্কিম মানসটি পর্যালোচনা করে যে রত্ন তুলে এনেছিলেন তার মুল্যায়ন। কি লিখব বা কি লিখবে কেউ যেমন কাউকে বলে দেয় না, শরৎচন্দ্রকেও কেউ বলে দেয় নি। তিনি নিজেই নিজের খতিয়ান করেছেন। আমরা তাঁকে কৈশোরে দেখেছি, ভীষণ বাউণ্ডুলে জীবন তিনি যাপন করেছেন। রাজু প্রভৃতি ডানপিটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। বাঁশী বাজানো, গান গাওয়া, সিদ্ধি, গাঁজা খেয়ে ব্যোম হয়ে থাকা, আর সময় পেলেই কাগজ কলম নিয়ে বসা। কাগজের বুকে কলম দিয়ে কাদের কথা তিনি লিখবেন? বঙ্কিমের মত আঙ্গিক নিয়ে লিখতে লাগলেন। কিন্তু চরিত্র কোথায়? মনের মধ্যে কিছুই যে আসে না। ভাগলপুরের যত্রতত্র চোখ ফেরালেন। দেবানন্দপুরের পাঠশালার আঙ্গিনায় চলে গেলেন। লোকের অন্তঃপুরে মন ঢোকালেন। গ্রাম্য রাজনীতিও মাঝে মাঝে এসে মনে দোলা দিত। টুকরো টুকরো সব ইতিহাস। পুকুরপাড়ে বয়স্কা ও যুবতীদের কথাবার্তা মনে দাগ ফেলত কিন্তু গল্প কোথায়? সেই গল্পের সন্ধানেই কিশোর আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলেন। কতদিন যে তার সেই অন্বেষণে চলে গেল কেউ জানে না।

সে সময়ে তাঁর মানসিক চিন্তার কথা ভাবলে এই মনে হয়, ভেতরের ছট-

ফটানির যে কি যন্ত্রণা সে লেখক না হলে কারো বোধগম্য হবে না। লেখক মানসিকতাটি বড়ই বিচিত্র। লেখক কি ভাবেন কেউ জানে না। তার ভাবনার ফলটি যখন শরীর নিয়ে প্রকাশ পায় তখনই বোঝা যায়, তিনি কি ভেবেছিলেন? শরৎচন্দ্র তখন কি ভাবতেন কেউ জানে না। অথচ তাঁর কাণ্ড কারখানা দেখে মামার বাড়ীর সবাই অস্থির। এ ছেলে যে বয়ে গেছে সে আর বলতে হবে না। যেখানে যত নিষিদ্ধ জিনিস, সে দিকেই তার সব চেয়ে বেশি আগ্রহ। দাদু কেদার গঙ্গোপাধ্যায় তো এই দৌহিত্রের ব্যাপারে একেবারেই খাপ্পা। তাঁর রক্ষণশীল বাড়ী। দেশের মধ্যে একজন মান্যগণ্য লোক। তাঁর বাড়ীর ছেলে হয়ে এসব তিনি একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু কে শুনবে তাঁর চোখ রাঙানি? তখন শিবের মধ্যে যে ত্রিনয়নের খেলা চলছে। তিনি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছেন। সিদ্ধি গাঁজা শিবের মতই সেবন করছেন। আর যাত্রাদলে গিয়ে নারী সাজছেন। সেই নারীর রূপেই যেন তাঁর মধ্যে নারীর ছায়াপাত ঘটল। তখন তাঁর বয়স কত হবে? আঠার কি কুড়ি। এই বয়সই আমরা উল্লেখে পেয়েছি। সেই বয়েস মানে যৌবনের চাঞ্চল্য ভিতরে ভিতরে ভাঙচুর করেছে। সেই সময়ে এক ঘটনায় দেখি, কেদার গঙ্গোপাধ্যায় ভীষণ খাপ্পা। সমাজের একজন বিপরীতধর্মী লোক শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গিয়ে তাঁর বাউণ্ডুলে দৌহিত্র। একে তো তিনি জামাইয়ের ব্যাপারে খুশি নন। মেয়েটাকে যে জলে ফেলে দিয়েছেন এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। তার ওপর এই দৌহিত্র। রক্তের সম্বন্ধ যাবে কোথায়? কিন্তু যার বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার, তাঁর কানে এ সব গেলে তো? যেখানে আনন্দ, যেটা নিষিদ্ধ, যা করলে সবার রাগ হয়, সেই দিকেই তাঁর গতি। শিবচন্দ্র যেই হোক, দাদুর মত কাষ্ঠবৎ নয়। সংস্কারকে বুকে চেপে ধরে গেল গেল রব করেন না। সমাজ ভাঙার মন্ত্র যাঁর ভেতরে তখন ইমারত গড়ছে তখন সে তো এই মানুষকে বুকে চেপে ধরবেই। কৈশোরের মানসিকতা পুষ্টির গোড়া পত্তন যে এই শিবচন্দ্রের দ্বারা হয়েছিল, এ আর অস্বীকার করা যায় না। তখনই মামার বাড়ীর রক্ষণশীলতা ও অন্যের উদারতা দুই বিপরীতধর্মী সমাজ নীতি দেখে কিশোরের মনে এক আলো উঁকি দিচ্ছে। তখন তাঁর মনে হয়, যা সামাজিক নিয়ম বলে চিরকাল চলে আসছে, তার বিরুদ্ধে গেলেই রক্ষণশীলেরা চিৎকার করে ওঠে। কেন? অথচ দেখা যাচ্ছে, যে সব নিয়ম নীতি চালু আছে, সেগুলি নীতির দোহাই দিয়ে মানুষের অকল্যাণই ডেকে আনে। এই যে চিন্তাটা তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে, এর উত্তর সন্ধানেই

ভাবীকালের লেখক আত্মসমাহিত হলেন। মহাদেব আবার সিদ্ধি গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেন। কি লিখব বলে যে চিন্তাটা মনে আকুলি বিকুলি করছিল, যেন জীবনের সত্য খুঁজতে ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানের মধ্যেই যেন দেখতে পেলেন অসংখ্য মানুষ, মানুষের এই অবিচারে কাঁদছে। নিজের ওপর দিয়ে পরীক্ষাটা চলল. 'সবাই যা করে আমি তা করব না' যেই নিয়মের বাইরে যান, অমনি নিয়ম কর্তারা চিৎকার করে ওঠে। 'না, না, ছি ছি ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল।' কিন্তু তাঁর চোখের ওপর রাজেন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টান্ত তাকে মোহিত করে দিল। এই ছেলেটার মত দুর্দান্ত হিরো দুনিয়ায় আর একটিও নেই। অথচ সে হেন অসামাজিক কাজ করে না। তাকে তো দুনিয়া ছাড়া একটা সৃষ্ট জীব বলে মনে হয় কিন্তু তার এমন কতকগুলি গুণ আছে যা অন্যের নেই। এমন সুন্দর বাঁশী বাজায় যে মন পাগল করে দেয়। আর মনটি? আর্তের সেবায় সমর্পিত মন দেখলে মনে হয় সত্যিই বুঝি এর জোড়া নেই। মনই যে আসল সে সময়ে শরৎচন্দ্রের জানা হয়ে গেছে। তাই মন যখন আনন্দ সাগরে ভাসতে চায়, সেই আনন্দের জন্যে কট সমাজের নিয়ম নীতিগুলিকে বর্জন করাই শ্রেয়। কেন বর্জন কর্তব্য?

কিশোর সে কথাও গভীর প্রত্যয়ে ভেবেছিল এই ভাবনার জবাব আমরা শ্রীকান্তর প্রথম পর্বে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে ইন্দ্রনাথের মানসিক চিত্র অঙ্কনে পেয়েছি। ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম। এই যে ভালবাসা শরৎচন্দ্রের মধ্যে সৃষ্টি হল সংস্কারাচ্ছন্ন কঠোর নীতির পথ ও সংস্কারবিহীন ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে জীবনের সংঘাতই সৃষ্টি করল সংশয় ভাবিকালের লেখকের মধ্যে। দুই নীতির মাঝে পড়ে কিশোর বিচারের মাপকাঠি নিয়ে বসল। দৃষ্টি থাকল মানবাত্মার সম্পূর্ণ গভীরে। জয় হল সংস্কারবিহীন পথের। সংস্কার কি? না মানুষের গড়া কতকগুলি মেকি নিয়ম। কিন্তু যেখানে মানবাত্মা শুধু কেঁদে ফেরে সেখানে নিয়মের সার্থকতা কি? সে বয়েসে নারী চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত। কে মিশবে এই চালচুলোহীন বাউণ্ডুলের সঙ্গে? দাদুর বাড়ীর লোকেরা তাঁকে মনে করে পরগাছা। সুবোধ সুশীল হলে না হয় একটু করুণা করা যেত। অন্তঃপুর শুধু দাদুর বাড়ীর বন্ধ হল না, প্রত্যেক ঘরের অন্তঃপুরে ঢোকা তাঁর নিষিদ্ধ হল। অন্তরের কথা জানতে অন্তঃপুরে না ঢুকলে কি নারীর অন্তর জানা যায়? তখন তাঁর মনের মধ্যে দেবানন্দপুরের এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর স্বামী সর্পপ্রীতি ও সর্পচর্চায় জীবন ব্যয়িত করেছিল। কিন্তু

স্বামীকে সেই আত্মীয়া খুব ভালবাসত। ধর্মত্যাগী স্বামীকে সেই আত্মীয়া এতটুকু অমান্য করে নি, বরং নারী জীবনের যে স্বামীই ধর্ম, স্বামীই সত্য, স্বামীর পথেই মৃত্যু পর্যন্ত চলা উচিত এই ভেবে আত্মীয়া ঘর ছেড়ে স্বামীর পথগামী হয়েছিল। পরে অবশ্য সেই স্বামী সর্পকে চুমকুড়ি দিতে গিয়ে মারা যায় কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনে ছাপ রেখে যায়, আত্মীয়ার এই স্বামীধর্ম প্রীতি। শরৎচন্দ্র এই আত্মীয়াকে খুব ভালবাসতেন কিন্তু আত্মীয়ার এই ব্যবহারে তাঁর মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। সেই সংশয় কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য পর্যন্ত ছিল। শ্রীকান্তে সেইজন্যে অন্নদাদি আত্মীয়ারূপে চিত্রিত হয়েছে।

কিন্তু কৈশোর যৌবনের মধ্যস্থানে যে দুইমুখী সংস্কার তাঁর মধ্যে সংশয় উপস্থিত করেছিল, রাজেন্দ্রর সংস্কারহীনতা ও আত্মীয়ার সংস্কারবদ্ধতা কোনটার দিকে তিনি ধাবিত হবেন? নারী স্বামীধর্ম পালন করে। নীতির বিরুদ্ধচারী লম্পট স্বামী, তবু সংস্কারের বলে নারী তাকেই আপন বলে গ্রহণ করে। কেন? এই কেনর সন্ধানে মহাদেব চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

সেই সময়ে আমরা যৌবনের প্রথম ধাপে উন্নীত শরৎচন্দ্রের মানসিকতার একটা নির্দিষ্ট রূপের সন্ধান পাই। সেই মানসিকতায় দেখা যায়, তার কিছু সময়ের পরের লেখনী দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা প্রভৃতি রচনা। শরৎচন্দ্র পরে বলেছিলেন, 'আমি যৌবনে এই নারীর জীবন জানতে গিয়ে অনেক জঘন্য কাজ করেছি।' এ কথা যখন তিনি বলেন, তখন তিনি সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সামাজিক মানুষের উচ্চস্থানে বসে শ্রদ্ধা কুড়োতে ব্যস্ত কিন্তু যখন জীবন ও জীবনের অর্থ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তো এ কথা মনে হয় নি? এ কথা পরেও যে তাঁর বলা উচিত হয় নি এখন তাই মনে হয়। সেদিন যদি ঐ শিল্পী শিল্পের ধর্ম পালনে ঘোরালো পথে বিবরণ না করতেন, লেখক জীবন কি তাঁর পুষ্ট হত? নারী মনের গতি প্রগতি লক্ষ্য করার জন্যে সমাজের বাইরের অসামাজিক নারীর আলয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল।

একবার সেই উনিশ, কুড়ি বছরের একটি ছেলের কথা চিন্তা করুন। যে গোপনে গোপনে বারাঙ্গনা ভবনে ঢুকছে। 'ওহে খোকা এখানেও আসতে শুরু করেছ?' কেউ হয়ত তখন শরৎচন্দ্রকে দেখে বলেছিল। শরৎচন্দ্র তখন তাকে বলতে পারেন নি, 'আমি জীবন খুঁজতে আসি।' সে কথা বললেও যে কেউ বুঝত না এবং পাগল ভাবত বলে বলেন নি।

আজ আমরা সেদিনের সেই শরৎচন্দ্রকে চিন্তা করতে পারি। মনের মধ্যে

ঘৃণা। কিন্তু বাইরে রূপ ও অরূপের মোহ। তরুণ শরৎচন্দ্র কোন বহুবল্লভার পাশে বসে আছেন। অনেক কথা তাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করছেন। বহুবল্লভা উত্তর দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে বলছে, 'তুমি কেমন ধারা ব্যাটা ছেলে গো, তখন থেকে শুধু বকর বকর করছ? কাজ কর, পয়সা দাও, চলে যাও। স্ফূর্তি করতে এসে এত কথার দরকার কি?'

শরৎচন্দ্র আর কথা বলতে পারেন নি, উঠে চলে এসেছিলেন। তখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে কি দেখা যেত, একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণার ও বেদনার চিহ্ন। ঐ মেয়েটা জানল না, তাদের ঘরে যে দেবতা এসে ফিরে গেল, সে যে তাদের ভাল করবার জন্যেই ছদ্মবেশে এসেছিল। এমনি ঘুরতে ঘুরতে রচিত হল দেবদাস।

আমাদের এই লেখাটা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা লেখক হলে নিশ্চয় এর অন্তর্নিহিত ভাব বুঝবেন। কিন্তু যাঁরা লেখক নন, শুধু পাঠক, তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ, লেখক সত্তার বিচার সহজ চিন্তায় করবেন না। শরৎচন্দ্র সেদিন যে সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, কজন সেই পথে গমন করে? কিন্তু শরৎচন্দ্র সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে একদিন আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করবেন, এ জানা কথা বলেই যেন ঈশ্বর তাঁকে ঐ সব স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওরে যারা অস্পৃশ্য, অশুচি তাদের কাছেই তো ভগবান বাস করেন। সব মানুষের ভেতর ভগবান আছেন। কিন্তু যার কেউ নেই, সেই তো ভগবানকে আগে পায়। শরৎচন্দ্র সেই ভগবানের সন্ধানেই পতিতার সংস্পর্শে গমন করেছিলেন। নারী চরিত্রের অন্তর্মুখী প্রকাশ তাঁর সেখান থেকে। আর কেউ এইভাবে পতিতালয়ে যান নি। গেছেন কিনা তার কোন লিখিত বিবরণ নেই। তাদের কথা থাক। শরৎচন্দ্রের মত লেখনী কার? মানুষের অন্তরাত্মার গভীরে ঢুকে অন্তরের প্রকাশ কার লেখনীতে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে? হয় নি বলেই তো এই শতবর্ষের সময়ে তাঁর মূল্যায়নে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে।

আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের লেখকের কথা জানি না। আর জানলেও তাদের লেখক জীবন পুষ্ট করার গোপন কাহিনী আমাদের জানা নেই। শুনেছি মোপাসাঁ এমনি ছিলেন। শিল্পী তাঁর ভাব প্রকাশের জন্য নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সে অভিজ্ঞতার নানাস্তর নানাভাবে গঠিত। শরৎচন্দ্রও নারীজীবন অন্বেষণে পতিতা মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন। সেই থেকে আমরা কি পেয়েছি? না, অনন্ত কিছু নারী চরিত্র। অনন্ত নারী কি পতিতালয়ে দেহব্যবসা করে? এ

কথা শুনলে হয়ত আপনারা মুচকে হেসে বলবেন, 'ভাল কথাই বলেছেন। অনন্যা নারীরাই পতিতালয়ে বাস করে।' আমরা বলব, 'কেন অনন্যারা বুঝি গৃহস্থ ঘরে বাস করে? পতিতারা অনন্যা নয়? নারী সত্তা বলে তাদের কিছু নেই? ওরা কি জন্মেই পতিতা হয়েছিল?'

একথা ঐ উনিশ বছরের যুবক শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করেন নি বলেই নারী জীবনের প্রকৃতি খুঁজতে ঐ সব জায়গায় গিয়েছিলেন। বাস্তব জীবনে নারী এ ব্যাপারে মুখ খোলে না। প্রকৃতি জানারও অনেক অসুবিধে। অন্তরঙ্গ হলে না হয় কিছু আশা করা যায়। কিন্তু তাতে মনের পুরো প্রশ্নের উত্তর মেলে না। সেই জন্যে পতিতা মাধ্যমটি শরৎচন্দ্রের কাছে খুব প্রিয় মনে হয়েছিল। অনেক সহজ উপায়ে নারীর অনেক স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সেই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবগুলি আমরা পর পর তাঁর লেখনীতে পেয়েছি। শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'আমি কখনও আগে গল্প ভাবিনি। আমার মনে প্রথম দোলা দিয়েছে চরিত্র।' সে চরিত্র যুবক শরৎচন্দ্র যে ঐ পতিতালয় থেকে পেয়েছিলেন আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তিনি প্রথম দিকের রচনায় বারাঙ্গনাকেই লেখার মধ্যে ঢুকিয়েছিলেন। দেবদাসের জীবনে দুজন নারী এসেছিল। পার্বতী ও চন্দ্রমুখী। বাল্যকালে শরৎচন্দ্র কোন বালিকার সঙ্গে ওঠা বসা করেছিলেন কিনা সেটা অনুমান করা যায় না। তাঁর জীবনীকাররা কেউই স্পষ্ট লিখতে পারেন নি, শরৎচন্দ্রের একটি খেলার সাথী ছিল। আমরা ধরে নিলাম তাঁর অচেতন মনে সেই সাথীটি ঘুরে বেড়াত। পাঠশালার পড়ুয়াদের মধ্যে তো বালক বালিকা দুই ছিল। পারু উঠে এল কোন বালিকার মধ্যে থেকে। কিম্বা এও বলা যায়, মনে মনে যে মেয়েটিকে শরৎচন্দ্র ভালবাসতেন, সেই পার্বতীরূপে কলমে ধরা দিল। আর স্বভাবটা ধরলেন বারবনিতালয়ের কোন মেয়ের ছায়া থেকে। পার্বতীর মত কোন মেয়ে সমাজ হারিয়ে ঐ পতিতালয়ে এসেছিল। মেয়েটি কেঁদে কেঁদে বলল, 'আমি যাকে ভালবাসতুম, বাড়ার লোকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল না। এক দোজবরে আমার স্বামী হল। সে খুব বড়লোক কিন্তু তার প্রথম পক্ষের অনেকগুলি ছেলে আছে। আর তারা সব আমার চেয়ে অনেক বড। আচ্ছা তুমিই বলো নাগর, ঐ শ্বশুরবাড়ী থাকতে কোন মেয়ের ভাল লাগে?'

শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, 'তারপর!' মেয়েটি বলল, 'তারপর আর কি? প্রেমিকের জন্যে মন পোড়ে। ছুটে ছুটে বাপের বাড়ী চলে যাই। আমার বিয়ে হতে ছেলেটির মনে খুব লেগেছিল। সে এত শান্তশিষ্ট ছেলে, হঠাৎ কেমন হয়ে

গেল। তারপর তার অনেক দুর্নাম শুনলাম। মদ খায়। বাইয়ের মেয়েছেলের সঙ্গে মেশে। একদিন তার দেখা পেয়ে, তার চেহারা দেখে আঁতকে উঠলাম। চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখে সে বলল, কি হল ময়না কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আমার জন্যে তোমার এই গতি। সে চুপ করে রইল। তারপর আমি শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ছাড়লাম। দ্বিজপদর মন ভাল করার জন্যে বাপের বাড়ী থেকে গেলাম। আর কি আশ্চর্য আমারও মন অসম্ভব ভাল হয়ে গেল।'

'কিন্তু এটা যে অসামাজিক ভালবাসা। বিবাহিত মেয়ে হয়ে প্রণয়ী আমার পর। দুর্নাম রটল। খবরটা শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েও পৌছল। স্বামী আমায় ত্যাগ করল। মনে মনে স্বস্তি পেলাম।'

'তখন দ্বিজপদকে বললাম, চল, আমরা কোথাও চলে যাই। দ্বিজপদ বলল, কোথায়? বললাম, যেখানে হোক। কিন্তু সে সাহস করল না। বাড়ীতেও টিকতে পারি না।'

'আমার এ কূল গেল ও কূল গেল। শ্বশুরবাড়ী যে থাকতে পারতাম না এ জানি। আর ঐ দোজবরে বর। এই বলে মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়ল। বুড়ো বরের পাশে শুতেই গা ঘিন ঘিন করে।'

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

মেয়েটি বলল 'কেন বোঝ না? আমার বুঝি কোন ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই?'

'তোমাদেরও বুঝি ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকে?'

'বাহ্ বেশ বললে তো কথা? আমরা বুঝি কাঠের পুতুল।'

শরৎচন্দ্র এমন কোন গল্প কি বারাঙ্গনা ভবন থেকে পান নি? আমরা বলব পেয়েছেন, কারণ পদস্খলনের ইতিহাস তো ওখান থেকেই পাওয়া। নানা ধরণের পদস্খলন। সবই সমাজের রক্তচক্ষুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একদিন শরৎচন্দ্র যখন ভেবেছিলেন, কি লিখব? তার যেন জবাব পেয়ে গেলেন। মনে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার ধরণ। সেখানেও নারীরা প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও রোমান্সকে আশ্রয় করেছিলেন। নারী পুরুষের ভালবাসাই সমাজে মঙ্গল ঘটাতে পারে। শরৎচন্দ্রও সেই ভালবাসা চাইলেন কিন্তু সংঘাত এড়ালেন না। পদস্খলন হলে যে সব মেয়েরা পতিতালয়ে জায়গা পায়, তাদের বেদনা যেন তাঁর মধ্যে নতুন রূপ দান করল। সূর্যাস্তের পরে যেমন চন্দ্রের আবির্ভাব হয়, তেমনি চন্দ্রের সুষমার সন্ধানে তাঁর লেখনী হল অগ্রগামী। দেবদাসের মধ্যে পাই যেমন কিশোর জীবনের প্রেম। কিশোর কিশোরী বাল্যসখ্য ভুলে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হল,

তার মধ্যে প্রেমের বীজ লক্ষ্য করলেন। বঙ্কিমের প্রেমিক প্রেমিকা সোজাভাবে এত কথা বলে নি কিন্তু শরতের প্রেমিক প্রেমিকারা যেন পাকা হয়ে তাদের প্রয়োজন প্রকাশ করেছে। পার্বতীর মত কিশোরী মেয়ে তার সখীকে বলতে ছাড়ে নি, 'আমার নিজের জিনিসটিকে আমি নিয়ে যাব না?' সখী মনোরমা সংস্কার হারায় নি। সে অবাক হয়েছে। সে ভয় পেয়েছে কিন্তু পার্বতী নির্ভয়। এই পার্বতী চরিত্রটি কি শরৎচন্দ্র বারাঙ্গনা ভবন থেকে পান নি? অমনি চোখা চোখা কথা কি তিনি সেখান থেকে শোনেন নি? আমরা বলব যে বয়েসে তাঁর এই লেখা, তখন তিনি এদের কাছেই যাতায়াত করেছেন। পার্বতী, চন্দ্রমুখী ছুটি চরিত্র দেবদাস আখ্যানভাগে। একজন গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, একজন বারবনিতা। চন্দ্রমুখীর অতীত তিনি জানান নি। জানানোর দরকার মনে করেন নি। চন্দ্রমুখীকে দেখে দেবদাসের ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল। এ কি তাঁর মনের কথা নয়? জীবিত অবস্থায় এসব কথা তিনি গল্পচ্ছলেও কাউকে বলেন নি। বলতে যে দ্বিধা এসেছে সেই স্বাভাবিক। আজও অনেকে বলে না। কারণ যাদের আমরা পতিত বলেছি তারা ঘৃণ্য কিন্তু মনে মনে যে তাদেরই তিনি মানুষ বলেছিলেন সে বোঝা যায়। ভালবাসার জন্যেই যে নারী পতিতালয়ে আসে সে তিনি দেখেছিলেন। কটা মেয়ে অন্নবস্ত্রের ছুঃখের জন্যে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে? নারী সে তো জানে সম্ভ্রম হারালে তার আর সমাজে বাস করা হবে না? সেইজন্যে তার সর্বদাই ভয় থাকে। সম্ভ্রম বাঁচাবার চেষ্টা সেইজন্যে অদম্য। সে কি অন্নবস্ত্রের ছুঃখে এত বড় মূল্য দান করতে পারে? শরৎচন্দ্র সে সময়ে দেখেছিলেন, অন্নবস্ত্রের ছুঃখের চেয়ে নারী ভালবাসায় কাঙাল হয়ে ঘর ছাড়ে। কেউ ফুঁসলে নিয়ে এসে ভোগ করে এখানে রেখে যায়। কেউ সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসে। তাদের বিরুদ্ধে বিবিধ কারণ। অপছন্দের স্বামী ছিল বলে তারা অন্য মনে বাসা বেঁধেছিল। কিম্বা বৃদ্ধ স্বামী দোজবরে, লম্পট, বিয়ে করে অন্য নারী নিয়ে থাকে। তারপর গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। এ সব কথা সধবাদের স্বপক্ষে। বিধবা নারী খুব একটা পতিতালয়ে আসে না। এ কথা আমরা শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পরে জেনেছি। কিন্তু তিনি বিধবাদের হৃদয় যন্ত্রণাকে অবলম্বন করে প্রচুর উপন্যাস লিখেছিলেন। তাদের দেখা তিনি পতিতালয়ে পান নি। সে অভিজ্ঞতা তাঁর সমাজের মধ্যে থেকে হয়েছিল, তাও আগে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই যে নারী পতিতালয়ে এসে দেহ ব্যবসা শুরু করে, তাদের মানসিক কি যন্ত্রণা, সে তিনি বেশ উপলব্ধি

করেছিলেন। ছোটবেলায় ছিল একটু অন্য ধারণা, নারী জৈবিক ক্ষুধায় তাড়িত হয়ে ঘর ছাড়ে। সংসারে অর্থের অপ্রাচুর্য দেখে রূপসী মেয়ে কারও দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এসে বারাঙ্গনালয়ে ওঠে। তারপর সে সুখই পায় কারণ নিত্যনতুন লোক আর অর্থ তাকে অন্ধ করে দেয়। আমরা দেবদাসের মধ্যে চন্দ্রমুখীকে সেইভাবেই পেয়েছি। চন্দ্রমুখী রূপসী সুন্দরী। নিঃসন্দেহে পার্বতীর চেয়ে সুন্দরী কিন্তু দেবদাস প্রথমে তাকে দেখে ঘৃণা না করে পারে নি। আমরা সেই বয়েসের শরৎচন্দ্রকে এই ভাবে কল্পনা করতে পারি। তিনি ঐ পতিতালয়ে লক্ষ বাসরের রূপসী নারীর পাশে চুপ করে বসে আছেন। পাশে রূপসী, সুন্দরী, যৌবনবতী নারী কিন্তু মনে পুলক জাগলেও মন বলছে 'ও বহু ব্যবহারে কলঙ্কিত, ওকে ছুঁতেও ঘৃণা হয়।' হঠাৎ হয়ত শরৎচন্দ্র বলে ফেললেন, 'তোমাকে আমি ভালবাসি'। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, 'ভালবাসেন আমাকে? ভালবেসে আপনার কি হবে? আমরা পতিতা মেয়ে, কে আমাদের ভালবাসবে বলুন।' মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র অবাক হয়ে গেলেন, মেয়েটি কাঁদছে। তার সুন্দর আয়ত দুটি চোখের কাজল গড়িয়ে জল নেমে আসছে গাল বেয়ে।

শরৎচন্দ্র দেবদাসে লিখলেন চন্দ্রমুখীর চরিত্র। প্রথমে প্রচণ্ড ঘৃণা। ছুঁড়ে ফেলে দিল দেবদাস তাকে। টাকা দিয়ে ছুঁড়ে মারল মেয়েটির ক্লেদাক্ত যৌবনে। একেবারে অভিনব একটি পুরুষ চরিত্র। এমন মানুষরা কখনও আসে না বারাঙ্গনালয়ে। বনিতা চমকে উঠল। তারপরই জন্ম নিল ভালবাসা। আমরা এ জায়গায় কিছু অপ্রিয় কথা বলব, বারাঙ্গনা মেয়ে কি কাউকে ভালবাসে? ওরা তো একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে একজন মানুষ চায় কিন্তু ভালবাসা কি আর থাকে? ভালবাসা তো বারনারী হবার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে বিদায় নেয়। তবে অবশ্য এও বলা যায়, স্বভাব তো সব নারীর সমান নয়। অল্পবয়সী মেয়েরা যারা আশাবাদী, তারা ভালবাসার রংমশাল জেলে কোন কোন সময়ে কারও প্ররোচনায় এখান থেকে পালায় কিন্তু চন্দ্রমুখী অল্পবয়সী মেয়ে ছিল না। যাই হোক শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারায় ভালবাসা জন্ম নিল। চন্দ্রমুখী চুনিলালকে বলল, 'ওকে একটিবার এনে দাও।' চুনিলাল জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?' চন্দ্রমুখী বলল, 'আমি মরেছি।' এই যে মৃত্যু এ নারীর প্রেম। এ প্রেমের জন্ম হয়েছিল তখন শরৎচন্দ্রের মনে। তখন তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, নারী ভালবাসলে সে ভালবাসা

তারা অক্ষয় করে রাখে, তাহলে বারাঙ্গনা মেয়ে ভালবাসবে না কেন? দেবদাসকে ভালবাসা যায়, দেবদাসের মধ্যে যে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল, সে বেপরোয়া স্বভাবের পুরুষ কম দেখা দেখা যায়। ঘৃণা থেকেই' যে ভালবাসার জন্ম, সেটা স্রষ্টার মনে খেলা করেছিল। দেবদাস মদ খেয়ে বেচপ হয়েছে। চন্দ্রমুখী বাধা দিতে গেছে কিন্তু উত্তর যা শুনেছে চরম। 'মদ না খেলে তোমাদের এখানে আসা যায়?' চন্দ্রমুখী বলেছে 'অনেকেই তো আসে।' দেবদাস বলেছে, 'তারা কি আমি জানি না।' সেই চন্দ্রমুখী এই লোকটির জন্যে তার সাধের লোভের বেসাতি ত্যাগ করেছে। কৃচ্ছ সাধনের মধ্যে জীবন কাটানোর জন্যে এ অঞ্চল থেকে চলে যেতে চেয়েছে। দেবদাস দেখে অবাক, একজন বারবনিতা ভালবাসতে পারে এ যেন তার কাছে অজ্ঞাত। শরৎচন্দ্রের মহত্ব এইখানে। পতিতা নারীর ভেতরের কান্নাকে বাইরে বের করে তাকে সমাজে আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছেন।

একবার ভাবুন শরৎচন্দ্রের বয়স তখন কত ছিল? আপনি আমি যে চিন্তাধারা নিয়ে পতিতাদের বিষয়ে ভাবি, তাঁর চিন্তা ছিল অন্য। অবশ্য এ কথা বলা যায়, চন্দ্রমুখীর মত কি সব মেয়ে? কিন্তু চন্দ্রমুখীর মত মেয়ে পতিতালয়ে নেই এ কথাও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়? তিনি তাদের সমাজে আবার পুনঃস্থাপিত করবার জন্যে যে কৌশল নিয়েছিলেন, আমরা সে কথা কি একবারও ভেবেছি? চন্দ্রমুখী একটি ভাল চরিত্র। পতিতা হলেও দেবদাসকে খুব ভালবেসেছিল। এই কথা বলে আমরা দায়মুক্ত হতে পারি। কিন্তু স্রষ্টা চন্দ্রমুখীকে সৃষ্টি করে সমাজকে কি বলতে চেয়েছিলেন? না, পতিতা হলেও নারী যে তার নারীত্ব বিসর্জন দেয় না, কারও না কারও মধ্যে তার প্রাণ খুঁজে পায় এবং সে তখন সর্বস্ব দান করে আবার ভালবাসে এই ছিল তাঁর অন্তর্নিহিত ভাব কিন্তু আমরা পড়ার জন্যে পড়ে চন্দ্রমুখীকে আর মনে রাখি না। কারণ সে যে পতিতা। এই ঘৃণা সেদিনও উদ্‌গীরণ হয়েছিল, আজও হয়। পতিতারা ঘৃণ্য। তাদের কাছে আমরা যাই বটে কিন্তু ভালবাসার কথা মনেই আসে না। কেন? ওদের বহু ব্যবহারের দেহ কি কোন পূজায় লাগে? সত্যি কথা, 'কিন্তু তুমি যাও কেন?' 'না, একটা মোহের ঘোরে। অতিরিক্ত যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে।' অর্থাৎ তোমার প্রয়োজন মেটাতে। কিন্তু একটা কথা কেন ভোলা হয়, এই পতিতালয়েই তো কত চন্দ্রমুখী বাস করে। ওদের তোমার উদার মনের ভালবাসা পাওয়ার কি অধিকার নেই? শরৎচন্দ্র বহু

বছর আগে দেবদাস লিখেছিলেন। তখনকার সমাজ আর আজকের সমাজ এক নয়। বহু অন্তর্বিপ্লবের পর আজ সমাজ অনেক উদার হয়েছে। সেই উদারতা দিয়ে কি কোন মেয়ের পদস্খলনকে আমরা মেনে নিতে পারি না? অবশ্য এ কথা সত্যি, নারীর দেহের মধ্যে যে মালিন্য সৃষ্টি হয়, যত বড় সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিই হোক, তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হবেই কিন্তু দেহের ময়লা তো মনের মাধুর্যেই ধুয়ে যায়। এমন করে নারী যদি নিবিড় করে ভালবাসা জানায়, তার ঐ নোংরা জীবন কি ভোলা যায় না? আমরা তো দেখেছি কত শত নারী বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে। তার যন্ত্রণা যেন মুখে ফুটে ওঠে। সে হাসে বটে কিন্তু সে হাসি স্বতঃস্ফূর্ত নয়। একটু নাড়া দিলে বা ভাল কথা বললে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে মনের ব্যথা। এমনও অনেক মেয়ে বলে, 'আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমি এসেছি এখানে ছ'মাস কিন্তু কোন লোককে আমি কাছে ঘেঁষতে দিই নি।' 'কেন?' মেয়েটি দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে আঙ্গুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বলে, 'কেমন যেন ভাল লাগে না।'

'কিন্তু এসব না করলে তো তোমার আহার জুটবে না?'

'তাই তো ভাবছি।' হঠাৎ যদি সেই মেয়েটি আপনাকে বলে, 'আপনি আমায় এখান থেকে নিয়ে যাবেন? আমাকে আপনি বিয়ে করবেন?'

মেয়েটির কথা শুনে আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে? আপনি নয় তাকে যা-তা বলবেন। কিম্বা রেগে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যাবেন। এমনি কথা কি পতিতালয়ে গিয়ে কখনও শোনেন নি? শুনে না থাকলে শোনা বিচিত্র নয়। শুনলে আপনার ব্যবহার ঐ আগেই উক্ত করা হয়েছে কিন্তু আপনি রেগে পালিয়ে এলেন কেন? না, পতিতা মেয়েকে বিয়ে করার কোন ইচ্ছে আপনার নেই। যদি বলি যাকে বিয়ে করছেন, সে নিষ্পাপ কিনা খোঁজ নিয়েছেন? আপনি সাফাই গেয়ে বললেন, 'কি বললেন, এমন কথা মুখে আনবেন না।' রগচটা হলে, হয়ত ঠাস করে একটা চড়ই কষিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি বলব, পতিতা মেয়ের কাতরতা দেখে পালিয়ে এলেন কিন্তু যাকে বিয়ে করছেন সে অনাঘ্রাতা কুসুম এই কি আপনার ধারণা। তাহলে কিছু তত্ত্বকথা শোনাতে হয় আপনার ভাবিকালের বধূ সম্পর্কে। আশা করি রাগ করবেন না। সত্য কথা স্পষ্ট করে বলাই ভাল। প্রথম তার বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যখন শরীরে পরিবর্তন এল, দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বা নিকট আত্মীয়

কোন পুরুষের সহযোগিতায় তার দেহ মালিন্য শুরু হল। দেহে বিষ প্রবেশ করল আরও পরে। সে হয়ত ভালবাসার অভিনয় করে দেহ অপবিত্র করে ফেলল। মেয়েটি মনে মনে কিছুদিন শঙ্কিত রইল। তারপর গর্ভসঞ্চারের ভয় অপসারিত হলে মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল! এই গর্ভসঞ্চারের ভয়টাই মেয়েদের ভাবায় বেশি। কিন্তু সে ভয় না থাকলে আর অনাচারের দোষ কি? তারপর আরও হয়ত অনেকের ভালবাসার মোহে পড়ে দেহ কলুষিত হল। একদিন আপনার সঙ্গে যখন বিয়ে হল, আপনি ভাবলেন আপনার চেয়ে সুখী কজন? তাই বলছি, অত সাফাই গেয়ে পতিতা মেয়েদের তুচ্ছ করবেন না। অবশ্য এসব কথা বলা হল একটা যুক্তিকে খাড়া করবার জন্যে। তবে এ যে হয় না এ কথা তো বলা যায় না। স্বাভাবিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে এই সত্যি। আপনি হয়ত বলবেন, জেনে শুনে কি ঐ সব মেয়েদের বিয়ে করা যায়? কেন দেবদাস ভাল বাসেনি? দেবদাস তো ওর ভালবাসায় পার্বতীর ভালবাসাও ভুলেছিল। তাহলে আপনি যে দাম্পত্য প্রেমের এত সাফাই গাইছেন, তার চেয়ে এ কি খারাপ হবে? বরং এই তো বলা যায়, দাগ পড়া মেয়ের ভালবাসায় আপনার সংসারমন্দির যত সুখের হবে, ঐ গোপন ভদ্র মেয়ের ভালবাসায় তত হবে না কারণ সে মাথা তোলে, এ মাথা তোলে না। আমরা শরৎচন্দ্রের বারবনিতা প্রসঙ্গ বলতে বসেছি। এ সব কথা তার সঙ্গে এসে গেল বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এই কারণে, শরৎচন্দ্র তো পুরোনো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ চেয়েছিলেন। রচনা তারই অন্তর্গত। উদ্দেশ্যহীনভাবে তো গল্প সৃষ্টি করেন নি। সমাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, *সমাজ তুমি যে ধারায় জীবনগুলি নিয়ে যাচ্ছ* তাতে মানবাত্মা কেঁদে কেঁদে তোমার অগ্রগতির পথই রুদ্ধ করে দিচ্ছে, তাকে মুক্তি দাও, উদার হও, নতুন সমাজ এসে মানুষের মনে আনন্দের *বন্যা বইয়ে দেবে। পৃথিবীতে মানুষ* আসে কি জন্যে, শুধু কি কাঁদতে না তার জীবন ভোগ করতে? সেই ভোগের জন্যে যে সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, সে না সরিয়ে দিলে মানুষ এই পৃথিবীতে কি সুখে বাস করবে? শরৎচন্দ্রের এ আশ্বাসবাণী সমাজের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল কিনা জানি না। তবে বিপ্লব যে রোখা যায় নি, সে আজ সর্বত্র তাকিয়ে দেখা যায়। তবু শরৎচন্দ্রের বারবনিতারা সমাজে স্থান পায় নি। তাঁর কারুণ্য [illegible] করে নি। ঘৃণ্যরা ঘৃণ্য দেশেই রয়ে গেছে। শুধু তাঁর [illegible] হয়েছে। লেখাটি ভাল। বেশ্যার মেয়ের প্রেম বেশ [illegible] এই কথা শোনার জন্যে কি শরৎচন্দ্র এত

চিন্তা করে বারবনিতা প্রসঙ্গ এনেছিলেন? আজ এত বছর পরে লেখকের চিন্তাধারার আসল উদ্দেশ্য খতিয়ান করে মনে ব্যথাই জাগে। এই সনাতন দেশ সনাতনী ধর্মকে বজায় রাখবার চেষ্টায় মানবাত্মাকে শুধু দলিতই করে যাচ্ছে। উদারতার মেকি আস্ফালন আছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সুদূরাভিসারী।

অনেকে অবশ্য এসব প্রসঙ্গ উঠলে বলেন, শরৎচন্দ্রের অপরিণত বয়েসের রচনা। বারবনিতা তাঁর তরুণ মনের উচ্ছ্বাস। তাদের নিয়ে আমাদের কোন ভাবনা আসে না কিন্তু তাই যদি হয় পরিণত বয়েসে তিনি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা, সাবিত্রী, অচলা, কিরণময়ী, জ্ঞানদা, কমল, সবিতা, সারদা—প্রভৃতি মেয়েদের কেমন করে আঁকলেন? আরও যাঁরা উন্নাসিক তাঁরা বলেন, লেখকের শিক্ষাধারা নিচুগামী ছিল বলে সেইজন্যে তাঁর চিন্তাধারাও নিচু পথে গমন করেছিল। তাই যদি হয়, তাহলে তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে জনপ্রিয় হয়ে আছেন কেন? লেখার মধ্যে নিশ্চয় এমনিই একটি আন্তরিক সুর আছে যা জনপ্রিয়তার উর্ধ্বে তাঁকে এখনও রেখে দিয়েছে। চাই কি আরও কতকাল তিনি জনপ্রিয় থাকবেন কেউ জানে না। আর এরও আসল রহস্য, মানুষের অন্তরের এমন জায়গায় গিয়ে তিনি বসে আছেন, যা অল্প কথায় শেষ করা যায় না। যেমন ক্লাসিক গানের রীতিই হল, তান, লয়, বিস্তার করতে করতে গভীরে পৌঁছে যাওয়া, তেমনি ক্লাসিক সাহিত্যের রীতিই হল, যুগ থেকে যুগান্তরে তার বিচরণ। সে কখনও পুরোনো হবে না। বৃত্তের আকারে যেমন জন্ম, মৃত্যু আবার জন্ম, তেমনি নতুন মানুষ আসছে যাচ্ছে কিন্তু তারা চিরায়ত সাহিত্যের সেই রচিত মানুষগুলির সঙ্গে আপন সত্তা মিলিয়ে নিজেরই ছবি দেখতে পাচ্ছে। সে বহুকাল আগে ঘটে যায় নি। আজও ঘটমান বর্তমান তার অস্তিত্ব। তারও কারণ সম্পূর্ণ এই সত্যের মধ্যে যে, তিনি মানুষের হৃদয়ের বেদনায় এমন জায়গাটি ধরে টান দিয়েছিলেন, যে সে বেদনা দিনের পর দিন মানুষের হৃদয়ের ভেতরেই আসন নিয়ে আছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি দেখতে দেখতে নারী পুরুষ উভয়েই নিজেদের চরিত্র দেখতে পায়। আমরা চন্দ্রনাথের সরযূকে বিস্মৃত হই নি।

সে সময়ে তিনি কি সরযূকে বারাঙ্গনালয়ে দেখেন নি? আমরা বলব, সরযূ তাঁর পাশে বসে চোখের জলে ভেসেছে। তিনি তার বয়স, চেহারা, সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তারপর কথা শুনতে শুনতে আরও মুগ্ধ। শুনলেন সে নিষ্পাপ কিন্তু তার এখানে আসার কারণ, মায়ের পাপ। মা সংসারে পাপকে

ডেকে নিয়ে এসেছে। এক দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় মুগ্ধ হয়ে ঘর ছেড়েছে কিন্তু সেই লোকের সান্নিধ্যেও সুখ পায় নি। অগত্যা রাঁধুনিবৃত্তি নিয়ে কৃচ্ছসাধনের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। তারপর সরযূ বড় হল কিন্তু ওর বিয়ে দিতে গিয়ে মা ধরা পড়ে গেল। সরযূ মায়ের পাপের কাহিনী সব জানত না, জানতে পেরে সে আর সভ্য সমাজে থাকে নি, এখানে চলে এসেছে।

শরৎচন্দ্র কি তখন সেই মেয়েটির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নি? মায়ের পাপে মেয়েও সমাজ পরিত্যক্তা হয়, এ যেন তাঁকে অবাক করে ছিল। তারপর রচিত হল চন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি সরযুকে সমাজ পরিত্যক্তা করলেন না। সমাজেই ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। আর চন্দ্রনাথের খুড়োর মুখ দিয়ে বলালেন, 'সমাজ মানে কি আমি তুমি। আমার টাকা আছে, সুতরাং সমাজও আমার করায়ত্ত।' সে যুগে চন্দ্রনাথের খুড়ো যে কথা বলেছিলেন, সে কথা কি আজকের কথা নয়? আসল তো আপনার আমার মন। মনের জীর্ণ সংস্কারগুলিকে বিদায় দিলেই তো মনের উদারতাগুলি ফুলের পাপড়ির মত দল মেলে। বহু ব্যবহারে যা পুরোনো হয়ে গেছে, তাকে ত্যাগ করাই কি আমাদের উচিত নয়! সমাজকে নতুন পথ দেখালেই তো সমাজ ধীরে ধীরে পুরোনোকে বর্জন করবে। আর যারা প্রাচীন তারা খেদোক্তি করবে। কানে না নিলেই হবে।

'শুভদা'ও স্রষ্টার সেই সময়ের রচনা। বহু চরিত্রের সমাবেশ সেখানে আছে। ললনা ছলনা। 'দুটি নামই যেন সেই তাদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।' এ উক্তি শুভদার ঠাকুরঝি রাসমণির। তবে শুভদার ঠাকুরঝির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল কারণ ললনা সেই পথেই এগিয়েছিল। ললনা কেন এগিয়েছিল? সেই নিয়ে শরৎবাবু এক দীর্ঘ কাহিনী ফেঁদেছেন। হারাণ মুখুজ্যে যে ধরণের মানুষ, সংসার করে সংসারের দায়িত্ব বহন করে না, এমন চরিত্র আজও দুর্লভ নয়। কিন্তু শুভদার পতিভক্তি একটু অন্য ধরণের। স্ত্রীর স্বামী ছাড়া গতি নেই বলেই কি স্ত্রী নির্বিবাদে এইভাবে স্বামীকে ক্ষমা করে? নারী জীবনের দুর্লভ চরিত্র নিঃসন্দেহে কিন্তু বড়ই পীড়াদায়ক মনে হয়। হারাণ শুধু স্ত্রীকেই পীড়া দেয় না, আমাদেরও সহিষ্ণুতা কেড়ে নেয়। ওকে যেন স্বীকার করতে মনে বাধে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট এই চরিত্র তৎকালীন পুরুষজাতির নির্মম অত্যাচারকেই মনে করিয়ে দেয়। সত্যিই কি এমনি অসম্ভব বদ স্বভাবের লম্পট, মদ্যপ, তাড়িখোর, চোর, বেশ্যাসক্ত মানুষ ছিল? না থাকলে আর সেই অনন্য শিল্পী আঁকবেন কেন? তবে মনে হয় বড় বেশী রঙ চালা হয়ে গেছে। মাত্রাধিক্য

তার চরিত্রের বয়ান। মনুষ্য চরিত্র ক্ষেত্র বিশেষে নির্মম হয় কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে করুণার পাত্র কি এতটুকু থাকে না? মাঝে মাঝে দেখা গেছে হারাণ ভাল হয়ে গেছে কিন্তু সে ভাল ঐ ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলার গোড়াপত্তন। শুভদাও যে বোঝে নি তা নয় কিন্তু সে নির্বাকই থেকেছে। নারী জীবনের এই নিরুত্তর সহনশীলতা, এ যেন নারীকেই মানায়। শুভদার বুঝি তু... হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যায়। শুভদার মতই মেয়েটি সহনশীলা। খবরের কাগজে সাংবাদিক ক... খবরটি ছাপা হয়েছিল। গরীব ঘরের মেয়ে তৃপ্তি। স্বামী নিতীশের সংসারে তার ভূমিকা অনন্যা। দুটি সন্তানও তাদের হয়েছিল। ওরা এক গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। গুরু তন্ত্রসাধনা করে। নিতীশের হঠাৎ মাথায় চাপল সে তন্ত্রসাধনা করবে। গুরুকে সে কথা বললো। গুরু বলল, 'এখন নয় পরে।' কিন্তু নিতীশের সে কথা ভাল লাগল না। নিতীশ ...র সন্ধানে থাকল। এক ভণ্ড গুরুর সাক্ষাৎ পেল। গুরু বলল, 'মন্ত্র দিতে পারি কিন্তু তোমার স্ত্রী এসে আমার উরুর ওপর নগ্ন হয়ে বসবে, আর ভৈরবী হয়ে বসে বসে মদ খাবে। নিতীশ গিয়ে তার স্ত্রীকে বললো কিন্তু তৃপ্তি মাথা নেড়ে জানাল অসম্ভব। নিতীশ তবু চাপ দিতে লাগল কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই স্বীকার করল না। এই নিয়ে ওদের মধ্যে খুব মন কষাকষি হল। নিতীশ গিয়ে সে কথা ভণ্ড গুরুকে বললো।

গুরুদেব তাকে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা দিয়ে দিল। এখন পঞ্চমুণ্ডীর ওপর সাধনা করতে হবে। পাঁচটা মুণ্ড চাই নিতীশের। সে বেড়াল, পেঁচা, বাঁদর, ব্যাঙ ইত্যাদির মুণ্ড যোগাড় করল কিন্তু নর মুণ্ড কোথায় পাবে? স্ত্রীর ওপর অত্যাচার শুরু করল। মার ধোর চলতে লাগল। একদিন হাত পা জানলার সঙ্গে বেঁধে তার চোখ দুটি অন্ধ করে দিল। ডাক্তার দেখে রায় দিল, অ্যাসিড দিয়ে চোখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি পুলিশে খবর দিলেন না। তৃপ্তি চোখে গগলস দিয়ে ঘোরে কিন্তু পাড়া-পড়শীরা কেমন সন্দেহ করে। নিতীশের অত্যাচারের কথা তো তাদের অজানা ছিল না। নিতীশকে তারা ধরল। কিন্তু নিতীশ পালিয়ে গেল। পরে অবশ্য পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করে। এ ঘটনা শরৎচন্দ্রের কালে ঘটে নি। এই বিংশ শতাব্দীতে। এখনও স্ত্রীর ওপর স্বামীর অকথ্য অত্যাচারের তুলনা হয় না কিন্তু স্ত্রী নির্বিবাদে তা সহ্য করে যায়। এই প্রসঙ্গ উত্থাপনে এইটুকু বলা যায়, শরৎচন্দ্রের হারাণ চরিত্র এতটুকু বেমানান হয় নি। আর নারীর সহনশীলতা যুগে যুগে একই ধারায় একই রূপে প্রকাশ হয়ে এসেছে।

হারাণের জন্যেই তো শুভদার পরিবারে ভাঙন। সেই ভাঙনে শুভদা কত সহ্য করেছে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন কিন্তু ললনার জীবন তাতে প্রবোধ মানে নি। সে একটি যুবতী সুন্দরী নারী, তার আশা আকাঙ্খা জলাঞ্জলি গেছে কারণ সে বিধবা কিন্তু যৌবনের কান্না তো সে সংযত করতে পারে নি। একদিকে পিতৃ সংসারের অভাব, অন্য দিকে দুস্তর মরুভূমির মত আশাহীন ভবিষ্যৎ। ললনা পালিয়ে গেল। পলায়নে সে আত্মহত্যা করতে চায়নি, চেয়েছিল কলকাতায় গিয়ে দেহ ব্যবসা করতে। ভাগ্য দোষে জমিদার সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়ে গেল।

ললনার যে গল্প তিনি ফেঁদেছেন, আমরা যদি বলি তিনি ললনার দেখা বারবনিতালয়ে পেয়েছিলেন, তাহলে কি কথাটা অত্যুক্তি হবে? ললনার মত রূপসী সুন্দরী যৌবনবতী নারী তাঁর পাশে বসে তাঁকে তার দুঃখের কথা শুনিয়ে গেছে। ললনা যে কলকাতায় এসে দেহ ব্যবসা শুরু করে টাকা উপার্জন করতে চেয়েছিল সে কথা তো তাঁর বর্ণনায় পেয়েছি। ধরুন সেই ললনার মত কোন অসামান্য সুন্দরী চিৎপুর রোডে একটা বিরাট বড় বাড়ী ভাড়া করে গেটে দরওয়ান রেখে ব্যবসা করত। সেখানে যারা আসত তারা ঐ সুরেন্দ্রনাথের মতই ধনী। শরৎচন্দ্র সুযোগ করে সেই বাড়ীতে ঢুকেছেন। পরিচিত হয়েছেন ললনার সঙ্গে। একদিন দেখেছেন নারীর সস্তা বেসাতি। চন্দ্রমুখীও রূপবতী, তারও দৌলত কম ছিল না কিন্তু তার ঘরের অতিথি ললনার উঁচুমানের সঙ্গে মেলে না। এই মানসিকতার ওপর নির্ভর করে দরওয়ানের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তিনি ললনার কাছ পর্যন্ত এগোলেন। কিন্তু গিয়ে কি দেখলেন? দেখলেন যেন রাজকন্যা বসে আছে স্বল্পবসনে অসামান্য রূপের জৌলুস নিয়ে এক রত্নখচিত সিংহাসনে। যেন মনে হয় উর্বশী বা মেনকা ইন্দ্রের রাজসভায় নৃত্য সেরে পালঙ্কে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ললনা চিনতে পারল তার স্রষ্টাকে। স্রষ্টাকে ইসারায় ডেকে পাশে বসিয়ে তার হৃদয় যন্ত্রণার ইতিহাস খুলে ধরল। শরৎচন্দ্র এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ললনাকে সেই চিৎপুর নিবাসিনী করেন নি। জমিদার সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র উপপত্নী করে তারই মালিকানায় রেখে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের ললনার একটা গতি হল কিন্তু যে ললনারা এ সুযোগ পায় না? জয়াবতীর মত ভাগ্যহীনা মেয়েকেও তো দেখা গেছে? পুরুষের রূপমুগ্ধ হলে নারী নিজের প্রয়োজন চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু তারা জানে না কতদিন এ রূপ মুগ্ধ করবে তার কোন স্থিরতা নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি পারে সে গুছিয়ে নিতে থাকে। ললনার পাশে জয়াবতীর সমস্যাও যেন শরৎচন্দ্রের মনে ঝলকে উঠেছিল। আমরাও দেখেছি এই সব দেহ

বিলাসিনী নারী কত দ্রুত আখের গুছিয়ে নেবার জন্যে তৎপর হয়। একটা দিনও তারা বৃথা যেতে দেয় না, কারণ রূপ তো চিরকাল পুরুষের মনে আকর্ষণ জাগাবে না। আর নারীর রূপও দীর্ঘস্থায়ী নয়। দেহ ব্যবসায়ী নারীর ভবিষ্যৎ তাই রূপ ও রূপোর সঙ্গে যুক্ত। রূপ চলে গেলে রূপো নিয়ে সে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে। তাই বারাঙ্গনালয়ের অভিজ্ঞারা নতুনদের বলে, 'ওরে যত পারিস্ এই বেলা জমিয়ে নে। এ রূপও থাকবে না, এ যৌবনও থাকবে না।' তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা যে পতিতাদেব নিয়ে আলোচনা করছি, তাদের জীবন কত অনিশ্চতার মধ্যে ধরা। একটি পুরুষও জীবনে পাশে থাকে না, যে তাকে ভবিষ্যতে দেখবে। তাই যখন তাদের ব্যবহার নিয়ে আমরা আলোচনা করি, তখন অনেক তাত্ত্বিক আলোচনার তুফান ওঠে। 'মেয়েগুলি একেবারে যা-তা! অর্থের দিকে বেজায় ঝোঁক। কোন আনন্দ দেয় না। যেন পকেট থেকে ছিনিয়ে নেবার তালে থাকে।' এ সব কথাগুলি যে একেবারে অযৌক্তিক নয় আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। জয়াবতী ললনা আসার পর তার অবস্থাটা বুঝেছিল। প্রথমত তার ভালবাসা, দ্বিতীয়ত সুরেন্দ্রনাথের অবহেলা। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, জয়াবতী আত্মহত্যা করতে সুরেন্দ্রনাথ মর্মাহত হয়েছিল। কিন্তু তাই কি কেউ হয়? জয়াবতীর প্রতি লেখকের মমতাই বুঝি সুরেন্দ্রনাথের মনে শোকের দুর্ভাবনা জাগিয়েছিল। জয়াবতী তো সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী নয়। স্ত্রী হলেও জয়াবতী কি ললনার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত? ভালবাসার রেষারেষিতে নারী চিরকালই তার অবস্থাটা বুঝতে পারে। ললনাকে বিয়ে করতে চাওয়াও সুরেন্দ্রনাথের মহত্ব কিন্তু ললনা রাজী হয় নি কারণ তার মনে সংস্কার। নারী সামাজিক স্বীকৃতি তখনই চায়, যখন তার চরিত্র নির্মল। এসব দিক দিয়ে নারীকে সুন্দরই বলা যায়। কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। ললনা বিয়ে করলে তো তার পূর্বপ্রণয়ী শারদা বা সনাতনকে করতে পারত কিন্তু বিয়ে করা তো তার জীবনে নেই কারণ সে বিধবা। এই যে নারী মনের সংস্কার গোপন করে কিছু করতে চায় না, এটা শরৎচন্দ্র এই নারী মন পর্যালোচনা করেই পেয়েছেন। এদের মহত্বের সন্ধান আমরা করি না, শুধু দোষ খুঁজে বেড়াই কিন্তু নারী পুরুষের স্বভাব আলোচনা করলে দেখা যায়, নারীর স্বভাব পুরুষের চেয়ে অনেক নির্মল। আপনি একটি চোর ডাকাত, বদমাস খুনী নারী পাবেন না, যদি পান তাহলে তার সঙ্গে পুরুষের যোগ আছে ধরে নিতে হবে। পুরুষই তাকে ছলেবলে কৌশলে এ পথে নামিয়েছে। বিড়ম্বিত নারীর উপায়

নেই দেখে সে এই পথে নেমেছে। ধরা পড়ার পর তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, 'তুমি এ পথে কেন এলে ?' সে যা বললো তা ঐ সম্পর্কের সঙ্গে মেলে। কিম্বা হয়ত অনেক অভাবের জন্যে সে বাধ্য হয়েছে এই পথে আসতে। সে অভাব নিজের জন্যে নয় বাপমা ভাইবোনের জন্যে। এই বাপমা ভাইবোনের জন্যে একালে নারীকে দেহ ব্যবসাও করতে দেখা যায়। এই যে নারীমনের আমরা আলোচনা করছি, যারা পুরুষ পাঠক হয়ত একটু রাগ করছেন, কিন্তু আমরা অনেক গবেষণা করে দেখেছি, সত্যিকারের নারী স্বভাবের মধ্যে নির্মল ও পবিত্র রূপটাই সব চেয়ে বেশি প্রকাশ পায়। স্বভাব খারাপ নারী কি নেই কিন্তু সেটা তরুণ বয়েসের নারীর মধ্যে খুব কম দেখা যায়। সময় ও জগতের অনেক অবিচারের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে কিছু কিছু পরিণতা নারী মুখরা হয়, শরৎচন্দ্র তাদের নিয়েও কাজ করেছেন। শুভদা গল্পে কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী, ঠাকুরঝি রাসমণি, বামুনের মেয়ের রাসমণি, পল্লীসমাজের রমার মাসী, অরক্ষণীয়া গল্পে বড়জা স্বর্ণমঞ্জরী প্রভৃতি চরিত্র তার প্রমাণ। এসব রমণীরা কেন এত মুখরা ও কুটিল স্বভাবের হল, খোঁজ নিলে জানতে পারা যায়, তাদের পিছনে এমন এক ব্যর্থ কাহিনী আছে যা অশ্রুজলে সিক্ত করে। সেই জন্য এরা পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে অমনি ব্যবহারে মত্ত হয়। এমন প্রৌঢ়ার দেখা আমরা বারবনিতালয়েও পাই, যারা তরুণী মেয়েদের শিক্ষা দেয়, 'ওরে তোরা এই বেলা গুছিয়ে নে। আর সময় নেই।' তাদের মুখ দিয়ে অনেক অশ্রাব্য কথাও শোনা যায়, যা শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। তবে এদের দেখে আমরা সমগ্র নারীজাতির বিচার করব না। যারা ভালবাসার কাঙাল, ভালবাসার জন্যে সব ত্যাগ করে, তাদের নিয়েই আমাদের আলোচনা। শরৎচন্দ্রও সেই আলোচনা করেছিলেন।

তার সম্পূর্ণ কাতরতা এই নারীদের স্বপক্ষেই প্রকাশ হয়েছিল।

কি লিখব এই নিয়ে যখন মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল, তাঁর সামনে বঙ্কিম রচনা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগাঁথা। সেই সময়ে সেই তরুণ বয়েসে নারীমনের এই চিন্তা শুধু শক্তির পরিচয়ই প্রকাশ করে নি, অপরিমিত সাহসেরও খোঁজ পাওয়া যায়। কেউ তো তাঁকে বলে দেয় নি, 'ওহে ছোকরা তুমি বেশ্যালয়ে গিয়ে বেশ্যাদের জীবন দেখ। দেখলেই লেখার রসদ পেয়ে যাবে।' ঐ কথা যে কেউ বলে নি তাঁর জীবনী ঘেঁটে পাওয়া যায়। আর বললে যে লেখক লিখতে পারে না এও আমরা জানি, কারণ লেখকের লেখা আসে আপন মমতায় আপন অন্তরের দর্শনে। তার দেখা ও বোঝার মুন্সিয়ানা অনুযায়ী

লেখা ফোটে। অপরের বলার ভিত্তিতে ফোটে না। তাই অনেক লেখক বলেন, গল্প শুনলেই কি লেখা যায়? গল্পটা আপন আঁধারে বহুদিন ধরে লালন করলে তারপর হাতে উঠে আসে।' সেইজন্যে শরৎচন্দ্র যে আপন মমতায় ও বহুদিনের কল্পনায় এই পতিতা মাধ্যমটি চিন্তা করেছিলেন তা বলা যেতে পারে। স্বাভাবিক ঘৃণা তাঁরও যে জাগে নি সে বলা যায় না। তিনি সাধারণ মানুষের মতই পতিতাদের ঐ ঘৃণ্য জীবনকে ঘৃণা করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদের অন্তরের দিকটাও দেখেছেন। মহৎ মানুষের কল্পনাই যে অলৌকিক পথে বিচরণ করে এ আমরা বরাবর দেখে এসেছি। শরৎচন্দ্র সেই মহতী মানুষের পথই অনুসরণ করেছিলেন। যখন সাধারণ মানুষ দরজায় জানলায় দাঁড়ানো ললনাদের দেখে পুলকিত বোধ করেছে, তখন তিনি তাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে বেদনায় অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়েছেন। আমরা একবার সেই মহতী মানুষকে কল্পনা করি। কোন বারাঙ্গনালয়ের পথে সন্ধ্যেবেলাই পাশ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, চাই বেলফুল। মেয়েরা বেলফুলওয়ালাকে ডেকে তার কাছ থেকে বেলফুলের মালা কিনে মাথায় লাগাচ্ছে। মেয়েরা হাসছে, মন্তব্য করছে, কোন কোন খদ্দেরকে চোখ টিপছে। তার মধ্যেই কেনা বেচা হচ্ছে। প্রচণ্ড একটা উত্তাপের মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতিটা চলা ফেরা করছে। শরৎচন্দ্র এরই মধ্যে দেখলেন, একটি মেয়ে চুপ করে লজ্জায় মুখ নত করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাসছেও না বা কোন খদ্দেরকে আকর্ষণ করার জন্যে কোন কৌশল অবলম্বন করছে না। তিনি একটু অবাক হলেন। এমন মেয়ে তো সচরাচর দেখা যায় না। ও অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কি ওর ব্যবসা চলবে? মেয়েটার প্রতি মহতী মানুষের একটু অনুকম্পা হল। গুটি গুটি তারই সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েটি তাড়াতাড়ি একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আসুন।' শরৎচন্দ্র মনে মনে বললেন, 'তোমায় আর আসুন বলতে হবে না। তোমার অবস্থা দেখেই আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার কাছে আসতে হয়েছে।' মুখে বললেন, 'ঘরে চল।'

এই বলে সেদিন সেই বরেণ্য লেখক অন্তরের সুষমা বিলিয়ে মেয়েগুলির সঙ্গে একত্র হয়েছিলেন। তৎকালে সমালোচক এই লেখকের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেক কটূক্তি করেছিল। অশ্লীল লেখক বলে গাল পেড়েছিল। তাঁর জন্মস্থান দেবানন্দপুরের মানুষ তাঁকে দুর্নামের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। কৈশোর যৌবনের ভাগলপুর তাঁকে খুব একটা শ্রদ্ধা জানায় নি। মনে মনে যে তিনি খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন তাঁর চিঠিপত্র পড়ে তাই মনে হয়। সব চেয়ে আশ্চর্য

লাগে, তিনি যখন উচ্চস্থানে উঠে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছিলেন 'কৈশোর যৌবনে আমি অনেক অন্যায় কাজ করেছি আর করতে চাই না।' অন্যায়টা কি? তবে কি এই পতিতাদের সঙ্গে সম্পর্ক? মানুষ যখন আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে অন্ধকারে আলো, সেই সময়ে আলোর সন্ধানে মানুষের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। সেই আলোর সন্ধানে মানুষ এমন অনেক কাজ করে যা পরবর্তীকালে তাকে সফলতার পথে নিয়ে যায়। শরৎচন্দ্র কৈশোরে সেই আলোর সন্ধানে মহতী পরিকল্পনা মনে ধারণ করেছিলেন। সেই মহতী কল্পনাই তাঁকে উত্তরকালে যশস্বী করেছে। এ কথা কি তিনি পরিণত বয়সে বুঝতে পারেন নি কিন্তু ব্যক্তি-সত্তা যখন তাঁকে জনপ্রিয়তার উর্দ্ধে উঠিয়ে দিল তখন Boldly বলতে পারলেন না, 'বেশ করেছি আমার চিন্তাধারার গভীরতার জন্যেই তো আজ আমি যশস্বী।' বরং সামাজিক স্বীকৃতির জন্যে মুখে চাবি লাগালেন। আর কাতর অনুনয়ে বললেন, 'যা বাল্যে করেছি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর। এখন আমি ভাল ছেলে হয়ে গেছি।'

কিন্তু ব্যক্তি আক্রমণকে তিনি দাবাতে পারলেন না। তাঁর ব্যক্তি জীবন নিয়ে নানাভাবে তাঁকে অপদস্থ করা হল। 'তাঁর জীবন সাধারণের মত নয়। তিনি বিবাহিত নারী নিয়ে সংসার করেন না। ব্রহ্মদেশেও তিনি কোন সরল জীবন যাপন করেন নি।' হাওড়ার সামতাবেড়েতে তাঁকে এক ঘরে করা হল। দেবানন্দপুরেও তাঁর কোন অস্তিত্ব থাকল না। আজ আমরা এত বছর পরে সেই বরেণ্য লেখকের মানসিকতার মূল্যায়ন করতে বসে বড়ই কাতর হয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, 'ওহে অহঙ্কারী বঙ্গ ভাষাভাষী তোমাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ।'

আরও আশ্চর্য হয়ে একটা কথা মনে আসে, যিনি চিরকাল সমাজ ভাঙার মন্ত্র নিয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁকেই একদিন সমাজের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে মার খেতে হয়েছিল। এতেই মনে হয়, প্রাচীন সমাজের সেই কুটিল রক্তচক্ষু তাঁর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এতদিন ওৎ পেতে ছিল, সুযোগ পেতেই ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল শরৎচন্দ্র তখন ক্লান্ত। কিম্বা বলা যেতে পারে যশের মুকুট পরে তিনি উচ্চ আসনে বসে পড়েছেন। সেই আগের দুঃসাহসের ছিটে ফোঁটা তাঁর মধ্যে ছিল না বলে তিনি সমাজ প্রভুদের কাছে মিনতি করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। সমাজ প্রভুরা ক্ষমা করেনি, বরং যত ভাবে তাঁকে দংশন করা যায় করেছে। এই যে সামাজিক উন্নাসিকতা দেখিয়ে তাঁকে ছোট করার চেষ্টা, এ যে কত বড় অন্যায় আজ আমরা এই এত বছর পরে উপলব্ধি করতে পারছি।

এ সব কথা ভাবলেও কেমন যেন নিজেদের গালে নিজেদের চড় মারতে ইচ্ছে করে। জীবিত অবস্থায় মানুষটাকে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বধ করেছি, তাঁর কাতর মনের অন্তর গভীরে একবারও ডুবুরি হয়ে নামি নি। তিনি কি অপরাধ করেছিলেন? না, অসামাজিকদের সঙ্গে মিশে এক নতুন সমাজের রূপ বঙ্গ-দেশের মানুষদের উপহার দিতে চেয়েছিলেন। তিনি লেখার মাধ্যমে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রতি মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর বাস করেন, সে কথা মানুষজাতি ভুলো না। মানুষকে অপমান মানে নিজেকে অপমান করা। এই যে উচ্চমার্গের কথা এ কার বোধগম্য হবে? ওর গভীরে কে ঢুকবে? তাই গভীরত্ব বাদ দিয়ে সহজ মানুষের মত সহজ বিচার করা হয়েছে। এ সব কথা উপস্থিত থাক। এ সব কথা বলতে শুরু করলে স্রোতের মুখ আটকানো যাবে না। অনেক অভিযোগ এসে পড়বে।

তাই আমরা তাঁর তরুণ মনের মানসিকতার সন্ধানে তাঁর লেখার আলোচনায় নিয়োজিত হই। মনের মধ্যে আদর্শ ছিল বঙ্কিম। বঙ্কিমের উপন্যাসের নারী চরিত্র নিয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে আলোচনা করেছি। বঙ্কিমের নারীরা সব ভাল-বাসার মোহে মুগ্ধ ছিল। ভালবাসাই জীবনের সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু সে ভালবাসা বৈধতার মধ্যে ঘটেছে। এই যে জোর করে বৈধতার সৃষ্টি, এটাই শরৎচন্দ্রের মধ্যে দোলা দিয়েছিল। নারী পুরুষের ভালবাসার মধ্যে বৈধ অবৈধতার প্রশ্ন থাকবে কেন? অবৈধ হলেই সে ভালবাসা ভালবাসা নয়? তবে কি প্রণয় বুঝে সুঝে আসবে? বাস্তব জীবনে নারীদের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন তা তো নয়। প্রণয় যখন ঘটে, সে পাত্র পাত্রী বিচার করে না। রূপ অরূপের প্রশ্ন থাকে না। অনেক কুৎসিৎ মেয়ে তো প্রেমে পড়ে। তার বাইরেটা সৌন্দর্যহীন কিন্তু মনের সৌন্দর্যকে কে রোধ করবে? অরক্ষণীয়ার জ্ঞানদা তার প্রমাণ। অরক্ষণীয়ার জ্ঞানদা ভদ্র ঘরের মেয়ে ছিল, তবু তার প্রণয় স্বীকার করা যায় কিন্তু পতিত মেয়ে ভালবাসে, এ যে বড় অন্যায় আবদার। শরৎচন্দ্র সোজাসুজি তাদের কথা বলতে বসলেন। চন্দ্রমুখী সেই মানসিকতার ফল। পরে 'আঁধারের আলো'তে বিজলীর মধ্যে তার ভালবাসা দেখিয়েছেন। বিজলী গঙ্গার ঘাটে সত্যিই যে সতেন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু নারী সে তখন বহু পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে পুরুষের প্রতিই তিতিবিরক্ত। ভালবাসার জন্ম যে তার মধ্যে হয়েছিল সে বুঝতে পারে নি। ছেলেমানুষের মত এক বোকা ছেলেকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছিল। ভেবেছিল প্রতিদিন যেমন কতকগুলি কামার্ত

পুরুষকে নিয়ে খেলে তেমনি খেলবে। কিন্তু কামদেব যে কখন তার পঞ্চশর নিক্ষেপ করে তার ভেতরটা দগ্ধ করেছিল সে জানতে পারে নি। পরিচারিকার কথাতেও বলেছিল, 'মন্দ কি? লোকটা কেমন আমার পাশে ঘুর ঘুর করছে দেখ্।' সেই মনেই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তার ঘরে। তখন সে হাস্যে লাস্যে পুরুষের মন জয়ের ব্যবসা করছে। মদমত্তও সেইজন্যে ছিল। সেই অবস্থায় পট্টবস্ত্র পরিহিত সত্যেন্দ্রকে দেখে তার লাস্যই প্রকাশ পায় কিন্তু বিজলী তখনও জানতে পারে নি, সে কাকে আঘাত করছে? সত্যেন্দ্রর অভিভূত মনে যে এক পবিত্রতার ছায়া পড়েছিল, সেটা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। সে জায়গায় মনে জমছে প্রচণ্ড গ্লানি। সে গ্লানির গরল কতখানি বিজলী জানতে পারে নি। যখন সত্যেন্দ্র ভ্রূকুটি প্রকাশ করে রাগে কাঁপতে কাঁপতে প্রস্থানোদ্যত হল, তখন বিজলীর চমক ভাঙল। তখন সে লুটিয়ে পড়ল পায়ের তলায়।

শরৎচন্দ্র পতিতা নারীর ভালবাসা প্রকাশ করতে চেয়ে এই গল্প ফেঁদেছিলেন কিন্তু বিজলীর চরিত্রে এমনি দুমুখী পরিচয় দিতে গেলেন কেন? মনে হয় তিনি পতিতার পুরুষ মনোরঞ্জন করার স্বাভাবিক আর্টটি প্রকাশের প্রবৃত্তি সংবরণ করতে পারেন নি। তাই বিজলীকে দিয়ে অমনি অভিনয় করালেন, তারপর তাকে সত্যেন্দ্রনাথের পায়ে লুটিয়ে দিলেন।

সে যাই হোক গল্প সার্থক কি ব্যর্থ সে নিয়ে আলোচনা করব না, তাঁর উদ্দেশ্যটুকু নিয়েই আমাদের আলোচনা। পতিতা মেয়েও যে ভালবাসে, এই তাঁর বলার উদ্দেশ্য। লেখক যখন এ গল্প লিখেছেন, তখন তিনি পরিণত। তখন তিনি টলস্টয়ের রেসারেকসনের প্রভাবে আলোড়িত। রেসারেকসনের ম্যাসলোভা চরিত্রটি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আমরা বলব, ম্যাসলোভার স্বীকৃতিতে কলমে তিনি জোর পেয়েছেন, আসলে তিনি ঐ বারাঙ্গনাদের দিকেই তাকিয়েছিলেন। চরিত্রহীন এই সময়ের রচনা। তারও বিরুদ্ধ সমালোচনা হলে তিনি ঐ রেসারেকসনের দোহাই দিয়েছিলেন। কিন্তু এ যে স্রষ্টার আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যর্থ চেষ্টা, এ নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ তিনি সমালোচনার মুখে পড়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না জেনে এই সব অসত্য কথা বলে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। আসলে পতিতার ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি বদ্ধ পরিকর হয়ে এই ভাবে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন।

আমরা সাবিত্রীকে পেয়েছি চরিত্রহীনে। সাবিত্রী পতিতা নয় কিন্তু পতিতার

সংস্পর্শে তাকে থাকতে হয়েছে। বাইরের চোখে তো সে পতিতাই। ভেতরের দিকে কে ওতো তাকায়? সাবিত্রী দেহ ব্যবসা না করে তার গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করত পরিচারিকার চাকরী করে। আসলে তো সে ঝি। সেই ঝিয়ের মানসিকতা ছিল পবিত্র নির্মল। দেহ ব্যবসা না করলে যে তার দেহ নিষ্কলুষ এটা বলা যায় না। তার দেহের দিকে তাকিয়ে অনেকেরই লুব্ধ বাসনা জেগেছে কিন্তু শরৎচন্দ্র সে জায়গায় এই পুরুষবেষ্টিত সমাজে সাবিত্রীকে কি ভাবে নির্মল রেখেছেন সে কথা তাঁর চরিত্রহীনের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। শরৎচন্দ্র এক সময়ে এই পতিতার দেহ ব্যবসা নিয়ে বলেছেন, 'ওদের দেহটা ঘৃণ্য হয়েছে বটে কিন্তু মন তো ঘৃণ্য নয়। মনের মধ্যে ভগবান আছে, সব মানুষই সেই জন্যে পবিত্র।' তাঁর মত ভাবতে সাধারণ মানুষ পারে না বলেই তাঁর কথাগুলি দুর্বল লাগে। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না, মানুষ ভগবানের সৃষ্টি। মানুষের অন্তরে ভগবান বাস না করলে কার অন্তরে ভগবান বাস করবে? সাবিত্রীকে তিনি দেহ ব্যবসায়ী করেন নি, তাকে দিয়েছেন অপরিমিত সংযম। সমগ্র পুরুষের লোলুপ চোখের সামনে তার নিজেকে বাঁচানো যে কি দুষ্কর, মাঝে মাঝে স্রষ্টার সংযমই অপদস্ত হয়েছে, সতীশ সাবিত্রীকে প্রথমে ভালবাসা দিয়ে বরণ করতে চায় নি, ওর প্রতি আসঙ্গ লিপ্সাই প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু ধীরে ধীরে সে লিপ্সা ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে, যখন দেখেছে, ওকে ছাড়া তার আর বাঁচার কোন সার্থকতা নেই। এটা সতীশের মধ্যে অনেক পরে জাগে। সতীশ এমনিই একটি বাউণ্ডুলে বেপরোয়া চরিত্রের লোক, কোন কিছুই মাত্রা রেখে করা তার মধ্যে কুলোয় না। পড়াশুনায় যেমন তার মেধা, চারিত্রিক অসংযম সৃষ্টিতে তার কোন জোড়া নেই। পড়াশুনা হল না তো হোমিওপ্যাথিক কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। আবার সেখানেও মন টেঁকে না। এই অস্থির চঞ্চল ছটপটে মানুষ যেমন বিরল, তেমনি এদের মনের মধ্যেও কোন প্যাঁচ থাকে না। এর সঙ্গে খানিকটা মিল শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি পাগল ইন্দ্রনাথের। সে ইন্দ্রনাথও তো বাস্তব জীবনে শরৎচন্দ্রের বাল্যসখা রাজেন্দ্র মজুমদার। শরৎচন্দ্র সত্যি মহা ভাগ্যবান এই জন্যে বলব, রাজেন্দ্রর মত একজন অদ্ভুত বন্ধু পেয়েছিলেন। এর চরিত্রটি তাঁকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে তিনি বহু জায়গায় তাকে বার বার প্রকাশ করেছেন। অবশ্য প্রভাবের কারণও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। এই জন্যে যে, এমন চরিত্র বড় একটা দেখা যায় না। সতীশও ছিল তেমনি আকর্ষনীয়। তার গুণ ছিল অনেক কিন্তু সে তার গুণ গুলিকে

তাচ্ছিল্য করত, গুরুত্ব দিত না। গানের গলা ছিল সুন্দর, বাজনাও সুন্দর বাজাতে পারত কিন্তু কোন কিছুতে তার স্থিরতা ছিল না। এমন লোককে কে না ভালবাসে? সাবিত্রী তাকে ভাল বাসবে এ আর এমন কি বিচিত্র কিন্তু সাবিত্রী তো ভাল মেয়ে নয়। অন্তত বাহ্যিক কৌলিন্য তার নেই। আর একটি লক্ষ্য করবার মত বস্তু, চরিত্রহীনে কলকাতার পটভূমিকা ছিল পাথুরীয়াঘাটা। অর্থাৎ বারাঙ্গনালয়ের কাছাকাছি। শরৎচন্দ্রের মন যে ঐ অঞ্চলে পড়ে থাকত, এটা আর অস্বীকার করা যায় না। সাবিত্রী যে বাড়ীতে থাকত, সে বাড়ীর পরিবেশও খুব সৌজন্যপূর্ণ নয়। বিলাসের প্ররোচনায় সমস্ত বাড়ী যখন মদ খেয়ে মাতলামী করতে লাগল, সে মাতলামী মেয়েদের কথাতেই বোঝা যায়। সেই বাড়ীতে যুবতী মেয়ে সাবিত্রী কৌলিন্য বজায় রেখে আছে, এ যেন সাবিত্রীর সহিষ্ণুতা নয়, তার স্রষ্টার সহিষ্ণুতারই প্রমাণ মেলে। শরৎচন্দ্র বরাবর নারী মনের বিভিন্ন কোণ নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। আর সে সব নারী সহজ অবস্থার মধ্যে বিচরণ করে নি। তারা সমাজ কর্তৃক উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা কিন্তু মনের দিক থেকে তারা যে কত বড় সে আর এক কথায় লেখা যায় না। নারী অবস্থা বিপাকে পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করে এই তাঁর ধারণা ছিল। আমরাও তাঁর সঙ্গে এক মত। কিন্তু পতিতা না হয়ে নারী বাইরে বেরলে যে তাকে কেউ সংযম ধারণ করতে দেয় না সাবিত্রীচিত্রণ তার প্রমাণ। তাই শরৎচন্দ্র সাবিত্রীকে অঙ্কিত করে মানব সমাজকে দেখাতে চেয়েছেন, তোমরা যে পতিতার নামে এত ঘৃণ্যমত পোষণ কর কিন্তু তোমরাই তো নারীকে এই পাপকুণ্ডে টেনে নামাও।

এই যে পতিতার জন্যে শিল্পীর মনের বেদনা, একি বড় একটা অন্য কারও রচনায় দেখা গেছে? অবশ্য এও বলা যায়, এত দরদ কার ছিল? তিনি তো শুধু পাঠক মনোরঞ্জনের জন্যে ও যশ কেনার জন্যে গল্প লেখেন নি। তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল সমাজকে নিচু পথ থেকে উঁচুপথে তোলা। তাঁর লেখার মধ্যে এত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, আর কার লেখায় এত পাওয়া যায়? এই চরিত্র হীনেতেই একদিকে যেমন লাঞ্ছিতা সাবিত্রীর আত্মসংযম, অন্যদিকে কিরণময়ীর হৃদয় যন্ত্রণা। দুটি পাশাপাশি নারী চরিত্র, কি অদ্ভুত মিল দেখুন! সাবিত্রী তার হৃদয়যন্ত্রণা কখনও প্রকাশ করে নি। সে আস্তাকুঁড়ের পাশ দিয়ে চলতে চলতে নিজেকে কত বুদ্ধি খাটিয়ে রক্ষা করেছে। অন্যে তার চারিত্রিক পবিত্রতা *নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করে নি।* কারণ সে জানে আমি কি? এমন কি ভালবাসার মানুষ সতীশের কাছেও সে নিজেকে

প্রকাশ করেছে 'আমি কুলটা আমার দেহ দেবতা গ্রহণ করতে পারে না'। অস্থির চিত্ত সতীশ তাই মনে করে সাবিত্রীকে যা নয় তাই বলেছে। নারীর এই যে আত্মগোপন, এ যেন নারীরই ধর্ম, এ কথা আমরা শরৎচন্দ্রের লেখনী থেকে যতটা পেয়েছি আর কারও লেখনীতে নয়। তিনি নিশ্চয় সাবিত্রীর মত নারীকে ভদ্রসমাজে খোঁজ করেননি। ঐ পতিতালয়েরই কোন পরিবেশে তার দর্শন পেয়েছিলেন। কিম্বা এও বলা যায়, কেউ গল্প করেছে। আমরা এরকম একটা ধারণা যদি করে নিই, শরৎচন্দ্র কোন পতিতালয়ে বসে আছেন, একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়েকে সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে তাঁর কৌতুহল হয়। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, সে এখানে থাকে বটে কিন্তু দেহ ব্যবসা করে না। কেন? না তার ধারণা, সৎভাবে জীবন যাপন করলে মনের মধ্যে কোন গ্লানি থাকে না।

'কিন্তু এখানে কোন সৎ মেয়ে আছে বলে তো কেউ বিশ্বাস করবে না।' উত্তর পেলেন, সব তাতে এসে যায় না।

তারপরেই শরৎচন্দ্রের কৌতুহল হল, এই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করার। আলাপও করলেন কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেলেন তার কথা শুনে।

তাঁর চিন্তাধারা যেন থমকে গেল। পতিতালয়ে বাস করে পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করে না, এমন মেয়েও আছে? প্রশ্নের পর প্রশ্নের জোয়ার তুললেন। '…তোমায় যে কেউ ভাল বলবে না এ নিশ্চয় জানো?' সে বলল, 'বয়ে গেল। আমি তো জানি আমি ভাল। বিবেকের দংশনে তো মরব না?'

'আচ্ছা, তোমার এই জীবনের প্রতি লোভ হয় না? এই আনন্দ, স্ফূর্তি, ভোগ, বিলাস অর্থের ঝনঝনানি। তুমি যে ভাবে জীবন যাপন কর আমার তো মনে হয় খুবই কষ্ট হয়।'

সে একটু থেমে মুখ নিচু করে ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'হয়। কিন্তু এও তো আমি জানি, কষ্টের মধ্যে যে আনন্দ ঐ জীবনে তা নেই।' তারপর গা ঝাড়া দিয়ে বলল, 'আমি ভাবতেও পারি না। রোজ রোজ এক গাদা পুরুষ এসে এই দেহটা নিয়ে…।'

শরৎচন্দ্র তাকিয়ে রইলেন অদ্ভুত এই মেয়েটির দিকে। তারপর বললেন, 'তুমি কি কাউকে ভালবাস?'

মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না।'

'কেউ ভাল বাসলে ভাল বাসবে না?'

মেয়েটি করুণকণ্ঠে বলল, 'কে ভালবাসবে বলুন? থাকি তো এই নোংরা জায়গায়। কাজ করি ঝিয়ের। ভাল কাপড় জামা পরে সভ্য ভব্য হয়ে থাকি বলেই কি আমি ভাল হয়ে গেলাম?'

শরৎচন্দ্র চুপ করে রইলেন। ওঁর মনের মধ্যে তখন মেয়েটির জন্যে একটা জায়গা সৃষ্টি হচ্ছিল। বললেন, 'এমন কেউ যদি তোমায় বিয়ে করতে চায় করবে না?'

মেয়েটি এই প্রশ্ন শুনে অদ্ভুত এক বিহ্বল দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর লজ্জিত কণ্ঠে বলল 'আমায় কেউ বিয়ে করবে?'

শরৎচন্দ্র দৃঢ়চিত্তে বললেন, 'করবে না কেন? তুমি তো নিষ্পাপ।'

অনেক পরে মেয়েটি ব্যথিত ও করুণকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি যে বিধবা বাবু। তাছাড়া আমার ভগ্নীপতি আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে বার করে এনেছিল। অবশ্য আমার দেহ কলুষিত করার সুযোগ সে পায় নি।'

শরৎচন্দ্র পরিণত বয়েসে বলেছিলেন, 'আমার সব চরিত্র দেখা। কল্পনা যা আছে তা গল্পের সঙ্গে মেলানোর জন্যে। তাহলে সাবিত্রীর এই চরিত্র তাঁর দেখা। আর আমরা যা কল্পনা করেছি অযৌক্তিক নয়। সাবিত্রীকে এই ভাবে কোথাও তিনি দেখেছিলেন, নয় ব্রহ্মদেশে, নয় এই কলকাতায়। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীতে আমরা দেখেছি ব্রহ্মদেশে অভয়াকে। চরিত্রহীনে আরাকানে কামিনী বাড়ীওলীকে। তেমনি সাবিত্রীকে তিনি এই ব্রহ্মদেশে বা কলকাতায় কোথাও দেখেছেন। না দেখলে দৃঢ়চিত্তে এ চরিত্র স্রষ্টার হাতে এত সুন্দর রূপে আসত না। শরৎচন্দ্র কখনও মুখ খুলে এ সব কথা গল্প করেন নি। কেন করেন নি, সে কথা জানা যায় না। তবে শিল্পী নিজেই কি জানেন কাকে দেখে কখন কি চরিত্র মনে লালিত হয়? হয়ত অনেক সাবিত্রী দেখে তারপর সবার থেকে ভালটুকু ছেঁকে নিয়ে তিনি নিজের মনের মত একটি চরিত্রই সৃষ্টি করেছেন। সেই জন্যে যখন শ্রীকান্তর জবানীতে রাজলক্ষ্মীকে তৈরি করেছেন, তখন অনেকে বললো, 'আপনি একে কবে দেখেছিলেন?'

শরৎচন্দ্র হেসে বলেছিলেন, 'কবে মানে?' সবার ধারণা শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী এই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী। তখন তিনি বললেন, 'আরে বাপু, এ সব সত্যি নয়, সব বানানো।' বানানো ঠিকই কিন্তু সে বানানোটার একটা ইঙ্গিত যে লেখকমনে বহুদিন ধরে লালিত হচ্ছিল, এ আর অস্বীকার করা যায় না। সেইভাবে সাবিত্রী লেখকমনে দোলা দিয়েছিল। পতিতার সম্পর্কে শরৎচন্দ্র

যেভাবে চিন্তা করেছেন, অন্তত কাউকে আর দেখা যায় নি। তবে রবীন্দ্রনাথও যে শরৎচন্দ্রের মত পতিতাকে নিয়ে ভেবেছিলেন, 'পতিতা' কবিতাই তার প্রমাণ।

'ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী, চরণপদ্মে নমস্কার
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা, লও ফিরে তব পুরস্কার
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋ ষরে ভুলাতে পাঠাইলে বনে যে কযজনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে বতনে, আমি তারি এক বারাঙ্গনা।'

পতিতার মনে মানসিক যন্ত্রণা কি? সেটাও ফুটে উঠেছিল কবির কলমে। পতিতার নিজের জবানীতে যে খেদোক্তি প্রকাশ হয়েছে তা শরৎচন্দ্রের চিন্তা ধারার সঙ্গে মেলে। রবীন্দ্রনাথের সময়কার মানুষ শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন রবীন্দ্রনাথ। পতিতার চিন্তা দুই স্রষ্টার মনে একইভাবে খেলা করেছিল। গদ্যে গল্প সৃষ্টি করেন শরৎচন্দ্র, তবে শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে ব্যাপকতার সৃষ্টি হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নয়। তবু একটি কবিতাতে যে মানসিকতা প্রকাশ করেছেন তা অনন্য। যেন ছত্রে ছত্রে কান্নাই প্রকাশ হয়েছে।

'মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা শুনিনি এমন সত্যবাণী।
দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি, নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা—
দূর দুর্গম মনোবনবাসে পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।'

রবীন্দ্রনাথও এই কবিতার মধ্যে পতিতার ভালবাসাই প্রকাশ করেছেন। সামান্য এই দেহ নিয়ে সবাই আনন্দ পায় কিন্তু কেউ মনের দেবতার সন্ধান পায় না। সেই মনে যে একজন তাপস কুমার সর্বদাই লালিত হচ্ছে সেখানে ক্লেদাক্ত দেহের এ অপমান কেন? মহতী মানুষেরা যে পতিতাদের ঘৃণা করেন নি এই কবিতাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ সাবিত্রীকে তাই শরৎচন্দ্র প্রকাশ করে মানব সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছেন, সে সাধারণ এক নারী হলেও সে অসাধারণ। আর পাশাপাশি সৃষ্টি করেছেন কিরণময়ীকে। কিরণময়ীর সৃষ্টিতে যেন সাবিত্রী আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিরণময়ী ব্যর্থ জীবনের হাহাকার নিয়ে নিজেকে নষ্ট করতেও কুণ্ঠিত হযনি, কিন্তু সাবিত্রী? তাহলে বোঝা যায় যারা ঘৃণ্য, যারা ছোট বলে সমাজে অনাদৃত, তারাই মনুষ্য জীবনে মনুষত্বের দাবী করতে পারে। এবং তারাই সাবিত্রীর মত এত ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যায়, পতিতারা অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রী করে

ঘটে কিন্তু তারা কখনও খদ্দেরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। শরৎচন্দ্রও এ সম্বন্ধে গল্প বলেছেন। আমরাও জানি কিছু কিছু। কত মাতাল, জুয়াচোর, বদমাইস, চোর, ডাকাত, খুনী এই সব জায়গায় আসে। নোংরা পরিবেশে নোংরা লোকেরই আমদানী হয় বেশি। সেইজন্যে বারাঙ্গনারা খুব সচেতন থাকে। ওরা কাউকে কিছু বলে না। ভাল ব্যবহারই করে কিন্তু খারাপ লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটলে ঐ ভাল মেয়েরাই আবার অন্যমূর্তি ধারণ করে। একটা গল্প এ প্রসঙ্গে বলা যায়। তিনবন্ধু এক বারাঙ্গনার ঘরে গেছে। গান বাজনা হৈ হুল্লোড় মদ ভাঙ খাবার পর তারা সেখানেই নেশায় ঢলে পড়ে। আরও অন্যান্যরা সেখানে ছিল, তারাও মদ ভাঙ খেয়ে মজলিশে যোগ দিয়েছে। তারপর এইভাবে রাত কেটে গেছে। সকাল হবার পব সেই তিন বন্ধুর এক বন্ধু উঠে বসে তার কোঁচার খুঁট হাঁতড়াচ্ছে। ঘরে তখন মেয়েটি ছিল না। আর দু'বন্ধু সেই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, কি খুঁজছ? তার তখন মুখের যে চেহারা, জবাব দেবার মত নয়। চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে সে বলে, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।' 'কি সর্বনাশ হয়েছে?' 'আমি আর বাঁচব না। আমার চাকরী যাবে। ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসব।' বন্ধু পাগলের মত কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। এই সময়ে ঘরে ঢোকে সেই মেয়েটি। স্নান করতে গিয়েছিল। স্নান করে কাপড় জামা পালটে এসে উপস্থিত হয়।

ঐ লোকটার কান্না দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে?'

তখন লোকটি বলে, 'আমার কোঁচার খুঁটে পুটুলীতে বাঁধা ছিল তিন হাজার টাকা। টাকাটা অফিসের। এখন কি করি?'

মেয়েটি তখন এগিয়ে গিয়ে খাটের গদির তলা থেকে পুঁটুলীটা বের করে দিয়ে বলে, 'এটাই তো?'

লোকটি তখন কান্না ভুলে লাফ দিয়ে পুঁটুলীটা নেয়। টাকাগুণে দেখে বলে, 'ঠিক আছে'। মেয়েটি তখন বলে, 'এভাবে টাকা রাখেন কেন? আপনারা যখন মাতাল হয়ে গেলেন, তখন একটি বদলোককে দেখলাম, আপনার পাশে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে, আর আমার দিকে তাকাচ্ছে। তাতেই বুঝলাম তার অভিসন্ধি খুব ভাল নয়। তখন উঠে গিয়ে আপনার কোঁচার খুঁট থেকে পুঁটলীটা বের করে রেখে দিয়েছি। ভাল করিনি?'

এর জবাব আর ঐ লোকটি কি দেবে? আমরা এর জবাব দিচ্ছি। তিন

হাজার টাকা। মেয়েটি ইচ্ছে করলে সরাতে পারত। তিন হাজার টাকার গহনা গড়ালে মেয়েটির সারা শরীর ঝলমল করত কিন্তু সে তা না করে খদ্দেরকে ফিরিয়ে দিল। এই মহানুভবতা কি আমাদের সভ্য সমাজে দেখা যায়? বরং মেরে দিয়ে লোকটাকেই মেরে বের করে দিত। এই মানসিকতার সন্ধানে এইটুকু বলা যায়, যাদের আমরা ঘৃণা করি, তারা যে ঘৃণ্য নয়, শরৎচন্দ্র যেমন দেখেছিলেন, যারা এসব অঞ্চলে যায়, যাদের চোখ মন একটু সচেতন থাকে তারাই বুঝতে পারে। অনেকে ঘরের সুন্দরী স্ত্রীকে বর্জন করে বারনারীকে বেশি পছন্দ করে। পছন্দ করবার কারণ তারা যৌন সংসর্গে অনেক সক্রিয় বলে অনেকের ধারণা। তাছাড়া নিষিদ্ধ পাথরে একটা আনন্দ আছে এ তো মানুষের চিরকালের নেশা। নিত্য নতুন নারী সংসর্গ এ তো পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। এমনও অনেক প্রৌঢ়কে দেখা যায, যারা যৌন সংসর্গে অক্ষম, অথচ বার নারী সঙ্গ তাদের ভাল লাগে। বোতল পকেটে নিযে বারনারীর ঘরে বসে মদ্য পান করা, তার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলা যেন সুখেরই নিদর্শন। আরও দেখা যায, কেউ নারীকে নগ্ন দেখে মনে আনন্দ পায, নগ্ন নারী সামনে বসে থাকবে, সেই দেখতে দেখতে মদ্য পান করবে। তবে এ সব অবশ্য অর্থকরী ধনী মানুষের আদিম মনের বিলাস। এদের পকেট উজাড করতে ধূর্ত নারীর মনও এতটুকু কাতর হয় না। শাঁসালো পার্টি দেখলে নিজের লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নেবার ফন্দিই তারা করে। আবার এই নারীকে দেখা যাবে কোন দুঃস্থ নাগর তার সমস্ত অর্থ ছড়িয়ে আনন্দ খুঁজলে তারা খোঁজ নেয। 'বাড়ীতে কে কে নাগরের আছে? 'আচ্ছা বাড়ীতে আপনার বৌ থাকতে আপনি এ অঞ্চলে আসেন কেন?' জবাব যা পায় তাতে তাদের মন ভরে না। তারা ভাবে, পুরুষের কি অদ্ভুত চরিত্র? এই ইঙ্গিত আমরা শুভদা গল্পে ক্যাত্যায়িনীর কাছ থেকেও পেয়েছি। সে হারাণকে বলেছে, 'তুমি আর এখানে এস না বাপু। বৌ ছেলেপুলেকে যখন খাওয়াতে পার না তখন এত বিলাস কেন? যাও এ কটা টাকা দিচ্ছি, বৌয়ের হাতে দিও। আর পারত কাজকর্ম করে টাকা উপায় কর। আমরা তো দানছত্র খুলে বসিনি, যে ঘরের টাকা বের করে দেব? আমাদেরও তো জীবন আছে, ভবিষ্যৎ আছে, যৌবন গেলে কে খাওয়াবে বলো।'

ঠিক কথা। শরৎচন্দ্র একেবারে হুবহু বারাঙ্গনার মনের কথা তুলে প্রকাশ করেছেন। যারা অভাবী যারা সংসার চালাতে অক্ষম, তাদের এত বিলাস

কেন? কিন্তু হারাণের মত মানুষ সংসারে যে অঢেল এ আর বলে দিতে হয় না। বারাঙ্গনা ভবনে যায় এমনি লোকই বেশি, কারণ সংসার যারা চালাতে পারে না, যারা অক্ষমতায় ভোগে, তারাই সস্তার মদ গিলে টলতে টলতে বারাঙ্গনালয়ে গিয়ে ঢোকে। আর সুন্দর মুখের থুতান ছুঁয়ে বলে, 'মালতী তোমার বুকে মুখ দিয়ে আমি যুগ যুগ পড়ে থাকি।'

এই যে মানুষের আদিম লিপ্সা এর পিছনের কারণ মানুষের নিঃসঙ্গতা। মানুষ শূন্যতায় ভোগে। নানা ভারসাম্যে মানুষের মন নিম্নগামী হয়। তখন এই সব দিকেই মানুষ বেশি ঝুঁকে পড়ে। আমাদের যাত্রা থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি হালকা আনন্দ বিনোদনে এর জন্যে ভীড় হয়। মনের ক্ষুন্নবৃত্তি সামান্য অল্প খরচায় চরিতার্থ করবার জন্যে মানুষ এগিয়ে যায়। মনের ক্ষুধা যে পেটের ক্ষুধার চেয়েও চরম সে আমরা এই সব সস্তা আনন্দ বিনোদনেই বুঝতে পারি কিন্তু সেই আনন্দ বিনোদনে যে সামাজিক সমতা কোথায় গিয়ে পৌঁছোয়, তা এতটুকু দেখি না। সমাজকে দৃঢ় করতে গেলে, মানুষের মঙ্গল আনতে গেলে যেমন কুপ্রথাগুলি বর্জন প্রয়োজন, তেমনি মানুষ যাতে সুস্থ, সবল ও পবিত্র হয় তার জন্যে অর্থনৈতিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে হবে ও ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

এ সব কথা এসে পড়ল এই জন্যে যে, সমাজে পতিতা নিবারণ আন্দোলন গড়ে তুলতে গেলে আগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পালটানো দরকার। না হলে পতিতার মঙ্গল সাধন করা যাবে না। আর্থিক চাপে যেমন নারীকে পতিতা বৃত্তিতে এগোতে হয়, পুরুষও তেমনি পতিতালয়ে যাবার জন্যে আগ্রহী হয়। সে যাই হোক্ এ নিয়ে আমাদের কোন লিখিত মতামত নেই। সে দেশের সরকার আছে, জনগণ আছে, তারা এর বিচার করবে। আমরা শরৎচন্দ্রের বারবনিতা প্রসঙ্গে নারীর মুক্তিই কামনা করেছ। শরৎচন্দ্রও তাই চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের লেখনীর ওপর যদি এতটুকু কারও শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে তাঁর ইচ্ছাগুলিকে ফলবতী করবার জন্যে জনগণ সাগ্রহে এগিয়ে আসবে। তিনি কত ছোট বয়েসে সমাজের এই গলিত নোংরা জঘন্য পতিতাবৃত্তি দেখে কাতর হয়ে উঠেছিলেন। নারীকে যখন আমরা এই বৃত্তিতে ঠেলে দিই সে যে কত কাঁদে সে তিনি দেখেছিলেন। সেই কান্নার কি কখনও শেষ হবে না?

ব্রহ্মদেশে থাকার সময়েও দেখেছিলেন, ব্রহ্মরমণীর ওপর বাঙালী যুবকের নির্যাতন। নারী সর্বদেশে সর্বকালে আপন মমতায় সেবা দিয়ে তার

প্রেমাস্পদকে অভিনন্দিত করে। সে সময়ই ওদেশের ব্রহ্মরমণীরা বাঙালী যুবকের খুব প্রিয় ছিল, এবং ব্রহ্মরমণীরাও নিজে উপার্জ্জন করে প্রিয়জনের ভরণপোষণ ব্যয় করত, সে বেশ রাজসিকই ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র একজন বাঙালী যুবকের নির্মমতা প্রকাশ করেছেন। দাদা বঙ্গদেশ থেকে গিয়ে ভাইকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে ওদের মধ্যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র হয়। যুবকটি একদিন ব্রহ্মরমণীকে বোঝায়, তামাক আনতে সে অন্যত্র যাচ্ছে, খুব শীঘ্র ফিরে আসবে। তামাক আনার জন্যে টাকাও বেশ নিল সেই রমণীর কাছ থেকে। জাহাজে ওঠবার সময় মেয়েটি চোখের জল আর রোধ করতে পারল না। কিন্তু যুবকটি সর্বসমক্ষে জাহাজ ঘাটে আরও এমনি এক হৃদয় বিদারক কাণ্ড করল যা লিখে প্রকাশ করা যায় না। দুজনে দুজনের ভাষা জানত না, যুবক কৌতুক করে ব্রহ্মরমণীকে বাংলায় বলল, 'তোমার বিহনে আমি আর থাকতে পারব না। সামান্য টাকা নিয়ে তোমার কাছ থেকে ভাগছি, ওতে আমার মন পূর্ণ হয় নি, তোমার হাতের আংটিও আমাকে দাও তাতে আমার কিছুটা দাঁও মারার অভাব পূর্ণ হবে।' এই বলে সে তার হাত থেকে আংটিটি খুলে নিল কিন্তু মেয়েটি ভাবল অন্য। সে ভাবল, তার স্মৃতি ভুলতে পারবে না বলে প্রেমাস্পদ তার চিহ্ন শরীরে ধারণ করে নিয়ে যাচ্ছে। সে খুশি মনেই আংটিটি হাত থেকে খুলে দিল। শ্রীকান্ত দেখে চোখে জল রাখতে পারে নি। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষ জাত? মনে এতটুকু মমতার উদয় হল না। আগে ওর দাদার কথায় শ্রীকান্ত প্রতিবাদ করেছিল, তার উত্তরে শুনেছিল, 'ব্যাটাছেলে এরকম বাইরে দু'চারটে অন্যায় করে, তাবলে সেইটে মনে রাখতে হবে নাকি?' ব্রহ্মদেশের কথা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, এই বঙ্গদেশেই কি সে ঘটনা ঘটে না? নারীর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নির্দয় পুরুষ কি তাদের প্রবঞ্চনা করে না? লক্ষ লক্ষ এমনি ইতিহাস এই পৃথিবীতে ঘটে গেছে, তার নজিরও খুব কম নয়। নারীর দুর্বলতার সুযোগে পুরুষ প্রবঞ্চিত করে তাকে বিয়ে করব বলে ঘর ছাড়াতে কি এখনও তারা এগিয়ে আসে না? এই পতিতালয়ে গেলেই তো জানা যায় তার পূর্ণ ইতিহাস। প্রায় মেয়ের মুখে শোনা যায়, সে অমুকের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে পিতগৃহ ত্যাগ করেছিল। তারপর……। তারপর, এই পতিতালয়ে তাকে চির জীবনের জন্যে বাসা নিতে হয়েছে। কেন? 'তোমাদের সমাজে তো আমার আর জায়গা হবে না। আমি তো উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছি।' নষ্ট

নারীকে তার পিতামাতাও জায়গা দেয় না। কি নিদারুণ এই ঘটনা দেখুন।

এই প্রসঙ্গে একখানি পুস্তক আমাদের হাতে এসেছে। পুস্তকখানির লেখক এক পতিতা। শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দেবী। 'পতিতার আত্মচরিত'। প্রকাশ করেছিলেন হিন্দুমিশন বাণী মন্দির, ৭ নং বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই পুস্তকখানি এক সময়ে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কারণ একজন পতিতা লেখনীর দ্বারা সমাজের অবনতির যে চিত্র তুলে ধরেছিল, সভ্যসমাজ তা সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু আমরা আত্মজীবনীটি পাঠ করে ঠিক উলটোটাই বুঝেছি, একজন পতিতা নারী সে শিক্ষিতা, আইনজ্ঞর মেয়ে হয়ে সমাজ 'তাকে যে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিল, তা চোখের জলেই এক সময়ে শেষ হয়ে গেছে। পতিতা নারী তার মনের কথা বাইরের সমাজে প্রকাশ করতে পারে না। তার মনের যে কি কষ্ট, সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। মানদাসুন্দরী সেই ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ না করে নিজেই নিজের আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছে। আর বিনয়ে জানিয়েছে, 'হতভাগী মেয়েরা যে কি নিদারুণ কষ্টে জীবন যাপন করে তার জন্যে কে দায়ী আমাদের সমাজ, পুরুষ জাতি না আমরা? নিজের অবনতির ইতিহাস এতটুকু লুকোয় নি, বয়ঃসন্ধির সময়ে কিশোরীর মনে যে উন্মাদনা জাগে, তার ফল কি হয়। সেই থেকে শুরু তার কাহিনী কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। পতিতার আত্মচরিত আমাদের উন্নাসিক রক্ষণশীল সমাজ প্রচার করতে দেয় নি। কারণও বেশ চমকপ্রদ। বহু মানীগুণীর গোপন স্বভাবের ইতিহাস লোক চক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল, এমনি যদি আরও দু চারজন লেখনী ধারণ করে আত্ম কথা প্রকাশ করে বসে, তাহলে আমরা জামা কাপড় পরে মুখে শিক্ষার পালিশ ঝুলিয়ে যে ঘুরে বেড়াই, অচিরে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে, আমরা কি, পাঁচজনে তা জেনে ফেলবে। আমাদের আবরণ খুলে যাবে। সে যে বড় সাংঘাতিক কথা। সেইজন্যে এর প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল কিন্তু যে গ্রন্থ মুদ্রণের ছাড়পত্র পেয়েছে, সে কি আর লোকচক্ষের অগোচরে থাকে? সত্য যদি জোর গলায় বলা যায়, তার যেমন মার নেই, তেমনি এই আত্মচরিত মানদা প্রকাশ করে আমাদের যে উপকার করেছে, আমরা তার ঋণ শোধ করতে পারব না। আজ এই বর্তমানে আমরা আর অজ্ঞ নয়, বা পুরোনো সংস্কারকে মনে রেখে অহেতুক সত্যকে অস্বীকার করি না। সেইজন্যে মানদাসুন্দরীর মত শিক্ষিতা পতিতা নারী এগিয়ে এসে যদি কলম ধরে, তাহলে সমাজের অনেক অবনতির ইতিহাস চোখের সামনে ফুটে

ওঠে। সে গ্রন্থও কি বাজেয়াপ্ত হবে? জানি না বর্তমান মানুষের মানসিক উদারতা। তবে এও বলা যেতে পারে, মানুষের সেই আদিম লিপ্সার কি কিছু ভদ্রোচিত উন্নতি হয়েছে? বরং বলা যেতে পারে, আজকের মানুষের দিকে তাকিয়ে তার গতি যেন অব্যাহতই আছে।

সে যাই হোক ঐ সম্বন্ধে আমরা একালের বারবনিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন মানদা সুন্দরীর কথায় ফিরে আসি। তার জন্ম হয়েছিল ১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ়। অর্থাৎ ১৯০০ সালের জুলাই মাসে। কি আশ্চর্য দেখুন, আর এই রচনা ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসেই লেখা হচ্ছে। মানদা ছিয়াত্তর বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিল। এই ছিয়াত্তর বছর পরে আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে নারীর কি উন্নতি হয়েছে সে কথা ভাবতে গিয়ে অবাক হচ্ছি, তারা সেই একই ধাপে আছে। শিক্ষার জলুস কিছু লেগেছে বটে কিন্তু সমস্যার কোন উন্নতি হয় নি। বরং অন্য সব অনুসঙ্গ যোগ হয়ে পতিতাবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভদ্র পরিবারের মেয়েরা দেহ বিক্রী করে কেউ বিলাস দ্রব্য ক্রয়ে উৎসাহী হচ্ছে, কেউ চাকরীর অভাবে নারীর সহজ সুযোগটা গ্রহণ করছে। তারপর অবশ্য কেউ বিয়ে করে সংসারে ঢুকে পড়ছে। কেউ মানুষের অত্যাচারে কণ্টকিত হয়ে কালের স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে। একালের নারীর জীবন ভাবনা নিয়ে অন্যত্র আলোচনা হবে, তখনই দেখা যাবে আজকের নারীর কি অবস্থা? ছিয়াত্তর বছর আগে মানদসুন্দরীর কি অবস্থা হয়েছিল সেটাই এখন বলা যাক্।

মানদা ধনীর সন্তান। সংসারে অভাব কিছু ছিল না। বাবার নাম সে প্রকাশ করেনি কারণ বাবা এতই নামজাদা লোক ছিল যে তার অপমান হত। সেই স্বনামধন্য ব্যক্তির সন্তান হয়ে একটু আদরের অভাবে তার পদস্খলন হল। নারী পুরুষ উভয়েই এক বয়েসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রিপুহীন হতে পারে না। পুরুষের একটু দেরিতে আসে। নারী অনেক আগেই প্রকৃতির লীলায় প্রাকৃতিক কতকগুলি পরিবর্তন শরীরে পায়। তারপর সে অদ্ভুত ভাবে নিজের সম্বন্ধে মনোযোগী হয়। এই সময়ে প্রচণ্ড প্রহরা না দিলে তার পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। মায়ের স্থান এখানে সর্বাগ্রে। মানদার মা মারা যেতে সে নিজেই এই প্রবৃত্তির জন্যে ভেসে যায়। সে কথা মানদা বর্ণনার ছলে বারবার উল্লেখ করেছে। মানদা যে একটি নারী নয়, সে সমগ্র নারীজাতির প্রতিভূ হয়ে নারীজাতিকে সাবধান করার জন্যে এই গ্রন্থ লিখেছে, সে আমরা তার লেখনী থেকে পেয়েছি। সে অকপটে স্বীকার করেছে, নিজের পদস্খলনের গোপন কাহিনী। তার লিখিত বর্ণনা

আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। পুরো বইটা তুলে দিলেই ভাল হত। আপনারা স্পষ্টই দেখতে পেতেন, একটি মেয়ে কিভাবে ধাপে ধাপে নরকের নিচে নেমে যায়।

'আমি ঘর ছাড়িলাম কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্টভাবে দিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। শরীর ধর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে যে বয়েসে আমাদের যৌবন চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তখন বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা সমাজে আছে। বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষায় নিরত এবং সর্ব্বদা সৎসঙ্গে রাখিলে এই যৌবন চাঞ্চল্য অল্প বয়সে আসিতে পারে না। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গেরই অভাব। তাহার ফলে তরুণ হৃদয়ে অকালে যৌন সম্মিলনের উদ্দাম কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে। আমি সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার ফলে কাব্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই পড়িতে শিখিয়াছি। তাহাতে আমার হৃদয়ে কল্পনার উত্তেজনায় দুষ্প্রবৃত্তিই সকলের আগে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই—যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্ম্মভাবের উদয় হয় এমন কোন পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই। আমোদ প্রমোদ যাহা ভোগ করিয়াছি তাহা সমস্তই অতি নিম্নস্তরের। থিয়েটারে নাচ গান, সিনেমার চিত্র কখনও হৃদয়ে সদ্ভাব জাগ্রত করে নাই। অল্প বয়স্কদের পক্ষে তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা বিপদ্‌জনক। দুই একটা দাঁত উঠিলেই যদি শিশুকে মাছ খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে যেমন গলায় কাঁটা বিঁধিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়; থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণ তরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতেছি। আমার মত যাহারা আছে, তাহারাও ইহার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে।

বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াই আমার মনে হইয়াছিল, আমি খুব জানি। তরুণ সাহিত্যিকদিগের গল্প উপন্যাস যথেষ্ট পড়িয়াছিলাম; বিশেষতঃ মুকুল-দার অনুগ্রহে সেলী, বায়রণ, সেক্সপীয়ার বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তকও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সুতরাং অহঙ্কার যে আমাকে ফুলাইয়া তুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

আমি যখন গৃহ ত্যাগ করি তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। এই বয়সে

যদি আমি আমাকে নিঃসহায় ও বুদ্ধিহীন মনে করিতাম, যদি ভাবিতাম যে আমিত সংসারের কিছুই জানি না—যদি আমার পদে পদে ভয় হইত, তবে আমি কখনই এমনভাবে বাহির হইতাম না। কিন্তু একটা মিথ্যা গল্প আমাকে দুঃসাহসী ও দূরদৃষ্টিহীন করিয়া তুলিল। আজ মনে হয়, আমি যদি উপযুক্ত অভিভাবকের অধীনে থাকিতাম, তবে, আমার ভাল হইত। স্বাধীনতার মধ্যে পরাধীনতার প্রয়োজন আছে।'

এই যে মানদা সুন্দরীর আত্ম নিবেদন এ কি সমস্ত মেয়ের কথা নয়? মানদা সুন্দরী যে বয়েসে গৃহত্যাগ করেছে সে তো আজকের বালিকা বয়স কিন্তু ১৫।১৬ বৎসরের নারীর প্রথম যৌবন এ বড় উন্মাদনার নজীর রাখে। আমরা স্কুলের বড় ক্লাসের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন নতুন কি এক পাওয়ার মোহে বিভোর? পদস্খলন তো সে সময়েই ঘটে। সেই বয়েসেই দেখা যায়, কত কত কিশোরী পতিতালয়ে এসে জায়গা নিয়েছে। মানদা সুন্দরী তাদেরই চোখ ফোটাবার জন্যে এই আত্মকথা লিখেছে। কিন্তু চোখ কি কারও ফোটে? এই বয়সটা যে বড় খারাপ। তাই জবরদস্ত অভিভাবকের দরকার, যারা এদের দাবিয়ে রাখবে। নারী পরাধীনতা পছন্দ করে। এ তাদের জন্মগত স্বভাব। নিজে তারা কিছু বুঝতে পারে না। সেই অবুঝ মনের পাহারায় কোন শক্ত পাহারাদার দরকার। মানদা সুন্দরী বলেছে, 'আমার মা থাকলে বোধ হয় আমার এমন হত না।' বাবা ছিল কিন্তু বাবার শিথিল পাহারার কোন যত্ন ছিল না, তাছাড়া তিনি ছিলেন বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত। এদিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসৎ পেতেন না। বিমাতা যে ছিল তিনি অনাদর করতেন না কিন্তু মানদার চেয়ে বেশি বড় নয় বলে শাসনও করতেন না।

মানদা তার আত্ম কথার ছত্রে ছত্রে তার দুঃখময় জীবনের কথাই জানিয়েছে। শরৎচন্দ্র এ আত্মকথা পড়েছিলেন কিনা জানি না কিন্তু তাঁর লেখনীর মধ্যে মানদার বেদনাই মূর্ত হয়ে ওঠে। মানদা যার সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল সেই রমেশ এক সময়ে তাকে ছেড়ে যায়। মানদা তখন সহায় সম্বল হীন এক অভাগী নারী। বৃন্দাবনে এক মহান্তজীর আশ্রয় পায়। মহান্তজী তাকে তাঁর আশ্রয়ে জায়গা দেন না। বাগান পরিদর্শক রামকিষণ ও তার স্ত্রীর কাছে রেখে দেন। মানদা সেখানেই কাজকর্ম করতে থাকে কিন্তু প্রবৃত্তি যার জেগে গেছে সে কেমন করে নিশ্চিন্তে বাস করবে? কোন এক সুদর্শন শিষ্যকে সে প্রলুব্ধ করে কিন্তু মহান্তজীর দৃষ্টি প্রখর, বুঝতে পারেন এবং তাকে এক ধনী শিষ্যের সাহায্যে

কলকাতার উদ্ধার আশ্রমে পাঠিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মানদার গর্ভে যে সন্তানটি এসেছিল সেটি মৃত বলে ঘোষিত হয়। মানদা বেঁচে যায়। কলকাতায় আসার পর বাড়ীর জন্যে তার মন কেমন করতে থাকে কিন্তু বাবা তাকে ঘরে নেবেন না জানে কারণ মহান্তজী তার বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন, বাবা জানিয়েছিলেন, ও মেয়েকে ঘরে নিলে আমাকে এক ঘরে হতে হবে। মানদা এই জায়গায় অভিযোগ করেছে, 'পিতা আমায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মত পাপরতা পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মর্যাদা, অর্থসম্পত্তি, দেহমন বিক্রয় করেছে, ঐ দেখুন, তাদের সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে—তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত—রাজনীতিক ও দেশ সেবক বলিয়া বিখ্যাত, ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেকে ঋষি মহান্ত ও গুরুগিরী ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া শুনিয়াও নীরব। কোর্টে কাউন্সিলে করপোরেশনে গুরুগিরিতে কোথাও তাদের কোন বাধা নাই। আর আমরা কবে বালিকা বয়েসের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এক ভুল করিয়াছিলাম, তার ফলে এই ১২ বৎসর ধরিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। এইত আপনাদের সমাজের বিচার।'

মানদা সুন্দরী শিক্ষিতা। শিক্ষিতা বললে ভুল হবে তার কালচার কোন অংশে নিম্নগামী নয়। সে যা অভিযোগ করেছে, আমাদের সংস্কৃতিবান জীবনে তার মূল্য আছে। সত্যিই আমরা যা করি তা কি অন্যায় নয়? স্বীকার করতে বাধ্য, মেয়েটি প্রবৃত্তির প্ররোচনায় অন্যায় করেছে কিন্তু সে অন্যায় কি তার ইচ্ছাকৃত? তারা ঐ বয়েসে যৌন প্রবৃত্তির যাঁতাকালে পড়ে? বেশ ধরে নিলাম সেটা ঈশ্বরের দান। কিন্তু মানুষ সেখানে তাদের চরম শাস্তি দেয় কেন? মানুষ ভেবে নিতে পারে না, ওর তো কোন দোষ নেই, এ তো প্রকৃতির নিয়মে প্রাকৃতিক কতকগুলি প্রবৃত্তির মত একে স্বীকার করে নিতেই হবে। আমরা যেমন মলমূত্র ত্যাগ না করে থাকতে পারি না, এও তাই কিন্তু যৌন প্রবৃত্তি যেন মানুষের কাছে এক চরম পাপ বলে মনে হয়। এই চরম চিন্তাটাই আমাদের পাপের অপরাধ বলে ভাবায়। আর সেটার সবচেয়ে অপরাধ নারীর যেন বেশি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা যেন নারীকে নিয়েই বেশি চিন্তা করেছে। এই চিন্তাই যে কত বড় ঘোরতর অন্যায়, সে এই মানদা সুন্দরীর আত্মকথা পড়ে বোঝা যায়। মানদা সুন্দরীর কথা নয় আমরা ছেড়ে দিলাম কিন্তু যে কোন পতিতা নারীর কাছে আপনি যান, সে চোখের জলে এই অভিযোগই করবে। সে

বলবে, 'আমি নয় একবার অন্যায় করেছি কিন্তু বাবা মাও আমাকে ক্ষমা করল না, কেউই আমাকে ক্ষমা করে না।' বাবা মার কথা বললে এই বলা যায় কন্যাস্নেহ কি তাদের মধ্যেও নেই। সব বাবা মা পাষাণ নয় কিন্তু সমাজ? সমাজ যখনই জানবে মেয়েটি বাড়ী থেকে চলে গিয়ে একজনের সঙ্গে ছিল, তখনই তো কানাকানি উঠবে। শহর হলে বেশি সোরগোল হবে না, ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে কিন্তু গ্রাম হলে.........

এই কারণেই বাবা-মাকে স্নেহ ছিন্ন করে বিদায় দিতে হয়। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের চতুর্থপর্বে শরৎচন্দ্র কমললতাকে এই সমস্যার মধ্যে দেখিয়েছেন। অবশ্য কমললতা ছিল বিধবা। বিধবা ঠিক বলা যাবে না, শরৎচন্দ্র শুধু বলেছেন, 'কমললতার কলকাতায় বিবাহ হইয়াছিল, আর সেই স্বামীর নাম শ্রীকান্ত, সেইজন্যে কমললতা নতুন গোঁসাইর নাম মুখে আনতে পারে না।' সেই কমললতাকে প্ররোচিত করে তাদেরই জানাশুনা লোক মন্মথ গর্ভবতী করল। কমললতার বাবা কন্যাস্নেহে অন্ধ হয়ে এই কুলাঙ্গারকে উলটে স্তুতি জানিয়ে বিয়ে করতে বললো কিন্তু মন্মথ এমনিই নরাধম, এই দুর্বলতার সুযোগটি ত্যাগ করল না। 'গর্ভ যে কে করেছে আমি জানি? আমি বাঁচাতে পারি কিন্তু বিশ হাজার টাকা আমায় দিতে হবে।' মন্মথ এও বলল, 'গর্ভ আমার ভাইপো যতীন করেছে।' যতীনের আত্মহত্যার জন্যে মন্মথই দায়ী। অথচ এই মন্মথ কিভাবে কমললতার বাবার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে চাইল? কমললতা তারপরই ঘর ছেড়েছিল।

শরৎবাবুও নারীর এই অবস্থা বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর চোখে তো কিছুই এড়ায় নি। তখন লোকে সেইজন্যে তাঁকে বলত, শরৎচন্দ্র নারীদের একটু বিশেষ চোখে দেখেন। শরৎচন্দ্রও তা স্বীকার করে বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমার ওদের জন্যে খুব কষ্ট হয়।' কিন্তু শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারীর যে সব অবস্থাগুলি তাঁর গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে, আমরা তো দেখেছি, সেইগুলিই সমস্যা। সেই সমস্যার কণ্টকিত হয়ে বড়দিদির মাধবী, চন্দ্রনাথের সরযূ, শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী, পথনির্দেশের হেমনলিনী, গৃহদাহের অচলা, পল্লী-সমাজের রমা এরা সমাজের কাছে মার খেয়েছে। শরৎচন্দ্র গল্পে নারী শরীর সৃষ্টি করে তাদের সমস্যা দেখিয়েছিলেন কিন্তু সেই সমসাময়িক সময়ে মানদাসুন্দরী তার আত্মকথা প্রকাশ করেছে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সমস্যার সঙ্গে কি মানদাসুন্দরীর আত্মকথার মিল নেই? আমরা বলব, হ্যাঁ সম্পূর্ণ মিল, কারণ মানদা যা আত্মকথায় বলেছে, শরৎচন্দ্রের

নারী সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। মানদা অন্যায় করেছিল কিন্তু সে জন্য কি সেই দায়ী? হ্যাঁ, তার ঘরে উপযুক্ত অভিভাবক ছিল না। নানারকম লোক আসত তাদের বাড়ীতে। রূপবতী কন্যার প্রতি আকর্ষণেই যে তারা আসত, সে কথা মানদার বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। মানদার মনে তখন ফুলটি সবে ফুটছে। মনে উন্মাদনা আছেই। সেখানে যদি শাসনের রক্তচক্ষু থাকত তাহলে হয়ত ফুল পাপড়ি মেলত না কিন্তু শাসন মানদার জীবনে ছিল না। মানদার পতিতা জীবনের বারো বছর অতিক্রান্ত হবার পর তার আত্মকথা লিখেছে। এই বারো বছর সে যে কি নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে অতিবাহিত করেছে, তারই একটি একটি দিনের কাহিনী এই দিনলিপি। আমরা তার আত্মকথা পড়ে পতিতা জীবনের অনেক গোপন কাহিনী পাই। এই বারো বছর তার কাছে কত লোক এসেছে। তার জীবনের কত উত্থান পতন হয়েছে। কত ধরণের পতিতাকে সে দেখেছে। স্ট্যাম্প মারা পতিতা যেমনি আছে, তেমনি নানাধরণের বৃত্তিতে নিয়োজিত অথচ গোপনে পতিতাবৃত্তি করে সেরকম নারীর সংখ্যাও কম দেখেনি। অফিসের কেরানী, নার্স, ডাক্তার, টেলিফোন গার্ল, টাইপিস্ট, অভিনেত্রী, কীর্ত্তনওয়ালী, সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা—এদের কথা ভাবলে শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে ঘৃণাই হয়। এইসব নারী কি স্বইচ্ছায় এই পথে নামে? না, আমরা পুরুষরা এদের প্ররোচিত করি? কেউ অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নেমে পড়ে। তবে তার সংখ্যা খুব কম। নারী সহজে তার দেহ কলুষিত করতে চায় না। কিন্তু প্রলোভন? তাছাড়া তাদের প্রবৃত্তি! যৌন আকাঙ্ক্ষা তো তাদেরও আছে। সে যদি কোন কারণে নিবৃত্তি না হয়, তখন এইসব প্রলোভনগুলি কাজে লাগে কিন্তু আমরা দোষী করি এই নারীদের। একবারও ভাবি না এর জন্যে তো দায়ী আমরা।

মানদা যখন প্রথম পতিতাবৃত্তি শুরু করে সে চায় নি এই পতিতাবৃত্তি নিতে। ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে সে তার নির্বাণ চেয়েছিল কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে, সে ঐ হিন্দুসমাজের ঘৃণারই মত। অথচ শিবনাথ শাস্ত্রী থাকলে এমন হত না। শিবনাথ শাস্ত্রী নিজে বহু পতিতাকে এই বৃত্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কত মেয়েদের মাসিক সাহায্য দিয়ে সহজ জীবন যাপনে টেনে এনেছিলেন। সেই ব্রাহ্মসমাজে বড় আগ্রহ নিয়ে মানদা প্রভৃতিরা গিয়েছিল, তারপর আছে রাণীমাসীর যুক্তি। একরকম রাণীমাসীর উপদেশেই মানদাকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাণীমাসী সমাজের ঘৃণ্য

অবস্থাগুলি দেখিয়েছিল। পুরুষের ঘৃণ্য আদিম লালসাগুলি চোখের সামনে তুলে প্রকাশ করেছিল। মানদা দেখল কি বীভৎস সেই জীবন। তবু মানদা একটি দিনের জন্যে সুখী হয় নি। হবে কেমন করে? শিক্ষার প্রলেপ যার মধ্যে বিচারের মানদণ্ড নিয়ে বার বার বিবেকের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে, সে কি দেহব্যবসা করে পরিতৃপ্ত হতে পারে? মানদা চায় নি এ ব্যবসা। কেউ যদি তাকে একটু আশ্রয় দিত, তাহলে হয়ত সে নিজে উপার্জন করে জীবন চালাতে পারত কিন্তু তেমন কেউ তার জীবনে এল না।

এ প্রসঙ্গে আমরা আজকের মেয়ে হোস্টেলের কথা বলতে পারি। নারী-কল্যাণ সমিতিও তৈরি হয়েছে। সেদিন ছিল কিনা জানি না। তবে থাকলে নিশ্চয় মানদা তার সুযোগ নিত। মানদা তার আত্মকথায় লিখেছে, 'কত বিখ্যাত ডাক্তার, অধ্যাপক, উকিল আমার ঘরে আসত, সমাজের কত শত গণ্যমান্য ব্যক্তি।' বুঝুন একবার ব্যাপারটা। যাদের আমরা সামাজিক স্বীকৃতি দিই না। তাদের ঘরে গোপনে যাবার জন্যে আমাদের কি প্রবল আগ্রহ? মানদা সে কথা লিখতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। বরং ফলাও করে সে কথা জানিয়েছে। সে যে আমাদের চোখ খুলে দিতে চেয়েছে এই কথায় বোঝা যায়। রূপ এখানে যত না দরকার হয়, ছলাকলাই বেশি। সে কথা রাণীমাসী তাকে শিখিয়েছিল। পুরুষরা বেশ্যাপল্লীতে যখন সন্ধ্যেবেলা আসে, তাদের চোখে কন্দর্পঠাকুর ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। মানদার মুখেই শোনা যায়। 'রাণীমাসী আমাকে কতগুলি কৌশল শিখাইল। কাপড় পরিবার ফ্যাশন, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপে হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দুঃখ ও অপ্রীতির কারণ থাকিলেও আগন্তুক পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে—তাহা যে কপট, তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে। প্রণয়ী মদ্যপানাসক্ত হইলে তাহার মন রক্ষার জন্য কিরূপে মদের গ্লাস ঠোঁটের কাছে ধরিয়া মদ্যপানের ভাণ করিতে হয়, তাহা দেখিয়া লইলাম। লম্পটের মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের আমোদ চায়, তাহাকে তাহাই দিতে হয়। এইপ্রকার প্রতারণা শিক্ষা করিতে করিতে আমার বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে আর এক নূতন মানদার সৃষ্টি হইতেছে।

আমি ভাল গাহিতে পারিতাম। গলার স্বরও আমার বেশ সুমিষ্ট ছিল, একথা পূর্বে বলিয়াছি। (মানদা বাল্যকালে শিক্ষক রেখে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিল।) ঐ বিদ্যাটি পতিতার জীবনে খুব কাজে লাগে। রাণীমাসী আমাকে গান

শিখাইবার জন্য একজন ভাল ওস্তাদ রাখিল। সে বলিল, তোমার ব্রাহ্মসঙ্গীত অথবা স্বদেশী গানত এখানে চলবে না। লপেটা, হিন্দী গজল অথবা উচ্চাঙ্গের খেয়াল ঠুংরী এসব হল বেশ্যা মহলের রেওয়াজ। কীর্ত্তনও শিখতে পার। আমি তিন-চার মাসের মধ্যেই সঙ্গীত শিক্ষায় উন্নতি দেখাইলাম। কীর্ত্তন শিখিতে কিছু দেরী হইল।

ছলনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোক চিনিবার বিদ্যাও শিখিতে হইয়াছিল। কে চুরির মতলবে আসিয়াছে—কে কুৎসিত রোগাক্রান্ত—কে দুষ্ট প্রকৃতির লোক, কে ভাল মানুষ ও সরল চিত্ত এ সকল আমাদিগকে মুখ দেখিয়া ধরিতে হয়। অনেক সময়ে বিপদে পড়িয়াছি। একদল লোক আছে, তাহারা বেশ্যা বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও বেশ্যাকে হত্যাও করিয়া থাকে। এমনিভাবে প্রাণটি হাতে লইয়া পতিতা নারীকে ব্যবসা করিতে হয়। দু-পাঁচ টাকার জন্যে কোন নারী একেবারে অপরিচিত পুরুষকে গ্রহণ করে—হয়ত সেই বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীলোকটির বুকে ছুরি বসাইয়া তার গহনাপত্র লইয়া পলায়ন করিল। হতভাগিনী আর চক্ষু মেলিল না। পতিতার পাপের শাস্তি এই রূপেও হাতে হাতে পায়।'

পতিতা নারীর জীবন ইতিহাস শুনে আপনাদের কেমন মনে হচ্ছে? ঐ অঞ্চল দিয়ে চলতে চলতে যখন আপনারা সেজেগুজে ললনাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন, মনে হয় যেন ওরা কত সুখী। কি বলেন? কিন্তু তারা যে কত ভয়ের মধ্যে দিয়ে জীবন চালায়, মানদার বর্ণনাতেই তা দেখা যায়। মানদা নয়, প্রতিটি পতিতা নারীরই জীবন ইতিহাস এই। ওরা যে কত দুঃখে পাল ছেঁড়া নৌকোর মত জীবনের প্রদীপটি জ্বালিয়ে নিয়ে যায়। শরৎচন্দ্র তা দেখেছিলেন বলেই কাতর হয়েছিলেন। কেউ ওদের পাশে নেই। রোগাক্রান্ত হলে মুখে জল দেবার কেউ থাকে না। যারা সহায় ছাড়া জীবন কাটাতে পারে না তাদের এই অবস্থা কল্পনা করা যায় না। ওরাও তো মায়ের সন্তান। ওদেরও তো সামাজিক পরিচয় ছিল। হয়ত কারুর কারুর জীবন খুব আহ্লাদে কেটেছিল। সামাজিক সেই অসংখ্য আপন লোকের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ একা এই জীবনের টানা পোড়েন ভোগ করতে হয়। সেখানে তাকেই নিতে হয় কর্ত্রীর ভূমিকা। তার ভুলের মাশুল কারুর ওপর চাপাবার নেই। তার রোগ হলে কেউ ঘরে নেই মুখে জল দেবার। একা ঘরে চোখের জলে ভেসে স্মৃতিকেই রোমন্থন করতে হয়। আর আমরা তাদের দেখে উল্লসিত হয়ে

উঠি। বলি, 'বাহবা ভাই, বেড়ে খাসা মাল।' এমনও অনেক পতিতাকে দেখা গেছে, যারা স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে এই পতিতালয়ে এসে জায়গা নিয়েছে। তারপর স্বামীর প্রতিপত্তি গেছে, সে এসে দাম্পত্যের দাবিতে পতিতা স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা চেয়েছে। না দিলে এমন সব কথা বলে আস্ফালন করেছে, যা খুবই খারাপ। অনেক মেয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াতে স্বামীকে টাকা দিয়েছে। অনেক মেয়ে দয়াপরবশ হয়ে সাহায্য করেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেছে, 'একদিন তো ও আমারই সব ছিল।'

এই যে নারী মনের কাতরতা এ কি আর কোথাও পাওয়া যায়?...মমতা ছটপট করছে। জিজ্ঞাসা করলে বলল, 'আপনি একটু তাড়াতাড়ি আমায় ছেড়ে দিন না।'

'কেন?'

সে একটু চুপ করে থেকে সলজ্জ হেসে বলল, 'বাবা এসেছে তো।'

'বাবা?' • ; সবারই লাগে 'তোমার বাবা জানে, তুমি এ কাজ কর?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা এসেছে কেন?'

মমতা আবার চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তো মাসে মাসে কিছু টাকা দিই। সে টাকা নিতে এসেছে।' এই মমতাদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায়। ওদের বাড়ীতে এটাকে মেয়েদের ব্যবসা বলেই জেনে নিয়েছে। এ ব্যবসায় বেশ টাকা উপায় হয়। 'কিন্তু বাড়ীতে টাকা দাও কেন?' মমতা বলে, 'বাহ্, না দিলে ওরা খাবে কি?' এর জন্যে অবশ্য আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাই এসে যায় কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছাড়াও একটা কথা বেশ চিন্তা না করেই বলা যায়, সেই নারীর কাতর মন। মানদার কাউকে টাকা দিতে হত না কিন্তু পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করে বহু সৎ কাজে সে মন দিয়েছিল। সেটা এই আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বর্ণিত। ১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন হয়। বাংলাদেশে তার পরিচালন ভার পড়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ওপর। ছাত্ররা স্কুল, কলেজ ছাড়বে। উকিল, ব্যারিস্টার আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করবে। কেউ কাউন্সিলে যাবে না। গভর্ণমেন্টের উপাধি বর্জন করা হবে। বিদেশী জিনিস কেউ কিনবে না। এই পাঁচ রকম বয়কট এই অসহযোগ নীতির মূল মন্ত্র ছিল। ইহা প্রচারের জন্যে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে,

নগরে নগরে সভাসমিতি, বক্তৃতা, পিকেটিং অর্থাৎ বিরোধকারীদের বাধা দেওয়া চলতে লাগল। যুবকরা স্বেচ্ছাসেবক দল করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভদ্রমহিলারাও পুরুষের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেদিনের কথা যারা জানেন, তাঁরা অনুমান করতে পারবেন। মানদা লিখেছে, 'বাংলাদেশের পল্লী-গ্রাম ও মফঃসল হইতেও বহু সংখ্যক মহিলা কর্মী আসিতে লাগিল। সে কি উৎসাহ—কি উদ্দীপনা, কি এক অপূর্ব কর্ম চঞ্চলতা দেখিয়াছিলাম। এই সকল মহিলা কর্মীদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নারী কর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।......পুলিশ চারিদিকে খুব ধর-পাকড আরম্ভ করিল। মহিলা কর্মীরাও পুলিশের হাতে নিস্তার পান নাই। আমরা কয়েকজন পতিতা নারী মিলিয়া একটা ছোট দল গঠন করিলাম।' দেখুন পতিতা মানদার মানসিকতা। মানদা আত্মকথা লিখে প্রকাশ করেছিল বলে আমরা তার মহানুভবতার সন্ধান পাই কিন্তু যারা আত্মকথা লেখে না? যারা নীরবে সমাজের মঙ্গল করে যায়? আমরা বিশ্বাসই করি না ঐ বারাঙ্গনারা আবার কোন সৎ কাজ করতে পারে? ওরা তো এক কাজ করার জন্যে ব্যবসা খুলে বসেছে। আমরা যদি মানদার ছাপা অক্ষরে লেখা তার আত্মকাহিনী না পেতাম, তাহলে হয়ত বিশ্বাসই করতাম না পতিতাদের এই আত্মত্যাগ। অবশ্য অনেকে বলবেন, মানদা শিক্ষিত ছিল বলে এই জন্যে ওসব কাজে মন দিয়েছিল। তাহলে তাদের বলতে হবে মানদার মত শিক্ষিত মেয়ে কি পতিতালয়ে বিরল? আরও একটি কথা বলা যায়, নারী পতিতাবৃত্তি নিলে কি তার স্বাভাবিক নারীত্ব সে বিসর্জন দেয়? শরৎচন্দ্র বিজলীর মধ্যেও তো তা দেখিয়েছিলেন। বিজলী অমন লাভের ব্যবসা সত্যেন্দ্রনাথের জন্যে কেন জলাঞ্জলি দিল? চন্দ্রমুখী কি পেল দেবদাসের মধ্যে যে সেও ছাড়ল ব্যবসা!

শরৎচন্দ্র এই পতিতা নারীর মধ্যে মানদাকেই যে দেখেছিলেন এতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি বারবার বলেছেন, 'ওরা দেহব্যবসা করলেও মনুষ্যত্বের বিচারে যে তারা এতটুকু ছোট নয় সে বার বার দেখা গেছে।' আমরাও দেখি মানদার মধ্যে সেই মনুষ্যত্বের মহিয়ান শিখা। অসহযোগ আন্দোলনে তাদেরও যে কিছু করবার আছে একথা তারা ভোলে নি। মানদা বলেছে, 'আমাদের বাবুগণ পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্বে ইস্টবেঙ্গল সাইক্লোন ফাণ্ডের জন্য চাঁদা তুলিতে গিয়া আমরা বাহিরের ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতে আমাদের সাহস, চতুরতা ও দক্ষতা

বাড়িয়াছিল। অনেক ছোট বড় দেশনেতার সহিত পরিচয়ও হইয়াছিল। এবার যখন আমরা পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে নামিলাম, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মীরা অতিশয় সুখী হইলেন এবং আমাদের বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিলেন।

এই অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা এত তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, একসঙ্গে সকলে কাজ করিবার সময় মনে থাকিত না যে, আমরা অস্পৃশ্য ঘৃণিত বেশ্যা—।' কি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা লক্ষ্য করুন। মনের মধ্যে সৎ চিন্তা, অথচ কি পাপে তাদের এই বৃত্তি নিতে হল? মানদা লিখেছে, 'সেই কর্মী যুবকেরাও ভুলিযা যাইত যে তাহারা বারবনিতার সহিত চলাফেরা করিতেছে। যে সকল পবিত্র চরিত্র ব্যক্তি কখনও বেশ্যালয়ে আসেন নাই বা আসিবার কল্পনাও করেন নাই, তাহাদের সঙ্গে আমরা এই অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় মাতিযা এক মোটর গাড়ীতে বেড়াইযাছি, হাস্য পরিহাসের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে কথাও বলিযাছি। সকলে আমাদের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিতেন—গর্ব্বের আনন্দে আমাদের বুক ফুলিযা উঠিত। একদিন কর্ম শেষে গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই স্থানে বসিযাছিলেন। আর কেহ ছিলেন না। আমরা যে বারবনিতার দল তাহা তিনি বুঝিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, শেষকালে এরাও এসে কাজে নেমেছে—এটা কি ভাল হচ্ছে, মিঃ দাশ? চিত্তরঞ্জন স্নেহের সহিত উত্তর করিলেন, আপনারা হলেন রুচি বাগীশের দল। আমার সঙ্গে আপনাদের মিলবে না। সঞ্জীবনীর সম্পাদক কেষ্ট মিত্তিরের কাছে যান। তিনি আপনাদের মনের মত লোক। কেশব সেনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হ'যে উদার মত অবলম্বন করবার জন্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সৃষ্টি হল। কিন্তু শেষে উহারই মধ্যেও ক্ষুদ্রতা দেখা দিল। কূপের মত এতটুকু হলে হবে না—সমুদ্রের মত প্রশস্ত বিশাল হয়ে সকলকে গ্রহণ করা চাই। পাশ্চাত্য দেশে কি দেখ্‌ছেন? আমাদেরও তাই করতে হবে। যাদের ঘৃণায দূরে ঠেলে রেখেছি, তারাই আজ এগিযে এসেছে। এ শুভ লক্ষণ, আমি আস্তাকুঁড়ের আবর্জনায় এক অপূর্ব শক্তির সন্ধান পেযেছি।'

মানদার বর্ণনায় আমরা লোকান্তরিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মানসিকতার সন্ধান পাই। এতেই প্রমাণিত হয়, মহৎ মানুষের চিন্তাধারায় উদারতার সম্ভাবনাই বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সময়ে শরৎচন্দ্রও দেশবন্ধুর সঙ্গে অসহযোগ

আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। মানদাকে সম্ভবত সে সময়ে তিনি দেখে ছিলেন। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও তখন এই ধরণের নারীর চিন্তা ছিল।

শরৎচন্দ্র শুধু একা এদের নিয়ে চিন্তা করেন নি, দেশবন্ধুও চিন্তা করেছিলেন। আগে উক্ত হয়েছে শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা। মানদার বর্ণনায় পাই, সে অনেক পতিতা মেয়ের ঘরে শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি দেখেছে। জিজ্ঞাসা করলে জেনেছে, 'উনি আমাদের কাছে ঠাকুর। উনি আমাদের জন্যে যেভাবে ভেবেছিলেন, আর কেউ অমনভাবে ভাবে নি।' কেউ কেউ ঠাকুরের পাশে রেখে তাকে পূজা করত। এই যে পতিতাদের মন, এদেরই আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি কিন্তু কেন সরিয়ে রেখেছি? না, তারা অস্পৃশ্য, ঘৃণিত। অথচ তাদের ঘরে যেতে আমাদের বাধে না। শরৎচন্দ্র এদের ঘরে গিয়ে ভাত খেতেন। এদের কুশল প্রশ্ন করতেন। তারা আপন লোক ভেবে দাদা ঠাকুর এয়েছে বলে আপ্যায়ন করত। তাঁরই জবানীতে আমরা পাই, একবার তিনি জোড়াসাঁকো থেকে ফিরছেন। রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সেই বাড়ীরই লোক। হঠাৎ পথে এক আধাবয়সী রমণী তাঁকে ধরল। বলল, 'কি দাদাঠাকুর আমায় চিনতে পারছ না?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ পেরেছি কি খবর পাঁচুর মা?'

পাঁচুর মা বলল, 'কতদিন তুমি এদিকে আসনি। আজ পেয়েছি চল আমার বাড়ীতে।'

সঙ্গে যে লোক ছিল, সে একটু অবাক হল। শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এদের জানেন নাকি?'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ। এদের সঙ্গে আমাকে মিশতে হয়। এদের সঙ্গে না মিশে পারি না।' তারপর সঙ্গের লোকটিকে বিদায় দিয়ে তিনি পাঁচুর মা র সঙ্গে তার বাড়ীতে গেলেন। পাঁচু পড়া করছিল না বলে তার মা বকছিল। পাঁচুর মা বলল, 'দেখ না দাদাঠাকুর, পাঁচুকে আমি বলছি তুই অন্তত পেথম ভাগটা আর দ্বিতীয় ভাগটা শেষ কর। দাদাঠাকুরের মত নয় দুখানা বই লিকে খাবি।'

ওদের ধারণা তাদের দাদাঠাকুরের বিদ্যে ঐ পেথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। তবু তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তারপর সেই পাঁচুর মার হাতে রান্না খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলেন। তারপর অন্যান্য অনেক মেয়ের সঙ্গে দেখা করে তাদের হাতে তামাক খেয়ে, কুশল প্রশ্ন করে, তারপর বাড়ীর পথে

রওনা হলেন। এই জবানীতেই প্রতীয়মান হয়, শরৎচন্দ্র ঐ পতিতাদের কত কাছের মানুষ ছিলেন। যাদের কেউ নেই, যারা নিঃসহায়, যারা জীবনের মাঝে শুধু শূন্যতা অনুভব করত, তাদের অন্তরের বেদনা তাঁর মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করেছিল। শোনা যায়, বারাঙ্গনালয়ে বারাঙ্গনারা দাদাঠাকুর এলে যেন প্রাণের কোথায় একটা আপন লোকের সাড়া পেত। কে যে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাবে, কে বাতাস করবে, তামাক সাজবে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। আমরা ধরুন সেরকম একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হই। কোন এক দুপুরে শরৎচন্দ্র কোন এক বারাঙ্গনালয়ের সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ডাক দিলেন, 'কই রে পুঁটি, কই রে কমলা, বিন্দু...।'

সমস্ত বাড়ীটা দুপুরের ঘুমে ঝিমুচ্ছিল। সারারাত্রি ধরে তাদের তো অনেক স্নায়ু যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু দাদাঠাকুরের ডাক যেন তাদের মর্মমূলে গিয়ে বিঁধল। কে যে কোথায় পড়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল, কাপড় চোপড়ের ঠিক থাকল না। কারও গায়ে জামা নেই, জামা অবশ্য প্রায়ই থাকত না, সে কাপড় ঠিক করতে করতে ছুটল। কারও তখনও ঘুমের খোয়াড়ী ভাঙে নি, সে ঢুলতে ঢুলতে এগোল। দাদাঠাকুর এসেছে, সে কি আর ক্লান্তিতে ঘুমোতে পারে? প্রাণের বন্ধু দাদাঠাকুর। যাদের কেউ নেই, তাদের আত্মীয়, বন্ধু, ভাই, বোন, মা-বাবা তাদের প্রাণেরই একজন। সহায় সম্বলহীনাদের প্রাণের হারানিধি। অন্তর মথিত হীরামাণিক। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কুড়ি পঁচিশটা মেয়ে কে দাদাঠাকুরকে তার ঘরে নিয়ে যাবে, সেই নিয়ে তাঁর হাত ধরে টানাটানি।

দাদাঠাকুরের তখন অবস্থা সঙ্গীন। 'ওরে ছাড় ছাড় আমি বুড়ো মানুষ পড়ে যাব যে।'

কিন্তু মেয়েরা ছাড়ে না। ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। কেউ বলে 'তুমি দাদাঠাকুর আমার ঘরে যাবে। আমি তোমার জন্যে বেনারস থেকে ভাল সুগন্ধি তামাক আনিয়ে রেখেছি।'

কেউ বলে, 'আমিও আনিয়েছি দিল্লী থেকে ভাল মেঠাই।'

কেউ বলে, 'আজ দাদাঠাকুর খুব ভাল মাংস রান্না করেছি। তুমি আসবে যেন আমার অন্তর্যামী জানত। আমার ঘরে চলো।'

কেউ বলে, 'দাদাঠাকুর আমি একটা খাসা শীতল পাটী কিনেছি। তুমি তাতে শোবে চলো।' কেউ বলে, 'তোমার জন্যে নতুন বালিশ বানিয়ে রেখেছি। ফুলের নক্সা করেছি।' এই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রীতি মত একটা ঠাণ্ডা লড়াই লেগে

যায়। দাদাঠাকুর তো জানেন, কারও ঘরে গেলে কেউ খুশি হবে না। তখন সকলকে বাধা দিয়ে বলেন, 'তোমরা একটু চুপ কর। বিনতার ঘরটা তো বড়। ওর ঘরে আমি বসি তোমরা সবাই এস।'

বিনতার ঘরটা সত্যিই বড়। যে শীতল পাটী কিনেছিল, নিয়ে এল। বেনারসের তামাকও সাজা হল। দিল্লীর মেঠাইও বাদ পড়ল না। যে মাংস রান্না করেছিল সেও নিয়ে এল এক বাটি। সেই সব খেতে খেতে তাদের প্রাণের দাদাঠাকুরের সঙ্গে তারা প্রাণের গল্প করতে লাগল। কেউ বলল, 'দাদাঠাকুর আমায় একটা মণিওর্ডার লিখে দেবে?'

দাদাঠাকুর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন রে মণিওর্ডার কি হবে?' মেয়েটি সলজ্জ হেসে বলল, 'খবর পেলাম ওর খুব অসুখ। তাই কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।' দাদাঠাকুর তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন 'যা নিয়ে আয়।' মণিওর্ডার লিখতে লিখতে বললেন, 'টাকা যে পাঠাচ্ছিস নেবে তো!'

মেয়েটি ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। দাদাঠাকুর তাড়াতাড়ি বললেন, 'থাক্ থাক্ চোখের জল ফেলতে হবে না। টাকা পাঠাচ্ছিস্ কতগুলো পয়সা তো খরচ হচ্ছে। যদি না নেয় ফেরৎ আসবে তো!'

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দাদাঠাকুর মন যে মানে না। যখনই শুনেছি, তখন থেকেই প্রাণের মধ্যে কেমন যেন করছে। সে ভুলেছে, আমি তো ভুলতে পারি না।'

দাদাঠাকুর জানে এই মেয়েটির মন। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চোখের জল মুছতে বললেন।

এইভাবে কারুর ব্যাঙ্কের রসিদ, কারুর বাড়ীওয়ালা পিছনে লাগছে তার সম্বন্ধে উপদেশ, কেউ বন্ধকী জিনিস ছাড়াতে চায় আসল ও সুদ হিসেব করিয়ে নিল, কোন মাতাল কাউকে ভীষণ মারধোর করেছিল, সেই নিয়ে আলোচনা। দাদাঠাকুর তাকে সাবধান করে বললেন, 'মালা, লোকজন দেখেশুনে ঘরে তুলিস। চোখটা যে বেঁচে গেছে এই তোর ভাগ্যি।'

মালা হয়ত বলল, 'কি করব দাদাঠাকুর? হতছাড়া এ কাজে বড়ই ঝামেলা। মদ তো অনেকেই খায় কিন্তু ঐ লোকটা যে এমন ঝামেলা করবে জানব কেমন করে? হঠাৎ একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'মৃণ্ময়ী তোর কি হয়েছে রে? শরীরটা খারাপ দেখছি। আয় আয় কাছে আয় নাড়ীটা দেখি।'

নাড়ী দেখে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাগজে লিখে দিলেন। এটা কিনে নিয়ে খাস্। বলাবাহুল্য শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী শিখেছিলেন। শিখেছিলেন এদের জন্যে কিনা জানা যায় না। তারপর বললেন, 'আজ আর ব্যবসা করিস্ না।'

মৃণ্ময়ী কাগজ হাতে নিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'ব্যবসা না করলে খাব কি দাদাঠাকুর? কে খাওয়াবে বলো?' দাদাঠাকুর পকেট হাঁতড়ে তাকে দশটা টাকা দিয়ে বললেন, 'আজ আর ব্যবসা করবি না বুঝলি?'

এইভাবে শরৎচন্দ্র তাদের আপনজন হয়ে আপন মমতা প্রকাশ করেছেন। মেয়েরা তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভাল বেসেছে। কেউ দাদাঠাকুরের পা টিপে দিয়েছে, কেউ চুল তুলে, কেউ তামাক সেজে। বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে এসেছেন। মেয়েরা এবার সাজগোজ করে ব্যবসায় নামবে এখন। আর এখানে থাকা সমীচিন নয়।

এইভাবে আর একদিন আর এক বারাঙ্গনা ভবনে গেছেন। শরৎচন্দ্র কেন এইভাবে ওদের মধ্যে গিয়ে হাজির হতেন? না, ঐ ঘৃণিত অস্পৃশ্য বলে সমাজ যাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তারাও যে মানুষ তাদেরও যে মনুষ্যত্ব আছে এ তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি বলে যেতেন। তাঁর হৃদয়ের বীণাযন্ত্রে যে কবে ওদের রাগিনী বেজে উঠেছিল সে তিনি নিজেই জানেন না। সে ঘটনা তো বহু আগের কাহিনী। সে কথা বলার আগে আর একজন মানুষের কথা এই প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে সে কথাই আগে আলোচনা করা যাক। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। মানদার আত্মকথা থেকে আমরা সে কাহিনী পেয়েছি। যেমন দেশবন্ধু, শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা আগে জেনেছি, তেমনি প্রফুল্ল রায়ের কথাও মানদা আমাদের জানিয়েছে। মানদা লিখেছে, 'ইহার কিছুদিন পরে উত্তর বঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন হয়। বন্যা-বিধ্বস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় নানা প্রকারে চাঁদা তোলা হইতে থাকে। ইহার জন্য এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধিনায়ক হইয়া ছিলেন। ছাত্র ও যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল—ধনীলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহু অর্থ দান করিলেন- থিয়েটার ও বায়স্কোপ কোম্পানীর মালিকেরা বেনিফিট নাইট-এর বন্দোবস্ত করিলেন,—ছোট ছোট ক্লাব ও নানাপ্রকার সমিতি অভিনয়াদি আমোদ প্রমোদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিলেন, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও সাহায্যের সামান্য টাকা মঞ্জুর হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রকাশ্য কর্ম ক্ষেত্রে নামিয়া আমাদের সাহস

বাড়িয়াছিল, সুতরাং এই ব্যাপারেও আমরা উদাসীন রহিলাম না। আমাদের দল পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার গঠিত ছিল। তবে এবারে উহাকে আরও বড় করিতে হইবে। আমরা প্রস্তাব করিলাম, নিজেদের মধ্যে চাঁদা না তুলিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হাড়কাটা-গলি, রামবাগান, সোনাগাছি, ফুলবাগান, চাঁপাতলা, আহেরীটোলা, জোড়াসাঁকো, সিমলা, কেরানীবাগান প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীর পতিতাগণ পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইল।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কলিকাতার অধিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক এক দলে প্রায় ৫০।৬০ জন পতিতা নারী—তাহাদের পরিধানে গেরুয়া রংয়ের লাল পাড় সাড়ী—এলো চুলে পিঠের উপর ছড়ান—কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত—মনোহর চলনভঙ্গী, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ ক্লেরিয়নেট্ ও হারমনিয়াম বাজাইতেছে। অগ্রে অগ্রে দুইটী নারী একখানি শালুর নিশান ধরিয়া যায়, তাহাতে কোন পাড়ার পতিতা নারী সমিতি, তাহা লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে তারপর দুই নারী একখানি কাপড় ধরিয়াছে, তাহাতে দাতারা টাকা নোট পয়সা প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেছে। আর দুইজন লোক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই যে সুন্দরী তাহা নহে, তবে তাহারা সকলেই নিতান্ত কুৎসিত একথাও সত্য নয়। যাহা হউক, সাজিয়া বাহির হইলে পতিতা নারীদের সকলকেই সুন্দরী দেখায়। কারণ, ইহার উপরেই তাহাদের ব্যবসার ভিত্তি। রূপ দেখাইয়া জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বেশ্যাদের দাঁড়াইবার নিয়ম নাই! তাহা হইলে পুলিশে বাঁধিয়া নেয়। তাহারা তাহাদের দরজার চৌকাঠের বাহিরে আসিতে পারে না। সুতরাং খাটি বেশ্যা পল্লীতেও তিন চারিটি স্ত্রীলোককে কদাচ রাস্তার উপরে এক সঙ্গে দেখা যায়। এমন অবস্থায় যদি বেশ্যারা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে থাকে, তবে তাহা সাধারণ লোকের চক্ষে কেমন লাগে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্য অসংযম ও ভোগ লালসার মধ্যে থাকাতে পতিতা নারীদের চরিত্রে কুভাবই প্রবল থাকে। অসহযোগ আন্দোলনে দেশ-প্রীতির ভাব, অথবা বন্যা পীড়িতের সাহায্যে ভিক্ষা করার কার্য্যে দয়ার ভাব পতিতা নারীদের চিত্তকে বিশেষ অধিকার করে নাই। আমরা নিজেদের লোকের

সম্মুখে জাহির করিবার একটা সুযোগ পাইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি, এই মাত্র।'

এই যে উদার ভাবে মানদার মত প্রকাশ, এর মধ্যে তার উদারতাই প্রকাশ পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সে নিজে পতিতা কিন্তু পতিতা নারীর দোষগুলি সে ঢেকে কথা বলে নি। শিক্ষা, অশিক্ষা, মানসিক দোষ-ত্রুটি সবার মধ্যেই আছে। পতিতা নারী বলে যেমন ঘৃণ্য নয়, আবার পতিতা বলেই যে হেলাফেলা তা নয়। আসলে আমরা যেমন গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের মধ্যে দেখি ওরাও তাই। ওদেরও মধ্যে ভাল মন্দ আছে। কেউ কিছু পড়াশুনা জানে, তারা পড়াশুনা নিয়ে দিন কাটায়। কেউ গল্পের বই পড়তে ভালবাসে তার ঘরে গল্পের বইয়ের ছড়াছড়ি। রুচি পতিতালয়েও কম নেই। এমন পতিতাও আছে যে লোক বিচার না করে তাকে ঘরে তোলে না। অর্থই সেখানে বড় হয় না, রূপ সৌন্দর্য দেহ সুষমা, কালচার সেখানে প্রয়োজন হয়। এসব শুনলে হয়ত অনেকে বলবে, এ বানিয়ে লেখা কিন্তু ... সম্বন্ধে খোঁজ নিলেই জানা যাবে আসল কাহিনী। তাছাড়া মানদা-সুন্দরীই তো তার প্রমাণ। তারই আত্মকাহিনী পড়লে দেখা যায়, সে সাহিত্য সংস্কৃতিতে কিরকম পণ্ডিত ছিল। সে নিয়মিত প্রবাসী, ভারতবর্ষ পড়ত। তরুণ সাহিত্যিকদের লেখার সমালোচনা করত। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। তার আগে মানদার জবানীতে বন্যা পীড়িতদের জন্যে পতিতাদের ভিক্ষার কথাই বলা যাক। 'আমরা যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতাম, তখন শত শত লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বন্যাপীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর দুঃখে কাতর হইয়া সকলেই আমাদের তহবিলে টাকা দিত না ; আমাদের রূপ দেখিয়া, আমাদের গান শুনিয়া, আমাদের কটাক্ষ খাইয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়া টাকা দিয়া যাইত। ছাত্র ও যুবকদের দলে এত লোকের ভীড় হইত না।

সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বেলাই পতিতা নারীর দল অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইত। আমরা বহু সহস্র টাকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু নানা অপব্যয় করিবার পর তাহার অংশ বিশেষ কেন্দ্রীয় সমিতির তহবিলে পৌঁছিয়াছে। আমরা যাহা কিছু দিয়াছি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের টাকা লইতে সুনীতিবাদী ব্যক্তিদের আপত্তি ছিল। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া মত করিলেন।' মানদা এই প্রসঙ্গ কেন গর্বের সঙ্গে লিখেছে, এ কথা ভাবলে এইটুকু বলা যায়, মহৎ মানুষের উদার মনের চিন্তা-

ধারা মহতী মনেরই পরিচয়। দেশবন্ধু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যেমন ঘৃণা করেন নি, বরং পতিতাদের জাতে তুলে নেবার চেষ্টা করেছিলেন তেমনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের মধ্যেও তা দেখা গিয়েছিল। এ কি মানদার অন্তরের কান্নারই অধ্যায় নয়?' তোমরা যাদের পতিত করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তাদের ঘৃণাই করলে কিন্তু পতিত করল কারা? সে তো তোমাদেরই ঐ জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। নারীর জন্যে তোমরা যে শাস্ত্রের বচন বিদ্ধিবদ্ধ করেছ, তার কি রূপান্তর হয় নি? তার কি পরিবর্তন হতে পারে না?' এ কথা এই নিরুপায় নারীদের দিকে তাকিয়ে সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহনও বলেছিলেন। তিনি তো হিন্দু ধর্মের এই গোড়ামী দেখে তিতিবিরক্ত হয়ে নতুন এক ধর্ম প্রবর্ত্তন করেছিলেন। কিন্তু সে ধর্মের মধ্যে এই সব হিন্দুধর্ম পরিত্যক্ত নারীদেরই জায়গা পাবার কথা। অথচ সেই ব্রাহ্মধর্মও রামমোহনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্কীর্ণতা আষ্টেপৃষ্ঠে ধারণ করল। হতভাগীদের জায়গা আর কোথাও হল না। বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন নি, কিন্তু ধর্ম নিয়ে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু কিছুই হল না। আমরা আজও নারীর সতীত্ব নিয়ে শুধু বড়াই করি। শরৎচন্দ্র লেখনীর মধ্যমে সেই নারীর সতীত্বের বহু নমুনা দেখাতে চেয়েছিলেন। সতীত্ব কি? না, নারীর এক পুরুষে সীমাবদ্ধ থাকা। সেই এক পুরুষ যদি তার যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে নারীকে না গ্রহণ করে তবে নারী কি করবে? শরৎচন্দ্র এই প্রশ্নেরই উত্তর বার বার চেয়েছেন। নারীর অন্তরের বেদনা তাঁর লেখায় যেভাবে ফুটে উঠেছিল, নারীদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল কিন্তু যাদের জন্যে এসব করতে গিয়েছিলেন তাদের কি উপকার হল? সাবিত্রী কি এখনও তার হৃদয় যন্ত্রণা নিয়ে দোরে দোরে ঘোরে না? রাজলক্ষ্মী কি নিজের পাপের জন্যে এখনও ক্ষতবিক্ষত হয় না? মা যদি পদস্খলিতা হয়, তার জন্যে মেয়ে দায়ী হবে কেন? সরযূর মত মেয়ে কি এখনও সমাজে স্বীকৃতি পায়। পুরুষের আসক্তি, তাদের ব্যভিচার, তারা যে সব পাপ করে কোন দোষের মধ্যে নয় কিন্তু নারীর জন্যে সবই পাপ। নারীর একবার ভুলভ্রান্তি হলেই সারাজীবনের জন্যে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জ্বলতে হয়। এই জীর্ণ সংস্কার কি নারীর গা থেকে কখনও অপসারিত হবে না? মানদাও সে কথা তার আত্মকাহিনীর প্রতি ছত্রে ছত্রে সমাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তার বই বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হল। তার আত্মকথা বাড়ীর মেয়েদের কাছে যাতে না পৌছোয়, তারই চেষ্টা করা হল কিন্তু যা সত্য তা কি আর গোপন থাকে? এই আত্মকথা প্রকাশের মধ্যে মানদার যেমন দৃঢ় মনোবল লক্ষ্য করা যায়, তেমনি

শরৎচন্দ্রের মনোবল। তাঁর বই যত প্রকাশ হয়েছে, রুচিবাগিশের দল চিৎকার করে উঠেছে, অশ্লীল, অশ্লীল কিন্তু কোথাও অশ্লীলতার নাম গন্ধ ছিল না। শুধু নারীর মনের কান্নাই তার মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল। চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ সেই নারীমন যে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তারও হৃদয় যন্ত্রণা আছে, তারও মনে গোপন প্রেম তাকে সংস্কারের বাইরে টেনে নিয়ে যায়, সেই সব কথাই শরৎচন্দ্র গল্প সৃষ্টি করে বলেছিলেন কিন্তু চিরকাল যারা নারীকে জড় পদার্থ ভেবে এসেছে, নিজেদের খুশির হীরামন পাখি ভেবে এসেছে, তাদের যদি জীবন্ত করে মুখে ভাষা দেওয়া হয়, স্বার্থন্বেষীদেব মনে লাগবে না? শরৎচন্দ্রের বইও বোধ হয় বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত, যদি সরকার পক্ষ এদিকে দৃষ্টি দিত। আরও একটা কথা বলা যায, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বড় লেখকরা লেখার মাধ্যমে নারীর এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে 'চোখেব বালি' প্রকাশ তার প্রমাণ। তার মধ্যে বিনোদিনীব চরিত্র কোন অংশে সতীপণার ধার ধারে নি। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্তর পড়ে এই জানা যায়, তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'আমাব যা কিছু প্রেরণা সে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিনী থেকে আমি নারী মনের যন্ত্রণার সন্ধান পাই, আর রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির বিনোদিনী আমাকে দৃষ্টিমুগ্ধ করে। আমার চেতনার সঞ্চার হয় কিন্তু আমার লেখা ভিন্ন পথ গ্রহণ করে সে হল আমাবই কল্পনা।' তাঁর লেখা নিয়ে খুবই এককালে আন্দোলন হয়েছে। বহু পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার প্রয়োগ করেছে। বহু লোক যেচে এসে বহু সুনীতিমূলক কথা বলে গেছে, তিনি নির্বিকার থেকেছেন। তিনি তো জানেন তিনি কি করেছেন। কাদের কথা বলবার জন্যে তিনি কলম ধরেছেন। যে সময়ে তিনি চরিত্রহীন লিখেছেন, সে সময়ে তাঁর মধ্যে Perfection এসে গেছে।

তার আগে একটা সংশয়তার দোলায় তাঁর মন অস্থির ছিল। ভাগলপুরে ছেলে খেলার মত যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, সে সাহিত্য কতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ডিকেন্স, হেনরি উড, মারি কোরেলির লেখা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল কিন্তু তবু নিজস্ব যে ভাব ভাবনা তার মধ্যে কাজ করেছিল সেটা ঠিক কিনা কিছুতে বুঝতে পারেন নি। সেই জন্যে তাই লেখা প্রকাশের দিকে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। বাবার মতই তাঁর লেখা হয়ত পাঁচজনকে শুনিয়ে শেষ হয়ে যেত যদি না সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বড়দিদি উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশ করতেন।

এই যে সংশয়ের দোলা, নতুন এক ভাবের চিন্তা, দাপটে কিছু কথা স্পষ্ট ভাবে বলা, এর মধ্যে সেই নিজস্ব কৃতিত্বই প্রমাণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন তিনি তা বলবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর অবৈধ প্রেমের রূপ সহ্য করতে পারেন নি। সংস্কারহীনতা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। শরৎচন্দ্র সেই অবৈধ প্রেমের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। কতদিন যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী নিয়ে ভেবেছেন জানি না, তবে তাঁর উপন্যাসই যে তাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, এ কথা তাঁরই জবানীতে পাওয়া যায়। সেই প্রেরণা শরৎচন্দ্রের জীবনে বিফলে যায় নি। বঙ্কিমবাবু বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, আবার বিধবাকেই বিষ খাইয়েছেন। কেন? এই কেনর সন্ধানে সেই আঠারো কুড়ি বছরের যুবক রাতের পর রাত ভেবেছেন। আর তার সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। সেই অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা আমরা আগে প্রকাশ করেছি। নারীকে জানতে হবে। নারীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওরা কি ভাবে, কি চায়, কি ভাবে জীবন যাপন করলে ওদের সুখ হয়, এই জানার জন্যেই তাঁকে পতিতালয়ে যেতে হয়েছে। তখন যে তিনি খুব বেশিই ঐ সব অঞ্চলে যেতেন, তাঁর লেখনী দেখলে মনে হয়। দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদার মধ্যে যে তারই প্রভাব স্পষ্ট, এ অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালে লেখার মধ্যে গভীরতা এসেছে, চরিত্রগুলি ঐ ভাবে স্পষ্ট হাজির হয়নি, তবু এর বাইরে যে যান নি, তাঁর সব শেষ লেখাতেও দেখা গেছে। সংশয়ের দোলা তাঁর মধ্যে ছিল বলে লেখা প্রকাশের চেষ্টা করেন নি কিন্তু পরে যখন ঐ লেখাগুলিই জনসমাদৃত হয়, তখন তিনি মনেব দিক থেকে সম্রাটে পরিণত হযেছেন। আর তাঁকে পায় কে? তাই যারা বিধবা, পতিতা, মেসের ঝি নিয়ে উপন্যাস লেখার জন্যে ব্যঙ্গ করেছিল, তাদের তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'আমি এথিক্সের ষ্টুডেণ্ট, নীতির দিক থেকে অবিচল, আমি যা করছি, খারাপ করছি না। এই যে Boldness, এ তাঁর মধ্যে এল কোত্থেকে?

একদিন কত বিনিদ্র রাত্রি ভাবনার মধ্যে দিয়ে শুধু ভেবেছেন কি লিখব? কি ভাবে লিখলে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে নাড়া খাবে? এই যে গভীর প্রত্যয়ে ভাবনা, এ কার কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন? তাঁর জীবনীকারদের রচনা থেকে দেখি, কেউ তাঁর পাশে ছিল না। এ তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনা, অথচ সে সময়ে কি টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবন যেত। মা ভুবনমোহিনী দেবী মারা গেছেন। এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হল না। দাদুর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বাবা শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে খঞ্জরপুরে নন্দা ধোপীর বাড়িতে বাস

করতে লাগলেন। তিনি কলেজ জীবন হারাতে ভাগলপুরে রাজবনেলী স্টেটে শিবশঙ্করবাবুর সহকারী হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। তাঁর জীবনীকারদের রচনায় দেখি, এই সময়ে তিনি মাদক দ্রব্য পান করতে শুরু করেছিলেন।

একথা প্রকাশ করে কি বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে জানি না, কিন্তু লেখক মাদক দ্রব্য পান করতে শুরু করে, এ কি একটা উল্লেখযোগ্য কথা হল? জীবনীকারদের মানসিকতা যাই হোক, মনে প্রাণে যে লেখক হওয়ার চিন্তা করে, তাকে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, এ আমরা জানি। যাই হোক, শরৎচন্দ্র যে এই সময়ে পুরোপুরি নিজের অধীনে চলতে শুরু করেছিলেন এটাতেই বোঝা যায়। সে সময়ে তাঁর বন্ধু ছিল শরৎচন্দ্র মজুমদার, কুমার সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ ঘোষ, উপীলা ভাদুড়ী প্রভৃতি। এঁদের প্রভাব যে তাঁকে নিষিদ্ধ পথের দিকে টানত, এ আর অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী কালে এঁরাই যে এসব প্রচার করেছেন, এই ধারণা হয় কিন্তু শরৎচন্দ্র কার দ্বারা প্রভাবিত, এ কথা কেউ জানে না। তিনি যে নিজের মধ্যেই নিজেকে গঠন করেছেন, এ কে জানবে? দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে বসে মদ খেত। চন্দ্রমুখী বাধা দিলে বলত, 'তোমাদের ঘরে মদ না খেলে কি আসা যায়? মদ খেয়ে বেহুঁশ হলেই তো তোমাদের সঙ্গ ভাল লাগে।' চন্দ্রমুখী বলেছিল, 'অনেকে তো মদ না খেয়ে আসে।' দেবদাস ক্রুদ্ধভঙ্গিতে বলেছিল, 'তারা নরাধম।' শরৎচন্দ্র যদি মদ না খেতেন, বেশ্যাবাড়িতে না যেতেন, তাহলে কি দেবদাসের মানসিকতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হত? চুনীলাল প্রত্যহ সেজেগুজে চলে যেত। সারারাত কাটিয়ে বাড়ী আসত, দেবদাস জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কোথায় যাও চুনী?' চুনী বলেছিল, 'মেয়েমানুষের বাড়ীতে।' 'আচ্ছা ওখানে গেলে আনন্দ হয়?' চুনী বলেছিল, 'আমি তো পাই। কিন্তু দেবদাস গিয়ে এতটুকু আনন্দ পায় নি।

সাধারণ মানুষ লেখকের লেখা পড়ে আনন্দ পায় কিন্তু লেখকের এই অভিজ্ঞতার জন্যে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে সরে গেলে তারা পছন্দ করে না। এ প্রসঙ্গে আমরা মাইকেল মধুসূদনের কথা বলতে পারি। তাঁর স্বভাবের চঞ্চলতাই তাঁকে পূর্ণ যশ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। পাঠক লেখা পড়ে যেমন খুশি হয়, লেখকের একটা মূর্তি মনের মধ্যে গড়ে তোলে। তার এতটুকু এদিক ওদিকে হলে লেখককে মন থেকে সরাতে দ্বিধা করে না। সেই জন্যে শরৎচন্দ্র যখন খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন, তখন তিনি কোথাও নিজের সম্বন্ধে মুখ খোলেন নি। কেন খোলেন নি? তাঁরও ধারণা, আমাদের উপরি লিখিত ধারণারই

প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষ কেন যে ভাবে না, লেখকের লেখা চার দেয়ালের মধ্যে বাস করলে আসে না। যার যত অভিজ্ঞতা তার তত লেখার উৎকর্ষতা। শরৎচন্দ্র সেটা খুব ছোট বেলা থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন বলে তাই খ্যাতির উচ্চধাপে উঠেও তিনি সময় পেলে বেরিয়ে পড়তেন। বামুনের মেয়ে লেখবার সময়ে একটা অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, কোন এক গ্রামে গিয়ে ক্ষুধার্ত হতে একটি বাড়ীতে তিনি আশ্রয় চেয়েছিলেন। সেই বাড়ীর একটি মেয়ে তাঁকে স্বপাকে রান্না করবার জন্যে যোগাড যন্ত্র করে দিয়েছিল। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি রান্না করে দিতে পারবে না?' সে বলেছিল, 'আমি তো বামুন নই।' এই অভিজ্ঞতার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শরৎ তুমি বাউণ্ডুলের মত কত জায়গায় ঘুরতে পার, আমি এমন এক পরিবারের মানুষ যে আমার নিজস্ব ইচ্ছায় কিছু করবার নেই।'

এই বাউণ্ডুলে হয়ে ঘোরার চিন্তাটা শরৎচন্দ্র ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলেন। সবাই যা করবে, আমি তা করব না। সবাই যা ভাববে, আমার ভাবনা তা নয়। এই যে নিয়ম বিরুদ্ধ ছন্নছাড়া মন এটাই তো তাঁকে সাহিত্যের উপাদান জুগিয়েছে। তাঁর গল্প, তাঁর চরিত্রচিত্রণ সম্পূর্ণ একেবারে নূতন। তাঁর নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে চরিত্রের ভাবনা যেন একাকার হয়ে গেছে। রাজবনেলী স্টেটে কাজ করার সময়ে শিবশঙ্করবাবুর সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় গিয়েছিলেন বলেই তো পরে শ্রীকান্ত ও চরিত্রহীনে তার প্রভাব পড়েছিল। এই রকমভাবে তিনি প্রথম যৌবনে আদমপুরে কুমার সতীশচন্দ্রের নাট্যশালায় অভিনয় করে, শরৎ মজুমদারের কারখানায় কাজ করে, ক্রিকেট খেলে, মদ খেয়ে সময় ব্যয় করেছেন। এই দিনগুলি তাঁর বড় অলস মন্থর গতিতে বিদায় নিয়েছিল। অবশ্য ভাল হয়েছে এই জন্যে বলা যাবে, লেখকের মানসিক গঠন হচ্ছিল মনে মনে। এই সময়েই তো তাঁর ঐ আগের উপন্যাসগুলি লেখা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, লেখকের আলস্য বিফলে যায় না। কিছু না কিছু গঠন তার মধ্যে দিয়ে হয়। রাজলক্ষ্মী কিভাবে এল এইবার দেখুন।

১৯০৩ সালে পারিবারিক মনোমালিন্যের ফলে একেবারে ভাগলপুর ত্যাগ করেন। সেই সময়ে তিনি হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী বেশে ঘুরতে ঘুরতে মজঃফরপুরে গিয়ে উপস্থিত হন। এই সন্ন্যাসীর মানসিকতা আমরা শ্রীকান্তের মধ্যে পেয়েছি। শরৎচন্দ্র নিজে সন্ন্যাসী হয়ে সন্ন্যাসীদের মানসিকতা দেখে তিনি একেবারে অভিভুত হয়ে গিয়েছিলেন। এরা যে কি অদ্ভুত বুজরুক সে

আর কল্পনা করা যায় না। তাঁর এই সন্ন্যাসীদের ওপর ধারণা, তাঁর সন্ন্যাসী মেজভাই একবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে রামকৃষ্ণমঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। শরৎচন্দ্র কিছু বলতে চান নি, বলতে গেলে তিনি নার্ভাস হয়ে পড়তেন কিন্তু যখন বলবার জন্যে বার বার উৎপীড়িত হন, তখন তিনি এমন সব কথা বললেন, যা তাঁর পূর্বেরই অভিজ্ঞতার ফল। সমাজের অনেক দুর্নীতি ভদ্রতার মুখোস পরে সভ্য সমাজে ঘুরে বেড়ায়, পরবর্তীকালে তিনি যখন উচ্চস্থানে উঠেছেন, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সে সবের মুখোস খুলে দিয়েছেন, সেইজন্যে অনেকেই তাঁকে স্পষ্ট বক্তা বলত।

আসলে তো তা নয়। স্পষ্ট তিনি হয়েছেন, অনেক দেখে শুনে। এবার রাজলক্ষ্মীর কথায় আসা যাক। শরৎচন্দ্র এই সন্ন্যাসীর বেশে মজঃফরপুর গেলে তাঁর ছদ্মবেশ খসে পড়ে। সেখানে তিনি বন্ধু মহাদেবের সাহায্য পান। তিনি সঙ্গীত বিষয়ে আগেই পটু ছিলেন, এখানে এসে গানের মজলিশে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। শুধু [illegible] আরও আনুষঙ্গিক অনেক কিছু তাঁর জীবনে আসে। সে সবগুলি যে সাধারণের ভাল লাগার মত নয়, আমরা স্বনামধন্যা সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর স্মৃতিবিষয়ক রচনায় পাই। তিনিই পরে তাঁর বন্ধু নিরুপমা দেবীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্র যে ভাল নয়, ওকে বিশ্বাস করা যায় না, অন্তত কোন ভদ্র মেয়ে যে ওকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, এটাই সাবধানবাণীর আসল বক্তব্য। সে যাই হোক, শরৎচন্দ্র তখন অন্য গ্রহের মানুষ। কে তাঁকে ভাল বললো, কে খারাপ বললো, ওসব ভ্রূক্ষেপই করেন না।

তরল আনন্দের দিকে সর্বদাই যে তাঁর ঝোঁক, এটা বরাবরই দেখা গিয়েছিল। সেই তরল আনন্দের আস্বাদ পান তিনি মহাদেবের সান্নিধ্যে। আমরা তাঁর বিনিময়ে লেখকের কাছ থেকে কি পেয়েছি? না, চারখণ্ডে সমাপ্ত সুবৃহৎ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস। রাজলক্ষ্মীর দেখা কি তিনি সেখানে পেয়েছিলেন? ধরে নিলাম, না। সেখানে পিয়ারী বাঈজী বলে এক রূপসী যৌবনবতী নারী অপূর্ব সুকণ্ঠে গান গেয়ে আসর মাৎ করেছিল। শরৎচন্দ্রও গান গেয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে বাঈজী তার প্রতি আসক্ত হয়। এই আসক্তি তাঁকে এতই অভিভূত করে যে লেখকের মনে পাতার পাতা লেখা হয়ে যায়। আমরা যদি কিছু সংলাপ মনগড়া তৈরী করি তা কি খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে? ধরা যাক্ আসর জমজমাট। মদের পেয়ালা হাতে হাতে ঘুরছে। শরৎচন্দ্রও দু'এক পাত্র খেয়েছেন। নেশা খুব বিশেষ হয় নি। গানও তিনি প্রাণ ভরে গেয়েছেন। মাঝে মাঝে বাঈজীর সঙ্গে

চোখাচোখি হয়ে গেছে। তার মুগ্ধ দৃষ্টি শরৎচন্দ্রের 'পরে। ঠোঁটের ওপর হাসির রেখা। চোখ দিয়ে যেন কি কথা বলতে চায়। ভাবখানা এমনি। 'তুমি এসব খাচ্ছ কেন? তুমি কেন এখানে এসেছ?' তারপর বাঈজী উঠে নিজের ঘরে চলে গেছে। শরৎচন্দ্রকে ডাকতে পাঠিয়েছে। শরৎচন্দ্র গেলে বলেছে, 'তুমি এত ভাল গান গাও, তোমায় তো ওদের মত মনে হয় না। তুমি এখানে কেন?'

শরৎচন্দ্র হেসে চলে আসতে চেয়েছেন। বাঈজীর কথার উত্তর তো তাঁর মনের ঝুলিতে নাই। তিনি কেন আসেন, কেন এই সব পছন্দ করেন, একি তিনি নিজেই জানেন?

তিনি চলে আসতে চাইলে বাঈজী জামার খুঁট ধরে বাধা দিয়েছে। 'আমার কথা শুনলে না?'

'কি?'

'তুমি এখানে আর আসবে না?'

'কেন?'

বাঈজী একদৃষ্টে শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। বাঈজীর চোখ দুটির ওপর যেন কিসের ভাষা। শরৎচন্দ্র অভিভূত। বাঈজী আবার কথা বলল, 'আমাকে কথা দাও আর আসবে না? এ জায়গা তোমার জন্যে নয়। ঐ লোকগুলোর মত তুমি নও।'

শরৎচন্দ্রের তখন জানা হয়ে গেছে বাঈজী তাকে ভালবেসেছে। তাই জবাবও তিনি দেন, 'যদি না আসি, তাহলে তো তোমায় দেখতে পাবনা। তোমার গান শুনতে পাব না।'

বাঈজী বুঝে চুপ করে গেছে। তারপর অনেকক্ষণ বাদে অস্ফুটকণ্ঠে বলেছে, 'আমার গান তোমায় আমি আলাদা শোনাব। আমি যখন ঘরে থাকব তুমি এস। তবু তুমি এই আসরে যেও না।' বলে বাঈজী শরৎচন্দ্রের হাতখানা নিয়ে নিজের কোমল গালে চেপে ধরেছে।

অনুমান নয়। এমনি কিছু ঘটনাই সেই মজঃফরপুরে ঘটেছিল। কোন বাঈজীর মনে শরৎচন্দ্র জায়গা পেয়ে ছিলেন, কিম্বা এও বলা যায়, আসরে গান শুনতে শুনতে মনে মনে বাঈজীকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বাঈজীর নিটোল স্বাস্থ্য, দেহ গৌরবর্ণ, পটলচেরা সুর্মালাঞ্ছিত আঁখি, রসাপ্লুত রক্তাভ ঠোঁট জোড়া —তাঁকে ভালবাসার স্বপ্নের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপরই রচিত হয়েছিল রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীতে আমরা কি পাই? এক বাঈজীর মানসিকতা। যার

অতীত ঘৃণিত কিন্তু মনটা ঐ মজঃফরপুরের বাঈজীর মত। সেই ক্ষণস্থায়ী প্রেম লেখকের মনে দীর্ঘ প্রেমের নজির সৃষ্টি করেছিল। আর সেই প্রেমে চিরকাল নায়ক এক ভবঘুরে জীবন নিয়ে থাকে। বাঈজী তার প্রেম দিয়ে নায়ককে আপন করে রাখে। তার নিজস্ব নারীত্বের সবটুকু ঐ এক পুরুষে উৎসর্গীকৃত। রাজলক্ষ্মী বার বার নিজের পাপের পথ থেকে বেরিয়ে এসে সহজ জীবনের কান্নায় নায়ককে আপন করেছে। শরৎচন্দ্রের মানসিকতায় ছিল বাল্যপ্রেমের কাতরতা, কারুর সঙ্গে তিনি বৈঁচীফলের মালা বদল করেছিলেন কিনা জানা যায় না, বাল্য প্রেমের গোপন ইচ্ছা যে তাঁর মধ্যে ছিল, লেখনী দেখেই তা মনে হয়। পার্বতী মালা না দিলেও দেবদাসের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা সহজাত ছিল, এবং অদূর ভবিষ্যতে তার ভালবাসা সমাজ সংসার মানে নি, সে আমরা দেখেছি। পরিণীতায় ললিতা মালা বদলের জোরে শেখরকে স্বামী বলেই জেনেছিল। রাজলক্ষ্মীর জোরও সেইজন্যে। শ্রীকান্তের প্রতি প্রাণঢালা ভালবাসা, সে ঐ বাল্যকালে বৈঁচীফলের মালা দেওয়ারই ফল। বাল্যকালে মেয়েরা এত পাকা হয়, সে শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারায় দেখা যায়। অবশ্য সে যুগে এই সম্ভব ছিল। কারণ, বাল্যবিবাহ তো সে সময়ে চালু ছিল। মেয়েদের পুতুল খেলতে খেলতে বিয়ে হত। সে যাই হোক্, এই রাজলক্ষ্মীকে বেস্টন করে এসেছে অভয়া। অভয়ার মানসিকতা দেখুন, স্বামীর জন্যে তার কাতরতা ছিল, এক পুরুষ ছাড়া মেয়েরা ব্যভিচারিণী হয় বলেই তো রোহিনীর ভালবাসা প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু সেই স্বামীর ব্যবহার শেষপর্যন্ত কি হল? শ্রীকান্ত মেনে নিতে পারেনি কিন্তু রাজলক্ষ্মী মেনে নিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী বলেছিল, 'অভয়া অন্যায় করেনি। জগতে প্রণয়ের দাম যে সবচেয়ে বেশি সে তো সে নিজেই বুঝতে পাচ্ছে।' রাজলক্ষ্মী এক এক সময়ে তার প্রণয়ের বাইরে গিয়ে বাঈজী জীবন নিতে চেয়েছে। নিয়েছেও কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। নাককান মলে স্বীকার করেছে, 'আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম, এ পথ আমার নয়।' এই মানসিকতাই শরৎচন্দ্রের নারীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। এই মানসিকতা তিনি পতিতার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। রাজলক্ষী তো আপাতত দৃষ্টিতে পতিতাই কিন্তু তার গঙ্গাজলের মত পবিত্র মন কোথায় দেখা যায়? পল্লীসমাজের রমা আজীবন রমেশকে মনে মনে ভালবেসে গেল, শুধু সে মুখ খুলতে পারল না পল্লী সমাজের জন্যে। চরিত্রহীনের কিরণময়ীও তো তাই। হৃদয়ের ক্ষুধা এতই তাকে পঙ্গু করেছিল যে উপেন্দ্রর প্রতি তার আসক্তি জাগে। এই জাগাটা যে

অন্যায় নয়, এ তো স্রষ্টা বার বার দেখিয়েছেন। কিরণময়ী যদি আরাকানে দেহ ব্যবসা শুরু করত, তাহলে কি আমরা অন্যায় বলতাম? কখনই নয়। একালে এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটে। আর সেই সব নারীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা সপাটে বলে, 'কি করব, কাউকে যদি না পাই, দেহের ক্ষুধা মেটাব কেমন করে?' শরৎচন্দ্রের কাল আজ অস্তমিত। এখন নারীর সতীত্বের মূল্যবোধ অনেক পালটে গেছে. আমরা যদি বলি, এ বিপ্লব শরৎচন্দ্র ঘটিয়েছেন, তাহলে কি বলাটা অত্যুক্তি হবে? মনে তো হয় না। তবে এ নিয়ে আমরা একালের বারবনিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

বারবনিতা প্রসঙ্গটা আভিধানিক অর্থে পতিতাদেরই বোঝায় কিন্তু আমাদের এই সাংসারিক জীবনে নারী সব সময়ে কি তার মন এক পুরুষে রাখতে পারে? উত্তর হবে, না। কেন? নারী স্বাভাবিক জীবনে কখনই এক পুরুষে খুশি থাকে না। সমাজ বন্ধন হোক আর যাই হোক। এই স্বাভাবিক। শুধু দুর্নাম রটবার ভয়ে সংযত হয়। তার ওপর নানারকম জটিলতা বিবাহিত জীবনে এসে পড়ে। এমনও তো দেখা গেছে, জোর করে বাবা মা বিয়ে দিল। স্বামীর সংসার করল। সন্তান গর্ভে নিল। হঠাৎ দেখা গেল, তার পূর্বপ্রণয়ী আসা যাওয়া করে। জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে, 'ভালবাসা তো জোর করে হয় না, ওকে আমি ভালবাসি।' এ নারীকে আপনি কি বলবেন, 'নষ্টা, পতিতা, দ্বিচারিণী।' তাই বারবনিতা শব্দের যে আখ্যাই হোক, সেটা খুব সহজভাবে বলা যায় না। অনেক ভাবেই তার অর্থ সৃষ্টি হয়।

এই সব নারীমনের বিভিন্ন মানসিকতা নিয়ে শরৎচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। বাঙ্গালী মনের সংস্কার বর্জন করে তিনি পাশ্চাত্যের রূপকে জীবনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। শেষপ্রশ্নের কমল সেই চরিত্র কিন্তু সে কি স্বীকার করা যায়? তবু সেই উদারতা আমাদের আধুনিক সমাজে এসে গেছে। মনের মিলটাই আসল। জাত-কুল মানা ওটা কুসংস্কারের ধর্ম। মনের মিল নিয়ে শরৎচন্দ্র বিপ্লব করেছেন, যেখানে মনের মিল, সেখানে সমস্ত বাধাই চলে যায়। যদি সংস্কার না আটকায়, নারী পুরুষের জীবনে এর চেয়ে সুখ আর কিছুতে নেই।

এ তো গেল আমাদের সাধারণ জীবনের প্রশ্ন। পতিতাদের কথা কি বলেছেন? তিনি সাতশ পতিতা নারীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করে একটি নারীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেটি ব্রহ্ম প্রবাসকালে বেঙ্গল সোসিয়াল ক্লাবে পাঠ করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তার দর্শন আমরা পেলাম না। আমাদের ঠিক দুর্ভাগ্য নয়, পতিতাদেরই দুর্ভাগ্য। সেই সব হতভাগিনী মেয়েদের কথা একজন বলবার জন্যে এগিয়েছিলেন, অগ্নিদেবতার কালগ্রাসে তা ভস্মীভূত হয়ে গেল। আজ সে কাহিনী থাকলে যে রচনা লিখতে কলম ধরেছি, তার অনেক উপকার হত। পতিতা নারী যে মানুষ, তারা দেহ ব্যবসা করে বটে কিন্তু তাদের মন যে গৃহস্থ বাড়ীর নারীর মনের চেয়ে কোন অংশে অপবিত্র নয়, সেটা প্রকাশ হত। পাঠিকারা রাগ করবেন না। গৃহস্থ মেয়েরা অনেক সময়ে অনেক ঘটনা গোপন করে রেখে বাইরের চোখে নিজেকে পবিত্র প্রমাণ করে। তার কারণ সভ্য সমাজে বাস করতে গেলে গোপন না করলে বাঁচা যায় না। কিন্তু এ জায়গায় পতিতা মেয়েরা গোপন করে না, তারা বলে, 'আমরা যা তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা স্ট্যাম্প মারা। কিন্তু আমরা আর কোন গোঁজামিল দিতে রাজী নই।' তারা ছলাকলা করে খদ্দের আকর্ষণ করে বটে কিন্তু মনের থেকে তারা খাঁটি। তাদের অর্জিত অর্থে বহু পরিবার পুষ্ট হয়, পরিত্যক্ত স্বামীও এসে তার পতিতা স্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে যায়। আপনি গেলে দেখবেন, ওদের প্রত্যেকের ঘরে প্রচুর ঠাকুর দেবতার ছবি। পালপার্বণে তারা উপবাস করে। প্রয়োজনে কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে, তারকেশ্বরে যেতেও তাদের বাধে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'বাহ্, হিন্দুর মেয়ে না, দেহব্যবসা করি বলে কি মানুষ নয়?' মানুষ নয় কথাটা বলা ওদের প্রচলিত অর্থে। অর্থাৎ নারী নয়। এই নারী মনের সন্ধানে শরৎচন্দ্র একদিন ওদের আলয়ে গিয়েছিলেন। ঘৃণা করেন নি বরং বার বার তাদের সমাজে প্রবেশ করে তাদের অতল দেখেছেন। কোন জীবনীকারের লেখায় দেখলাম না একজন পতিতাকে তিনি সমাজে জায়গা করে দিয়েছেন। তাতেই মনে হয়, তাঁর সীমিত শক্তির চিন্তায় এ সাহস করেন নি। তবে আগে উক্ত হয়েছে, তাঁর দাদাঠাকুরের ভূমিকাটি। বানানো গল্প নয়, এ সত্যিই। সেই সাতশো পতিতার কাহিনী যদি আজ আমরা পুস্তকাকারে পেতাম কি যে ভাল হত। হয়ত তাঁর সম্বন্ধে অনেকের ধারণা একটু পালটে যেত কিন্তু পতিতাদের তো ভাল হত। জনপ্রিয় লেখকের লেখার যেমন সমাদর আজও আছে তেমনি তাঁর রচিত পতিতা চরিতকথা পড়ে পতিতা সম্বন্ধে মানুষ একটু অন্য রকম ভাবত। তাদের অন্য সারিতে বসিয়ে সেই পুরোনো সংস্কারকে বুকে রেখে ঘৃণা করত না। পতিতালয়ের পথ দিয়ে যেতে যেতে একজন একজনকে ফিস ফিস করে বলত, 'এই ঐ মেয়েটা বোধ হয় কমলা।'

'কমলা কে ?'

প্রশ্ন কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরদাতা ধমকাত, 'কমলা কে জানিস্ না ? শরৎচন্দ্রের নারীর ইতিহাস পড়িস নি ? সেই যে মেয়েটা নাচে গানে আনন্দে, স্ফূর্তিতে পতিতাভবন মুখরিত করে রাখত। সবাই তাকে বিয়ে করতে চাইত কিন্তু সে সবার কথায় মাথা নাড়ত, আমি বিয়ে করবই না।'

'কেন ?'

'আমি তো বেশ্যা। তুমি কি বিয়ে করে আমাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারবে ?'

কেউ বেপরোয়া হলে বলত, 'হ্যাঁ আমি ঘরে নিয়ে যাব। আমি তোমায় বিয়ে করব। আমি তোমায় বৌ করব।'

সবার কথায় কমলা হাসত। কমলার মধ্যে কি ইচ্ছেটা জাগত না ? তার দু'বছর আগেই তো তাকে একজন ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করব বলে বের করে এনে এখানে তুলেছিল। কিন্তু মেয়েটি এমনিই প্রাণবন্ত যে তাকে ভাল না বেসে পারা যায় না। যে কোন খদ্দেব এলেই তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেত।

আব সেই তাকেই ভালবাসত। 'কমলা, আমার সঙ্গে যাবে ?' কমলা বুকে মুখ গুঁজে মাথা নাড়ত। 'কেন যাবে না ?' কমলা বুকের মধ্যে মুখ গুঁজেই উত্তব দিত, 'আমি যে খারাপ মেয়ে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে বল্‌তো !'

সেই কমলা একদিন ভালবাসল। একজন প্রায়ই আসত। সবাই ভাবল খদ্দের। কেউ তো কারুর খোঁজ রাখে না। একদিন দেখা গেল কমলা দোকানে গিয়ে একটা জামা কিনল। সঙ্গের বন্ধুরা বলল, 'কি রে কার জন্যে ?

'আছে।' কমলা আর ভেঙে কিছু বললো না। সেই জামা যার গায়ে উঠল, সবাই দেখল। সবাই আরও জানল, ছেলেটি কিছু করে না। কেমন উদাস উদাস চাউনি। কমলাই তাকে সাহায্য করে। বন্ধুরা বলল, 'কমলা তুই মরেছিস্ ? এত খাটনির পয়সা ঐ বাউণ্ডুলে লোকটাকে দিস্।'

কমলা বলল, 'তা হোক।' আরও পরিবর্তন দেখা গেল, লোক এলে কমলা তাড়িয়ে দেয়।

বাড়ীওলী বলল, 'কিরে আমার দশ দিনের ভাড়া জমেছে, কবে দিবি ?'

'দেব।'

আরও ক'দিন পরে বাড়ীওলী বলল, 'কি হল আমার ভাড়া ? শুনেছি তুই নাকি আর ঘরে লোক ঢুকতে দিস্ না ?'

কমলা বলল, 'না মাসী, ও পছন্দ করে না।'

বাড়ীওলী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল. 'তোকে যে ঘোড়া রোগে পেয়েছে সে বুঝতে পাচ্ছি। আমার ঘরটাই নাহয় খালি করে দে।'

কমলা মৃদুস্বরে বলল, 'খুব শীগগীর দেব। ও একটা চাকরী পেলেই আমরা তোমার ঘর ছেড়ে দেব।'

বাড়ীওলী আর কিছু বলল না। বিরক্ত হয়ে চলে গেল। কিন্তু একদিন কমলার নিস্তব্ধ ঘরে খুব কান্না উঠল। কমলা ডুঁকরে ডুঁকরে কাঁদছে, কি ব্যাপার? বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে ভীড় করে দাড়াল। জিজ্ঞাসা আর করতে হল না, কমলাই বলল, 'আমি মরেছি। আমার যথাসর্ব্বস্ব ঐ লোকটার হাতে তুলে দিলাম, সে নিয়ে পালাল।' তার কথাতে এই জানা গেল, দিন চারেক আগে সে এসে বলেছিল, 'আমি একটা চাকরী পেয়েছি কিন্তু হাজারখানেক টাকা আমাকে জমা দিতে হবে।' কমলা ভালবেসে তার সব গহনা তার হাতে তুলে দিয়েছিল, এই আসছি বলে সেই যে আর আসে নি। এমান ধরণের কাহিনী কি আমরা শরৎচন্দ্রের নারীর ইতিহাসে পেতাম না? শ্রীকান্তের চতুর্থ পাঠে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলছে, 'তোমায় আর চাকরী করতে হবে না।'

শ্রীকান্ত বলল, 'তাহলে কি করব?'

'কেন আমাদের দুজনের চলার মত কি কিছু নেই?'

শ্রীকান্ত চুপ।

রাজলক্ষ্মী বলল, 'জানো আমি আমার পাপের পয়সা দিয়ে নিজের জীবনও চালাই না। আমার অনেক ব্যবসা আছে একটা কাপড়ের দোকান, একটা মুদির দোকান। তুমি তো একটা দোকান চালাতে পার?

শরৎচন্দ্র চতুর্থ পাঠ লিখেছিলেন অনেক পরে। রাজলক্ষ্মীর এ অভিজ্ঞতা কি তাঁর ঐ পতিতা জীবন থেকে আসে নি? সেইজন্যে বলব, আমরা বড় কিছু হারিয়েছি। সেই সাতশো পতিতার কাহিনী আমাদের হাতে এলে আমাদের অনেক উপকার হত। আমরা অনেক নারীর কাহিনী একত্র জানতে পারতাম। কল্পনা নয়, বাস্তব কাহিনী।

কোন একজন এ যুগের সাহিত্যিক বলেছেন, শরৎচন্দ্র সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে নিজের লেখক জীবন নষ্ট করেছেন রসের ক্ষেত্রই লেখক জীবনের আসল ধর্ম, সমাজ সংস্কারকের নয় কিন্তু বেঁচে থাকলে শরৎচন্দ্র এর উত্তর দিতেন। তিনি সমাজ ও জীবনকে যে আলাদা করে দেখেন নি তাঁর প্রতিটি চরিত্রই তার প্রমাণ। লেখক যে শুধু রসের খাতিরে লেখা লিখবে এ তিনি

মেনে নিতে পারেন নি। আর রস, তাঁর লেখায় কি রস ফোটে নি? বরং বলা যায়, তিনি ছিলেন রসের সাগর। তার চরিত্রগুলি সেই রসসাগর সাঁতরে মানুষের বুকের মাঝখানে এসে জমেছে। এত আলোচিত কি এ কালেরও কোন লেখকের লেখা নিয়ে হয়েছে? তাঁর কল্পনাপ্রসূত সেই রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, কিরণময়ী, অচলা, জ্ঞানদা, অলকা, বিজয়া, পার্বতী, চন্দ্রমুখী, মাধবী, ললিতা, রমা, বিজলী, নারায়নী, বিরাজবৌ, শুভদা, সন্ধ্যা এরা কি নারী চরিত্রের এক একটি দৃষ্টান্ত নয়? এরা যেন সজীব, কোন মানবী কল্পনা নয়। আমাদের এই সুখ দুঃখের সংসারের মানুষের সঙ্গে এরাও যেন জড়িয়ে গেছে। এমন লেখক এই বঙ্গভাষায় আর কে আছে? যাঁর সৃষ্টি এত প্রাণবন্ত, আজ এই শত বৎসরের প্রাক্কালেও তাঁর পাঠক সংখ্যাও দেখবার মত। এখনও যেন নারী তার প্রাণ খুঁজে পায় এই সব চরিত্রের মধ্যে থেকে। তাই ঐ লেখকের কথার তাৎপর্যের কোন অর্থ নেই। বরং তিনি যেমন ক'রে ভেবেছিলেন, আজকের লেখকের তেমন করেই ভাবা উচিত। তবে যিনি মহত্বের কাণ্ডারী, মহৎ চিন্তা তাঁকে জীবনের গভীরে পৌছে দেবেই। তাঁকে অনুসরণ করবে অন্যেরা। তাঁকে নিয়ে সমালোচনা নয়। সমালোচনার উর্ধ্বে তিনি। লেখকরা অনেকেই পতিতালয়ে যান কিন্তু গিয়ে কি খোঁজেন? না মনের একটা আনন্দ স্ফূর্তি। সহজভাবে নারীর সান্নিধ্য, যে সান্নিধ্যটা সাধারণ জীবনে খুব সহজ নয়। সেইভাবে একদিন শরৎচন্দ্রও এই পতিতালয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি এইসব মেয়েদের কাছ থেকে যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাননি, তাঁর মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল, সেই প্রশ্নের সমাধান চেয়েছিলেন। কিন্তু সমাধান করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছেন, অদ্ভুত কতকগুলি জীবন দর্শন করে। এরাও মানুষ। এরাও একদিন আমাদের সমাজভুক্ত ছিল কিন্তু কোন্ পাপে যে এরা ঐ বারাঙ্গনা ভবনে ঢুকল তা তিনি জানেন না। জানার চেষ্টাতেই সারা জীবন ধরে আমাদের জীর্ণ সমাজের নির্মম অত্যাচারগুলিই তাঁর গ্রন্থে লিখে গেছেন। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি সমাজ সংস্কারক। সমাজের নির্মম অত্যাচারগুলিই তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সমাজ সংস্কারক যদি না হতেন, তাহলে কি রাজলক্ষ্মী চরিত্র সৃষ্টি হত? রাজলক্ষ্মী বার বার শ্রীকান্তকে চেয়েছে কিন্তু কখনও নিজের অবস্থাটা বিস্মৃত হয় নি। কখনও তাকে নারী সহবাসে উদ্ভুত করে নি। এ কৃতিত্ব অবশ্য লেখকের। তাঁর সংযম পাতায় পাতায় কাজ করেছে কিন্তু তা যে নয় আমরা পতিতা চরিত্র আলোচনা করে দেখেছি। পতিতা নিজের ঘৃণ্য দেহ যে পূজায় নিবেদন করে না, তা আমরা

জান। সেইজন্যে তাকে যদি গৃহস্থঘরে গিয়ে বাস করতে বলেন, সে বলবে, 'ছি, আমি কি ভাল আছি যে তোমাদের ঘরে গিয়ে থাকব?' এই মানসিকতা কোথায় পাওয়া যায়? এই মহানুভবতা আর কাদের মধ্যে দেখা যায়? শরৎচন্দ্র এই সব দেখেছিলেন বলেই তাদের জন্যে তিনি সারাজীবন কেঁদেছেন। তাদের তিনি সমাজে স্থান দিতে পারবেন না জানতেন কিন্তু আর যাতে তারা এসে এখানে ভীড় না করে সেইজন্যে লেখনীর মধ্যে নারীর যন্ত্রণা দেখিয়ে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু উপকার কি হয়েছে? সেকথা আমরা বলব না, বলবেন আপনারা, যারা এই লেখা পড়ছেন। তবে যদি বলেন, এই বই লেখা হচ্ছে কেন? তার উত্তরে বলব, শরৎচন্দ্র যে ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করেছিলেন, আজ এই তাঁর জন্ম শত বর্ষের সময় সেই ইচ্ছাটা যাতে কার্যকরী হয়, তারই জন্যে এই প্রবন্ধের উপস্থাপনা। আর প্রার্থনা সমগ্র মানব সমাজের কাছে, নারীমনের বেদনার অংশীদ হোন। নারীকে মানুষ বলে জ্ঞান করুন। আমরা আর একবার সেই মানদাসুন্দরীর আত্মচরিত পাঠে চলে যাই। যে নারী তার স্খলন থেকে উত্তরণের সমস্ত কাহিনী অকপটে লিপিবদ্ধ করেছিল, এতটুকু লুকোয় নি, তার কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখ করলেই আপনারা দেখতে পাবেন, শরৎচন্দ্র কেন তাদের জন্যে এত উতলা হয়েছিলেন? মানদাসুন্দরী বলেছে, 'আমি এই জঘন্য জীবন চাইনি কিন্তু প্রথম আমার প্রবৃত্তির লোপ, যৌবনের উদ্দামতা ভুলতে না পেরে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবকের সঙ্গী হলাম, তারপর সেই পাপে আমাকে আমার পরিবার গ্রহণ করল না। কেউ যদি আমাকে একটু আশ্রয় দিত, তাহলে কি এই বৃত্তি আমি নিতাম?' মানদাসুন্দরীর কথাটাই যথার্থ, প্রায়ই মেয়েরা চায় না এই জঘন্য বৃত্তি ধারণ করে বেঁচে থাকতে। এই সব দেখেই মনে হয় শরৎচন্দ্র সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নারী পুরুষ উভয়েই প্রবৃত্তির দাস। এক সময়ে যৌবন যখন আসে, কেউ হৃদয়ের দুর্বলতা রোধ করতে পারে না। পুরুষ সামাজিক শক্তিতে বেঁচে যায়, নারী পারে না। এই নারীদের জন্যেই শরৎচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপনা করেছেন। যেমন, বড়দিদির মাধবী, বিধবা হলেই যে কামনা বাসনা লোপ পাবে, এর কোন মানে নেই। অবশ্য বিধবা মাধবী কোন যৌন আকাঙ্খা করে নি কিন্তু দৈহিক কামনার আগেই তো হৃদয়ের মধ্যে একটা ভালবাসার জন্ম নেয়। শরৎবাবুই তো বলেছেন, 'মাধবীর কাছে দুজনেই ছেলেমানুষ, যেমন প্রমীলা, তেমনি তার মাস্টারমশাই। দুজনের জন্যেই ভাবতে হয়।' যুবতী নারীর স্নেহ যে প্রেমে রূপান্তরিত হয়,

সে কথা শরৎচন্দ্রের উক্তিতেই ধরা যায়। যদিও তিনি বলেছেন, 'এ আমার বাল্যকালের রচনা, অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু মাধবীর প্রেম তো মিথ্যা নয়। তেমনি নারী যে বয়সকালে ভালবাসার জন্যে কেমন উদ্দাম হয়, সে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন, আর এই ভালবাসার ক্ষুধা নারী প্রায় ক্ষেত্রে সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে প্রবৃত্তি দমন করে রাখে। অবশ্য তিনি কোন গল্পে দেখান নি, নারী এই প্রবৃত্তির জন্যে পতিতালয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে তাঁর কলম সংযত। দেবদাসের চন্দ্রমুখী দেবদাসের সংস্পর্শে ভাল পথ গ্রহণ করেছিল। মায়ের পাপে মেয়েকেও ত্যাগ করে সরযুকে পতিতালয়ে পাঠান নি। তাকেও সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমন কি ললনা দেহ ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে সুরেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই যে সামাজিক স্বীকৃতি, এতেই কি মনে হয় না শরৎচন্দ্র কি চেয়েছিলেন? মানদা আক্ষেপে বলেছে, 'কবি সাহিত্যিকরা পতিতাদের নিয়ে যে সব চরিত্র আঁকছেন, তাতে মানুষকে আরও ঘৃণা করা শেখাচ্ছেন কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে কেন? পতিতা করছে কারা? সমাজের সেই সব চিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলুন।' শরৎচন্দ্র গৃহদাহ উপন্যাসে অচলার মধ্যে দিয়ে মানদার মনের কথাই পরিস্ফুট করেছিলেন। কে দোষী অচলা, সুরেশ, না মহিম? অচলার মনের নানা ওঠাপড়া দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। কখনও সুরেশকে অচলা ঘৃণা করেছে, কখনও মহিমের অবহেলায় ক্ষিপ্ত হয়েছে। সংসারে নিরুচ্চার, নির্ব্বাক, শীতল চরিত্র মহিম কি দুর্লভ? কখনই নয়। এমন মানুষ ঢের ঢের আছে, যারা স্ত্রীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা নিতে পারে না। 'সেই সব' অক্ষম স্বামীদের জন্যেই নারী প্রায় ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত। একটা গল্প এই প্রসঙ্গে মনে এল, বন্ধুবান্ধবরা বৌভাতে এসেছে, সুন্দরী, সপ্রতিভ, বিদুষী স্ত্রীকে দেখে কম জোরী বন্ধুকে বন্ধুবান্ধবরা সর্বসমক্ষে রসিকতা করল। 'ললিত, তোর এমন বউ হওয়া উচিত হয় নি। এ যে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।' তারপরই দেখা গেল, বন্ধুদের মধ্যে কেউ নিয়মিত যাতায়াত করছে। স্ত্রী বুঝে স্বামীকে সাবধান করল কিন্তু স্বামী দুর্বল, স্পষ্ট করে মানী বন্ধুকে কিছু বলতে পারল না। তারপরেই যদি কোন ঘটনা সংসারে ঘটে তার জন্যে কে দায়ী? শরৎচন্দ্র গৃহদাহ নাম দিয়ে মহিমের গৃহদাহ করেছেন। সুরেশও কি অচলাকে পেয়ে সুখী হয়েছিল? অচলার দেহ আকাঙ্খায় পাশবিক আকর্ষণে সুরেশ যে সব কাণ্ড করল, কিন্তু দেহ পাবার পর কি হল? সে বুঝল, যে দেহ স্বইচ্ছায় সুস্থ আবেদনের মধ্যে পাওয়া যায় না, সে দেহ জোর করে গ্রহণে কোন সুখ নেই।

শরৎচন্দ্র এ উপন্যাস রচনা করে পাঠককে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন ? অস্থির চিত্ত পুরুষের যে কামপ্রবৃত্তি গগনচুম্বী হয়, সে যে ভাল নয়, সে হওয়াও উচিত নয়, এই তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু কে আর শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ মনে রেখে নারীর পিছনে ধাওয়া করে ? তবু লেখক তাঁর কাজ করে গেছেন। এখন আপনি গ্রহণ করবেন না করবেন, আপনার অভিরুচি। মানদা সুন্দরীও তাঁর আত্মচরিতে সেই কথা লিখেছেন, 'কতরকম মানুষ এই সংসারে দেখলাম। শিক্ষিত, অশিক্ষিতর বিচার থাকে না, ধনী নির্ধনীও ছার, পতিতা নারীর একটু কৃপা পাবার জন্যে দলে দলে তারা এই আলয়ে হত্যে দেন। কত মানুষের সুন্দরী স্ত্রী, কত মানুষের সামাজিক উচ্চ আসন, প্রতিপত্তি, সব ধূলায় ধূসরিত। তারা আমাদের ঘরেই পড়ে থাকে। আর আমরা নষ্টা মেয়েছেলে, ভালবাসার অভিনয় করে, মিথ্যা কথার জাল বুনে, প্রবঞ্চনার আশ্রয় দিয়ে তাদের জানাই, আমি তোমার কত প্রিয়। এই যে আমাদের পরিবর্তন, এর জন্যে দায়ী কারা, ঐ তো যারা আমাদে[illegible] আসে। ধিক এ নারী জীবনের। নারীর যদি সহজ কোমল ভাব গেল, তবে থাকল কি ?'

এই যে নারী জীবনের রূপান্তর, কোমল থেকে ভীষণ, সহজ থেকে জটিল, এসবই কি শরৎচন্দ্র দেখেন নি, দেখেছিলেন বলেই তো তাদের নির্বাণ চেয়েছিলেন। সাহিত্যে তাদের তুলে নিয়ে এসে তাদের মনের কান্নাই গল্পের আকারে প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র বহু নারীকে মুক্তি দেবার জন্যে কাশী, বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। সে সময়ে তাই ছিল। কাশী, বৃন্দাবনে গিয়ে জপতপ করে, প্রবৃত্তি দমনের মধ্যে দিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দিক। আজ আর সেইরকম কোন জায়গা নেই, যেখানে গেলে তাদের মুক্তি মিলবে। তবে সান্ত্বনা, এক সমাজ আর আগের মত অত নামাবলী গায়ে দিয়ে চলে না। পতিতাবৃত্তি এখন মেয়েরা করে অন্যার্থে, সে আলোচনা আমরা একালের বারবনিতা প্রসঙ্গে করব।

শুধু শরৎচন্দ্রের বারবনিতা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, সেই বরেণ্য লেখকের প্রতি আমাদের যদি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে পতিত থেকে নারীদের উত্তরণ ঘটালেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। তবে এই বলা হবে না, পতিতালয় একেবারেই নির্মূল করে দেওয়া হোক। পতিতাবৃত্তি যারা চায় তারা করুন, এমনও তো নারী আছে যারা স্বইচ্ছায় এসব করতে খুশি হয়। তারা বলে, নিত্যনতুন পুরুষসঙ্গ, আর অঢেল টাকা, এ কোথায় পাওয়া যাবে ? তারা থাকুক। আর যাদের সমাজ ঠেলে দেয়, মানুষ অবিচার করে, এখানে এসে শুধু কাঁদে, না

পারে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে, না পারে সমাজে ফিরে যেতে। তাদের জন্যে শরৎচন্দ্র যেমন আন্দোলন করেছিলেন, আমরাও করব, তাদের যেন সমাজ ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাদের যেন উদারচেতা যুবকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিয়ে করে।

মনের দিক থেকে-তো তারা নিষ্পাপ। মন যেখানে নিষ্পাপ, দেহের মালিন্য সেখানে কতদিন থাকবে? দেহ তো একটা জড় মাংসপিণ্ড। দেহ নিয়ে চিন্তা এখন আর করা উচিত নয়। এসব নিয়ে য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে যেমন সমস্যাবিহীন হয়েছে, তেমনি এ দেশের আধুনিক রূপায়ণেও সেইরকম হওয়া উচিত। শরৎ-চন্দ্র শেষের দিকে সেই মনের কথাই বলেছেন। শেষপ্রশ্নে কমলের মুখ দিয়ে তিনি সেই জাগরণ আনতে চেয়েছিলেন। কমল চা বাগানের সাহেবের ঔরসজাত সন্তান। মা বাঙালী কিন্তু কমল তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত নয়। সে সাহেব বাবার আদর্শে গঠিত। সমাজে বিয়ে জিনিসটাকে সে খুব বেশি আমল দেয় না। মনের মিলের প্রাধান্য দেয় বেশি। শিবনাথ জীবন থেকে চলে যেতেও সে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে নি। এই যে অভিনব মানসিক গঠনের নতুন নারী এ বাঙালী জীবনে বড় তর্কের সামিল। তর্ক কমলও কম করেনি, যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছে, আশু বদ্যির শিক্ষাদীক্ষা পালটে দিয়েছে, পুরোনো সংস্কারের দিকে তাকিয়ে উপহাস করেছে, হরেনদের ব্রহ্মচর্য দেখে সে না হেসে পারে নি। শরৎচন্দ্র শেষ জীবনে নারীর এই প্যাটার্ণ সৃষ্টি করে তিনি ভবিষ্যৎকেই উপলক্ষ্য করেছিলেন-কিন্তু সে কি অসার্থক হয়েছে? আপনারাই বলবেন, এ প্রসঙ্গে এই লেখকেব কিছু বলার নেই। স্রষ্টার ভবিষ্যদ্বাণী যে বিফলে যায় নি, এই দশকে তা দেখতে পাই। ঘরে ঘরে কমলরা তর্কের ঝড় তুলে আশু বদ্যিদের একেবারে ধরাশায়ী করে দেয়। আশু বদ্যিরা আজও হিন্দুর সনাতন সংস্কারকে বুকে চেপে ধরে ছি ছি করে কিন্তু কমলদের মৌল অধিকার তো কেড়ে নিতে পারে না, বরং এও লক্ষ্য করা যায়, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় তথা বঙ্গ সমাজের নতুন ধারা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বঙ্গনারী একটি পুরুষের সঙ্গই চায় কিন্তু সে পুরুষ তার জীবন-মরণের সাথী হবে, বন্ধু হবে। রাধার সে কানু গীত যেন সার্থক। বঙ্গনারীর এই রূপান্তর নিয়ে প্রাচীনেরা মাঝে মাঝে খেদোক্তি করে, 'ছি ছি এ কি সব আজকালকার মেয়েরা হল? স্বামীকে স্বামী বলে জ্ঞান করে না। বন্ধু বলে। নাম ধরে ডাকে।' সাপ পুরোনো খোলস ত্যাগ করে নতুন খোলস পরছে। কানে একটু খটোমটো লাগবেই! কিন্তু এই আমাদের হওয়া উচিত। য়ুরোপ সভ্যতার কিছু মিশেল কড়া চায়ের লিকারের

মত পাকা হওয়া উচিত। সব দেশই তো সব দেশের ভালটা নিতে চায়। তাকে তো কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। যুগ পালটায়। পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পরিবর্তন ঠেকানো যায় নি। নারীর মনের নীরব কান্নার শেষ উত্তর তাঁরই কলমে বহু বছর আগে আমরা পেয়েছি।

অনেকে বলে, মেয়েরা শিক্ষিত হয়েই কাল হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষা দেশে নারী সমাজে বিপ্লব এনেছে। আগে যেমন তারা কথা বলত না, এখন তাদের মুখে খই ফোটে। কথাটা লক্ষ্য করুন। বঙ্গনারীর মুখে খই ফোটা বঙ্গীয় যুবসমাজ পছন্দ করে না। কিন্তু অন্য দেশীয়রা আবার এই বঙ্গনারীর সঙ্গলাভে উন্মুখ হয়। কারণ তারা বলে, 'বঙ্গনারীদের মনের মধ্যে একটা অন্যরূপের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। তাদের স্নেহ-মমতা, সেবাপরায়ণা মূর্তি, দাম্পত্য প্রেম একটু বেশি। ভালবাসলে যে তারা ভালবাসতে পারে, বঙ্গনারী তার প্রমাণ।' এই যে অন্য দেশীয়দের ধারণা - কি আমাদের গর্বের বস্তু নয়? তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের নারী সমাজে এখনও বঙ্গললনাদের প্রাধান্য কমে যায় নি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে। কিন্তু নিজেদের দেশে বঙ্গললনারা সেই আধুনিকতায় ঘৃণ্য হবে কেন? চণ্ডীদাস তো বহু আগে এ কথা বলে গেছেন, তাহলে নারীকে সংস্কারহীনতায় মুক্তি দিতে আমাদের বাধে কেন?

পুরুষের সেই নির্বুদ্ধির মত কথাগুলি এখনও কি চালু থাকবে? 'মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাকবে?' শরৎচন্দ্রই প্রথম এই মেয়েছেলের মুখে ভাষা দিয়ে শিশুর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে ছিলেন। 'ওরে তোরা কথা বল, মুখ বুজিয়ে থাকিস্ না। একটু একটু করে বলতে বলতে তারপর একদিন সহজ হয়ে যাবে। বিপ্লব না করলে কেউ অধিকার এগিয়ে দেবে না।' তাঁর লেখার মধ্যে এই ছিল আসল মন্ত্র। নারী সেই সব পড়তে পড়তে অলক্ষ্যে কখন মুখে ভাষা পেয়েছে। এই ভাবে চিন্তাটা কেউ করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু এই যে তার গোপন প্রার্থনা ছিল, আজ মূল্যায়ন করতে গিয়ে বোঝা যায়। অবোঝার কিছু নেই। আপনিই দেখুন না, তাঁর নারী চরিত্রগুলি। কোন কোন সমালোচক বলেছেন, 'তাঁর লেখার মধ্যে সব নারীর প্যাটার্ণই এক।' তাঁদের সবিনয়ে বলতে হয়, 'এক জায়গায় কিছু বঙ্গললনাদের বসিয়ে পরীক্ষা করুন, ত পর স্বভাবের কোন কোন জায়গায় কি তারা আলাদা? একটি রচনা নিয়েই আলোচনা করা যাক, শ্রীকান্তের চারটি পর্বর মধ্যে কটি নারী আছে। প্রধান নারী রাজলক্ষ্মী কিন্তু

তাকে বেষ্টন করে যারা আছে, যেমন অভয়া, সুনন্দা, কমললতা, অন্নদাদি, পুঁটু, টগর, চক্রবর্তী গিন্নী এমন কি পদ্মও কি সম্পূর্ণ আলাদা নারী নয়? আলাদা বলতে কি শরীর না স্বভাব? শরীর, রূপ, চেহারা যাই হোক স্বভাবের কথাই বলা যায়। আর স্বভাব বলতে গেলে তাদের সমস্যা। এই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রতিটি নারী কি এক স্বভাবের না তাদের সমস্যা এক? আলোচনা আগেও হয়েছে, এখনও করা যায়, সেই বঙ্গললনারা কেউই এক স্বভাবের ছিল না। অভয়া দাপটে ব্রহ্মদেশে চলে গিয়েছিল, একজন অল্প পরিচিত যুবকের সঙ্গে, কিনা তার স্ত্রী জীবনের অধিকার স্বামীর কাছ থেকে আদায় করতে। অভয়া অন্য নারী, যে স্বামী ছাড়া কাউকে মনে স্থান দিতে চায় নি। সুনন্দা পণ্ডিত পরিবারের মেয়ে, যেন এক জ্বলন্ত আগুন, ভাশুরের মিথ্যাচারকে সে কিছুতে ক্ষমা করতে পারে নি। কমললতা অপূর্ব সুকণ্ঠ নিয়ে রাধামাধবের পায়ে জীবনের সব সঁপে দিতে চেয়েছিল, কোন কলঙ্কই তাকে স্পর্শ করে নি। তার শেষ পরিণতিও বড় মর্মস্পর্শী। এই মানব সমাজ তাকে যত দুঃখ দিয়েছে, সে মানব সমাজের বাইরে চলে গিয়ে ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে তার জীবনের সব দুঃখ ভুলতে চেয়েছে। অন্নদাদির স্বামী-প্রেমই শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করেছিল। এই কি বঙ্গললনা? তাঁর সংস্কারবোধে প্রথম আঘাত দিয়েছিল এই দিদি। মেয়েদের স্বামী ছাড়া যে কেউ নেই, এ কথা তাঁর মন মানতে চায় নি। আর এই বোধই শরৎচন্দ্রকে আজীবন নারীর প্রেম এক পুরুষে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছে, সেখানে তাঁর উদার মনের কোন আপোষই চলে নি। তাই তিনি বলেছেন, 'বাঙালী মেয়েদের এই শাশ্বত একনিষ্ঠ প্রেম স্বামীর জন্যে এ এই বঙ্গদেশেই সম্ভব।' তারপর পুঁটু, তার আড়াই হাজার টাকার জন্যে বিয়ে হচ্ছিল না, পুঁটুর স্পষ্ট কথাগুলিও লক্ষ্য করবার মত। 'আমার বাবা তো গরীব, কোথায় পাবে এত টাকা?' টগর এমন ধরণের মেয়েছেলে, যার মুখের ওপর নন্দমিস্ত্রী কথা বলতে পারে নি। এই ধরণের মেয়েমানুষের চরিত্র চিত্রণ প্রায় জায়গায় শরৎচন্দ্র করেছিলেন। এরা মেয়েমানুষই, কারণ এরা নারীর ঐ সহজাত কোমলতার ধার ধারে না। গাঁয়ে যেমন কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঝগড়া করে, তেমনি এদেরই কিছু অপভ্রংশ বারাঙ্গনালয়ে এসে দাঁত খিঁচিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ওরকম কত লোক আমি ইয়ে করে দিয়েছি। আমি কি কাউকে ভয় করি?' তারপর চক্রবর্তী গিন্নীর চোখের জল বাঁধ মানে না। সে সংসারে চায় একটা শান্তি। আর পদ্ম শুধু হাসে। শরৎচন্দ্র পদ্মকে পদ্মর মতই তৈরি করেছেন। তার সরল মন, আশাভরা

চাউনি, শুধু হেসেই যায় কিন্তু ও কি জানে না তার জীবনে দশমণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। এই জীবন ও যৌবন শুধু মন্দিরে সেবা করেই যাবে। ঐ নিষ্প্রাণ পাথরের দেবতা কোন আশ্বাসই জানাবে না। এই যে ব্যর্থ জীবন, শরৎচন্দ্র কলম চালাতে চালাতে গোপনে কি তিনি কাঁদেন নি? এই সব নারী চরিত্রগুলি কি একই প্যাটার্ণের? সমালোচকরা কোন্ দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন করলেন অজ্ঞাত কিন্তু আমরা দেখি, তা নয়। শাশ্বত একটি নারীমন এই সব নারীদের মধ্যে কাজ করেছে বটে কিন্তু তারা এক-একজন এক-এক রকমের। যেমন একটা উৎসব বাড়ীতে শাড়ী, গহনা-পরা অনেক মেয়ের সমাবেশ দেখা যায়, সবাই সাজগোজ করেছে, গয়না পরেছে, দেহ সুষমাও কারুর কম নয় কিন্তু কথার ধরণ এক নয়, বিষয়বস্তুও এক নয়। কেউ গরবিনী, স্বামী-গরবে ভুঁয়ে পা পড়ে না। কেউ ধনীর গৃহিণী, শুধু সৌভাগ্যের নানা নিদর্শন বড় গলায় সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। কেউ স[illegible] স্নেহে বিগলিত, কেউ আবার সন্তান না হওয়ার জন্যে দুঃখের কথা বলছে। কারুর শাশুড়ী খারাপ, কেউ ননদের জ্বালায় টিঁকতে পারে না, সে কথা করুণ কণ্ঠে বলছে। এই ধরণের নানা স্বভাবের নারী শরৎচন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে। তবে এও বলা যায়, সত্যিকারের যারা যুবতী নারী তাদের চাওয়া-পাওয়া-ভাবনার গতি প্রায় এক।

সে কথা বললে আবার এও বলা যায়, কোন যুবতীর চাওয়া পাওয়ার রকম কি এক? কুমারী মেয়ের এক চিন্তা, কবে আমার বিয়ে হবে? বিবাহিতা মেয়ের চিন্তা অনেক। স্বামী যদি ভাল হয়, শাশুড়ী দজ্জাল। শাশুড়ী ভাল হলে, স্বামী ভাল নয়, লম্পট। অবশ্য শাশুড়ী ভাল হয়, এ কমই দেখা যায়। আমাদের বঙ্গশাশুড়ীরা মনে করে, ছেলেকে আমার বউ এসে কেড়ে নিল। ফ্রয়েড অবশ্য বলেছেন, এটা জেলাসি অফ সেক্স। বৌয়ের সঙ্গে ছেলের যৌনক্রিয়া তার মনে ঈর্ষা জাগায়। এ সব কথা বললে অবশ্য সনাতনপন্থীরা একটু ক্ষুব্ধ হবেন, তাই এ প্রসঙ্গ থাক্। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিবাহিতা মেয়েদেরই হাজার সমস্যা। সেই মেয়েরাই কুলটা নাম নিয়ে সমাজ বহিষ্কৃত হয়। তারাই মাঝে মাঝে স্বামী, শাশুড়ীর ষড়যন্ত্রে জীবন বিসর্জন দেয়। এদের কথাই শরৎচন্দ্র বিশেষ করে বলতে চেয়েছিলেন। কমললতা কি পাপ করেছিল যে সে স্বামী হারাল? অথচ তার কোমল মনের তো তুলনা নেই। যে কোন পুরুষ কমললতার আকর্ষণে মুগ্ধ হত। অভয়া কেন ব্রহ্মদেশে এসে স্বামীকে পেল না? কিরণময়ী কেন স্বামীর কাছ থেকে সুখ পেল না। তার তো ডালাভরা যৌবন রাশি সে

করে স্বামীর পায়ে নিবেদন করতে চেয়েছিল কিন্তু কি হল তার ঐ প্রস্ফুটিত যৌবন শোভা নিয়ে? স্বামীতো ফিরেও দেখল না। এই যে স্বামীর কাছ থেকে মেয়েদের চাওয়া, এ যে কি বেদনার মধ্যে অস্ফুট থাকে, যে ভুক্তভোগী সেই জানে। একে নারীধর্মে নির্লজ্জ হতে বাধে, তার ওপর এই না পাওয়ার বেদনা। শরৎচন্দ্র স্পষ্টই কিরণময়ীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'উপীনবাবু, আমি স্বামীকে ভালবাসি নি। কেন ভাল বাসব বলুন তো? স্বামী কি কখনও আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছে?' উপীন লজ্জা পেয়েছে, আমরাও লজ্জা পাই কিন্তু লজ্জার যে এতে কি আছে জানি না। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরা সবাই জানে, নর নারীর মধ্যে আসল সম্বন্ধ কি? নারী পুরুষ মানসিক প্রস্তুতি ঘটিয়ে পরস্পরের সঙ্গে দেহমিলন করে। এই মানসিক প্রস্তুতিই আসল কারণ। উভয়ের সমান ইচ্ছা না হলে মিলন সুন্দর হয় না। এই সমান ইচ্ছা নিয়েই দ্বন্দ্ব। কিরণময়ী এই সমান ইচ্ছার অংশীদার হতে পারে নি বলেই তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। এমনি কত কিরণময়ী নারী তাদের হৃদয় জ্বালা নেভাতে পারে না, তার আর ইয়ত্তা নেই। শরৎচন্দ্রের কলম এই সব মেয়েদের জন্যে কাতর হয়েছিল। কিন্তু ঐ যে বললাম, তিনি ভয়ঙ্কর কিছু পরিণতি দেখাতে ভয় পেয়েছেন। আমরা কিন্তু বাস্তব জীবনে ঐ ভয়ঙ্কর কিছুকেই দেখি। পতিতালয়ে গিয়ে কি তেমনি কোন নারীর মুখে শোনেন নি, 'দূর, যে আমার স্বামী হল, সে যেন কেমন? এত নিষ্প্রাণ পুরুষকে নিয়ে কি আমরা ঘর চলে?' কিম্বা এও যদি আপনি শোনেন, মেয়েটি ডির্ভোস পিটিশান করেছে শুধু স্বামীর ইম্পোটেন্সীর জন্যে। এতো অনেক দূরের কথা বলা হল, লম্পট স্বামী কে চায়? কেউ নয়। বিয়ে হবার পর দেখা গেল স্বামী অন্যমনা, কোন স্ত্রী সহ্য করতে পারে? কিরণময়ী যে রূপ নিয়ে ভাঙা বাড়ী আলো করে ছিল, সেই রূপ নিয়েই তো মেয়েরা অসুখী হয়।

যারা বিপ্লব আনতে পারে, তারা বেরিয়ে যায়, আর যারা পারে না? সমাজ সংসার তাদের কিছুই দিতে পারে না। আজ এসব কথা আলোচনার মাধ্যমে উল্লিখিত হল শুধু শরৎচন্দ্রের মুল্যায়ন করতে গিয়ে। নাহলে এসব নিয়ে কে-ই বা আলোচনা করে কিন্তু এ আলোচনা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, আপনি পড়তে পড়তে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। অর্থকরী ভারসাম্য অনেকেরই থাকে না, অর্থকষ্ট প্রায় সংসারে আছে, তবে সংসার চলেছে কেন? কিন্তু সেই সংসারকে মন্দির বানানো যায়, যদি দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকে। নারী যে পুরুষের কত সহায়ক, সে তো প্রায় সংসারে দেখা যায়। তাহলে শরৎচন্দ্রের নারীদের দেখুন, তাদের কেউ সুখ

পেল না। আসলে সুখ যে বড় অর্থবহ, সুখের জন্যেই তো এত কথার জাল বোনা। শরৎচন্দ্রও নারী পুরুষের জীবনে সুখ চেয়েছিলেন, আমরাও চাইব সবার জন্যে সুখ।

আজ এই শত বর্ষের প্রাক্কালে বরেণ্য লেখকের অমর আত্মার শান্তি প্রার্থনায় তাঁর দরদী মন যেভাবে নারীর অধিকারের জন্যে চেষ্টা করে গেছেন, আমরা সেই নারীদরদীর মতই দরদী হয়ে উঠব তাদের মৌল অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্যে। ওদের জীবন, যৌবন যাতে না ব্যর্থ হয়, ওরা যাতে মানুষের মধ্যেই নিজেদের সুখ, আনন্দ, স্বস্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্যে করব প্রার্থনা।

এই কি সেই স্রষ্টার প্রার্থনা ছিল না? বলুন, আপনিও তো তাঁর অনেক গল্প পড়েছেন, কুসুম কেন অভিমানী হয়ে স্বামীর ঘরে গেল না। তার কি ইচ্ছে ছিল না কিন্তু তার অন্তরে যে অভিমান তাকে কুরে কুরে খেয়েছিল তার জবাব দেবে কে? আমরা নিরপরাধ কুসুমের হৃদয়হীনতা দেখে মাঝে মাঝে রেগে গেছি। সপত্নী পুত্রকেও সে নিজের নারীত্বের অবমাননায় ক্ষমা করে নি। ঐ জায়গায় শরৎচন্দ্র মাতৃত্বের চেয়ে নারীত্বকেই বড় বলে দেখিয়েছেন। নিজের হৃদয়ের কান্না যেখানে সান্ত্বনা পেল না, সেখানে সন্তান স্নেহের মূল্য কি? আমরা এই প্রসঙ্গে কিছু অন্য ভাবনার নজির তুলতে পারি। অবৈধ সন্তানের মাতৃত্ব অনেক সময়ে অনেক মেয়ে সানন্দে স্বীকার করতে পারে না। সেখানে মাতৃত্বর চেয়ে নারীত্ব বড় হয়, এ বহু দৃষ্টান্তে দেখা গেছে। বুক ফেটে যায় তবু কলঙ্কিত নারীত্বের জন্যে গর্ভের ভ্রূণ পৃথিবীর আলো দেখতে পায় না। কুসুমও স্বামীর হৃদয়হীনতার জন্যে সন্তান স্নেহ বিসর্জন দিতে আমরা বিস্মিত হই। কেন? তার সেই পাপেই তো চরণ মারা গেল। বৃন্দাবন ও কুসুমের মিলন লেখক টেনেছেন কিন্তু নিরপরাধ একটি শিশুর জীবন দান করে। এ জায়গায় আমরা দরদী শরৎচন্দ্রের নিষ্ঠুরতা স্বীকার করতে পারি না কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যে সম্পূর্ণ কুসুমের ওপর, কুসুমের হৃদয়-সংঘাত, তার নারীত্বের অপমান, এসবই তাকে বেশি কাতর করেছিল। কুসুমকে বৃন্দাবন নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছে কিন্তু সে যে সামান্য আশ্রিতজন নয়, তার পত্নীত্বের অধিকার সর্বোপরি তার নারীত্বের সম্মানের জন্যে সে চেয়েছে এক বিরাট সমারোহের আয়োজনে স্বামী তাকে যোগ্য সমাদরে ভূষিত করে নিয়ে যাক্। এই সেই শাশ্বত নারী অভিমানী সীতা। এই যে নারী মনের দুর্জয় অভিমান একি আমরা সংসার

জীবনে দেখি না? স্বামীর তাচ্ছিল্য, তার অপমান নারীমনের আষ্টেপৃষ্ঠে আঘাত হানে। আবার তাকেই একটু তোয়াজ করা হোক, সে সব ভুলে স্বামীর সংসারে গিয়ে ঢুকবে।

এই যে মনের নিভৃত প্রত্যাশা, এ তো আজন্ম নারীর স্বভাবের সঙ্গে জড়িত। শরৎচন্দ্র এই নিভৃতরূপটিও তাঁর মমতা দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। এমনি ভাবে নারী মনের আলোচনা বোধ হয় এর আগে আর হয় নি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের নানা মূল্যায়ন হয়েছে কিন্তু তাঁর মানস রূপটি কোন গভীর পথ দিয়ে চলতে চেয়েছিল, এই আলোচনায় যেন সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হল। তাঁর পূর্ব সমালোচকগণ অনেক রকমভাবে তাঁর সাহিত্য জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু আমাদের সাংসারিক জীবনে তাঁর দান কতখানি, গল্প লিখে তিনি দেশের মানুষের কি উপকার করেছিলেন, এই আলোচনায় যেন পূর্ণ হয়ে গেল।

সেই বরেণ্য লেখকের জন্ম শতবর্ষে কোন এক সাহিত্যিকের মন্তব্য, শরৎচন্দ্র সমাজ সংস্কারক হয়ে রসের সাগরে রস হারা হয়ে লেখক জীবনকেই কণ্টকিত করেছিলেন, তাঁকে বিনয়ে এই বলতে হয়, তিনি শরৎচন্দ্রের মূল্যায়নে বড়ই ভুল চিন্তা করেছিলেন, পৃথিবীতে একজনই জন্মায় যিনি সবার মাঝে একজন হয়েই থাকেন, যাঁর চিন্তা, ভাবনা, কারুর সঙ্গে মেলে না। তিনি সবার মত লেখকই শুধু নয়, আরও কিছু যা মহতী মানুষের সঙ্গেই মেলে। মহৎ যে নন, নিশ্চয় আপনার আর ধারণা হয় না। তাঁর কর্ম, তাঁর অধ্যবসায়, তাঁর চিন্তা, মানুষের জন্যে কাতরতা, এসবই যে তাঁকে মহৎ জীবনে পৌঁছে দিয়েছিল, আমাদের সঙ্গে আর আপনি দ্বিমত হবেন না। আসুন আমরা সেই বরেণ্য লেখকের আত্মার মঙ্গল কামনা করি। আর বলি, এমনি করে তোমরা যেন যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে পথ দেখাও।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জন্মের একশত বছর পরে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তারই মূল্যায়ন। সমাজ কোন্ পথে মানুষকে নিয়ে চলেছে? বিষয় বস্তুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তর তাই স্পষ্ট দেওয়া যাবে না। তবে আলোচনা করা যায়, আমরা সেইটুকু করব। শরৎচন্দ্রের কাল আর এখন নেই। সে সময়ে সমাজ, সংসার মানুষের মধ্যে যে সংঘাত নিয়ত মানুষকে পঙ্গু করে দিচ্ছিল, সে কাল আজ অস্তমিত। ব্রাহ্মণরা নিজের আত্ম অহঙ্কারে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। ভাল হয়েছে। বল্লাল সেনের জাতিভেদ প্রথার কু-অভিপ্রায় মানুষের আত্মার যে অপমান শুরু করেছিল, তাব অনেক কুফল অনেকদিন সমাজ সংসারে রাজত্ব করেছে। তারপর বিদায় নিয়েছে। এখন স্বস্তি। এর জন্যে আমরা আমাদের বহু মহতী মানুষের কাছে ঋণী। শরৎচন্দ্র ছিলেন, এই সময়েব মানুষ, তাঁর আন্দোলনও অনস্বীকার্য কিন্তু এখন আমরা শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবর্ষে সামাজিক জীবনে কি পরিবর্তন দেখছি?

অর্থনৈতিক চাপ বরাবরই আমাদের মধ্যে ছিল। ভারতবর্ষ আজন্ম গরীব দেশ। এখানকার মানুষ আজন্ম গরীব কিন্তু গরীব দেশের অন্তর গভীরে ছিল একটি সৎ জীবনের পরিকল্পনা। অসৎ যে ছিল না তা নয়, তাহলে তাদের আঁকলেন কেমন করে শরৎচন্দ্র? কিন্তু সেই চিরকালের অসৎ মানুষেরাও আজকে অন্য ভূমিকা নিয়েছে। শরৎচন্দ্র যে মানুষের কথা লিখেছিলেন, শহরে বাস তাদের কমই ছিল। তবু যা ছিল, আজকের মত নিশ্চয় নয়। আগেই আলোচিত হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের জীবন ধাবণের মূল্যবোধ পালটে দিয়েছিল, কি আমরা পেয়েছি তা জানা গেছে। নারীর ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা বাঁচার পরিকল্পনা পেয়েছি। তাতে সামাজিক কি বিবর্তন হয়েছে? না, সস্তা সেন্টিমেণ্ট নিয়ে বাঁচার চিন্তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। তারপর এল দেশের মধ্যে মন্বন্তর। সেও বাঁচার প্রশ্ন। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে নারী যেমন সতীত্ব পরের হাতে তুলে দিয়ে ছিল, গোপনে গোপনে বহু ষড়যন্ত্রকারী দল গড়ে উঠেছিল, যারা এই নারীর দেহ মূল্যধন করে ব্যবসা ফেঁদে বসল। আজও সে ব্যবসা সমান তালে চলে আসছে। এই বর্তমানেও তার এতটুকু মন্দগতি নয়, বরং দ্রুতই। আর এই সব ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বড় বড় ধনী সম্প্রদায়। আপনি একটু খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন

বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা থেকে দলে দলে মেয়ে এই শহরে কত আসছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা দাখিল করা যায়। সেদিন শিয়ালদহ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি একটা প্রয়োজনে। হঠাৎ ট্রেন প্লাটফরমে থামতে যাত্রীরা নেমে দৌড় লাগাল। ভীড় দেখে একটু সরে দাঁড়াতে হল। মানুষ তো আর দেখে শুনে পথ চলে না। প্রয়োজনে তারা যে ক্ষেপা হাতীকেও হার মানায়। হঠাৎ চমকাতে হল একজনকে দেখে। আমারই পরিচিত। বেশ পরিচিত। কলেজে এক সঙ্গে পড়তাম। ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেন্ট ছিল কিন্তু চেহারা কেমন হয়ে গেছে? লপেটা ধরণের চেহারা। গায়ে একটা টেরিলিন পাঞ্জাবী। পানের রসে ঠোঁট দুটি রাঙা। আর এই বিকেল বেলাতেই যে দু' পাত্র খায় নি, বলা যাবে না। আমাকে দেখে চিনতে পারল। হাসল, কি খবর?' ততক্ষণে তার পিছনে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি দেখতে এত সুন্দরী যে আমার দৃষ্টি না গিয়ে পারল না।

বন্ধু আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, 'আমার ওয়াইফ'। মেয়েটি যে চমকাল, আমার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু ততক্ষণে বন্ধুটি আমার খোঁজ নেওয়ায় মন দিয়েছে। আমি যথা উত্তর করতে সে 'চলি' বলে গা দোলাতে দোলাতে বিদায় নিল কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্নই গেঁথে থাকল মেয়েটি চমকাল কেন? আর ওর সীমন্তে সিঁদুর নেই কেন? বাঙালী মেয়ে হলেও যত আধুনিকা হোক সিঁদুর না দিয়ে তো পারে না? মেয়েটি যে আধুনিকা তা তো মনে হল না, বরং গ্রামীণ এক ছাপ তার সুন্দর দেহ ঘিরে ছিল। এ প্রশ্নটা প্রশ্ন হয়েই থাকল। উত্তর মিলল না। আমি আমার কাজ সেরে স্টেশন থেকে বিদায় নিলাম। দু'তিন মাস পরে সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে সন্ধ্যে বেলা হাঁটছি। উত্তর কলকাতার বারবনিতালয় পার হয়েছি, হঠাৎ অনুভব করলাম, কে যেন আমার পিছনে পিছনে আসছে। অনুভব আর রইল না লোকটি পাশেই এসে গেল। ময়লা কাপড়-জামা, পান খাওয়া ঠোঁট, খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে ভর্তি, বসন্তের দাগে ভরা একটা মুখ। বিনয়ে বলল, 'যাবেন নাকি?'

'কোথায়?' লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ হল না, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'খুব সুন্দর, বয়স বেশি নয়। রেটও কম।'

তখন বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। এ যে দালাল সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। একটা কৌতুহলও মনে উকিঝুঁকি দিল। আবার বিবেকও নাড়া দিল। কিন্তু

নীতিবাদের দোহাই দিয়ে কৌতূহলকে ত্যাগ করা গেল না। বললাম, 'কত দিতে হবে?'

সে একটা রেট বললো। খানিকটা গররাজির মত অবস্থা নিয়ে মনে মনে পকেটের রেস্তটা গুণে তার পিছু পিছু ধাওয়া করলাম। একটা বড় বাড়ীর নিচে এসে দাঁড়াল। তারপর বিনয়ে আমার অনুগতর মত সিঁড়ির পথ দেখিয়ে তিনতলায় নিয়ে গেল। একটা দরজার ভারী পর্দা সরিয়ে বলল, 'দিদি।' ভেতর থেকে সাড়া এল। লোকটা আমার দিকে ফিরে বলল, 'আসুন।' সে ঢুকল না, আমাকে পর্দা সরিয়ে ঢোকার জায়গা করে দিল।

ঘরটি বেশ পরিপাটি করে সাজানো। বার্নিশ করা সুন্দর খাট, স্টীলের আলমারী, ড্রেসিং টেবিল, সোফাসেট, ঘরের গৃহস্বামিনীও সুসাজ্জিতা। এতক্ষণ ঘরেব দিকে লক্ষ্য ছিল, গৃহস্বামিনীর মুখের দিকে তাকাই নি কিন্তু তাকাতেই হঠাৎ চমকে উঠলাম। সে মুখ তো আমি ভুলিনি, সে যে আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

'বাবু!' লোকটির দিকে ফিরলাম। মেয়েটি বলল, 'ওকে কিছু দিয়ে দিন।' ছ'টো টাকা পকেট থেকে বের করে দিতে সে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। মেয়েটি দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। তখনও আমি বিস্ময়ে সেই কথাটিই ভাবছি, আমার স্মরণ দৃষ্টি সেই স্টেশনের ধারে ঘোরাফেরা করছে।

মেয়েটি পাশে বসল। বেশ ঘন হয়ে। বলল, 'কিছু খাবেন?' ও কি আমায় চিনতে পারে নি? বললাম, 'না। একটা কথার জবাব দেবে?'

সে আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল।

'আমায় চিনতে পারছ না?'

তখনও মেয়েটির দৃষ্টি আমার মুখের ওপর। বলল, 'না তো! এর আগে আপনি এসেছিলেন নাকি?'

আমি কি জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ও বুকের কাপড় সরাল। 'তাহলে কিছু খাবেন না?' ভরন্ত বুক। শরীরে বেশ ঝিম ঝিম ভাব আনে।

'ইচ্ছে নেই। আচ্ছা, তুমি প্রফুল্লকে চেনো?' সে আমার মুখের দিকে তাকাল। 'এখন বিছানায় যাবেন না, আর একটু বসবেন?'

'কিন্তু আমার কথার জবাব দিলে না?'

'বলুন' বলে সে আমার একটা হাত তার হাতের মধ্যে নিল। নিজের ঘড়ির দিকেও তাকিয়ে দেখল, সময় যে দেখছে সে আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমার

তখন কৌতূহল সীমা লঙ্ঘন করেছে। তার অপরিমিত যৌবনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মাস তিনেক আগে তুমি শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেছিলে না!'

মেয়েটি এবার স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমার সঙ্গে আমার সেদিন আলাপ হয়েছিল, মনে পড়ছে না? তোমার সঙ্গে যে ছিল, সে আমার বন্ধু। প্রফুল্ল তোমার পরিচয় দিল ওয়াইফ বলে, তুমি প্রফুল্লর ওয়াইফ নও?'

এবার মেয়েটি অবাক ভাব কমিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'হ্যাঁ মনে পড়ছে। কিন্তু লোকটির নাম তো প্রফুল্ল নয়!'

'কি?'

'বিনোদবাবু।'

বুঝলাম প্রফুল্ল নাম ভাঁড়িয়েছে। বললাম, 'সে যাই হোক, কিন্তু তুমি বিনোদবাবুর ওয়াইফ নও?'

আমার নির্বুদ্ধিতায় মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসিটি সুন্দর, জলতরঙ্গের মত সুর সৃষ্টি করে সারা ঘরময় ছড়িয়ে গেল। আমার আরও কাছে সরে এল, বলল, 'আমি তো সবার ওয়াইফ। এখন আপনার।' মেয়েটি আবার ঘড়ি দেখল।

বুঝলাম আর বেশিক্ষণ সময় নিলে এই মুখ অন্য রকম হয়ে যাবে। মনে মনে বেশি কিছু দেবার অঙ্গীকারে কথার জাল বুনে চললাম। তার জবানীতে যা জানলাম এই, বীরভূমের সোনাই গ্রামের বেশ বড় ঘরের বৌ ছিল এই মেয়েটি। জমি, জায়গা, ক্ষেতখামার, পুকুর, দালান। বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার। তবে জাতে চাষী। কিন্তু চাষী পরিবারের কোন স্বাধীনতা ছিল না। পুরুষরা অধিকাংশই চরিত্রহীন। মেয়েটির স্বামী বিয়ে পর্যন্ত সব কিছু ভার নিয়েছিল। বিয়ের পর আর স্ত্রীর দিকে তাকায় নি। অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না শ্বশুর বাড়ীতে। শ্বশুর বাড়ীতে জ্ঞাতি গোষ্ঠি অনেক। আরও যে সব বৌরা ছিল, তাদের চরিত্রও ভাল নয়। স্বামী ছাড়াই তারা জ্ঞাতি পুরুষদের সঙ্গে লিপ্ত ছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'কি করব? স্বামীকে যখন পাই না, যৈবন জ্বালা মিটুবো কোত্থেকে?'

'তারপর?'

জয়া বলল, 'আমার খুড়-শ্বশুরের দেখলাম আমার প্রতি দৃষ্টি। একদিন পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে আসছি, দেখি আমার দিকে প্যাট্ প্যাট্

করে তাকিয়ে আছে। একদিন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছি, সামনে এসে দাঁড়াল। হাত ধরে টান দিল। বাড়ীর অন্যান্য বৌরা সেই দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।

আমার এক দেওরের বৌ খুব কাজিল, সে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, দিদি তুকে খুড়-শ্বশুরের মনে ধরেছে। কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। একি বাড়ীতে আমার বিয়ে হয়েছে? এরা কেমন ধারা সব লোক। রাত্রে মত্ত অবস্থায় স্বামী বাড়ী আসতে তার পাটি জড়িয়ে ধরলাম। ওগো আমায় তুমি বাঁচাও। আমি এইভাবে নিজেকে নষ্ট করতে পারব না।

স্বামীর আমার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। শোনা যায় তার বাইরে মেয়েছেলে অগুণতি। মত্ত অবস্থায় এমন পেটে লাথি মারল, আমি তিনদিন আর উঠতে পারলাম না।

বাপের বাড়ীতে চিঠি লিখলাম, উত্তর এল, বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠিয়েছি, ওখানেই ভালভাবে থাকবার চেষ্টা কব।

এদিকে খুড়-শ্বশুরের থাবাও বার বার আমাকে ঝাপ্টা মারতে লাগল। একদিন অতর্কিতে দুপুরবেলা ঘরে ঢুকে পড়ল। আমাব চিৎকার করবার আগেই দরজা বন্ধ করে আমার মুখ চেপে ধরল।'

জয়া থামলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুড়শাশুড়ী ছিল না?'

'ছিল না আবার? কিন্তু ঐ যে বললাম, এ বাড়ীর সবই যেন উলটো। পুরুষদের কিছু বলার শক্তি কোন মেয়েরই ছিল না। খুড়শ্বশুর ঘর থেকে চলে যাবার পর সমস্ত শরীরটা যেন জ্বালা করতে লাগল। মনে হল পুকুরের মধ্যে চিরকাল ডুবে থেকে সমস্ত জ্বালা জুড়োই। তাই গেলাম কিন্তু চিরকালের জন্যে ভুলতে পারলাম না। ফিরে এসে খুড়শাশুড়ীর পায়ে পড়লাম কিন্তু যে কথা শুনলাম কানে আঙুল দিতে হয়। চাষার ঘরের মেয়ের আবার সতীপণা কি? খুড়শ্বশুর দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল, আমার দিকে টেরিয়ে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর যেন তার সাহস বেড়ে গেল। দিন নেই রাত নেই আমার শরীরের ওপর হামলা।

রাগ করে স্বামীকে বললাম, আমি গলায় দড়ি দেব।

স্বামী বলল, দড়ি নেই নাকি?

তুমি স্বামী হয়ে এর বিহিত করবে না? তোমার মেয়েমানুষ, তোমার খুড়ো ভোগ করবে?

স্বামী নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বলল, একজন করলেই তো হল। কেন তোমার ভাল লাগে না?

কি আর উত্তর দেব? হতভাগী মেয়ের কথা আর কে বুঝবে? এইভাবে দিন চলছিল। কিছুকাল পরে গ্রামেই শুনলাম, বেশ কিছু মেয়ে চালান যাচ্ছে কলকাতায়। টাকা দিয়ে গ্রাম থেকে লোক কিনে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক অভাবী ঘরের মেয়ে স্বইচ্ছায় যাচ্ছে। অনেকে টাকা নিয়ে মেয়ে পাচার করে দিচ্ছে।

লোকটিকে একদিন দেখলাম আমাদের বাড়ীর সামনে। কি করে আমার খোঁজ পেয়েছিল জানি না। পরে জেনেছিলাম খুড়শ্বশুর টাকা নিয়ে আমার খোঁজ দিয়েছিল। সেই বিনোদবাবুর একটি কথায় আমি রাজী হয়ে গেলাম। ঐ শ্বশুর বাড়ীতে থাকার চেয়ে তো এখানে নাম লেখানো অনেক ভাল।'

জয়া থামলে বললাম, 'সেদিন তাহলে গ্রাম থেকে প্রফুল্লর সঙ্গেই আসছিলে?'

জয়া চোখের জল মুছছিল, বলল, 'হ্যাঁ।'

এমনি হতভাগী মেয়ে যে কত তার ইয়ত্তা নেই। বিয়ে হবার পর কত আশা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে আসে কিন্তু তার পরিণতি কি হয়? জয়ার কাহিনী আমাকে এ কালের জীবন ভাবনা পালটে দিল। তারপর প্রফুল্লর সঙ্গে একদিন দেখা হল, 'কি হে প্রফুল্ল কি খবর?'

সে বলল, 'এখন সময় নেই ভাই অন্যদিন কথা বলবো। খুব ব্যস্ত।' আমি বললাম, 'তোমার ব্যস্ততা তো আমার জানা আছে। দেশবিদেশ থেকে মেয়ে ধরে ধরে এনে সাপ্লাই দাও।'

প্রফুল্ল থমকে দাঁড়াল। যেন তার ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি। পড়াশুনায় মেধাবী ছেলে ছিল সে। বাড়ীর অবস্থাও খুব খারাপ নয়। সে আমার হাত ধরে বলল, 'চলো কোথাও গিয়ে বসি।' যেন মনের কথা উজাড় করার জন্যে সে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু সে কাছাকাছি কোথাও বসল না। আমায় টানতে টানতে একটা বাড়ীর সামনে আনল।

বিরাট বড় বাড়ী। সামনে গেটে দুদিকে দুটো দরওয়ান। গেটের ভেতরে চার পাঁচটি নানারঙের গাড়ী। প্রফুল্ল বলল, 'এ বাড়ীটা ভাল করে দেখে নাও।' দেখে নিলাম। তারপর বলল, 'চলো।'

দুজনে এসে বসলাম একটা চায়ের দোকানে। প্রফুল্ল চায়ের অর্ডার দিয়ে বলল, 'দেখলে তো বাড়ীটা!' তারপর সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, আমি একটু ঠেলা

দিতে ম্লান হেসে বলল, 'পিছনের কথাগুলি মনে পড়ছে তো, তাই কেমন যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় এম অফ ইওর লাইফ লেখার সময় বার বার লিখতাম, বড একজন ইঞ্জিনিয়ার হব, কিম্বা ডাক্তার, আর আজ! বুঝলে অসীম, জীবনে যা ইচ্ছা করা যায়, তা হয় না। কিভাবে যে সব উলটে যায়, ভাবাই যায় না।'

আমি ছটফট কবে বললাম, 'ওসব ছেড়ে দাও। কিভাবে তুমি এই হলে তাই বলো। এই সময় চা এসে গেল, সে চায়ের কাপটা টেনে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপব বলল, 'ঐ যে বাড়ীটা দেখলে না, ঐ বাড়ীর মিঃ মুখার্জিই আমার জীবনে শনি। ওর জন্যেই আমাব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিছুই হওয়া হল না।'

ভূমিকা ভাল লাগছিল না, ছটফট করে বললাম, 'তাবপর।'

প্রফুল্ল আমার কথায় কান দিল না, বলে চলল, 'ত্রিকাল মুখার্জি, নামটাও যেমন, কাজেও তেমনি। ত্রিকালই বটে।' বলে সে হাসল। তিনটি কালকেই যে জয় করে দোদণ্ড প্রতাপে বাস কবে আসছে। পড়াশুনায় ছিলাম ব্রিলিয়ান্ট ষ্টুডেন্ট, স্কুল ফাইন্যালে চারটে লেটার পেয়েছি, বি, এসসিতে ডিসটিংশন, জীবনে এসে গেল শনি। তখন যে ত্রিকাল মুখার্জি আমাদের বাড়ীতে ঘন ঘন আসছে আমারই জন্যে জানব কেমন করে? বাবা ত্রিকালের গাড়ী দেখলেই কেমন যেন কেঁপে ওঠেন। আর ছটফট করতে করতে বলেন, প্রফুল্ল বলে দে আমি বাডী নেই।

এমনি কতদিন হয়েছে, আমি বলবার জন্যে এগিয়েছি, ত্রিকাল সামনে দাঁডিয়ে। আর কি গম্ভীব গলা? সত্যেশ্বব আর কতদিন চালাকি করবে? ভেবেছ, এমনি কবে কি আমাব হাত থেকে পার পাবে?

বাবার কাঁপুনি ততো বেড়ে যায়, বাবা কাঁপতে শুরু করলেই গলার স্বরটাও সেই সঙ্গে কাঁপে। বাবা বলে, না, না চালাকি কি? আমি তো কোন চালাকি করি নি। আমি যখন টাকা ধার নিয়েছি শোধ করবই। বাবা এসব কথা যখন বলেন, তখনও শরীরটা কাঁপে। আমার মা ছিল না তো জানতিস্। সংসাব দেখাশুনা আমার ঐ একটি মাত্র বোন করত। বাবার অমনি চিৎকার শুনলেই নয়ন এসে সামনে দাঁড়াতো। আর বলতো, বাবা তুমি আবার চিৎকাব করছ? ডাক্তার কতবার করে বলে গেছে না, উত্তেজিত হয়ো না।

নয়নের কথা শুনলেই বাবাও চুপ করে যায়, আর ত্রিকাল মুখার্জিকে দেখি

নয়নের দিকে তাকিয়ে হাসছে। একদিন বাবা সেই রকম চিৎকার করছে.
ামি বাড়ী ছিলুম না, বাবার ঘরে ঢুকে দেখি, তখনও বাবা কাঁপতে কাঁপতে
দছে, আপনি এত বড় কথা আমায় বললেন, আমার একমাত্র মেয়ে। ত্রিকাল
নলেন, তা তুমি এই দু' লাখ টাকা কি ভাবে শোধ করবে? বাবা বললে, সে
ামি শোধ করতে পারি না পারি দেখব।

ত্রিকাল বললেন, দেখব বললে তো চলবে না। আমি তোমায় এক সোজা
ৃসেব শিখিয়ে দিচ্ছি। শোধও করতে হবে না, টাকাও দিতে হবে না।
ার তুমি শোধ করবে কেমন করে? তোমার আছে কি? বাড়ীটা আমার
াছে বাঁধা পড়েছে। আর ফ্যাক্টরী তো দুদিন পরে তুলে দিতে হবে। বাবার
। এই অবস্থা আমি একেবারে জানতাম না। বাবা তাহলে আমাদের
াছে চাপা দিয়ে দিয়ে এতকাল চলেছে?

আমি বললাম, মিঃ মুখার্জি আপনি কি বলছেন?

ত্রিকাল বললেন, তোমায় আর কি বলব? তুমি আর এর মধ্যে থেকো না।
ৃমি তো ছেলেমানুষ।

বললাম, আজ আর আমায় ছেলেমানুষ বলে সরিয়ে রাখতে পারবেন না।
াবার কথা আমায় বুঝতে দিন।

ত্রিকাল আমার কথার জবাব দিলেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন,
তাহলে কি ঠিক করলে?

বাবা বললে, আপনার কাছ থেকে যদি আমি এতগুলো টাকা না নিতাম,
তাহলে ঐ কথা বলার জন্যে আপনার মুখ ছিঁড়ে নিতাম।

ত্রিকাল রাগ করলেন না। লোকটি যে কত ধূর্ত, তখন আমি বুঝতে পারিনি।
বললেন সে তো আর পারছ না। আমার কাছে ঋণী বলেই তো ঐ কথা বলছি।

নয়ন বোধ হয় এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল সে এসে বলল, বাবা
তুমি ভেব না, ওনার প্রস্তাবে আমি রাজী। অন্তত পিতৃঋণ তো শোধ হবে।

বাবা বললেন, তুই কি বলছিল্ নয়ন? না না উনি বিয়ে করলেও আমি
তোকে দিতে পারি না।

নয়ন বলল, তা হোক, তুমি কিছু ভেব না বাবা।

বাবা বললেন, তোকে নিয়ে গিয়ে ও ব্যবসা করবে। এ আমি প্রাণ থাকতে
হতে দিতে পারি না? তুই তো জানিস না ঐ ত্রিকাল মুখার্জির অনেক মেয়ে ব্যবসা
আছে। দু'তিনটে বোথেলও চালায়। বাইরে থেকে অজস্র মেয়ে নিয়ে আসে।

নয়ন তখন চোখের জলে ভাসছে, চোখ মুছতে মুছতে বলল, তা হোক, তোমায় তো বাবা আমি মুক্তি দিতে পারব।

আর আমি থাকতে পারলাম না, আমি সামনে গিয়ে বললাম, না নয়ন তোকে যেতে হবে না। মিঃ মুখার্জি আমায় দিয়ে যদি কিছু হয় তাহলে বলুন, আমি সব করতে পারি কিন্তু তখন জানতাম না, মিঃ মুখার্জি কি চাল চাললেন। দু'মাসের মধ্যে বুঝতে পারলাম, আমিও যেমন ভেসে গেলাম, নয়নকেও বাঁচাতে পারি নি।

মিঃ মুখার্জি আমাকে দিয়ে ঐ মেয়ে সাপ্লাইয়ের ব্যবসাই শুরু করলেন। মিঃ মুখার্জির হেন গোপন ব্যবসা নেই যা করেন না। চোরা চালান, বিদেশ থেকে তাল তাল সোনা এনে বাজারে ছেড়ে দেন। দামী দামী পাথর তাও বিদেশে রপ্তানি করেন। আমি একদিন এসব দেখে প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনে টাকা করতে গেলে বুঝি এইসব করতে হয়?

ত্রিকাল মুখার্জি হেসে বলেছিলেন, ঠিকই ধরেছ। টাকা করতে গেলে এই করতে হয়।

আমি মেনে নিতে পারলাম না, ঘৃণায় বললাম, এ তো অসৎ উপায়। এতে কি আপনি শান্তি পান?

ত্রিকাল বললেন, ওহে ছোকরা, শান্তি শান্তি করে যে চিৎকার করছ, টাকা না হলে কি শান্তি হয়? এই দেখনা, আমার যে এত টাকা আমার কি শান্তি নেই? আমার বউ ছেলে মেয়ে কত সুখে আছে। আমি কত সুখে আছি।

প্রফুল্ল বলল, 'সত্যিই আমি তাই দেখি, ত্রিকাল মুখার্জি খুব সুখে আছে। সে যে আগে কত কষ্ট করেছে মনেই হয় না। দুটি ভাতের জন্যে দোরে দোরে ঘুরেছে। টাকার অভাবে পড়াশুনা করতে পারে নি। আর আজ তার বাড়িতে কত সৌভাগ্য। ত্রিকাল মুখার্জির দুটি ছেলেমেয়ে যেন পাখায় ভর দিয়ে চলে। যেমন পোষাক, তেমন চেহারা। মিলিকে দেখে কতদিন আমারই বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে।

বাবা তারপর মারা গেল। আমি একদিন বললাম, মিঃ মুখার্জি কিছু টাকা না দিলে তো নয়।

ত্রিকাল বললেন, টাকা, টাকার কি দরকার? আমি তোমায় যা কাজ করাই গুণে গুণে টাকা দিই। আমি তো কোন বাকী রাখি না।

হ্যাঁ মিঃ মুখার্জি বাইরে যাওয়ার খরচও দেন, আর তার সব লোক দেশ বিদেশে আছে, তাদের কাছ থেকে মেয়ে আনলে আমায় দেন মাথা পিছু পঞ্চাশ

া। নিজে আনতে পারলে ঐ রেট ডবল হয়ে যায়। কিন্তু তাতে তো
দায় চলে। তাই বললাম, আমায় অন্তত কয়েক হাজার টাকা ধার দিন।
মিঃ মুখার্জি চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, বাবা মারা গেছে। আমি
। বাবার ঋণ শোধ করেছি। এখন নয়নকে বিয়ে না দিলে তো নয়? মিঃ
র্জি সে সময়ে আর কিছু বললেন না। হঠাৎ সেদিন দেখি, নয়ন সেজেগুজে
রিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছিস্ এত বেলায় নয়ন?
নয়ন উত্তর দিল না কিন্তু ওর হন্তদন্ত হয়ে চলে যাওয়া দেখে আমার কেমন
ন সন্দেহ হল। পিছু নিলাম। যা ভেবেছি তাই, ও গিয়ে ত্রিকাল মুখার্জির
ড়িতে ঢুকল। সন্ধ্যে হয় হয়, কেমন একটু সন্দেহ লাগল। নয়ন এ সময়ে
ন? লোকটা তো খুব সুবিধের নয়। কিছুক্ষণ বোধ হয় ইতস্তত করেছি।
পরে গিয়ে দেখি ত্রিকাল মুখার্জি বসে বসে মদ খাচ্ছে, আর নয়নের কথা
নছে। নয়ন বলছে, আপনার যে আমার ওপর অনেকদিন থেকে লোভ আমি
নি, ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে এসেছি। আমায় নিলে যদি আমার বাবার
শোধ হয় তাহলে আমায় নিন। অন্তত আমার বাবা মরে শান্তি পাবে।
ওরা কেউ আমায় দেখতে পায় নি, আমি ঢুকে বললাম, না নয়ন, বাবার
কা আমি আমার জীবন দিয়ে শোধ করেছি, তুই বাড়ী চ।
নয়ন বলল, না দাদা, তোমার জীবন দিয়ে বাবার টাকা শোধ হয়নি,
ই দেখো এনার চিঠি।
চিঠিতে ছিল, তোমার বাবার দু'লাখ টাকার কি ব্যবস্থা করলে? শোধ
রার চেষ্টা কর। আমি আর কতদিন অপেক্ষা করব?
চিঠিটা পড়ে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। ত্রিকাল মুখার্জির দিকে তাকিয়ে
ললাম, আপনি মানুষ না কি?
ত্রিকাল বললেন, তুমি বলো।
বললাম আপনিই তো বলেছিলেন, আমার দ্বারা বাবার ঋণ পরিশোধ
য়েছে।
ত্রিকাল মদের গেলাসটা টেবিলে রেখে নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা
মিই বলো নয়ন—
আমি রেগে বললাম, নয়ন কি বলবে? আমি আমার ব্রিলিয়াণ্ট জীবন দিয়ে
আপনার খিদমৎ খেটেছি!
ত্রিকাল বললেন, ব্রিলিয়াণ্ট আবার কি? তোমায় বরং আমি সাহায্য

করেছি, চাকরী দিয়েছি। তুমি আমার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ? পেয়েছ কিনা বলো!

তা পেয়েছি।

তবে।

আমার আর মুখে কোন জবাব এল না। হঠাৎ ত্রিকাল ডাকলেন, বেয়ারা! বেয়ারা এলে বললেন, এই লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দাও।' আর একটা সোডা দিয়ে যাও।

বেয়ারা বলল, চলিয়ে।

আমি বললাম, নয়ন, তুই চলে আয়।

নয়ন চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, দাদা তুমি যাও। আমায় আর ডেকো না। আমায় বাবার ঋণ শোধ করতে দাও।

আমি বললাম, নয়ন, আমি সারাজীবন মিঃ মুখার্জির কাছে খেটে বাবার ঋণ শোধ করব, তবু তুই এইভাবে নিজের জীবন নষ্ট করিস্ নি। আমি যে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করেছি কিন্তু আমার কথা আর শেষ হল না। বেয়ারা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।'

প্রফুল্ল থামলে বললাম, 'তারপর!'

প্রফুল্ল তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। টেবিলে মাথা দিয়ে ছেলেমানুষের মত শুধু কেঁদেই চলল। আর আমি ভাবতে লাগলাম, বাইরে থেকে আমরা যা ভাবি, মানুষের জীবন যে তা নয় এই প্রফুল্লই তার প্রমাণ। প্রফুল্ল অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে চোখের জল ঝরিয়ে তারপর বলল, 'আজ সে নয়নও বারাঙ্গনা ভবনের একজন বারবনিতা আর আমি...।'

প্রফুল্লর ব্যথাভরা চাহনির দিকে তাকিয়ে আমি চলে এলাম। যে প্রফুল্লকে দেখে আমার বিস্ময় জেগেছিল, সেই প্রফুল্লর ইতিহাস শুনে আমারই ভেতরটা কেমন করতে লাগল। এই বীভৎস জগৎ। এই জগতে আমরা চলে ফিরে বেড়াই? শরৎচন্দ্র বামুনের মেয়েতে গোলোক চাটুয্যেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তার নির্মমতা দেখে আমরা তাকে সহ্য করিনি কিন্তু আজকের এই ত্রিকাল মুখার্জি? কে দোষী? ত্রিকাল না আমাদের এই সমাজ? এখানে ঈশ্বরকে দায়ী করা হবে, না মানুষকে দায়ী করা হবে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় কি নয়ন ও প্রফুল্ল ভেসে গেল, না মানুষের সেই আদিম চিরাচরিত ভেল্কিবাজী খেলায়। জবাব কারুরই ঝুলিতে নেই। জবাব আমাদের এই যুগের পরিবর্তন। মানুষ দিন দিন শুধু নিজের আত্মনির্ভরতার

খোঁজ করছে। নিজে বাঁচব, নিজে সুখে থাকব, অন্যকে মেরে ধরে নিজের সুখের চিন্তায় মানুষের প্যাটার্ণ পালটে যাচ্ছে। ঐ যে আগে বলা হয়েছে, একদিনে এই মূল্যবোধ পালটায় নি। দিন দিন ধরে সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের স্রোত সরস্বতীর ফল্গুধারার মত বয়ে বয়ে নতুন সমাজের পত্তন করেছে। দেশের আইন পাপীকে শাস্তি দিতে পারে কিন্তু আইন সমাজ পালটাতে পারে না। আপনি কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন, খবরে জানানো হচ্ছে, অমুক গ্রামে, তমুক একটি মেয়ের পাঁচ মাস বিয়ে হয়েছিল, তাকে মৃত অবস্থায় পুকুরপাড়ে পাওয়া গেছে। দেখাগেল, তার গলায় আঙুলের ছাপ, তাকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে। পুলিস স্বামীকে ধরল, স্বামী স্বীকার করল সে মেরেছে। 'কেন?' 'মেয়েটির স্বভাব ভাল নয়।' 'কি করে জানলে?' 'আমার অবর্ত্তমানে একটি লোক প্রায় এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে দেখা করত।' মনে পড়ল দেবদাসের পার্বতীকে। পার্বতী, সে যুগে সমাজকে মেনে নিয়েছিল। মেয়েটিও হয়ত বাবামার অবাধ্য না হয়ে এই বিয়ে করেছিল। কিন্তু স্বামীর নির্মমতা, একেবারে হত্যা। পার্বতীর স্বামী ভুবন চৌধুরী যদি স্ত্রীর এই বিশ্বাসঘাতকতা জানত তাহলে কি সেও এই ধরণের কিছু করত না? তাই বলা যেতে পারে, দেবদাসের পার্বতীদের এখনও সেই নিরুপায় অবস্থা। সমাজ যতই পালটাক, নারীর জন্যে সমাজের অনুশাসন সেই একই আছে। উদারতা সে বাইরের চোখে। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা কোন স্বামীই সহ্য করে না। 'স্বামী' গল্পের সেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী উদার ঘণশ্যাম কোথায়? সংসার জীবনে ঘণশ্যাম বোধ হয় একজনও নেই যে সৌদামিনীদের বাঁচাতে পারে। তাই বলতে হয়, শরৎচন্দ্র এ গল্প লিখে স্বামীদের একটু উদার হতে বলেছেন। ঐ সৌদামিনীদের মতই নারীদের মন। ওরা একেবারেই অবলা। নিজেরা কি করে নিজেরাই জানে না। একবার মনে করে এটা ভাল, আবার মনে করে সেটা ভাল। তবে ঘণশ্যাম বড়ই স্বাধীনতা দিয়ে ফেলেছিল সৌদামিনীকে। এত স্বাধীনতাও মনে হয় নারীজীবনের পাপ। হোক না শিক্ষিত, শিক্ষার প্রলেপ দিয়ে কি নারী স্বভাব পালটানো যায়? ওরা তো একদিকে বলতে গেলে শিশুর মতই সরল, শুধু মমতার সন্ধানে থাকে, একটু মমতা জানালেই তারা স্থান কাল পাত্র ভুলে যায়। এই যে নারীমন এতো আর পালটায় না। একটু প্যাটার্ণ পালটাতে পারে কিন্তু ভেতরে সেই একই ধারা। আগের নারীরা নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছে, এখন আর করে না। এখন তর্ক বাধায়। নিজের আধুনিকত্ব জাহির করে কিন্তু পরিণতি বোধ হয় আগের নিয়মেই সমাধা হয়।

সেই নিরুপায় নারীজীবন। ঈশ্বর যাদের কোনই নিরাপত্তা দেন নি, তখন মানুষ কেন দেবে? মানুষও সেই সুযোগটি নেয় কিন্তু সংসার জীবনে নারীর অবদান যে কম নয়, সে যুগেও যেমন দেখা গিয়েছিল, এ যুগেও কম দেখা যায় না। সে যুগের মেয়েরা অন্তঃপুরের শান্তি দশহাতে বজায় রাখবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হত, এ যুগের মেয়েরা শুধু অন্তঃপুর দেখে না, বাহির বিশ্বেও তাদের উপস্থিতি সমান তালে বজায় রাখবার চেষ্টা করে। স্বামীর অল্প আয় তো কি হয়েছে? শিক্ষিত মেয়েরা উপার্জনের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরাই বরং এই সব মেয়েদের নষ্ট করবার তালে ঘুরি। একটা গল্প এই প্রসঙ্গে শোনা যাক্।

'স্বামী অসুখ নিয়ে বাড়ী ফিরল। স্ত্রী তার সর্বস্ব দিয়ে স্বামীকে ভা-। করার চেষ্টা করল কিন্তু স্বামীর অসুখ বাঁকা পথ নিল। কমলা চোখে সরষে ফুল দেখল। যা গয়না ছিল স- শেষ: অগত্যা ডাক্তারের শরণ নিল। ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলল, আপনি আমাকে কৃপা করুন। স্বামী ভাল হলে আপনার সব টাকা শোধ করব। কথাটা হচ্ছিল ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে। ডাক্তার তাকিয়ে দেখল অশ্রুমুখী নারীর দিকে। কাপড়ের আড়ালে নারীর যৌবন তাকে প্রলুব্ধ করল। দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। কমলার নারী মন একবার কেঁপে উঠল। ডাক্তারের আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে দু'চোখে জল নিয়ে বলল, আমার স্বামীর আরোগ্যের সব ভার আপনি নেবেন তো!

এইটুকু সান্ত্বনা, ডাক্তার বেইমানী করে নি। সে তার স্বামীকে ভাল করে তুলেছিল এবং কমলা পড়াশুনা জানত, বি. এ. পাশের ডিগ্রী ছিল তার। ডাক্তারের চেষ্টায় সে একটি অফিসে চাকরী পেয়ে গেল।

একালের নিয়মে কমলা আত্মহত্যা করল না, স্বামী ভাল হয়ে গেলে সব জানাল। বরং এই হল, কমলা একবার যে সতীত্ব খুইয়েছিল, সেটাই তার হল মূলধন। স্বামীর ইচ্ছায় ও তার অধ্যবসায়ে নিত্য নতুন মানুষের সাহচর্যে কমলা নিজেকে বিকিয়ে দিল। ওরা টাকার মুখ দেখল। জীবন ধারণের মান অনেক উঁচুতে উঠে গেল। গাড়ী, ফার্নিস ফ্ল্যাট, ফোন, ফ্রিজ, বছরের দু'তিনবার বাইরে যাওয়া। ওদের একটি মাত্র মেয়ে নামী দামী স্কুলে পড়ে। পোষাক পরে ধনী-কন্যার মত। টিফিন খায় প্যাটিস্, সন্দেশ, ডিম সহযোগে। সন্তোষের মনে কোন বিকার নেই। সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, খদ্দেরের সঙ্গে দরদস্তুর করে নেয়। নিঃশব্দে খদ্দেরের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেয়। বলে যায়, 'দু'ঘণ্টা পরে আমি আসব, তুমি তৈরী থেকো।'

এই সন্তোষ রায়ের সঙ্গে আমার হঠাৎ আলাপ হয়ে গেল। কমলাকেও দেখলাম। তাদের গল্প আগে শুনেছিলাম। কৌতুহল ছিল। বন্ধুর মারফৎ আলাপও হল। এক হোটেলে ঘর ঠিক করলাম। কমলা যথারীতি পাঁচটার পর সন্তোষ রায়ের সঙ্গে এল। আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'ঠিক আছে আমি দু'ঘণ্টা পরে আসব। দু'ঘণ্টায় হবে না?' হাসলাম। প্রশ্নটা আমায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। কমলা তখন বুকের কাপড় সরিয়ে দিয়েছে। সেই দিকে আড় চোখে তাকিয়ে আমি কি জবাব দেব ভাবছি, কমলা বলল, 'দু'ঘণ্টা এনাফ কি বলেন?'

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। সন্তোষ রায় ও.কে. বলে শিষ দিতে দিতে চলে গেল। কমলা পাঁশে এসে বসল, 'কাপড়টা খুলে রাখব?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে কাপড় জামা খুলে রেখে, শায়া সম্বল করে পাশে এসে বসল।

আমি বললাম, 'বেশ্যাবৃত্তি করতে মনে লাগে না?'

সে বলল, 'না। খারাপ কি? ভালই তো আছি। ভিক্ষে করলে তো আপনি পয়সা দেবেন না? বরং কিছু দিয়ে কিছু নিই। এক্সচেঞ্জ অফ লেবার।' সে হাসল।

'কিন্তু এ লেবার তো আমাদের সমাজে ঘৃণ্য।'

কমলা উষ্মা প্রকাশ করে বলল, 'একি শরৎচন্দ্রের যুগ ভেবেছেন? নীতির দোহাই আমরা মানি না। শরৎচন্দ্রের কিরণময়ী হৃদয় যন্ত্রণা নিয়ে মরেছে। রাজলক্ষ্মী, পার্বতী, মাধবী এরা সেকালের মেয়ে। তারা সতীত্বের চিন্তায় না পেরেছে বাইরে যেতে না পেরেছে ঘরে থাকতে।'

'আচ্ছা সে নয় শরৎচন্দ্রের যুগ। একালে কি সতীত্বের কোন মূল্য নেই?'

কমলা বলল, 'না।'

'কারণ'?

'আমরা শুকিয়ে মরে যেতে চাই না। আপনি তো জানেন না, একদিন আমার ঐ স্বামী মরে যাচ্ছিল। সেদিন যদি আমি সতীত্ব বজায় রাখতাম, তাহলে কি স্বামী বাঁচত?'

'কিন্তু স্বামী যদি স্বীকার না করত?'

'তাহলে লোন্‌লি লাইফ লিড করতাম।'

মেয়েটি বেশ ইংরিজী বলে দেখে মুগ্ধ হলাম। উচ্চারণও চমৎকার। আর সবচেয়ে যেটা তার বৈশিষ্ট্য, সে হল খুব স্মার্ট। স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভাল।

আমার অন্যমনস্কতা দেখে কমলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবছেন? ভাবনার কিছু নেই। আমার স্বামী এ নিয়ে কখনও ভাবে না। আমরা য়ুরোপ, আমেরিকা দেশের মানসিকতা নিয়েছি। কোন পুরুষের সঙ্গ দিলে আমাদের মন অপবিত্র হয়ে যায় না। আপনি যেই এখান থেকে যাবেন, চিরতরে আপনাকে ভুলে যাব।

সে আর কথা বাড়াল না, নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমার জামার বোতামে হাত দিল।

আর আমি তখন ভাবতে লাগলাম, কি করে সম্ভব হল এই মানসিকতা? আগের জীবনে নারী এই সতীত্ব রক্ষার চিন্তায় কত দুর্ভাবনায় মরেছে, তখনই মনে পড়ল আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অন্তর্বিপ্লব ঘটে ঘটে এই পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। 'দেনা পাওনা' উপন্যাসে অলকা জীবানন্দকে বাঁচাতে গিয়ে সতীত্বকে মূলধন করেছিল, তবু সে মিথ্যা কিন্তু গ্রামবাসী তাকে রেহাই দেয় নি। অলকা তো জানত তার কিছু খোয়া যায় নি, তাই সে মাথা উঁচু করে ছিল কিন্তু যদি তার কিছু খোয়া যেত? আর একালের কমলা সতীত্ব বলে কিছুকে মানতে চায় না। সে বলে আমি ভাল আছি? তবে কি শরৎচন্দ্রের সেই শেষপ্রশ্নের উত্তরই সার্থক? কমল যেমন বলেছিল, 'বিবাহটা কিছু নয়, মনের মিল। অ্যাডজাস্ট-মেণ্ট। মন্ত্র পড়ে বিয়ে করলেই কি সার্থক?'

সেটা আমরা শরৎচন্দ্রের কল্পিত গল্প বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই কমলার গল্প তো কল্পিত নয়, এ যে এ কালের রূঢ় বাস্তব। এ কালে আরও কত যে গল্প পথে ঘাটে ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। স্বামী যেমন স্ত্রীকে মূলধন করে উঁচু তলায় উঠে যায় তার দৃষ্টান্ত মিলল, তেমনি, মা বাবা, ভাই বোন সমগ্র পরিবার মেনে নেয় সে দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সেদিন এমনি একটি মেয়ের দেখা মিলল। একটি সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মেয়েটাকেও অনেকক্ষণ দেখলাম, এ পাশ ও পাশ ঘুরছে। মনে হল কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে। কলেজে বা স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে বলে মনে হল। বয়েসও সেই মত। তবে মুখ চোখ বেশ সপ্রতিভ। বেশবাস সাধারণ। দু'চারবার চোখাচোখিও হল। হঠাৎ দেখি সে আমার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এমনভাবে তাকালে সব পুরুষের যেমন শরীরটা ঝিম ঝিম করে ওঠে, আমারও করল। চোখ সরিয়ে নিলাম কিন্তু আবার তাকালাম, সে তাকিয়ে আছে। মনে হল যেন চোখে ইসারা করল। মনটা ছলাৎ করে

উঠল। পা পা করে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি চাপা স্বরে বলল,
'যাবেন ?'

বললাম, 'কোথায় ?'

মেয়েটি হাসল, 'এই কাছেই।' ওর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। 'একটা রিক্সা নিন না।' রিক্সা নিলাম। রিক্সার মধ্যে দু'জনে পাশাপাশি বসলাম। তখন বুঝে নিয়েছি ব্যাপারটা। এই মেয়েটি যে এসব করে একবারও ভাবি নি! বললাম, 'কত তোমায় দিতে হবে বললে না তো!'

সে একটা টাকা বললো।

আমিও দরদস্তুর করে একটা ঠিক করলাম। কিন্তু কৌতূহল মেয়েটির দেহ আকাঙ্খা নয়, তার ভেতরটা জানা। একে তো দেখে মনে হয় কোন স্কুল, কলেজে পড়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি কোন কলেজে পড়ো ?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ কলেজে ?'

সে একটা কলেজের নাম করল।

'এ সব কর কেন ?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না করলে টাকা পাব কোত্থেকে ?'

'চাকরী বাকরী!'

সে আমার দিকে আবার তাকিয়ে বলল, 'দেবে কে ? আপনি দেবেন ?'

জবাব দিতে পারলাম না। বয়স কত হবে মেয়েটির ? খুব জোর সতেরো, আঠারো। বয়স আন্দাজে শরীরটা খুব ভরাট হয় নি। বাহু, কোমর সবই কিশোরীর মত।

এক সময়ে রিক্সা থেমে গেল। ঝর্ণা নামল। নেমে আমায় বলল, 'আসুন'। দু' একটা গলি পার হয়ে এক জায়গায় থেমে আমায় চাপা স্বরে বলল, 'কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে বলবেন, বন্ধু।' আমি তাকিয়ে আছি দেখে বলল, 'ভদ্রলোকের পাড়া তো! জানতে পারলে তুলে দেবে।'

তখনও বুঝতে পারি নি সে কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তার পিছু পিছু একটা গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকলাম। ভাঙা চোরা একতলা। অন্ধকার হয়ে গেছে বলে কিছু ঠাওর হল না। একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল, একটা ছেলে তক্তাপোশের ওপর বসে পড়া করছে। ঝর্ণার চেয়ে দু' এক

বছরের বড় বলে মনে হল। আমাদের পদশব্দতে সে চোখ তুলে তাকাল ঝর্ণা বলল, 'দাদা ও ঘরে যা'।

ছেলেটি বইগুলি হাতে নিয়ে চলে গেল। কোন প্রতিবাদ করল না দেখে বুঝলাম, তার সব জানা আছে। ঝর্ণা বলল, 'বসুন।' সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, কোন আসবাবের বালাই নেই। একটা মাত্র তক্তোপোশ, তাও পায়া ভাঙ্গা, একটা দিকে ইট দিয়ে সমতা রক্ষা করা হয়েছে। আর কিছুই নেই ঘরে। ঘরটি খুবই পুরোনো। দেওয়াল নোনাধরা। চুণ যে কতকাল পড়ে নি কে জানে। আবার জায়গায় জায়গায় উই হয়েছিল, তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, চিহ্ন বর্তমান।

ঝর্ণা ঘরে ঢুকল। বেশবাস পরিবর্তন করে ঘরোয়া একটা কাপড় পরেছে। গায়ে কোন জামা নেই। দরজা বন্ধ করে বলল, 'একি আপনি এখনও জুতো খোলেন নি?'

জুতো খুলতে খুলতে বললাম, 'ঐ যে ছেলেটি পড়ছিল, ও তোমার আপন দাদা?' 'হ্যাঁ'। তাকিয়ে আছি দেখে সে বলল, 'কেন বিশ্বাস হচ্ছে না, বুঝি? পাশের ঘরে আমার মা বাবা, আরও তিনটি ভাই বোন আছে।'

'তুমি যে এ সব কাজ কর, তাঁদের সমর্থন আছে?'

'থাকবে না কেন? আমি কি লুকিয়ে কিছু করছি নাকি?' ঝর্ণা উত্তর দিয়ে বুকের কাপড় সরালো। বুক খুব ভারী নয়। হয়ত বাড়তে দেওয়ার আগে স্পর্শের উন্মাদনায় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ফলের বৃদ্ধির আগে গাছ থেকে পেড়ে নিলে যেমন হয়। 'তোমার বাবা কিছু করেন না?'

'বাবা আর করবে কেমন করে? বাবা তো অসুস্থ, পঙ্গু। শুয়ে থাকে।'

'আগে কিছু করতেন না?'

'প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করতেন।'

'শিক্ষকের মেয়ে হয়ে তুমি এই সব কর?

ঝর্ণা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন? লেখেন টেখেন নাকি?'

'না লিখি না। একালের মেয়েরা কিভাবে জীবন যাপন করছে সেই কৌতূহল।'

ঝর্ণা বলল, 'একালের মেয়েরা কি ভাবে জীবন যাপন করছে জানি না। তবে আমি এই টুকু বলতে পারি, আমি যদি এ কাজ করা ছেড়ে দিই, তাহলে আমাদের পরিবার না খেয়ে মরবে।'

'এর চেয়ে মরা কি ভাল নয় ?'

'না। মরতে কে চায় বলুন তো! আমরাও মরতে চাই না, কেউই মরতে চায় না। দাদা বি. কম. পাশ করলেই আমি এ কাজ ছেড়ে দেব। দাদা নিশ্চয় একটা চাকরী পাবে। পাবে না ?'

'নিশ্চয়! ঠিক তো কিছু নেই। চাকরীর বাজার ভাল নয়।'

ঝর্ণা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, 'নিশ্চয় দাদা পাবে। না পেলে আমাদের চলবে কেমন করে ? তছাড়া, আমিও বি. এ. পাশ করব। আমিও কি কিছু করতে পারব না ?'

কত আশা এই ঝর্ণার। এই মুহূর্তে সেই আশা ভেঙে দিতে ইচ্ছে করল না। 'তুমি বিয়ে করবে না ?'

ঝর্ণা ফিক করে হেসে বলল, 'আমার তো ব্যবস্থা করাই আছে। মানিকদা আর অপেক্ষা করতেই চায় না।'

'সে এসব জানে ?'

'কিছু কিছু আন্দাজ যে না করে এমন তো নয় ? কিন্তু সে বড় ভাল, আমাকে ভীষণ ভালবাসে। বলে, তুমি যাই কর, তবু তুমি আমার।

ঝর্ণা বেশ খুশি মেজাজেই বিছানার রোলটা তক্তোপোশের ওপর ছড়িয়ে দিল।

আমার এই সামান্য টাকার বিনিময়ে একটা পরিবারের আয়ু আরও একদিন দীর্ঘতর হল। এমনি কতজনার টাকা এই পরিবারের জীবনকে বাঁচাচ্ছে। কমলার কথা মনে পড়ে, 'ভিক্ষে তো আপনারা দেবেন না ? এক্সচেঞ্জ অফ লেবার। আমি লেবার দিয়ে টাকা উপায় করছি। দোষ কি ?' ঝর্ণাও লেবার দিয়ে টাকা উপায় করছে। এ যুগের মূল্যবোধে এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সহজ চোখে দেখে বলি, ছি। কিন্তু বাঁচার পন্থা খুঁজে দিতে পারি না। বাঁচতে গেলে যে এসব সংস্কার শিকেয় তুলে রাখতে হবে, এরা তা বুঝে নিয়েছে। ঐ যে ঝর্ণা স্বপ্ন দেখছে, তার দাদা পাশ করলে সে চাকরী পাবে। তার আবার বিয়ে হবে, সে সংসার করবে। মানিকদা ভীষণ ভাল। এমনি ঝর্ণারা বিয়ে করে কিনা জানি না, তবে তাদের স্বপ্ন কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তারা স্বপ্ন দেখেই সংসারের হাল হাতে নেয়। আর কতকগুলি মানুষ বাঁচে। এ যুগে বাঁচাটাই প্রধান। এমনি বাঁচা বারাঙ্গনালয়ের যুবতী মেয়েও চিন্তা করে। তারও মনে কোন পাপ স্থায়ী হয় না। সেও মনে মনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। এমনি এক পতিতা নারীর কাহিনী বলা যাক্। ধরা যাক্, মেয়েটির নাম বীণা।

অল্প বয়স, আঁটোসাঁটো গড়ন। চার বছর এই পতিতালয়ে এসেছে। মেয়েটির স্বভাব ভাল। টাকা পয়সার জন্যে কোন কামড় নেই। কিন্তু না দিলে মুখটা কেমন শক্ত হয়ে যায়। সেও যে স্বপ্ন দেখে জানতাম না। একদিন তার ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকেছি, দেখি একটি লোক খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কালো, বেঁটে, স্বাস্থ্যবান, যাত্রাদলের মত এক মাথা বাবরি চুল। বীণা গিয়ে সেই চুলের মুঠি ধরে বলল, 'এই ওঠো, আমার লোক এসেছে।'

লোকটি একবার মাথা তুলে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম, সে চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল, অসুস্থ বলে মনে হল, বীণাকে বললাম, 'থাক্ ঘুমচ্ছেন, আমি বরং অন্যদিন আসব।' বীণা বলল, 'না না এখুনি চলে যাবে। কাল সারারাত যাত্রা করে এসেছে তো, তাই শরীরটা কাহিল।' লোকটা একটুখানি শুয়ে থেকে সত্যিই বেরিয়ে গেল।

বীণা দরজা বন্ধ করে ফিরে আসতে বললাম, 'এটি কি তোমার নাগর?' বীণা মুচকি হেসে বলল, 'নাগর বলো না, বলো আদমী। নাগর তো তুমি?'

'আদমী, তবে কি একে বিয়ে করবে?'

বীণা ঘরের টুকিটাকি কাজ সারছিল। সারতে সারতে বলল, 'ইচ্ছে তো সেইরকম আছে।' তারপর কাছে সরে এসে খাটের কোণা ধরে বলল, 'জানো, যাত্রা দলে ওর খুব নাম। চেহারা তো দেখলে? রাম সীতার পালায় রাবণ করে। কর্ণার্জুনে অর্জুন করে। আমাকে বলেছে দু'বছর অপেক্ষা করতে। এখন তো খুব টাকা পায় না। অ্যাপ্রেনটিস্ না কি বলে তাই।' বলে বীণা খুব এক চোট হেসে নিল। বীণা যে স্বপ্নে বিভোর সে আর বলে দিতে হবে না। আমি সেই বীণার কথাই ভাবতে লাগলাম। পতিতা মেয়েও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। পতিতা মেয়েও চায় একটা নিরাপত্তা। বললাম, 'এখন তাহলে রোজগার করে ওকে তোমাকে খাওয়াতে হয়?'

বীণা সঙ্গে সঙ্গে করুণকণ্ঠে বলল, 'বাহ আমি না খাওয়ালে কে খাওয়াবে বলো। ওকি এখন টাকা উপায় করে যে আমায় খাওয়াবে?' এই সময়ে দরজার কড়া নড়ল। বীণা দরজা খুলে দিলে লোকটি মুখ বাড়িয়ে বলল, 'বীণা আমি মেনকার ঘরে শুতে যাচ্ছি। ভীষণ ঘুম পেয়েছে আর পারছি না।' 'বীণা তাড়াতাড়ি বলল, 'না না তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমার দেরী হবে না।'

লোকটি চোখ বন্ধ করে সরে গেল, বীণা দরজা বন্ধ করে আমার কাছে এসে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি নেবে বুঝলে। সারারাত ঘুমোয় নি তো!' সে হাসল।

ামার ভেতরে তখন একটা জালা সৃষ্টি হচ্ছিল, কেন জ্বালা জানি না। বোধ
। পুরুষের সেই ঈর্ষা কিন্তু বীণার কাতরতা দেখে আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল,
ব মেয়েরাই চায় নিরাপত্তা ও একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, সে পতিতার মধ্যেও
ম নয়। যতক্ষণ রইলাম, বীণার ব্যবসায়ী মন একদিকে ব্যবসা করে উপার্জন
রার জন্যে যতনা আগ্রহ, বাইরের দিকে মন পড়ে রইল। একবার বিরক্ত হয়ে
ললাম, 'ধ্যুৎ আর আসব না।'

মেয়েটি জবাব দিল না। মেয়েটি তখন যে স্বপ্ন ঘোরে আছে সে দেখেই বোঝা গেল। এমনি অল্প বয়েসের পতিতা মেয়ে যে সবাই স্বপ্ন দেখে, সে অভিজ্ঞতা আমার আরও হয়েছিল। এমনি ঘটনা প্রায় আকচার। বিশেষ করে এই পাপ ব্যবসা থেকে সরে যাবার জন্তে অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে একটা উন্মাদনা থাকে। যায়ও কিন্তু ফিরে আসতেও বেশি দিন হয় না। জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হয়ে বলে, 'দূর বাপু, তোমাদের গৃহস্থ ঘরে গিয়ে থাকা অনেক জ্বালা। এত সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে রঙ ফলিয়ে বলে যে থাকা যায় না।' এই যে গৃহস্থ ঘরের মানসিকতা নিয়ে পতিতা মেয়েদের অভিযোগ, এর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার নেই।

এটা আগেও শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন। স্ট্যাম্প মারা মেয়েদের মানসিকতায়, আর গৃহস্থ মেয়েদের মানসিকতায় অনেক তফাৎ। যা গোপন তা গোপন রেখেই গৃহস্থ নারী তার সতীত্বের বড়াই করে কিন্তু পতিতারা তা করে না। পতিতা যা তা তো সবাই জানে কিন্তু সে কি ভাল হতে পারে না? বরং সে যত ভাল হয়, গৃহস্থ মেয়েরা তত হয় না। একথার সপক্ষে একটা কথা শুধু বলা যায়, গৃহস্থ নারীকে যে তার কৌলিন্য বজায় রাখবার জন্যে প্রতিরোধের আবরণ সৃষ্টি করতে হয়, না হলে তার যে শান্তি বিঘ্নিত হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, যে পাপী, তার তো পরিচিতি সবার জানা হয়ে গেছে, তার আর গোপনের কিছু নেই, সে ভাল হলেও লোকে সাফাই গায় না। কিন্তু যাকে লোকে ভাল জানে, তার এতটুকু বেচাল কারো সহ্য হয় না, সেইজন্যে গৃহস্থ নারীকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। শরৎচন্দ্রের দেবদাসের দুটি নারীচরিত্র দেখুন না। পার্বতীকে নিয়ে যত লোকে আলোচনা করে চন্দ্রমুখীকে নিয়ে করে না। কারণ চন্দ্রমুখী যত ভালই হোক সে সমাজ পরিত্যক্তা নারী। অথচ দেবদাসের মধ্যে চন্দ্রমুখী ও পার্বতী দুটি নারীর ভালবাসা জন্মলাভ করেছিল। চন্দ্রমুখী দেহব্যবসায়ী বলে দেবদাসের ঘৃণা ছিল কিন্তু নারীর ভালবাসা সে প্রত্যাখান করতে পারে নি কিন্তু

যুগে সে দেবদাস কোথায়? পতিতা নারীকে যে ভাল বাসবে? সেইজন্যে
াদেরও ভাঁওতায় পড়তে হয়। আর ফিরে এসে বলে, 'ধ্যুৎ তোমাদের গৃহস্থ
:র যাওয়াই পাপ।'

তাই বলতে হয়, একালে অনেক কিছু পালটেছে কিন্তু যারা একবার বিশেষ
াতায় নাম লিখিয়েছে তাদের আর সমাজ কোন করুণা করে না। সামাজিক
বৈবর্তনে এর আগে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক চাপের ফলে মধ্যবিত্তের মানসিকতা
কি ভাবে ভেঙে যাচ্ছে। স্বামী কত সহজ অবস্থায় স্ত্রীর দেহ ব্যবসা মেনে নেয়।
তার কারণ বাড়ী, গাড়ী, জীবন ধারণের মান উঁচু ধাপে তোলার জন্যে ঐ সব
ঠুনকো মানসিকতা মনে স্থান দেয় না। ঠুনকোই একে বলা হবে কারণ কি ভাবে
স্বামী স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাহচর্যে ছেড়ে দেয়? এ গল্প নয় সত্যি কাহিনী.
আপনিও একটু চোখ মেলে দেখলে এর সন্ধান পাবেন। স্বামী যখন স্ত্রীর এই
দেহ ব্যবসা মেনে নিতে পারে, তখন আপনার আমার মনে ব্যথা লাগবে কেন?
এই হচ্ছে আজকের জগৎ। যেন তেন প্রকারেণ অর্থশালী হও। অর্থই হচ্ছে
মধ্যবিত্ত সমাজকে উঁচুতে তুলে দেবার মজবুত সিঁড়ি। ঝর্ণার কাহিনীও
কাল্পনিক নয়। কত ঝর্ণারা প্রত্যহ শহরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঐ বাঁচার
চিন্তায়। আপনি একটু অন্যমনস্ক থাকলেই আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়ে
বলবে, 'যাবেন নাকি?' আপনিও অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন?
আপনার কি তখনই মনে পড়ে যাবে না ঝর্ণার কাহিনী?

এই পরিবর্তনশীল সমাজ শরৎচন্দ্র দেখেন নি। দেখলে কি করতেন জানি
না। তবে দেখলে বরেণ্য লেখকের হাত দিয়ে এর অন্তর গভীরের আসল ছবিই
ফুটে উঠত। তিনি শেষের দিকে উচ্চ মধ্যবিত্তের একটা দ্বন্দ্ব দেখাবার চেষ্টা
করেছিলেন কিন্তু সেটার ছিল অন্য অর্থ। 'নববিধানে' সে নব্যপন্থী ও প্রাচীন
পন্থীদের সংঘাতের চিত্র তার মধ্যে নিহিত ছিল। ঊষা প্রাচীনপন্থী ছিল,
এবং সে মাছ-মাংস খেত না, একাদশী, উপবাস করা, পূজা আরাধনায় তার
সময় ব্যয় হত, এই জন্যে তাকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু এক সময়ে
দ্বিতীয় স্ত্রী মরে গেলে লোক লজ্জার ভয়ে সেই প্রাচীন পন্থীকে আনতে হল। তার
পর নানান সংঘাত সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা। শেষে প্রাচীনেরই জয় হয়েছে। স্রষ্টা
প্রাচীনের জয় ঘোষণা করে এই বলতে চেয়েছেন, যা সত্য ও খাঁটি চিরকালই
তা গ্রহণ যোগ্য। নতুনের প্রতি মোহ থাক্ কিন্তু আড়ম্বরের কোন দাম নেই।
নতুনকে পরিত্যাগ করেছেন এই বলে, নব্যসমাজের জীবন ধারণের মধ্যে

যা দেখা যাচ্ছে, তা শুধু পাশ্চাত্য ঘেঁষা নকলনবিশি, তার মধ্যে বঙ্গসমাজের নির্ভেজাল খাঁটি জিনিসটি নেই। এই কথায় বর্তমানের কালটি এসে পড়ে। শৈলেশ, বিভা, ক্ষেত্রমোহনের কাল নয় নেই কিন্তু তার চেয়ে যে আরও আমরা ওপরে উঠে গেছি, সেটা বেশ চোখ মেলে দেখা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজ যে পালটাচ্ছে তা তো একটু আগেই বলা হয়েছে, উচ্চবিত্তরা আগেই তাদের ধরণ পালটেছে সেটা শরৎচন্দ্রের নববিধানেই দেখা গেছে কিন্তু নববিধানের পর……।

ত্রিকাল মুখার্জিকে আপনারা দেখলেন, সেই রকম ধনী সম্প্রদায় এখন যত্রতত্র, তাদের জীবন ধারণ আর গোপন নেই। ত্রিকাল মুখার্জির মতই তারা মান বজায় রাখবার জন্যে নানান গোপন ব্যবসা করে। কেউ দেউলিয়া খাতার নাম লিখিয়ে স্ত্রী পুত্রের কাছে সম্মান রাখবার নানান ফন্দি ফিকিরে মন দেয়। সে যে কত অসামাজিক কাজ আপনি মাঝে মাঝে খবরের কাগজের পাতা খুললেই দেখতে পাবেন। বড় বড় কেতাদুরস্ত মানুষ যারা, তাদের জীবন ধারণ দেখলে আপনাকে চমকাতে হবে। একটা উপমা দেওয়া যাক্। …অমলেশ শিকদার কোন একটি ফ্যাক্টরীর ইনচার্জ ছিলেন, ইনচার্জ থাকাকালীন ফ্যাক্টরী থেকে অনেক মাল সরিয়েছেন। সেই মাল বিক্রী করে কিছু টাকা করেছেন। স্ত্রী রঞ্জনা এ ব্যাপার দেখে একটু অস্বস্তি অনুভব করেছিল। কিন্তু স্বামীর যুক্তিতে চুপ করে যায়। স্বামী যুক্তি দেয়, 'বড়লোক হতে হবে না!' তারপর অমলেশ ধরা পড়েন। কিন্তু ফ্যাক্টরী প্রমাণ করতে পারলেন না বলে অমলেশ ছাড়া পেয়ে গেলেন। রঞ্জনাকে গর্বের সঙ্গে বললেন, 'দেখলে তো।' রঞ্জনা সত্যিই দেখল, স্বামী কত ধূর্ত। যাই হোক ইতিমধ্যে তাঁরা এক বেনামীতে বাড়ী কিনেছিলেন, সেখানে উঠে গেলেন। তাঁরা ছোটখাট বড়লোক হয়ে গেলেন। অমলেশ শিকদার নিজে একটা ফ্যাক্টরী করলেন। আগের ফ্যাক্টরীর মত মাল তৈরি করে রপ্তানী করতে লাগলেন। কিন্তু স্বভাবে সৃষ্টি হয়েছিল চুরি। চুরির ধান্দাই তাঁর মনে থাকল। ইতিমধ্যে বন্ধুর সংখ্যাও পালটে ছিলেন। অমলেশ আর পুরনো বন্ধুদের পাত্তা দিতেন না। বড়লোক হয়েছেন, সেই অনুযায়ী লোকের সঙ্গে মিশতে লাগলেন!

সেই বন্ধুদের দ্বারাই নানারকম গোপন ব্যবসার খোঁজ পেতে লাগলেন। একটি বিধবার অঢেল টাকা কিন্তু সংসারে কেউ নেই। বিধবা যুবতী, খোঁজ করে জানা গেল, তার ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য প্রচণ্ড। অমলেশকে দেখতে মোটামুটি সুপুরুষ। তিনি গিয়ে মনোরমার সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেই

পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছল। মনোরমার দুর্বলতায় সুড়সুড়ি দিয়ে বহু সম্পত্তি তিনি হস্তান্তর করলেন। মনোরমা একসময়ে অন্তঃসত্ত্বা হল। এটাই মনে মনে চাইছিলেন অমলেশ শিকদার। মনোরমা বলল, 'কি হবে? আমাকে বাঁচাও অমলেশ। আমি বিধবা, কি লজ্জা, ঐ সন্তান নিয়ে আমি করব কি?'

অমলেশ বললেন, 'থাক না। মানুষ করবে। তোমারতো কেউ নেই' মনোরমা রেগে উঠল, 'এ সময়ে তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?' কিন্তু অমলেশও কোন উপায় দেখলো না, আর সহায়হীনা মনোরমাও কিছু করতে পারল না। মনোরমা কিছু বললেই অমলেশ বলে, 'মাথা খারাপ। শেষকালে কি আমার হাতে দড়ি পড়বে?'

মনোরমা দিনের পর দিন রুগ্ন কৃশ হয়ে যেতে লাগল। অমলেশ মনে মনে খুশি হয়ে নিজেব জাল ছড়াতে লাগল। মনোরমার শরীরের অবস্থা দেখে একদিন অমলেশ বলল, 'মনো, তোমার যদি কিছু হঠাৎ হয়ে যায়, সম্পত্তিব একটা বিলি ব্যবস্থা করে যাবে না?' মনোরমা অমলেশের মনের কথা বুঝল। সে সেদিনই উকিল ডেকে অমলেশের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিল।

অমলেশই একদিন ভুল করে কটা ঘুমেব ওষুধ মনোরমার টেবিলে রেখে এল, মনোরমার আত্মহত্যা করতে আব বিলম্ব হল না। অবশ্য মনোরমা লিখে গিয়েছিল, 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। আমি স্বেচ্ছায় কলঙ্ক এড়ানোর জন্যে আত্মহত্যা কবছি।'

পুলিশ তবু অমলেশকে ছাড়ল না। জেরা করে আসল ঘটনা জানবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু প্রমাণ কিছু নেই। তাছাড়া অমলেশ শুধু মনোরমাব গার্জেন ছিল, সে কার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে অমলেশ জানবে কেমন করে? এবারও অমলেশ অদ্ভুত উপায়ে বেঁচে গেল।

কিন্তু এবার অমলেশ শিকদারের বাড়ীর ভেতর দেখুন। অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জনের পরিণতি কি? রঞ্জনা শিকদার ও তার মেয়ে বুবু শিকদার অদ্ভুত জীবন নিয়েছে। গাড়ী, বাড়ী, ফোন, রেডিও, ফ্রিজ, অঢেল আসবাব, খাওয়া দাওয়া প্রচুর। বন্ধু সমাগমেরও শেষ নেই। রঞ্জনার অঢেল বন্ধু বান্ধব। বুবুরও তাই। ওরা যে যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত। সে জীবন আদি রসাত্মক। রঞ্জনা গোপনে বারবনিতার জীবনই যাপন করে। ধনী সন্তান দেখে আলাপ করে। হোটেলে ঘর বুক করে। টাকা উপায় করে বাড়ী আসে। বুবুও তাই। এক এক সময়ে এমন হয়, মা, মেয়ের মধ্যে রেষারেষি লেগে যায়।

অমলেশ এসব জানেন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেন না। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে যায়। পুলিশ বুবু ও একটি ছেলেকে কোন এক ময়দান থেকে বিশেষ অবস্থায় ধরে। অমলেশকে থানায় যেতে হয়। মেয়েকে অমলেশ তাঁর গুড উইলের জোরে ছাড়িয়ে আনে কিন্তু রাগটা পড়ে গিয়ে স্ত্রীর ওপর। রঞ্জনা বলে, 'রাগ ফাগ আমাকে দেখিও না। তুমি যা তাই তো সবাই হবে। তুমি যদি ভাল হতে, তাহলে কি সংসার এমনি হত?'

অমলেশ বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'আমি কি করেছি? আমি তো অর্থের জন্যে এসব করি। তোমাদের সুখে রাখার জন্যে আমার এই চেষ্টা।' রঞ্জনা বলে, 'ও কথা বলো না। আমাদের সুখে রাখার চেষ্টা করনি। নিজের সুখের জন্যেই এসব করেছ?'

অমলেশ বলেন, 'কি তুমি সব যা তা বলছ?'

রঞ্জনা বলে, 'ঠিকই বলছি তোমায় আমি এত বছর দেখছি না। তুমি কি ছিলে আমি জানি না। দুর্যোধনের পাপে যেমন কৌরব বংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তোমার পাপেও যাবে। আমাদের আর শাসন করতে এস না। যা করছ কর গিয়ে।' অমলেশ আর জবাব দিতে পারে না, সরে যায়। এমনি অমলেশরা সরেই যায়। তবু কি সহজ উপায়ে ধনী হওয়ার পথ থেকে কেউ সরে দাঁড়ায়? এমনি উচ্চ বিত্তশালী দিন দিন গজিয়ে উঠছে। এ আজকের পরিণতি নয়, শরৎচন্দ্রের কালেও ছিল। শরৎচন্দ্রও তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। বেনী ঘোষালকে কি আমরা ভুলে গেছি? না গোলোক চাটুয্যে, রাসবিহারীকে বিস্মৃত হয়েছি। সেকালে যেমন তারা উঠে এসেছিল লেখকের গল্পের খাতায়, একালে বাস্তব জীবনে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং কি ভয়ঙ্কর তারা, এই কিছুক্ষণ আগে অমলেশ শিকদারকে দেখলেন। তবু অমলেশ শিকদারকে সহ্য করা যায়, সে তার স্ত্রীকে প্যালা দিয়ে টাকা উপায় করে নি কিন্তু মনীশ তালুকদার। মনীশ তালুকদারের মত লোক শরৎচন্দ্রের কালেও ছিল কিনা জানি না। অন্তত তাঁর লেখনীতে মেলে নি। সম্ভবত মনীশ তালুকদার একালের এক নতুন গোটা মানব সন্তান। মনীশ তালুকদার একটি ফার্মের অফিসার। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস সেই অফিসের। মনীশ খুব চৌকস ছেলে, স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম, বয়স আঠাশের মত। বড় বড় খদ্দের ধরার জন্যে বড় বড় হোটেলে পার্টি দেয়। সেখানে মদ, মেয়ে-ছেলের হুল্লোড় হয়। মনীশও সেই দলে ভীড়ে যায়। কণ্ট্রাক্ট সই করে অফিসকে দারুণ খুশি করে। অফিস তার এফিসিয়েন্সির জন্যে যথেষ্ট তাকে খাতির করে।

এ হেন মনীশ তালুকদার বিয়ে করতে চাইলে সুন্দরী, বিদুষী, সর্বগুণান্বিতা পাত্রী পাওয়া দুর্লভ নয়। ধনী সম্প্রদায় থেকে শুরু করে অফিসের এল. ডি ক্লার্ক পর্যন্ত চেষ্টা করবে কিন্তু পাত্র নিজেই যখন তার অভিভাবক, তার পছন্দের ওপর সবটা নির্ভর করবে। পাত্র অর্থের দিকে খুব একটা দৃষ্টি দেয় না। প্রথমে দেখে বিদুষী। সব চেয়ে যেটা লক্ষ্য পাত্রের সেটা হল মেয়েটি বাধ্য কিনা। বাধ্য মেয়ে দেখে মনীশ তালুকদার একদিন বিযে করে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে সেই স্ত্রীকে ট্রেইন করতে লাগল। ড্রিঙ্কে অভ্যস্ত করাল। ম্যানারস শেখাল। চুল বব করাল। পোষাকের স্বল্পতা শেখাল। পার্টি হলেই মিসেস তালুকদার ফার্স্ট লেডি। অন্য ভাড়া করা মেয়েরা যে কাজ করত মিসেস তালুকদারের ফার্স্ট প্রেফারেন্স। মনীশ আরও পপুলার হয়ে গেল। পার্টি খুশি মিসেস তালুকদারের ব্যবহারে। এক সঙ্গে ড্রিঙ্ক করে। সঙ্গ দেয়। কণ্ট্রাক্ট সই করতে মনীশের আর বেগ পেতে হয় না।

কল্পনা তালুকদার এ সবে খুব খুশি হয় না। সে গোপনে চোখের জল ফেলে কিন্তু মনীষের সামনে নয়। কল্পনা তালুকদার একদিন পার্টি থেকে ফেবার সময় প্রচুর ড্রিঙ্ক করে ফিরছিল। বেহুঁশই বলা যাবে। পাশে বসে মনীষ ড্রাইভ করছিল। হঠাৎ মনীশ কল্পনার গায়ে হাত দিল। কল্পনা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, 'ডোণ্ট টার্চ মাই বডি।'

মনীশ হাসতে লাগল, 'আজ বুঝি খুব ড্রিঙ্ক করেছ কল্পনা?'

কল্পনা জবাব দিল না। হঠাৎ ওর কান্না শুনে মনীশ বলল, 'কল্পনা তুমি কাঁদছ?'

কল্পনা বলল, 'না। কাঁদব কেন? তুমি আমায় কোথায় নামিয়েছ জানো'?

মনীশ কিছু বলতে গেল কিন্তু গাড়ী বাড়ীর সামনে আসতে আর বলা হল না। কল্পনা শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মনীশ পাশে এসে আবার তার গায়ে হাত দিল। কল্পনা আবার চমকে উঠল, বলল, 'বলেছি না আমার গায়ে হাত দিও না।'

'কেন কি হল?' মনীশ জানতে চাইল।

কল্পনা চোখ লাল করে বলল, 'জানো না ঐ ভাটিয়া…'

'কি?'

'সে কি তোমার অজানা? তোমার কণ্ট্রাক্টের জন্যে ঘরের বৌকে তুমি ওদের মধ্যে ছেড়ে দাও?'

'ভাটিয়া কি করেছে? ভাটিয়া তো খুব খারাপ লোক নয়?'

'খারাপ কেন হবে? খুউব ভাল। তোমার দশ লাখ টাকার কণ্টাক্ট তো সই হয়েছে, আর আমায় কি দিতে হয়েছে জানো?'

'কি?'

'ইজ্জত।'

'তুমি আজ খুব ড্রিঙ্ক করেছ কল্পনা, মাথার ঠিক নেই। ঘুমোও।'

'ঘুমবো তো বটে কিন্তু চিরকালের জন্যে ঘুমোবো।'

কিন্তু এই কল্পনারা কোনদিনও ঘুমোয় না। এরা এযুগে আবার সেজে গুজে পার্টিতে যায়। নাচে, গায়, ড্রিঙ্ক করে, পার্টির সঙ্গে হোটেলের ঘরে শোয়, আবার স্বামীর পাশে বসে বাড়ী ফেরে। দেখতে দেখতে তাদের যেটুকু বিবেক ছিল চলে যায়। এদের কি আপনি নষ্ট মেয়েছেলে বলবেন, কখনো নয়। এরাই একালে সমাজে মাথা তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরাই এখনকার নতুন মানুষ। একালের বারবনিতার পর্যায়ে যদি তাদের ধরা যায়, তাহলে ভুল করা হবে। হয় তো তারা আপনার আমার নামে মানহানির মামলা দায়ের করবে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বোধ হয় এদের দেখা হয় নি, দেখা হলে কি করতেন জানি না। বোধ হয় সংস্কার বোধে নিজেই আহত হতেন। তিনি মানুষের উদারতা চেয়েছিলেন কিন্তু এতখানি আশা করেন নি। তিনি তো কখনও নারীকে ইজ্জত দিয়ে তার মনের আকাঙ্খা মেটাতে বলেন নি। বরং কিরণময়ী তার হৃদয় যন্ত্রণায় শেষপর্যন্ত পাগল হয়েছে কিন্তু নিজের নারীত্ব বিসর্জন দেয় নি। স্রষ্টার মনে এটাই ঘৃণা জেগেছে কিন্তু একালে? ঘৃণা টিনা ওসব শিকেয় উঠে গেছে। একালের মূল্যবোধ বড় ভয়ঙ্কর। শরৎচন্দ্র এককালে পতিতাবৃত্তি নিবারণ করে নারীকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নারী এ যুগে কোন পথে? সে যুগে সামাজিক কতকগুলি সংস্কার বোধে নারী অত্যাচারিত হচ্ছিল। সতীত্বের ধ্বজা তুলে তাদের নারীত্ব কলঙ্কিত করা হচ্ছিল। এযুগে সেই নারী অনেক স্বাধীনতা পেয়েছে। অন্তঃপুরে আর আবদ্ধ নয়। মুখে তাদের ভাষা এসেছে। শিক্ষার আলোয় তাদের বুদ্ধি অনেক প্রখর কিন্তু আমরা নারীর কাছ থেকে কি লাভ করছি?

এ প্রবন্ধ যারা পড়ছেন, তারা হয়ত বলবেন, একটু বেশি আলোচনা হয়ে যাচ্ছে, না! নারী নিজে কি করবে? অর্থ নৈতিক চাপ, সামাজিক বির্বতনে যদি জীবন ধারণ বিড়ম্বিত হয়, নারী কি করতে পারে? সে বললে অবশ্য

কিছু বলা যাবে না, কারণ পরিবর্তনকে তো ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাকে মেনে নিতেই হবে।

তবে একালের বারবনিতা প্রসঙ্গে যদি এই সব সামাজিক মেয়েদের বারবনিতা বলা যায়, তাহলে কি খুব অত্যুক্তি হবে? শরৎচন্দ্র ঝিকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন বলে সে যুগে তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু সাবিত্রী ছিল নিষ্পাপ। নিষ্পাপ নারীকে কত যুদ্ধ করে তার নারীত্ব অটুট রাখতে হয়েছিল। স্রষ্টার মনে ছিল নিষ্পাপের সাধনা। সে ঝি বৃত্তি করুক না, সে তো দেহব্যবসা করে নি, পুরুষের লোভ তাকে এতটুকু টলাতে পারে নি। কিন্তু এ যুগে? এ যুগে সেই নিষ্পাপটুকু সরে গেছে, যুদ্ধ ঠিকই আছে। একালের নারী পুরুষের মধ্যে দুটো জিনিস খুব বেশিই দেখা যায়, সে হল অর্থ উপার্জনের চিন্তা, আর ভোগের মধ্যে সুখ। সুখ মেলে কিনা জানা যায় না। তবে স্বস্তি নিশ্চয় আছে। কমলা তো বলেইছে, 'এক্সচেঞ্জ অফ লেবার। আমি আমার মেহনত দিয়ে উঁচুতে ওঠবার সিঁড়ি কিনে নিচ্ছি।' উঁচুতে ওঠাটাই বড়, উঁচুতে উঠতে সবাই চায়। সে রাজাও চায় ফকিরও চায়। ভাগ্যের হাতে মার খাবার জন্যে কেউ বসে থাকে না। সেই ভাগ্যোন্নতির জন্যে ন্যায়নীতির প্রশ্ন খুবই গোলমেলে ব্যাপার, সে সব মনে না রাখাই ভাল। এ মূল্যবোধ আজকের আধুনিক সমাজের মানুষের মনে। এই মূল্যবোধও একদিন পাল্টাবে, সেদিন কি আসবে বোঝা যায় না। চিন্তাও করা যায় না সেই আগামী দিনের ভবিষ্যতে কি লেখা আছে। আমরা একালে বসেই বলি, মানুষের আজ কি মনোপ্রবৃত্তি হয়েছে। সমাজ নীতির কেউ ধার ধারে না। নারী পুরুষ যথেচ্ছ ভাবে মেলামেশা করে। সেদিন এক সংবাদিকের কলমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ব বিভাগের এক গবেষণা চোখে পড়ল। তাদের গবেষণা ছিল, 'একালের দম্পতিরা এত বিবাহবিচ্ছেদ করছে কেন?' গবেষণায় জানা গেল, ফ্রি মিকসিংই সম্পূর্ণ এর জন্যে দায়ী। আর ছেলেমেয়েদের ওপর বাবা মার প্রভাব পড়ে। সুখী ও অসুখী দম্পতিদের আলাদা করে জেরা করা হয়েছিল। আগের যুগেও দাম্পত্য জীবন সুখের হত না কিন্তু বিচ্ছেদের কোন প্রশ্ন ছিল না, কারণ বিচ্ছেদ আইনে বলবৎ ছিল না। সে যুগে পুরুষই বেশি অত্যাচারী দেখা যেত। পুরুষ নিজের অধিকার বলে স্ত্রীর ওপর প্রতাপ দেখাত, স্ত্রী অশিক্ষার দৌলতে নিরুপায় হয়ে স্বামীর অধীনতা স্বীকার করত। অর্থাৎ এক পক্ষ বলপ্রয়োগ করত, আর এক পক্ষ নতি জানিয়ে মনে জ্বালা নিয়ে চুপ

করে থাকত। এটা ভাল কি খারাপ সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। ভাল যে নয়, স্ত্রীলোকের অনেক অভিযোগে তা জানা গেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই একালে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বলবৎ হয়েছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীই আগে বিবাহ বিচ্ছেদ চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের গবেষণায় জানা গেল, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, অধিকাংশ বিবাহ পূর্বজীবনে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায়। বিবাহের আগে যদি মিলনের আনন্দ যুবক যুবতী পুরোমাত্রায় পেয়ে যায়, তাহলে বিবাহের পরে সে আনন্দের কোন মোহই থাকে না। এই গবেষনায় এটাই বলা যায়, বিবাহের পরে নবদম্পতির মধ্যে মিলনের একটা আনন্দ আছেই, এবং পরস্পরের কাছে এ আনন্দ কিছুকাল স্থায়ী হয় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কি হয়? পরস্পরের মধ্যে এই যৌন আকর্ষণই কি বিবাহ জীবনের আসল সেতু? কিন্তু তা যে নয় আমরা শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মনের আকর্ষণই সবচেয়ে প্রধান্য লাভ করে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে। আগে মূলের দিকে তাকালে কাণ্ডটা আপনিই এসে যায় কিন্তু মন যখন আমাদের ভঙ্গুর, মনের চাওয়া পাওয়া যখন আমাদের স্থির নয়, তখন দাম্পত্য জীবনে সুখ আসবে কেমন করে? তাই অসুখী হয় দম্পতিরা। আর অবাধ মেলামেশার ফল অবাধ মিলন। তাতে যেটুকু আকর্ষণ থাকে তাও অঙ্কুরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই যে অসুখী দাম্পত্য জীবনের গবেষণা, এতেই বোঝা যায়, আমরা নর নারীরা যে জীবন গ্রহণ করেছি, তা দীর্ঘস্থায়ী সুখের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা গল্প এই প্রসঙ্গে হাজির করা যায়, যেমন, দুটি যুবক যুবতীই দুই অফিসের চাকুরে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রঙ, কথাবার্তায় খুব স্মার্ট। বহু রূপ-মুগ্ধর দল তার পিছনে ঘুরে বেড়ায়। উর্বশী এর জন্যে গর্বিত। নিজের অফিসের যুবকরা যেমন তার পিছনে ঘুরে বেড়ায়, অন্য অফিসের যুবকরাও তার আকর্ষণে মুগ্ধ। উর্বশী সবার সঙ্গেই মেশে, সবাইকে সঙ্গ দেয়। অবাধ যৌন মিলনেও তার কোন ক্লান্তি নেই। বরং এই মিলনকে সে তুচ্ছ মনে করে। বলে, 'এ তো যৌবনের একটা খেলা। খেলায় কি কারুর ক্লান্তি আসে? কেন ছোট বেলায় পুতুল খেলা খেলিনি?' বুঝুন, বঙ্গললনা হয়ে উর্বশীর মানাসকতা। সেই উর্বশীর সঙ্গে হঠাৎ নিলয়ের আলাপ হয়ে গেল। নিলয়ও উর্বশীর মত বহু যুবতীর মনের আরাধ্য পুরুষ। নিলয়কে দেখতেও মোটামুটি সুন্দর। ব্রাকবাশ করা চুল। মুখশ্রী সুন্দর, স্বাস্থ্য অটুট। কথাবার্তায় চৌকস। চমৎকার হাসি দিয়ে

সে মেয়েদের মন জয় করতে পারে। নিলয় যদি কোন চিত্রতারকা হত, কেউ অবিশ্বাস করত না। এই নারীমনজয়ী নিলয় বহু নারীর প্রসাদ লাভে ধন্য হয়েছিল। এবং সে নারীর দুর্বলতার সুযোগে তাদের দেহও পবিত্র রাখে নি। এ হেন নিলয়ের জীবনে উর্বশী এল। দুজনে দুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসল। সত্যিই ভালবাসল। কেউ কারুর কাছ থেকে দেহ চাইল না, মনের নিবিড় আকাঙ্ক্ষাতেই তারা মিলে গেল। তারপর বিবাহ হল।

বিবাহ জীবনের প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে এক অবসাদ এসে গেল। পরস্পরের মধ্যে খিটিমিটি। কেউ কারো অধীনতা মানতে চায় না। তারপর মিলনের আনন্দতেও কোন আগ্রহ নেই। একদিনের কথা দিয়ে এ অংশ বোঝানো যায়। নিলয় বলল, 'কি তোমার শরীর ঠিক আছে তো!' উর্বশী নিলয়ের দিকে তাকাল। কোন জবাব দিল না। উর্বশী ভাবল, নিলয়টা খুব হ্যাংলা, কেবল শরীর নিয়ে চিন্তা করে। নিলয় সেই জন্যে অন্ধকার ঘরে উর্বশীর গায়ে হাত দিলে উর্বশী বিরক্ত হয়ে হাত সরিয়ে দিল। নিলয় বলল, 'কি হ'ল? এর মধ্যে মোহ কেটে গেল?' উর্বশী বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' নিলয় ভাবল, 'সত্যিই কি ঘুম? না, অফিসের সেই সঞ্জয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আসা হয়েছে।' নিলয়ের এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। হাজার হোক, উবশী এখন তার স্ত্রী, অন্য পুরুষের সঙ্গে মিশলে কি সে সহ্য করতে পারে? নিলয় উঠে বসল, বেড সুইচ জ্বেলে উর্বশীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, এর মধ্যেই সব মিটে গেল?' উর্বশী তাকিয়ে রইল নিলয়ের দিকে।

নিলয় বলল, 'সঞ্জয় বুঝি খুবই আনন্দ দিচ্ছে, তাই আমাকে আর দরকার নেই?'

উর্বশী উঠে বসল, বলল, 'কি সব বলছ? আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না'। নিলয় বলল, 'ঠিকই বুঝতে পারছ, সঞ্জয়কে যে ভোল নি, সে তো আমি জানি।'

সঞ্জয় উর্বশীর অফিসে চাকরী করে। এখনও উর্বশী তার সঙ্গে মেশে। তবে যৌন সংসর্গ হয় কি না জানা যায় না। উর্বশী বলল, 'তুমিও তো অপর্ণার সঙ্গে মেশ, মেশ না?'

নিলয় আর কথা বলতে পারল না, যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনি ফণা নামিয়ে ধপাস করে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল।

একালের দুই বিবাহিত যুবক যুবতীর মানসিকতা লক্ষ্য করলেন তো! কেউ

কাউকে বিশ্বাস করে না, অথচ দুজনেই প্রেম করে বিয়ে করেছিল। ওরা কি ভেবেছিল, বিয়ের পরও তারা পূর্ব জীবনের জের বজায় রেখে চলবে? কিন্তু কি যে হয়ে যায়, কেউ জানে না, অথচ হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ এই কি হয়ে যায় নিয়ে গবেষণা করেছে, তাতেই এই অবাধ মেলামেশা বিবাহ জীবনের সব আনন্দ লোপ পায় বলে রায় দিয়েছে। আমরাও এক গল্প দায়ের করে দেখালাম, উর্বশী নিলয়ের মানসিকতা। দুজনেই অবাধ মিলে মিশে মিলনের আনন্দ পরিপূর্ণ করে নিয়েছে, মেয়েদের আগে যেটা ভয় ছিল, বিজ্ঞানের আনুকূল্যে সে ভয় কিছুটা স্তিমিত হয়েছে, তাই নারীর আর যৌন মিলনে কোন ভয়ই জাগে না। অনেক আধুনিকাদের ব্যাগ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কোন বন্ধু জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ভাই প্রোটেকশনের জন্যে সঙ্গে থাকাই ভাল, কে ঝঞ্ঝাট চায় বল্?' এই যে মানসিকতা এ কেন নারীর মনে? না, সে জানে, তার প্রয়োজন পুরুষের কাছে যেমন বেশি, তেমনি নিরাপত্তার জন্যে নিজেরই সঙ্গে প্রোটেকশন রাখা ভাল। এই নারীদের যখন বিবাহ হয়, তখন তারা কি আর একটি পুরুষের স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার জানে, পতিতা নারীর মত বহু পুরুষের সঙ্গ দানের পর একটি পুরুষের ঘরণী সে হয় কিন্তু তার কি মনে পড়ে যায় না, তার পরিচিত পুরুষদের?

তাই বিবাহ জীবন আর সুখের হয় না। পুরুষের কথা বলতে গেলে এই বলতে হয়, তারা তো চিরকালের উন্মাদ, ঈশ্বর তাদের এই ভাবে গঠন করেছেন। সংযম তাদের মধ্যে খুবই কম। সেই জন্যে অনাদি অনন্তকাল থেকে শুধু পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে এসেছে। পুরুষই দশ বিশটা নারীর সাহচর্য পাবার জন্যে লালায়িত। পেয়েছেও তাই কিন্তু নারীকে আমরা সে সুযোগ দিই নি। একালে নারীও সেই সুযোগ পেয়েছে কিন্তু পরিণাম কি হচ্ছে? নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবনে আর সুখ নেই। তাহলে হয়ত আপনি বলবেন, 'আপনার কি ইচ্ছে, নারী আগের মত সংযম ধারণ করুক, আর পুরুষ নিজের প্রতাপ প্রকাশ করে যাক্।' কিন্তু সে কথায় এই বলা যাবে, আপনি আমি বললেই তো আর সেই জীবন ফিরে আসবে না। নারী নিজের শিক্ষা দীক্ষা বুদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার করে প্রগতির জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। সামনে লোভের রংমশাল, দেহসুখ স্বাভাবিকভাবে তার হাতের বাইরে নয়। একালের মানসিকতায় নারী সে সুখ গ্রহণ করবেই। ঠেকানোর সাধ্য আপনার আমার কারুর নেই। তাই

বলা যেতে পারে, দাম্পত্য সুখ বুঝি চিরতরে আমাদের জীবন থেকে বিদায় নিল। সমস্যাটা কি বুঝিয়ে না বলা গেলেও আশা করি না বোঝার থাকল না।

আর মা বাবার কলহ যে পরবর্তী ছেলে মেয়ের জীবনে দাম্পত্য সুখের অন্তরায় হয়, এ বলা বাহুল্য। আজকাল বহু ছোট ছেলে মেয়ের কাছে শোনা যায়, সে হয়ত স্কুলে না খেয়ে এসেছে, শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করল, 'রুমা, তোমার মুখ শুকনো দেখছি কেন?' রুমা যা বলল এই, 'বাবা মা খুব ঝগড়া করেছে, সেই জন্যে আমাদের আজকে রান্না হয় নি। বাবা না খেয়ে অফিস চলে গেছে। মা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘুমছে।' এও সেই উর্বশী নিলয়ের মত দাম্পত্য জীবন। আপনি খোঁজ নিলে এই দেখতে পাবেন, পাবেন অর্থকরী ভারসাম্যর চেয়ে, দাম্পত্য সুখের এই গভীর অন্তর্নিহিত বিশেষ অর্থটিই আসল কারণ। কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ কারুর অধীনতা চায় না। তার ফল সন্তানদের ওপর প্রতিফলিত হয়। এমনি একটি গল্প একজন লেখকের লেখনীতে পড়েছিলাম। মেয়েটি বিয়ে করতে নারাজ শুধু বাবা মার দাম্পত্য জীবন দেখে। বাবা মার ওপর অযথা অত্যাচার করে, কোন কারণ নেই রাগ হলেই বাবা মাকে ধরে মারে। একবার এমন মার মারল, মা খাট থেকে পড়ে গিয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল। পাঁচ বছরের মেয়ে শকুন্তলা সেই দৃশ্য অবাক চোখে দেখেছিল। জ্ঞান হবার পর থেকে সে বাবাকে কোনদিনও ক্ষমা করে নি। বড় হয়ে সে মনে মনে ঠিক করেছিল, সে কোনদিনও বিয়ে করবে না।

শকুন্তলা দেখতে খুব সুন্দরী হয়েছিল, পড়াশুনাও শিখেছে, ভাল অফিসে স্টেনোর চাকরী করে। সুতরাং মৌচাকের পিছনে তো মৌমাছি ঘুরবেই। শকুন্তলা তাদের সঙ্গ দিত, তাদের সঙ্গে ঘুরত, ভালবাসার খেলা খেলত কিন্তু কেউ বিয়ে করতে চাইলে সপাটে 'না' বলে দিত। এই 'না'র রহস্য কেউ জানত না। একটি যুবক অত্যাধিক ভাল বেসেছিল শকুন্তলাকে, সে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল, তখন শকুন্তলা ঘটনাটা বললো।

শিশুমনের ওপর কোন বিরুদ্ধ ছবি রেখাপাত করলে যে সেটা মনে দাগ ফেলে দেয়, শকুন্তলার দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ। এটাও গবেষণার কেন্দ্রীভূত ছিল। কি ছেলে বা মেয়ে সমস্ত শিশুমনই একই ধাঁচের। বাবা মা-র ব্যবহারের ওপর যে ছেলে মেয়ের চরিত্র গঠন হয়, এ আর কারো অজানা নয়। বাবা মা-র মধ্যে নিবিড় ভালবাসা থাকলে ছেলে মেয়ে ভালবাসার ইন্ধন পায়। পরিবেশ যে মানুষকে কি দেয়, সে এই শিশুমন দেখেই বোঝা যায়। বাবা

মা অত্যধিক মিথ্যে কথা বললে, শিশুও বলতে শেখে। বাবা মা সাবধান করলে মুখরা শিশু বলে, 'তোমরাও তো মিথ্যে কথা বলো।' এমন কি এও দেখা যায়, শিশুর সামনে বাবা মা যৌনক্রীড়া করলে শিশু মনে তার ছাপ পড়ে। সেও অন্যের সঙ্গে যৌন ক্রীড়া করতে চায়।

সেইজন্যে বাবা মার দায়িত্ব যে কত, সে এক কথায় বোঝানো যায় না। এই মুহূর্তে একালের জীবন ভাবনা দেখে তাই ভীষণ ভীত হতে হয়, ভবিষৎ কোন্ পদচিহ্ন ধরে এগোচ্ছে! আমরা শরৎচন্দ্রেব বারবনিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁর নারীরা কোন্ জীবনের সাধনা করেছিল, দেখেছি। তারপর থেকে বহু বছর গত হয়ে গেছে, শরৎচন্দ্র আজ জন্মের একশত বছরে পড়েছেন। তাঁর কাল আর নেই কিন্তু তাঁর সৃষ্ট মানুষগুলি যে কি ম্লান হয়ে গেছে, আজকের মানুষের জীবন ভাবনা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়। তিনি পতিতাদেব সমাজে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। তাদের ভেতরের ভালবাসা প্রকাশ করে, মানুষকে ভালবাসতে বলেছিলেন। 'তাদের বৃত্তিকে ঘৃণা কর, কিন্তু মানুষের আত্মার ভেতর যে ভগবান আছে, তাকে ঘৃণা কব না।' মানুষের আত্মার ভেতর ভগবান যে আজও বাস করে, সে তো অস্বীকার করা যায় না কিন্তু শরৎচন্দ্রের পথ আমরা কতটুকু গ্রহণ করেছি? তিনি জীবনভোর লেখার মধ্যে মানুষের কল্যাণই করতে চেয়েছিলেন। মানুষের সমাজে যে নারীর স্থান সর্বাগ্রে, নারীর কল্যাণময়ী রূপ যে জাতীয় জীবন গঠন করে, সংসার সুশৃঙ্খল করে, সেটা দেখে নারীর জীবনের বঞ্চনা মোচন করতে, তাদের স্বস্তি দান করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু সে আন্দোলন মুখে না করে কলমের বুকে সৃষ্টি করেছিলেন। সার্থক যে হয়েছেন, সেটা তাঁর জনপ্রিয়তায় প্রমাণিত হয় কিন্তু তিনি কি শুধু নিজের জনপ্রিয়তাই চেয়েছিলেন? না, সমাজের মঙ্গল চেয়েছিলেন? এই প্রশ্নটা এই শতবর্ষে অগণিত পাঠকের সামনে তুলে ধরা যায়। তাঁর সাবিত্রী, তাঁর কিরণময়ী, তাঁর অচলা, তাঁর পার্বতী আরও আরও অনেকে এ যুগে কোথায় গেল? এদের হাজির করেই তো জনমানসের সামনে নারীর মানসিকতা তুলে ধরেছিলেন। একরকম বলতে গেলে তারই আন্দোলনের প্রভাবে বঙ্গনারীর প্রগতি কিছুটা সম্ভব হয়েছে। কিছুটা বলা হল এই কারণে, সবটাই তো তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় নি। আগে ও পরে অনেকেই ছিলেন। তাঁদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, আমাদের বক্তব্য শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। তাঁর জীবন ভাবনার সঙ্গে যুক্ত শুধু নিছক

সাহিত্য নয়, সমাজ সংস্কারক হিসাবে। কিন্তু সমাজের কি উন্নতি হয়েছে তারই একটি পরিক্রমা আমরা করেছি। পরিক্রমা করে এই দেখতে পেয়েছি, নারী নিজের বক্তব্য রাখবার অধিকার পেয়েছে। নারী তার স্বাধীনতা পেয়েছে। বিপ্লব সে করতে পারে কিন্তু কোথায় যেন সে অসহায়, বিশেষ করে তার সাংসারিক জীবনে। শরৎচন্দ্রের কালে যে অসহায়তায় নারী পড়ে পড়ে মার খেত, সে কাল যেন অস্তমিত হয় নি। প্রসঙ্গত বলা যায়, সূর্যোদয় হয়েছে কিন্তু কোথায় যেন তার আলোর প্রকাশ লুকিয়ে আছে। আর বারবনিতার জন্যে যে আন্দোলন করেছিলেন, তাদের কোন উন্নতি হয় নি। বরং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে। আগে যৌবনের কান্নায় নারী পদস্খলিত হত. এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিবিধ কারণ, সে কারণ আগে আলোচনা করা হয়েছে। সে কারণের মধ্যে এইটুকু জানা গেছে, নারীর মুক্তি বুঝি ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত নয়।

নারী যুগে যুগে শুধু তার লাঞ্ছনার প্যাটার্ন পালটায়। সে যুগের লাঞ্ছনা ছিল অন্য। এ যুগে তার ভোল বদলেছে। এখন নারী নিজেই নিজের হন্তা হয়েছে। কেউ গরীব সংসারের জন্যে চাকরীর সন্ধানে ঘুরে সহজ পথে দেহ ব্যবসা নিচ্ছে। কেউ স্বামীপুত্রের সংসারে অর্থের প্রাবল্য আনবার জন্যে দেহ বিক্রী করে সেই সুখ প্রার্থনা করছে। এসব আমরা আগে বলেছি। এখন বক্তব্য অদ্ভুত এই যে, বারবনিতা জীবন এ তো শরৎচন্দ্র চান নি। তবে কেন এ হল? কিন্তু সবার উপরে যে সামাজিক পরিবর্তন, সে কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, সেটা ঘটবেই। আর এই ঘটমান বর্তমানকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। সে বোঝবার ক্ষমতা কারুর নেই। তাই এ আলোচনা এখানেই মুলতুবী রাখা ভাল। তবু না বলে পারা যায় না, আমরা বিভিন্ন গল্পের মধ্যে যে সব ঘটনা প্রকাশ করেছি তাতে এই প্রতীয়মান হয়, কিরণময়ী আর এ যুগে নেই। সে হৃদয় যন্ত্রণা নিয়ে স্বামীর ছাত্রী হয়ে থাকে না। অন্য পুরুষের সাহচর্য তাকে ভয় জাগায় না। সে দাপটে এগিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গ নেয়। কেউ প্রতিবাদ করলে বলে, 'কি করব, স্বামীর যদি আমার দিকে কোন দৃষ্টি না থাকে, তবে কি শুকিয়ে মরব?' ..অচলার কথা ধরুন, অচলা যাকে ভালবেসে বিয়ে করল, তার নীরবতাই তাকে অন্যদিকে ঘোরালো। একরকম তার সমর্থনেই কামপীড়িত পুরুষ নিজের সুযোগটি নিল। আর অচলা পরে যখন নিজের অসহায় অবস্থা বুঝল, তখন আক্ষেপে মরে গেল। এসব কথা আমরা আগেও আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি করতে চাই না। শুধু বক্তব্য, এই কিরণময়ী, অচলা কিসের সাধনা করেছিল? দ্বিতীয় পুরুষের

শয্যাসঙ্গিনী হ'তে তারা মরমে মরে গেল কেন? যখন কামিনী বাড়ীওলী বলেছিল, 'আমরা তো বেবুশ্যে, আমরা সুখের পায়রা, যে টাকা দেবে তারই আমরা কেনা বাঁদী?' এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিরণময়ীর অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠেছিল। কেন? নারীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মূলধন তার ইজ্জত, তার নারীত্ব। সেটুকু যদি সস্তা হয়ে যায়, তবে নারীর আপন বলতে কি থাকল? শরৎচন্দ্র নারীর ইজ্জত দিয়ে নারীকে কোন কল্যাণের পথ দেখান নি। বরং ভালবাসার রংমশাল জ্বালিয়েছেন। তাদের বিবিধ সমস্যা তুলে ধরেছেন। সমস্যাগুলি একটি একটি করে তুলে ধরে পাঠককে দেখিয়েছেন, 'তোমরা নারীর মনের কথা বোঝ।'

সমস্যা আজও আছে সেটা নিঃসন্দেহ কিন্তু এখন নারীর মানসিক স্থৈর্য অন্য একটা পথ ধরে এগোচ্ছে। সে পথ যে খুবই বন্ধুর, সেটাই আমাদের বক্তব্য। সে পথ যে রোধ করে দাঁড়াতে হবে এটাই এখানে আলোচ্য। শরৎচন্দ্রের শতবর্ষ উৎসব উদযাপিত হচ্ছে দিকে দিকে। অনেক মানী গুনী লেখক, রাজনীতিজ্ঞ, অধ্যাপক, সমাজসংস্কারক তাঁর জীবনভাবনা নিয়ে বহু বক্তব্য রাখছেন কিন্তু এই যে আজ সামাজিক বিবর্তন, এই দিকে কি কেউ আলোকপাত করছেন? মনে তো হয় না, কারণ এই ঝঞ্ঝাটের দিকে কেউই দৃষ্টি দিতে চাইছেন না। তারও কারণ, সামাজিক অন্তর্বিপ্লবে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। কিন্তু আমাদের কি কর্তব্য? বরেণ্য লেখকে, লেখনী নিয়ে যেমন আলোচনা হওয়া উচিত, তেমনি তিনি আজীবন যাদের জন্যে প্রাণ মন সমর্পন করেছিলেন, তাদের কথাও ভাবা উচিত। তাদের কল্যাণের জন্যে আরও একবার নারীজীবন খতিয়ে দেখা উচিত।

এই একশ বছর পরে বঙ্গনারীর কি পরিণতি হয়েছে? শিক্ষার আলোয় যাদের বুদ্ধি ঝকঝকে হয়েছে, তারা কি ভাবছে? আর যারা এখনও শিক্ষালাভে বঞ্চিত, তারাই বা কি করছে?

একটু দৃষ্টি মেললে সেটা ধরা যাবে। আমরা কিছুটা আগে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে, বঙ্গনারী নতুন বিপ্লবে মাথা গলিয়েছে। সেই বিপ্লবটা যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়, ফলও তার বিষময়, সেটা ভালভাবেই বোঝা গেছে।

শরৎচন্দ্রের শতবর্ষে তারই সংস্কার করতে হবে। করলে সেই বরেণ্য লেখকের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হবে। বক্তৃতা দিয়ে নয়, বা বক্তা সেজে নয়। বক্তা ও বক্তৃতা অন্য মহৎ কিছুর জন্যে মনে পড়ে না রাজলক্ষ্মীর

কথা! যে ভাগ্যদোষে বাঈজী জীবন নিয়েছিল কিন্তু সে আজীবন কিসের সাধনা করেছিল? প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা, দয়া, করুণা যেন তার নারী-জীবনের সমস্ত সত্তা ঘিরে মহীয়ান ছিল। তার সৃষ্টি তো ঐ শরৎচন্দ্রেরই। সেই স্রষ্টার মানসিকতায় যার জন্ম তার কর্মও স্রষ্টাই সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সেখানে আমরা কি দেখেছি, মূর্তিময়ী এক নারীকে? সে স্নেহে, করুণায় বাৎসল্যে সবাইকে জয় করে আছে। সে নিজের জন্যে একটুও ভাবে না, অথচ তার ভাবনা সবার জন্যে। তার সপত্নী পুত্রের বিবাহ, ভৃত্য রতনকে স্নেহ, অভাগিনী নারীদের জন্যে দান, সর্বোপরি যে যেখানে আছে, তাদের জন্যে অকাতরে তার মন ব্যাকুল হয়েছে। আর নিজের জন্যে সে রেখেছে একটু আশ্রয়, সে শ্রীকান্তর সাহচর্য। নারীর মনে একটি পুরুষেরই তো ছায়া পড়ে, যে সারাজীবন বুকের মধ্যে বিরাজ করে, যেমন রাধার বুকে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করত।

রাধাও যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিরহে পাগল হয়েছিল, রাজলক্ষ্মীও বার বার শ্রীকান্ত বিহনে পাগল হয়েছে। কখনও রাগ করেছে, কখনও অভিমান কিন্তু কখনও নিজেকে মূল্যহীন করে নি। তারপর শেষ পরিণতি মা হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে। এটা খুবই ইঙ্গিতের মধ্যে প্রকাশ করেছে, কোথাও শালীনতা বর্জিত হয় নি। এই যে নারীমনের সংযম, এটাই কি আমাদের ভারতীয় তথা বঙ্গনারীর আদর্শ নয়? রাজলক্ষ্মী তো ইচ্ছে করলে নিজের জৈবিক ক্ষুধাকে বড় করে শ্রীকান্তকে বলতে পারত, 'তুমি তো বেকার বাউণ্ডুলে লোক, আমার অনেক টাকা আছে, আমার কাছে থাকো, তোমাকে আমার দরকার।' সে দরকার কি স্পষ্ট করে না বললেও শ্রীকান্ত ঠিকই বুঝত। যেমন একালের রাজলক্ষ্মীর মত পেশাদার মেয়েরা বাবু রাখে, বাইরের চোখে তারা স্বামী কিন্তু ভেতরে তারা ঐ জন্যেই থাকে। শরৎচন্দ্র কি এসব জানতেন না? জানতেন বলেই তো এদিক দিয়ে তিনি রাজলক্ষ্মীকে সৃষ্টি করেন নি। কেন করেন নি? তার কারণ তিনি ভেবেছেন সেই আদর্শ নারীর ধর্ম। এই আদর্শ নারীর ধর্মটিই আমাদের বক্তব্য। আজ এই শতবর্ষের সময়ে সেই আদর্শ নারীর ধর্মতে নারীকে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে, সাংসারিক কল্যাণ না করলে জাতীয় জীবন ভেঙে পড়বে। আর অর্থনৈতিক চাপের ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে, তারও সুন্দর বিশ্লেষণের জন্যে প্রত্যেকের সজাগ হতে হবে। নারীর ইজ্জতকে মূলধন করে যে সাময়িক বাঁচা যায়, ভবিষ্যৎ রক্ষা হয় না। বরং নোংরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে

একদিন নিজেরই ঘৃণা লাগবে। তাই এ ইচ্ছা ত্যাগ করা সবারই শ্রেয়। তাতে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হবে না।

আর য়ুরোপ, আমেরিকা দেশের দিকে তাকিয়ে যে আমরা তাদের অনুকরণ করব, তাও ঠিক নয়। শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্নে সে প্রশ্নও উপস্থিত করেছিলেন, আমরা স্বীকার করি নি, তবে কেন সেই দিকে তাকিয়ে তাদের জীবনকে নেবার চেষ্টা করব?

এ সনাতন ভারতবর্ষ। এ দেশের মাটিতে আছে, আধ্যাত্মিক ভাব সাধনা। এর বাতাসের সঙ্গে অন্য দেশের বাতাস কি মেলে? এই বোধটুকু বার বার শরৎচন্দ্র নিজের লেখনীতে লিখেছিলেন। আমরাও সে কথা মন থেকে মুছে ফেলব না। হ্যাঁ, পার্বতী যেমন ভালবাসার মানুষকে পায়নি বলে পুড়েছিল কিন্তু সে তো দ্বিচারিণী হয় নি, তাতেই যে মানুষের বুকে জায়গা পেয়েছে। এই দগ্ধরূপ কি এ দেশের নারীর কাম্য নয়? এই দগ্ধরূপই তো ভারতীয় নারীর জীবনের ঐতিহ্য। এত কথা এসে গেল শুধু একালের নারীর দিকে তাকিয়ে। যারা এই প্রবন্ধ পাঠ করছেন, আশা করি বুঝতে পারছেন, কেন এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করা হচ্ছে।

একালের বারবনিতা প্রসঙ্গে তাই এইটুকু বলা যায়, শরৎচন্দ্র যেন এ ইঙ্গিত দেখে গিয়েছিলেন। তাই শেষের দিকে যখন আবার কলম ধরেছিলেন, তখন একেবারে এক পদস্খলিতা নারীকে উপন্যাসে এনেছিলেন। মৃত্যুর আগে শেষ উপন্যাস, 'শেষের পরিচয়'। 'আগে লিখেছিলেন 'শেষ প্রশ্ন'। তখন বুঝেছিলেন, তাঁর শেষ প্রশ্ন শেষেরই প্রশ্ন। নারী প্রগতির জন্যে তাঁর আর কিছু বলার নেই। তারপর বহুবছর নিরুত্তর ছিলেন। সমাজ, সংসার, মানুষের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নারীর অন্য একটা নতুন রূপ তাঁর মধ্যে ঝলকে উঠেছিল। লিখতে শুরু করলেন। সবিতা সেই নারী। যে নারী স্নেহে, করুণায়, প্রেমে সমুজ্জ্বল, স্বামী সৌভাগ্যবতী অথচ ঘর ছেড়ে চলে গেল। কেন গেল? যখন তাকে তার স্বামী ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সে বলল, 'জানি নে।' 'জানো না?' 'না।' নারীর এই মনের কথা নারীও জানে না। শরৎচন্দ্রও জানতে পারেন নি। তাই আবার ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করতে নারী বলল, 'যেদিন জানতে পারব সেদিন বলে যাব।'

এই যে নারী মনের রহস্য, এটা শরৎচন্দ্রের কাছে খুবই দুর্জ্ঞেয় ছিল। কথায় বলে না সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। নারীর এই ধর্ম বড় আশ্চর্য। আর নারী

জানে না সে কেন এটা করে? এই স্বভাবও তার দুর্জ্ঞেয়। স্ত্রি. দেবা ন জানন্তি। সেই রূপটি যেন শরৎচন্দ্র এই শেষের দিকে ধরতে পেরো. সুন্দরী বধূ ঘর ছেড়ে এক মাতালের ঘরে ঢোকে। আর সেখানে কি পায় এক উৎশৃঙ্খল পুরুষের কামপ্রবৃত্তির সোহাগ। সবিতাও তেরো বছ: রমণীমোহনের কাছ থেকে তাই পেয়েছিল কিন্তু বিস্ময়ে সেই ভেবেছিল, 'আমি লোকটাকে মেনে নিলাম কেমন করে?' তবে কি এই ধারণা হবে, সবিতা ব্রজগোপালের দ্বারা তৃপ্ত হত না, সেইজন্যে রমণীমোহনের ওপর ভর করেছিল?

তাও শরৎচন্দ্র ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন নি, শুধু বলেছেন, 'মেজবাবু বড় ভাল মানুষ ছিল।' ভাল মানুষ অর্থে কি বোঝাতে চেয়েছেন? ব্রজগোপালের কথায়ও তো বোঝা যায় না তিনি স্ত্রীকে খুশী করতে পারতেন না। যাই হোক নারীর পদস্খলনই এখানে স্রষ্টা বোঝাতে চেয়েছেন। সেখানে কোন হেতু বড় নয়। হেতু যে কিছুই ছিল না, সেটাই এ উপন্যাসের আসল বিষয়বস্তু। নারীর আজও অনেক পদস্খলন যে হেতুহীন সেটাই একালের ধর্ম। শরৎচন্দ্রের শেষের দিকে এই প্রশ্নই মনে উদয় হয়েছিল। বেঁচে থাকলে আরও কোন্ কোন্ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগত কে জানে? সে যাই হোক্, যে প্রশ্ন নিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেছেন সেটাই বলা যাক্। সেই পদস্খলনই একালের নারীর ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কারণে অতৃপ্ততা মনেরও হতে পারে দেহেরও হতে পারে। সে নারী নিজেই জানে না। সবিতাও জানত না। শরৎচন্দ্রের শেষের প্রশ্ন দিয়ে শেষের কথাই এসে যায়, নারী চরিত্র সত্যিই বিরাট রহস্য। দেবতা নিজেই যখন জানে না, তখন মানুষ তো তার কাছে শিশু। মানুষ চিরকাল তাকে গবেষণা করে যাবে। পৃথিবী এগিয়ে চলবে। আবার এক নতুন শরৎচন্দ্র জন্ম নেবেন, তখন তিনি আবার বসে যাবেন নারী রহস্য ভেদ করতে। নারীর দুঃখে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে। আমরা নতুন নতুন সৃষ্ট নারীর দর্শন পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠব। নারীর আবার এক নতুন রূপান্তর সেই সব সৃষ্টিতে দেখতে পাব।

এভাবেই চিরকাল নারীকে নিয়ে নানাবিধ আলোচনা হয়ে যাবে। আবার এমনি অনুশীলন হবে। পাঠক পাঠিকা তার রসাস্বাদন করবে।

তাই নয় কি?

———